হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি।

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

একবিংশতিবর্ষ।

১৩২০ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২০ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স দ্বারা

প্রকাশিত।

Printed by N. Dutt.

at the Janma Bhumi Press,

39 Manick Bose's Ghat Street.

CALCUTTA.

1914

বার্ষিক মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা] [ডাঃ মাঃ ।৵৹ ছয় আনা।

বর্ষসূচী।

১৩২০ সাল।

উ

ঐ

ক

গ

চ

জ

ত

দ

ন

প

শ

স

হ

৺

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি।

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

একবিংশতিবর্ষ।

১৩২০ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২০ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

সত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স দ্বারা

প্রকাশিত।

Printed by N. Dutt.

at the Janma Bhumi Press,

39 Manick Bose's Ghat Street.

CALCUTTA.

1914

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা] [ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা।

বর্ষসূচী।

১৩২০ সাল।

উ

ঐ

ক

গ

শ

স

হ

৺



ভক্তবীর সুরেন্দ্র নাথ মিত্র ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় করা ভাব বুঝিয়া এই ছবি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, ইহাতে শিবের মন্দির ও গির্জ্জার সন্মুখে গৌরাঙ্গদেব ও ঈশা উভয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন, ঠাকুর কেশব বাবুকে দেখাইতেছেন।

Janmabhumi Press.



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। | ১৩২০ সাল, বৈশাখ। | ১ম সংখ্যা।

জন্মভূমির একবিংশতি বর্ষ।

প্রণিপাত।

যিনি এই বিশাল বিশ্বমণ্ডলে, উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে, সকল দেশের, সকল জাতির, সকল মনুষ্যকে, রৌদ্র, বৃষ্টি, জল, বায়ু, শস্য, ফল, মূল, ইত্যাদি প্রাণধারণের যাবতীয় বস্তু সমভাবে দান করিতেছেন,—যাঁহার প্রসাদে আমরা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতির অপূর্ব্ব শক্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছি,—নব উদ্যমে "জন্মভূমি"র নব বর্ষের কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বে—সর্ব্বাগ্রে সেই ব্রহ্মাণ্ড-পতির শ্রীচরণে আমাদের সহস্র প্রণিপাত!

ধন্যবাদ।

করুণাময় জগৎপিতার কৃপায় আমাদের "জন্মভূমি" পত্রিকা যথাক্রমে বিংশতিবর্ষ অতিক্রম করিয়া একবিংশতিবর্ষে প্রবেশ করিল। "জন্মভূমি"র দ্বারা

জন্মভূমির যদি কিঞ্চিৎমাত্র উপকার সাধিত হইয়া থাকে, 'আমরাই তাহা করিয়াছি,' সেরূপ শ্লাঘা কদাচ আমাদের লেখনীর মুখে বহির্গত হইবে না; যদি কিছু সুফল ফলিয়া থাকে, তাহা সেই কৃপাময়েরই কৃপা। এই নববর্ষে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের এই প্রার্থনা যে, তাঁহার প্রসাদে বিগত বিংশতিবর্ষকাল যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে "জন্মভূমির" কর্ত্তব্য কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে, বর্ষে বর্ষে যেন সেই সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশনের শ্রীচরণকমলাশ্রয়ে সেইরূপে সর্ব্ববিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে এবং সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম-নীতি প্রচার ও হিন্দু সমাজের কল্যাণ-সাধন ব্রত পালন করিতে পারি। আমাদের অনুগ্রাহক, গ্রাহক, পাঠক ও উৎসাহদাতা লেখক মহাশয়েরা বিগত বর্ষে জন্মভূমির অঙ্গরাগ বর্দ্ধনার্থে যেরূপ উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমরা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মাসিক পত্রের উপযোগিতা।

জগতে যেমন অসংখ্য মানব, তেম্‌নি অসংখ্য গ্রন্থ। জগতে এত সৎগ্রন্থ আছে যে, সমস্ত মানব-জীবনেও তৎসমস্ত অধ্যয়ন করা অসম্ভব। সংসারী মানবের পক্ষে, ভাল ভাল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার অবসর অনেকেরই হয় না। "মাসিক পত্রে" সংক্ষেপতঃ বহু বিষয় আলোচিত, বহু তত্ত্ব সংগৃহীত, এবং বিবিধ বিষয়ের সারাংশ সঙ্কলিত হয়, বলিয়া মাসিক পত্র পাঠ করিতে জ্ঞানানুরাগী বিষয়ী ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ অনুরাগ, অভিরুচি ও অভিলাষ। "মাসিক-পত্র" যথানিয়মে পাঠ করিলে, অল্পকাল মধ্যে অনেক বড় বড় গ্রন্থ-পাঠের কার্য্য হইয়া থাকে। সুসম্পাদিত সাময়িক পত্র স্থায়ী সাহিত্য, সুতরাং স্থায়ী সামগ্রী। এই নিমিত্ত অধ্যয়নশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অন্যূন একখানি করিয়া উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা এমন কথা বলি না যে আমাদের মাসিক পত্রই উৎকৃষ্ট, প্রত্যেকে আমাদের পত্রিকাই গ্রহণ করুন। বোধ হয়, আমরা সেরূপ সঙ্কীর্ণ-হৃদয় নহি। বাঙ্গালায় অনেক সুবিজ্ঞ মাসিক সহযোগী রহিয়াছেন। যাঁহার যেখানিতে অভিরুচি, সেইখানিই তিনি গ্রহণ করুন। যিনি দেশের সমস্ত সাময়িক পত্রগুলি গ্রহণে শক্তিমান্ এবং মতিমান্, তিনি বড়ই ভাগ্যবান্। "জন্মভূমি" অপর কাহারও স্থান অধিকার করিবে না—"জন্মভূমি" নিজের স্থান নিজে অধিকার করিবে। "জন্মভূমি" পত্রিকার উদ্দেশ্য কি, জন্মভূমি তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ

করিবে; কারণ, "শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্"। এ স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক, এতাবৎকাল জন্মভূমি-পত্রিকাকে আমরা সার্ব্বজনিক করিতে সার্ব্বক্ষণিক চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।

মাসিক পত্রের আদর।

প্রাত্যহিক পত্রের জীবন এক দিবস *। সাপ্তাহিক পত্রের জীবন এক সপ্তাহ। কিন্তু, মাসিক পত্রের জীবন চিরকাল। প্রাত্যহিক পত্র প্রতিদিনের বার্ত্তাবহ। সাপ্তাহিক পত্র এক সপ্তাহের বার্ত্তাবহ। উভয়ই এক এক খানি আয়ত 'পত্র' আকারে প্রকাশিত। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, দৈনিক পত্র দিনান্তে এবং সাপ্তাহিক পত্র সপ্তাহান্তে বায়ু-বিতাড়িত বৃক্ষপত্রবৎ বিক্ষিপ্ত, পুরাতন পঞ্জিকাবৎ নিক্ষিপ্ত, এবং অব্যবহার্য্য জীর্ণ বস্ত্রবৎ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু, মাসিক পত্র সাধারণ বার্ত্তাবহ নহে, একাধারে বিবিধ ও বহুবিধ জ্ঞান-গর্ভ বিষয়ে পরিপূরিত এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, মাসিক পত্র পরিত্যক্ত হইবার সামগ্রী নহে—উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ন্যায়, গৃহিগণের গৃহে গৃহে, চিরদিন চিরস্থায়ী সম্পত্তিরূপে, সযত্নে ও সাদরে, সুরক্ষিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় মাসিক পত্রের প্রতি গ্রাহকগণের অত্যধিক আদর, এবং বিজ্ঞাপনদাতা গণেরও অত্যধিক আগ্রহ। তত্রত্য মাসিক-পত্র-সমূহ একটিবার উদ্ঘাটন করিলেই তাহার প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। মাসিক পত্র সমূহের বিজ্ঞাপনগুলি চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করে বলিয়াই মাসিক পত্রের প্রতি বিজ্ঞাপনদাতাগণেরও অত্যধিক আদর—সাহিত্য-সম্রাট্ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীমুখে আমরা প্রথম এই কথাটা শুনিতে পাই।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকগণ সমাজের প্রকৃত হিতৈষী ও পরম বন্ধু—পরার্থে স্বার্থ-বিসর্জ্জনকারী! এক একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে তাঁহারা যে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করেন, সেই সময়ে ও সেইরূপ পরিশ্রমে, তাঁহারা বহু সৎ সাহিত্য ও বহুবিধ গ্রন্থ স্থায়ী সাহিত্যরূপে প্রকাশ করিতে পারেন।—তাই বলি, প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকগণ যথার্থই পরার্থে স্বার্থ বিসর্জনকারী! আর একটী কথা—নানাবিধ বিষয়আন্দোলনে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই বিপদের মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়—এমন কি, দেশের জন্য ও দশের জন্য অনেকের বিরাগ ভাজন হইতে হয়।

* "Ephemeral"—Existing only for a day.

এজন্য প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিক পত্রের সহযোগী ভ্রাতাদিগকে আমরা যথেষ্ট সম্মান, সম্বর্দ্ধনা ও সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি।

বিলাতে মাসিক পত্রের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমাদের দেশেও মাসিক পত্রের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী। ১৩০১ বঙ্গাব্দে আমরা হিসাব করিয়াছিলাম, বিলাতে দৈনিক পত্রের সংখ্যা ছিল ৩৬—সাপ্তাহিক পত্রের সংখ্যা ছিল ৫৮৯; কিন্তু, মাসিক পত্রের সংখ্যা ছিল ৭৭২। বিগত বিংশতি বর্ষ মধ্যে বিলাতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের সংখ্যা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যদি কোনও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাহার সন্ধান করিয়া সাধারণের কৌতুহল পরিতৃপ্তি করেন, তবে একান্ত বাধিত হইব। বাঙ্গালায় আজকাল এত মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে যে এখনও আমরা তাহার সংখ্যা করিতে পারি নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালার অধিকাংশ মাসিক পত্রই "গতানুগতিক" প্রণালীতে প্রকাশিত হইতেছে—প্রায় সকলগুলিরই এক উদ্দেশ্য! কিন্তু, বিলাতে তাহা নহে।

বিলাতে কত বিষয়ে কত প্রকার মাসিক পত্র তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা।

১ সাহিত্য, ২ বিজ্ঞান, ৩ অধ্যয়ন, ৪ অধ্যাপনা, ৫ শিক্ষা, ৬ স্বাস্থ্য, ৭ শিল্প, ৮ কৃষি, ৯ বাণিজ্য, ১০ উদ্যান, ১১ জীবনী, ১২ ঔষধ, ১৩ চিকিৎসা, ১৪ ধর্ম্ম, ১৫ সমাজ, ১৬ সঙ্গীত, ১৭ দৃষ্টান্ত, ১৮ দাতব্য, ১৯ চিত্র, ২০ রন্ধন, ২১ গৃহস্থালী, ২২ কবিতা, ২৩ বনিতা, ২৪ গল্প, ২৫ উপন্যাস, ২৬ অভিনয়, ২৭ আমোদ, ২৮ রঙ্গ, ২৯ ব্যঙ্গ, ৩০ রহস্য, ৩১ রসিকতা, ৩২ সমালোচনা, ৩৩ প্রতিবাদ, ৩৪ পরিচ্ছদ, ৩৫ পশু-পক্ষী, ৩৬ বৃক্ষ-লতা, ৩৭ ফল-পুষ্প, ৩৮ যৌবন, ৩৯ ফ্যাসন, ৪০ শিক্ষক, ৪১ ছাত্র, ৪২ জনক-জননী, ৪৩ গৃহস্থ-গৃহিণী, ৪৪ বালক, ৪৫ বালিকা, ৪৬ যুবক, ৪৭ যুবতী, ৪৮ কেরাণী, ৪৯ ক্রীড়ক, ৫০ দর্জ্জী, ৫১ রজক, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিলাতে সকল শ্রেণীর লোকেরই এক এক খানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মাসিক পত্র বিরাজ করিতেছে। কিন্তু, আমাদের এমনই হতভাগ্য দেশ যে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মাসিক পত্র বিরাজ করিবে দূরে থাকুক, একখানি সুলিখিত ও সুচালিত মাসিক পত্র চলাই সুকঠিন। বঙ্গমাতার সন্তানগণের, বিশেষতঃ বঙ্গীয় ধনী-সন্তানগণের, কর্ত্তব্য বুদ্ধি এত প্রবল যে, একখানি মাতৃভাষার পত্রিকা গ্রহণ করাও তাঁহারা বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া মনে করেন!

তন্ময়তা বা ভাবোন্মাদ।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিরত্ন।

জগৎ ভাবময় বা জগন্ময় ভাব। জগতে যে কোন কার্য্য এবং যে কোন প্রাণী ভাবের অধীন। আহার নিদ্রা, শয়ন ভোজন, ভ্রমণ উপবেশন আমরা যে কোন কার্য্য ভাবাবেশে সম্পন্ন করিয়া থাকি, কিন্তু এই ভাবপ্রবাহের মধ্যে এমন একটি জিনিষ আছে, যাহাতে মানুষকে ভাবময় বা পাগল করিয়া তুলে, তাহাকে তন্ময় বা ভাবোন্মাদ কহে। এই তন্ময়তা ব্যতীত কোন কার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ হয় না বা হইতেও পারে না। পৃথিবীতে মানুষ অসংখ্য, ভাবও অসংখ্য, এবং প্রত্যেকের প্রকৃতি বা স্বভাবও স্বতন্ত্র। কেহ আহার প্রিয়, কেহ নিদ্রাপ্রিয়, কেহ ধর্ম্মপ্রিয়, কেহ অধর্ম্ম প্রিয়, এইরূপ সকলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের অধীন। ভাবেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, ভাবেই মনুষ্যত্বের বিনাশ। কিন্তু যে ভাবে মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ ঘটে, সেই ভাবই অবলম্বনীয়। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—ভাব, পশু ভাব, ইহাতে মনুষ্যত্ব বিনষ্ট করে, সুতরাং এবম্বিধ ভাবের বিবৃদ্ধি কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে তবে স্বাস্থ্য বা সমাজরক্ষার্থ যতটুকুর প্রয়োজন, কেবল মাত্র ততটুকু অবলম্বন করা উচিত। সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যেন কোন প্রকারে মনুষ্যত্বের অপচয় না ঘটে। আহারেও তন্ময়তার প্রয়োজন, কারণ দ্রুত-ভোজনে রস-বোধ হয় না, ভুক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হয় না, চর্ব্বিত না হওয়াতে ভুক্ত পদার্থের বৃহৎ খণ্ডগুলি পক্কাশয় পরিপাক করিতে পারে না, ফলে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা উচিত, কারণ আহারান্তে শ্রমজনক কর্ম্ম করিলে, ভুক্তদ্রব্য পক্কাশয়ে স্থির হইতে পারে না, ফলে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে। বাম পার্শ্বে শয়ন প্রশস্ত, কারণ পক্কাশয় বামপার্শ্বে অবস্থিত, বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, পরিপাক ভাল হয়। যথোচিতরূপে ভ্রমণ করা উচিত, ভ্রমণে শরীরের দাহিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, ফলে ভুক্তদ্রব্য সুজীর্ণ হয়, এবং ভুক্তদ্রব্য সুজীর্ণ হইলে, রক্তবৃদ্ধি হয়, রক্তবৃদ্ধি হইলে, বল বৃদ্ধি হয়, বল বৃদ্ধি হইলে স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে। আসন করিয়া উপবেশন করিলে, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হয়, ফলে শরীরের দাহিকা শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, ফলতঃ যাহাতে অব্যাহত থাকে, আহার নিদ্রাদিতে ততটুকু মনঃসংযোগ করা উচিত।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সকল বিষয়েই তন্ময়তার প্রয়োজন, তন্ময়তা ব্যতীত ধর্ম্ম-লাভ হয় না। অর্থে তন্ময় হইতে না পারিলে, অর্থ-লাভ হয় না, কাম ও মোক্ষে তন্ময় হইতে না পারিলে, কামনার পূরণ বা মোক্ষ-লাভ হইতে

পারে না। তন্ময়তা ব্যতীত উন্মত্ততা আইসে না বা উন্মাদনা ব্যতীত উন্মত্ত হওয়া যায় না, পরন্তু নিজে উন্মত্ত হইতে না পারিলেও পরকে উন্মত্ত করা যায় না। উন্মত্ততা তন্ময়তার একটি প্রধান লক্ষণ। যে তন্ময় হইতে পারিয়াছে, সে তৎব্যতীত আর কিছুই জানে না, তৎ ভাবিতে ভাবিতে, সে তৎভাবে বিভোর ও পাগল হইয়া যায়। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তন্ময়তার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মহারাজ যুধিষ্টির ধর্ম্মে তন্ময় হইয়া ধর্ম্মরাজ খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন। বুদ্ধদেব মোক্ষে তন্ময় হইয়া বুদ্ধত্ব-লাভ করিয়াছেন। গৌরাঙ্গদেব হরিনামে তন্ময় হইয়া দেশের সমস্ত লোককে পাগল করিয়াছিলেন।

অর্থ—অর্থেও তন্ময়তার প্রয়োজন, তন্ময়তা ব্যতীত অর্থ লাভ হয় না। সমুদ্র দেখিয়া ভীত হইলে, মুক্তা আহরণ করা যায় না। পাঁচহাত গভীর খাত দেখিয়া ভীত হইলে, স্বর্ণ হীরকাদি রত্ন আহরণ করা যায় না। রণস্থলে কামানের গর্জ্জন শুনিয়া সেনাপতির হৃদয় কম্পিত হইলে, যুদ্ধে জয়-লাভ করা যায় না।

কাম—কামনায়ও তন্ময়তার প্রয়োজন, তন্ময়তা ব্যতীত কামনা বা অভিলাষ পূরণ হয়না। ভগীরথের তন্ময়তার ফলে ভুতলে গঙ্গার অবতরণ ও ষষ্টি সহস্র সগর সন্তানের উদ্ধার।

মোক্ষাভিলাষীরও তন্ময়তা চাই, তন্ময়তা ব্যতীত মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। সংসারে থাকিতে হইলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ সম্পত্তির প্রয়োজন। অর্থাভাবে দারিদ্রের সহিত ও ধর্ম্মাভাবে পাপের সহিত সংঘর্ষণ অনিবার্য্য। এই সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলেই আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারি প্রকার পশু ভাব সংযমিত করা প্রয়োজন। পশুভাবের প্রাবল্যে মনুষ্যত্বের অপচয় ঘটে এবং তাহা হইতে ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষলাভের অন্তরায় উপস্থিত হয়। পৃথিবীর এই নিয়ম যে যেবিষয় তন্ময় হয়, সে তাহা লাভ করে। তন্ময়তা যাহার নাই, তাহার স্বভাব বড় চঞ্চল। সৌদামিনীর স্বভাব যেমন চঞ্চল বা বিকাশ যেমন ক্ষণিক, চঞ্চল মানুষের স্বভাবও তদ্রূপ ক্ষণস্থায়ী। এইরূপ স্বভাবে দৃঢ়তা থাকে না, দৃঢ়তা থাকেনা বলিয়া চঞ্চল মানুষ কোন কার্য্যেই সাফল্য লাভ করিতে পারে না। জলের উপরেই তরঙ্গ ও তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত, চঞ্চল মানুষকে সারা জীবন এই তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয়। তাহার ভয় বেশী ডুব দিবার সাহস নাই, কিন্তু তন্ময় পুরুষ নির্ভীক, ডুব দিয়া নিম্নে যেখানে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত

নাই, সেইখানে যায়। বাস্তবিক নিম্নেই যে রত্নের খনি!

তুমি কি চাও? অর্থ যদি তোমার প্রার্থিত বস্তু হয়, তাহা হইলে, অর্থে তন্ময় হও, অর্থ-লাভ হইবে। ধর্ম্ম যদি প্রার্থিত হয়, তবে ধর্ম্মে তন্ময় হও, ধর্ম্ম-লাভ হইবে। তন্ময়তা ব্যতীত সাফল্য-লাভ অসম্ভব, ইহা নিশ্চয় জানিও। বালক অভিমন্যুর কামনা সগর সন্তানগণের উদ্ধার। বালক নির্ভীক, নিশ্চল স্থির প্রতিজ্ঞ! সগর সন্তানগণের উদ্ধার যে কোন প্রকারে করিতে হইবে, এই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া হিংস্র জন্তু সমাকুল বনে তাহার গমন; ফলে সগর সন্তান-গণের উদ্ধার, গঙ্গার অবতরণ, অসাধ্য সাধন! যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশেবিদ্ধ হইয়া প্রাণ দান করিলেন, কিন্তু স্বীয় অভিমত পরিত্যাগ করেন নাই। যে যেভাবে তন্ময় হইয়াছে, সে তাহাই চায়। তৎব্যতীত সে কখনও জীবন ধারণ করিতে পারে না। তৎব্যতীত জগতের সর্ব্বপ্রকার সুখ, ভোগ, ঐশ্বর্য্য তাহার নিকট অতি নগণ্য; ইহাকেই বলে "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

—:০:-:০:—

বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা *।

লেখক,—বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ইংরাজীভাষায় খুব ভালরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, ইংরাজী ভাষা কখনও ইংরাজের মত আয়ত্ত করিতে পারিব না। মাইকেল, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি এই চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের "দি ক্যাপটিভ লেডী," "দি সেয়ার" ও "রামমোহনস্ ওয়াইফ" এখন কয়জনই বা পড়ে, এবং কয়জনেই বা ইহাঁদের নাম জানেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, নেশা শীঘ্র ছুটিয়া গেল, বাগ্‌দেবী শ্রীমধুসূদনকে স্বপ্নে বলিলেন,—

"ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজী,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি।"

এবং কবি বড় দুঃখে গাহিয়াছিলেন:—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধনলোভে মত্ত।"

* চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে লেখক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

শ্রীমধুসূদন মাতৃভাষার সেবক হইয়া অমরত্ব লাভ করিলেন, কাশীপ্রসাদ নিধুবাবুর ঢংএর যে সঙ্গীত রচনা করিলেন, তাহাই কেবল টিকিয়া গেল। আর বঙ্কিমচন্দ্রের ত কথাই নাই।

যদি সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মতবাদ গ্রীকভাষা শিক্ষা করিয়া জানিতে হইত, তাহা হইলে ইউরোপের শিক্ষিত লোকের মধ্যে শতকরা কয়জনলোক সে দিকে অগ্রসর হইতেন ? যদি হিব্রু শিখিয়া বাইবেল পড়িতে হইত, তবে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কয়জনমাত্র সফলকাম হইতেন ?

আমাদের দেশেও যদি সংস্কৃত না পড়িয়া রামায়ণ ও মহাভারত পড়িবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে দেশের কি দারুণ দুর্গতিই না হইত। শিক্ষিত জাপানী ও জর্ম্মানগণের অনেকেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের ইংরাজী ভাষায় উচ্চারণ ইংরাজদের ফরাসী ভাষায় উচ্চারণের ন্যায় অদ্ভুত ও হাস্যোদ্দীপক। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। জাপানী যে টুকু ইংরাজী জানেন, তাহাতে তাঁহারা ইংরাজী গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, এবং আবশ্যক মত ইংরাজীতে কিছু কিছু কথাবার্ত্তাও কহিতে পারেন। আমি নিজের কথাই বলিতেছি :—

রসায়ন চর্চ্চার অনুরোধে আমাকে জর্ম্মান ও ফ্রেঞ্চ গ্রন্থ অহরহ অধ্যায়ন করিতে হয়। এই সকল গ্রন্থ বুঝিতে আমার কোনও অসুবিধা হয় না। যদি রাসায়নিক গ্রন্থ ছাড়া অন্য গ্রন্থ পড়িতে হয় তাহা হইলে আমার মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়।

ইংরাজ বা জর্ম্মানের পক্ষে ফরাসী বা গ্রীক শিখিতে যে কষ্ট, আমাদের পক্ষে ইংরাজী শিখিতে তদপেক্ষাও অধিক কষ্ট। কারণ ফরাসী, গ্রীক ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় অনেক শব্দ এক এবং ভাষার রীতিও অনেকটা এক। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে সিভিল সার্ব্বিসের জন্য এককালে পরীক্ষা গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, সিবিল সার্ব্বিস ভারতবাসীর দ্বারা ভরিয়া যাইবে বলিয়া যে সকল ইংরাজ আপত্তি করিয়াছেন, তাঁহাদের আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন পরন্তু হাস্যজনক। ইংরাজ ছাত্রগণ স্বজাতীয় ভাষায় অর্জ্জিত জ্ঞানের সাহায্যে পরীক্ষা দিবে, আর ভারতবাসীগণকে বিদেশীয় ভাষা শিখিয়া সেই ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে। ইংরাজছাত্রগণের এইরূপ একটা প্রধান সুবিধা সত্ত্বেও যে তাহারা দলে দলে ভারতীয় পরীক্ষার্থীগণের দ্বারা পরাভূত হইবে, এরূপ

ভাবনা একান্তই রহস্যজনক।

বর্ত্তমানকালে ইংরাজী শিক্ষার জন্য আমাদিগকে যে উচ্চ মূল্য দিতে হয় তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বয়স ছয় বৎসর হইতে না হইতে আমরা শিশুর হস্তে "ফার্ষ্ট বুক অফ রিডিং" প্রদান করি; এবং আট বৎসর বয়সের সময় "থার্ড বুক্" পড়াই। অতঃপর ক্রমান্বয়ে উচ্চ ক্লাসের সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে "গ্রামার, কম্পজিসন, ফ্রেজস, ইডিয়মস্ রোস হিটস" প্রভৃতি আসিয়া বালকগণের স্কন্ধে চাপিয়া বসে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, সংস্কৃত আছেই। এই তরুণ বয়সে বালকগণ এক ইংরাজীর বোঝা বহন করিতে করিতেই ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া পড়ে। মেট্রিকুলেশন পাশ করিয়া যাহারা আই, সি. এস, পড়িতে চায়, তাহাদের নিস্কৃতি নাই; পর্ব্বত-প্রমাণ ইংরাজী সাহিত্যের বোঝা তাহাদিগকে ম্রিয়মান ও বিহ্বল করিয়া ফেলে। আই, সি, এস, ক্লাসের পক্ষে এই চাপ সত্যসত্যই অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের আবার ঐ ইংরাজীর উপর ম্যাথেমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্রী, বোটানী এবং তাহাদের "প্রাক্টিকেল" আছে। কাজেই দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত প্রায় অবিরাম ক্লাসের পর ক্লাস চলিতে থাকে। ইহার ফলে জীর্ণ দেহ, ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও ক্ষীণদৃষ্টি যুবকের দলে দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগকে তিল তিল করিয়া হত্যা করিতেছি। আমাদের মতে আই, সি, এস, কোর্স হইতে একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত; এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তক অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমার মোট কথা এই যে, ইংরেজী ভাষা "সেকেণ্ড ল্যাঙ্গো-য়েজ" হওয়া উচিত। 'স্যাল ও উইলের" প্রভেদ ও এপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজি-সনের পার্থক্য নিরূপণে যে সময় ও শক্তির অপচয় হয়, তাহা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিয়োগ করা উচিত। যাহা হউক সম্প্রতি প্রকাশচন্দ্র সিংহ প্রণীত "তর্ক-বিজ্ঞান"কে আই, এ, পরীক্ষার পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ-গণ যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আর একটী কথা বলিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব। পৃথিবীর অপরাপর জাতিগণ কি প্রকারে আপনার ভাষার উন্নতি বিধান করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমে রুশিয়ার কথা ধরা যাক। রুশিয়ার ভাষা অনার্য্য ভাষা; সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ আর্য্যভাষাসমূহের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই, সেই জন্য রুশিয়ার ভাষা শব্দসম্পদে বড়ই দীনা।

বেশিদিনের কথা নহে, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রুশিয়ানগণ মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসী ভাষার ব্যবহার করিতেন এবং বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য প্রধানতঃ জর্ম্মান ভাষা অবলম্বন করিতেন। এমন কি মেণ্ডেলিয়েফ-প্রমুখ মনীষিবর্গ জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকায় আপনাদের গবেষণার ফল সমূহ প্রকাশিত করিতেন। কিন্তু তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান প্রচার না করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না। এ জন্য মেণ্ডেলিয়েফ তাঁহার অমূল্য রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থ রুশিয়ান ভাষায় লিখিলেন। তাহার পর হইতে রুশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ যাবতীয় মৌলিকগবেষণা মাতৃভাষায় প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

এসিয়া খণ্ডে যে, জাতি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, আমাদের যে তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করা উচিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? জাপানি ভাষা এখনও সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, সেই জন্য জাপানীরা উচ্চ অঙ্গের মৌলিক গবেষণা ইংরাজী ও জর্ম্মান ভাষায় প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা, এমন কি কলেজের লেক্‌চার পর্য্যন্ত জাপানি ভাষায় দিতেছেন। জাপানীরা বেশ বুঝিয়াছেন যে, বিদেশীয় ভাষা অবলম্বন পূর্ব্বক বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রথমতঃ অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেশীয় ভাষাতেই বিজ্ঞানচর্চ্চা সমধিক বাঞ্ছনীয়। আশার কথা, হাওয়া ফিরিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট পরিষৎকে মাসিক এক শত টাকা দানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া মহানুভব তারকনাথের আদর্শে এবং দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ধনকুবেরদিগের সাহায্যে যদি একটা বিজ্ঞান-প্রচার-ভাণ্ডার গঠিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে দেশের একটী গুরুতর অভাব মোচন হয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধনকুবের এণ্ড্রু কার্ণেগি প্রদত্ত বৃত্তির সাহায্যে শত শত যুবক অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিজ্ঞান সেবায় ও গবেষণায় ব্রতী হইয়াছেন। আমাদের দেশেও এইরূপ ব্যবস্থার বোধ হয় সময় আসিয়াছে।

দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চা করিলে দেশের জনসাধারণের যে, কত উপকার হইবে, তাহা কি অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে? আমাদের দেশে ত ভীষণ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। আমরা আজ কাল গ্রাজুয়েটের

সংখ্যা দেখিয়া ভয় পাই। বাঙ্গলাচাকুরীজীবী বলিয়াই এই ভয় হয়; অর্থাৎ আমরা সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভে গ্রাজুয়েটের বাজার-দর দেখিয়া বিচার করি। কিন্তু যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ যুবকের সংখ্যা দেশে জ্ঞান বিস্তারের মাপ কাঠি বলিয়া ধরি, তবে হৃদয়ে গভীর নিরাশার সঞ্চার হয়। বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশনে প্রায় দেড় হাজার গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত জনসংখ্যা প্রায় আট কোটী হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, লাখকরা ২ জনেরও কম গ্রাজুয়েট হইতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, আমাদের দেশের অবস্থা কি শোচনীয়।

তোমরা ইংরাজিতে বিজ্ঞানালোচনা করিবে, প্রথমে ভাব দেখি তোমার দেশবাসীর মধ্যে কয়জন ইংরাজী বুঝিবে? অথচ সামান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি না জানা থাকায় লোকে কত কষ্টভোগ করিতেছে। ম্যালেরিয়া ও মশকে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পতঙ্গ কি প্রকারে শস্য ধ্বংস করে, রেশমকীটের কোন কোন ব্যাধি হয় এবং কিরূপে তাহা নিবারণ করা যায় * সারের প্রকার-ভেদের সহিত চাষের কি সম্বন্ধ, এবং সামাজিক রীতি নীতির উপর সামাজিক উন্নতি কতখানি নির্ভর করে, এই সকল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনা যদি দেশের লোকের নিকট সুপ্রাপ্য হয়, তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। আনন্দের বিষয়, কএক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি সম্প্রতি উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রণনের যত্নবান হইয়াছেন; তাঁহারা দেশের ও দশের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন, সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই সকল বার্ত্তা যদি ঘরে ঘরে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিকট পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে হয়, যদি "ঘাটে, পাটে, বাটে মাঠে," এই সকল বিষয় আলোচনা দেখিতে চান, তাহা হইলে মাতৃভাষার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বালক ও বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারী সকলে প্রাণপণে মাতৃভাষার সেবা করুন, তাহা হইলে আপনারা এই কর্ম্মভূমি জন্মভূমি ভারতবর্ষের উপযুক্ত সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেন, তাহা হইলে ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের জননী জন্মভূমিকে তাঁহার প্রাচীন রত্নসিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিতা দেখিতে পাইব।

---

* এইস্থলে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায় যে, সুবিখ্যাত লুই পাস্তর তাঁহার উদ্ভাসিত পশ্বাদির টিকাদ্বারা রোগচিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়া এক ফ্রান্স দেশেই বাৎসরিক প্রায় ৪২০০০০০ টাকা ব্যয়সংক্ষেপ করিয়াছেন।

"কৃত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ"

লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি, এ, এল, এম, এস।

(১)

যে দিকে ফিরাই আঁখি কেহ নহে স্থির
আপন আত্মায় অহো! মুহূর্ত্তের তরে!
পরিবর্ত্তনের যেন
সচঞ্চল নীর
এক দিক ভাঙ্গে, আর
অন্যদিকে গড়ে।
এই যাহা ছিল তার নাহিক সন্ধান—
এক স্রোত আসে, অন্য করিতে প্রস্থান।

(২)

সত্য কিছু আছে কিগো এ ঘোর বিকারে?
ধীর—স্থির—নিত্য বস্তু পরিণামহীন?
সুদুর্জ্ঞের এই তত্ত্ব—
ইহার বিচারে,
দর্শন, বিজ্ঞানশাস্ত্র
মত্ত চির দিন!
বেদের প্রথমে তারা, যে স্বরে গেয়েছে গান,—
সেই ধ্বনি, সে নৈরাশ্য, আজও বর্ত্তমান!

(৩)

সেই ধ্বনি "কেবা জানে? কে দিবে সন্ধান?
কোথা হ'তে এই বিশ্ব? দেবতারা—যাঁরা
অবির্ভূত সৃষ্টি দূরে
করিলে প্রমাণ?
পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি নর
কি জানিবে তারা?"
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূমি করি আলোড়ন,
আজিও কাঁদিয়া ফিরে কোথা সেইজন?

(৪)

মানব কল্পনা ঝলে যুক্তি তর্ক দিয়া,
যে সিদ্ধান্ত স্থির করে চূড়ান্ত তা নয়—
বলিল এখন যাহা,
কিছু দূর গিয়া,
সে সিদ্ধান্ত ভেঙ্গে ফেলে,
করিয়া সংশয়।
বিপ্রলিপ্সা, পরমাদ, ভ্রান্তিপূর্ণ নর—
কি করে জানিবে তত্ত্ব দেব অগোচর ?

(৫)

সৃষ্টিরহস্যের যেন সমস্যা পূরণ,
মনে হয় এঁর দ্বারা এইবার হ'ল,
মৃগ মরীচিকা বোধ
হয় পরক্ষণ ;
যত যাই তত দূরে
সরে যায় জল !
যে পিপাসা সে পিপাসা সেইত চীৎকার !
সেই তত্ত্ব অসম্পূর্ণ—সেই হাহাকার !

(৬)

অনিত্য এ বিশ্ব মাঝে কি যে চিরন্তন ?—
কি এমন আছে নহে পরিণামপর ?
কেন্দ্রে ধরি, বুকে করি,
যাহা, অনুক্ষণ,
নাম রূপে অভিব্যক্ত
এই চরাচর ?
এই প্রশ্ন—এই তত্ত্ব, নিরূপণ আশে,
শত শাস্ত্র ফুটিয়াছে—বিজ্ঞান আকাশে !

(৭)

কেহ বলে, অপ্ হয় সর্ব্ব মূলাধার ;
কেহ বলে, বায়ু হয় জগৎকারণ ;

সংখ্যা হতে এ জগৎ
কাহারও বিচার ;
আত্ম সত্ত্বা, কেহ তর্কে
করিছে স্থাপন।
কল্পনাই বিধাতার কেহ মূল ধরে
কেহ বলে এক তিনি হন চরাচরে।

(৮)

একই সত্ত্বা—ছুটি ধর্ম্ম, শান্ত ও সমৃদ্ধ ;
শান্ত হতে ঝরিতেছে জ্ঞান প্রস্রবণ ;—
নাহি রূপ, নহে দেশ,
নহে সীমাবদ্ধ,
সমৃদ্ধিতে প্রসারিত
অনন্ত ভুবন।
সৎচিৎ আনন্দ—শান্ত—শুদ্ধ নিরাকার ;
সমৃদ্ধ—বৈচিত্র্যপূর্ণ—অনন্ত আকার।

(৯)

কারও মতে পূর্ণতম এক সত্ত্বা হতে
ছুটি ধারা নেমে আসে, জীব আর জড় ;
জীব যাহা—আত্মতত্ত্ব
সত্য এ জগতে
জড়—বিশ্ব—চিন্তামাত্র
অলীক নশ্বর ;
কেহ বলে, আত্মা বিশ্ব সংশ্লেষণ করে,
যাহা পাই, নিত্য তত্ত্ব তাই চরাচরে।

(১০)

মনের বিকার এই বিশ্ব কারও মতে
কেহ বলে কিছু নাই দ্রব্য অভিধান ;
সাধারণ বুদ্ধি, কিন্তু,
যায় অন্য পথে,—

বলে সবই সত্য হয়,
বিশ্ব ও বিজ্ঞান।
বহু মন ভিন্নাধারে করিয়া স্থাপন,
সারথির বেশে কেহ দাঁড়াইয়া রন।

(১১)

এইরূপে বহু মত হয়েছে প্রচার
একই প্রশ্ন ভিন্ন পথে করি সমাধান ;
কল্পনাতে যত দূর
গেছে যা যাবার ;
বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ফুটে
একেরই বিজ্ঞান।
কিন্তু কোথা পরিতৃপ্ত মানবের তৃষা ?
নিত্য বস্তু এখনও হয়নি মীমাংসা !

(১২)

যেন কি সন্দেহ ঘোর ! যেন কি নিরাশ !
কি যেন রয়েছে কোথা লুকায়ে বেসুর !
যেন কি ছন্দের ভঙ্গ হৃদয় উদাস,
করিয়া দিতেছে শ্লোক হলেও মধুর !
যেন সব ঠিক আছে নাহি শুধু প্রাণ !
ব্যঞ্জনে লবণ যেন হয়নি সমান !

চাঁদ মালা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র।

(১)

আজ পঞ্চমী তিথি, বাড়ীর কর্ত্তা বাবু দালানে দাঁড়াইয়া প্রতিমার সাজ সজ্জার ব্যবস্থা করিতেছেন, ডাকের গহনা দিয়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ সহ ভগবতীর সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত হইয়াছে, চাল চিত্রের চতুর্ধারে কল্কা আঁটা হইয়াছে,

যেখানে যে ত্রুটি দেখিতেছেন, মথুরা নাথ রায় স্বচ্ছন্দে তৎসমূহ প্রতিমার সজ্জাকারীদিগকে সংশোধন জন্য বলিতেছেন।

দেবীগ্রাম কলিকাতার সন্নিকট হইলেও রেল ষ্টীমারে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হয় না, রায় মহাশয়ের দুর্গোৎসব পৈত্রিক কীর্ত্তি, বাপ পিতামহ যাহা এতাবৎ কাল করিয়া আসিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের বংশধর হইয়া কি উপেক্ষা করিতে পারেন ? যাতায়াতের সুবিধা না থাকিলেও মথুরা নাথ পূর্ব্বাহ্নে সকল জিনিষ পত্র বাটীতে সংগৃহীত করিয়াছেন। সহর হইতে যে সকল সামগ্রী সরবরাহের প্রয়োজন, ইতি পূর্ব্বেই তৎসমুদয় তাঁহার গৃহজাত হইয়াছে।

মথুরা নাথ কোন কাজ কর্ম্ম করেন না, পৈত্রিক যৎ সামান্য জমিদারির আয়েই তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। তবে বাহুল্য ভাবে তিনি কোন কাজই করেন না, অথচ যখন যে কাজ কর্ম্ম করেন, সুশৃঙ্খলে তাহা সাধিত হয়। তৎসম্বন্ধে কেহ কোন কথা কহিতে পারে না।

দেবীগ্রাম একসময়ে একটী গণ্ড গ্রাম ছিল, কিন্তু সময়ের অন্তরালে তাহার পূর্ব্ব কীর্ত্তি লোপ পাইয়া আসিয়াছে, যে কয়েকজনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন, তাঁহারাই দশভূজার আরাধনার উদ্যোগ করেন। কিন্তু আগে যেমন লোক জনের আহ্বান হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। "ভুজ্যতাম্ দিয়তাম্" কথাটি এখন কথার কথা দাঁড়াইয়াছে। রায় মহাশয়ের পৈত্রিক বন্দোবস্ত সকলই বজায় রাখিয়াছেন, প্রতিমা দর্শনে আসিয়া তাঁহার বাটীতেই গরীব দুঃখীজন একসরা করিয়া খৈ মুড়কী ও চারিটী করিয়া গুড়ে পক্কান্ন পাইয়া থাকে। অন্যান্য গ্রামবাসী অপেক্ষা রায় মহাশয়ের পূজায় খরচ আছে।

মথুরা নাথ দালানে, দিবাভাগ শেষ হইয়া আসিয়াছে, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগণে ঢলিয়া পড়িতেছেন, এমত সময়ে জনৈক নগ্নপদ কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ অন্তর রায়মহাশয়কে অভিবাদন করিলেন। ব্রাহ্মণ দৃষ্টে কায়স্থ সন্তান মথুরা নাথ সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন ও সম্মুখস্থ আসন গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। ব্রাহ্মণ বাক্যব্যয় না করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং ৺পূজার বার্ষিক জন্য রায় মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে মথুরা নাথ বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আমাকে এ অনুরোধ করিবেন না, যেহেতু পৈত্রিক বন্ধনী অনুসারে আমার এই পূজা। বাপ ঠাকুর দাদার সময় হইতে যাঁহারা যাহা বৃত্তি পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই পাইয়া থাকেন, আমি কাহাকে বঞ্চিত করিয়া আপনার এই আকিঞ্চন রক্ষা করিব ?

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—এ পূজায় এতাবৎকাল যাঁহারা যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের কাহাকেও বঞ্চিত করেন, আমার এরূপ অভিপ্রায় নহে। আর আমি সেরূপ বৃত্তি লইতে ইচ্ছাও করি না, একজনকে বঞ্চিত করিয়া আমার যাচিঞা কেন পূর্ণ করিবেন? তবে, আপনাকে আমার একটী কথা বলিবার আছে, আপনি যদি গরিবের কথায় কর্ণপাত করেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব। অনেক আশা করিয়া আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি, আপনি আমাকে বৈমুখ করিবেন না।

ব্রাহ্মণের এরূপ আকিঞ্চনে মথুরা নাথ বলিলেন,—ভাল আপনার কি অভিপ্রায় আমাকে ব্যক্ত করুন, আমি আপনার কথার অমান্য করিব না।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, মার সন্ধিক্ষণের পূজায় আপনি যে চাঁদমালাখানি দিয়া থাকেন, সেই খানিই আমার বার্ষিক করিয়া দিন। আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব, কিন্তু আপনার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় তালিকায় আমার নামটী লিখিয়া লইতে হইবে। "আমি বিষ্ণুপদ দেব শর্ম্মণঃ, উপাধি ভট্টাচার্য্য, নিবাস নৈহাটি।" ভট্টাচর্য্যের কথায় মথুরা নাথ আর কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না, তদ্দণ্ডে কর্ম্মচারীকে বিদায় তালিকায় ব্রাহ্মণের নাম ঠিকানা লিখিয়া লইবার ব্যবস্থা হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহু দূর হইতে মথুরা নাথের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আসন গ্রহণানন্তর তিনি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিলে, মথুরা নাথ তাঁহাকে পদ ধৌত করণের জন্য আকিঞ্চন করিলেন এবং যথাযোগ্য মিষ্টান্ন আহার করাইয়া ও পাথেয় দিয়া বিদায় দিলেন।

পূজার অবশানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া যে যাহার বিদায় লইয়া গেলেন, বিষ্ণুপদও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত চাঁদমালা বিদায় পাইলেন। রায় মহাশয় চাঁদমালার কিছুই মূল্য নাই জানিয়া তৎসঙ্গ নগদ একটী রৌপ্য মুদ্রা ভট্টাচার্য্যকে দান করিয়া ছিলেন।

(২)

বৎসরান্তে দুর্গোৎসব। এ বৎসর যাহারা সুস্থ শরীরে প্রফুল্ল মনে মহামায়ার আগমন দেখিল, মায়ের পাদপদ্মে বিল্বপত্র ও গঙ্গাজল উপহার দিল, আগামী বর্ষে তাহারা যে পুনরায় মাতৃ আগমন সমভাবে দেখিতে পাইবেন একথা কে বলিতে পারে? পূর্ণ দ্বাদশ বর্ষের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে ভাগ্যবান মায়ের প্রতীক্ষায় থাকিবেন, জগন্ময়ী দর্শন তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে! কিন্তু সে

সৌভাগ্য সকলের হয় না।

বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় সময়ের গতি, অবিরল ধারায় চলিয়াছে। যে যেমন ভাবে ইহার ব্যবহার করিবে, সে সেইরূপ ফলভোগী হইবে। কাল স্রোতের বিরাম নাই, দেখিতে দেখিতে বর্ষ পূর্ণ হইয়া গেল, আবার আনন্দময়ীর শুভাগমনে ধরায় আনন্দ ধারা বহিল, হিন্দুস্তানের প্রাণে আনন্দ উৎস উঠিল। মথুরা নাথ পূর্ব্বকার মত জগন্ময়ীর আরাধনায় উদ্যোগী হইলেন, নৈহাটী নিবাসী বিষ্ণুপদ বিপ্র চাঁদমালা বার্ষিক পাইলেন। গত বৎসর অপেক্ষা মথুরা নাথের আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, একারণ অন্যান্য বৃত্তিভোগীর যে পরিমানে বার্ষিক বাড়িয়াছিল বিষ্ণুপদও পূর্ব্বকার অপেক্ষা এবারে নগদ বিদায় দ্বিগুণ পাইলেন। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য রায় মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী কখন কাহার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন, অন্যের তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি নাই। যে বৎসর রায় মহাশয় বিষ্ণুপদের বার্ষিকের ব্যবস্থা করিয়া দেন, সেই সময় হইতে উত্তরোত্তর মথুরা নাথের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে, কোন সংস্রবে কখন কাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, বিশেষ সতর্কে লক্ষ্য রাখিলেও তাহা বোঝা যায় না। মোট কথা বিষ্ণুপদের প্রতি রায় মহাশয়ের ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে।

সংসারে পাঁচটা লইয়া বাস করিতে হইলে, প্রতি নিয়ত একটা না একটার অসুখ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, নিশ্চিন্ত ভাবে দিন যাপনের প্রায়ই সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। ৬শারদীয়া পূজার কয়েক মাস পরেই রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র নেপেন্দ্র নাথের বাত-শ্লেষ্মা বিকার হইল, রোগীর অবস্থা দেখিয়া দিনে দিনে ডাক্তার বৈদ্য হতাশ হইয়া পড়িলেন, মথুরা নাথ নিষ্ঠাবান কায়স্থ সন্তান, দেব দ্বিজে তাঁহার অটল ভক্তি আছে বলিয়াই পৈত্রিক কীর্ত্তিগুলি এতাবৎকাল বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন, পুত্রের শঙ্কটাপন্ন পীড়ায় জগদম্বার উদ্দেশে এক কালে সুবর্ণ চাঁদমালা মানসিক করিলেন। দৈবের অদৃষ্ট শক্তি, মথুরা নাথ যেক্ষণে জগৎ জননীর উদ্দেশে মানসিক করিলেন, তাহার পর মুহূর্ত্ত হইতে তদীয় পুত্রের পীড়ার কথঞ্চিৎ উপশম হইতে লাগিল, ডাক্তার কবিরাজ ইতোপূর্ব্বে হতাশ্বাস হইয়া ছিলেন, এক্ষণে রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তনে আশ্বসিত হইলেন এবং সকলেই বিশেষ যত্নের সহিত রোগীর পরিচর্য্যায় সংযত থাকিলেন। দেব অনুগ্রহে পুত্র নেপেন্দ্র আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এ ধারণা রায় মহাশয়ের হৃদয়ে এক কালে গ্রথিত হইল, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে মানসিক করিয়াই এ যাত্রা পুত্রকে

করাল কালের মুখগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন। জগদীশ্বরের কৃপায় মথুরা নাথের পুত্র সময়ে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন।

দৈব প্রসাদে বংশধর রক্ষা পাইল, রায় মহাশয় দেব দেবীর মানসিক পূজার উচিত মত ব্যবস্থা করিলেন। দুর্গোৎসবও সন্নিকট হইয়া আসিল, তিনি স্বর্ণকার ডাকাইয়া দস্তুর মত চাঁদমালার ফরমাইস দিলেন। স্বর্ণকার গৃহে সন্ধিক্ষণের পূজার চাঁদমালা প্রস্তুত হইতেছে, এ সংবাদ অবিলম্বে রায় মহাশয়ের পুরোহিত ও ইষ্ট দেবতা গুরুদেবের কর্ণ-গোচর হইল, উভয়েই সেই চাঁদমালার অংশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

যথা সময়ে পূজার ব্যবস্থা হইল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা বার্ষিক বিদায় পাইয়া থাকেন, কেহই বঞ্চিত হইলেন না। পুত্রের প্রাণ রক্ষার কারণ দেবতা ব্রাহ্মণে মথুরা নাথের সমধিক আস্থা হইয়াছে, এ কারণ অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর রায় মহাশয় সমধিক ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অন্যান্য দান অপেক্ষা চাঁদমালার মূল্য অবশ্য অধিক হইয়াছে. গুরু পুরোহিতের প্রাপ্য অপেক্ষা স্বুবর্ণ নির্ম্মিত চাঁদমালার মূল্য অধিক হওয়ায়, রায় মহাশয়ের গুরু পুরোহিত হইতে যাবতীয় প্রার্থী বিপ্রের সেই চাঁদমালায় লোভ দাঁড়াইয়াছে। যে যাহা বার্ষিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন, এবারেও তাহারা সেই মত পাইবে, বিদেশী ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে চাঁদমালা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, এতাবৎকাল বিপ্র সোলার চাঁদমালা পাইয়াই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এবার সোলার বিনিময়ে স্বুবর্ণ হইয়াছে। লোভ প্রযুক্ত মথুরা নাথের কুল পুরোহিত ও গুরুদেব উভয়েই সেই স্বুবর্ণ নির্ম্মিত চাঁদমালার অংশ জন্য লোলুপ হইয়াছেন, কিন্তু ন্যায্য পক্ষে এ মালা সেই বিদেশীরই প্রাপ্য, সদ্বিবেচক মথুরা নাথ গুরু পুরোহিতের আকিঞ্চন উপেক্ষা করিয়া সেই বিপ্রকে মানসিক চন্দ্রমালা অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া,—ঈশ্বর সমীপে পুনঃ পুনঃ কর্ত্তার ও পরিজনবর্গের মঙ্গল কামনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। রায় মহাশয়ের দুর্গোৎসব সকলেই প্রীত হইল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেহই মনক্ষুন্ন হইলেন না, কিন্তু লোভবশবর্ত্তী গুরু পুরোহিতের কিছুতেই মনতৃপ্ত হইল না।

ইহলোক ও পরলোক।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

ইহলোক প্রত্যক্ষ গম্য। পরলোক অনুভববাবগ্য ও শাস্ত্র নির্দিষ্ট। ইহলোকে যে শরীরে আমরা ভোগ করি, তাহা পার্থিব। পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ,—এই পাঁচটী ভূত সমবায়ে এই শরীর রচিত বলিয়া ইহা পঞ্চভৌমিক, তবে পার্থিব অংশ অধিক থাকায় পার্থিব শরীর বলা হয়। এই ভূত মিশ্রনের নাম কোথায়ও ত্রিবৃৎকরণ কোথায় বা পঞ্চী করণ নামে অভিহিত। আমরা যে জল পান করি, যে বাতাস স্পর্শ করি, যে তেজ দেখিতে পাই, তাহা মিশ্র পদার্থ। অমিশ্র ভূত আমাদের প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য হয় না। এই অমিশ্র ভূতের নাম অত্রিবৃৎকৃত বা অপঞ্চীকৃত। এই অত্রিবৃৎকৃত বা অপঞ্চীকৃত অবস্থাকে অব্যাকৃতাবস্থা বলে। এই অব্যাকৃতাবস্থাকেই নৈয়ায়িকেরা পরমাণু, সাংখ্যেরা তন্মাত্র বলে। অপঞ্চীকৃত জলের স্বাদ নাই, রূপ নাই, মহত্ব নাই। "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" অপই সর্ব্বাগ্রে সৃষ্ট হইয়াছে। এই অপ কারণ বারি। তাহা পঞ্চভূতাত্মক দেহে পার্থিব ভাগের আধিক্য নিবন্ধন ইহা পার্থিব।

পরলোকে শরীর বায়বীয়, তৈজস ও আপ্য। প্রেতযোনিকে আমরা বায়বীয় অবস্থা বলি। লিঙ্গ শরীরে পার্থিব অংশ নাই, এই কারণে প্রেত শরীরে গুরুত্ব নাই, ভার নাই। স্পর্শ করিলে ঘনীভূত বাতাসের মত বোধ হইবে। * তোমার মস্তকের পার্শ্ব দিয়া যাইলেও বোধ হইবে, যেন ঘনীভূত তীব্র বায়ু মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া দিল। তবে সংস্কারানুযায়িক মায়া দ্বারা পার্থিব শরীর ধারণ করার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তবে ইহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ করা কঠিন। তৈজস ও আপ্য লিঙ্গ শরীর দৃষ্ট হয় না, তবে শাস্ত্রে আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। এই বায়বীয় প্রেত শরীর ছায়াময়। অনেক সময় সম্মুখে থাকিলেও দেখিতে পাওয়া যায় না বা বুঝিতেও পারা যায় না।

এই পার্থিব শরীরে যে সকল কার্য্য আমরা করিয়া থাকি; লিঙ্গ শরীরে সেই সেই কার্য্যেই সংস্কাররূপে অনুবর্ত্তন করে। সংস্কার দয়া মায়াদির মত স্থায়ীবৃত্তি মাত্র। আমি জীবদ্দশায় কেবলই অধ্যয়ন করিয়াছি, মৃত্যুকালে সেই, অধ্যয়নের অনুশীলন করিয়াছি, লিঙ্গ শরীরেও সেই অধ্যয়ন স্পৃহা সংস্কাররূপে বর্ত্তমান রহিবে। কাজেই তখন কেবলই অধ্যয়ন করিতেছি এই মত বোধ হইবে।

---

* সকলে বিশ্বাস করিবেন না, সন্ধ্যাকালে বাড়ীর সম্মুখে আমি ও আমার বন্ধু দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া ছায়াময় লিঙ্গ শরীর দেখিয়াছিলাম, স্পর্শও করিয়াছিলাম ভয় বা বিস্ময় কিছুই হয় নাই।

তজ্জনিত তৃপ্তি, অতৃপ্তি, সুখ দুঃখ সমস্তই ঘটিবে। কাহাকেও ভিটাচ্যুত করিয়া পথে বসাইয়াছি, বর্ষায় সে ব্যক্তি বৃক্ষের তলায় রাত্রি কাটাইয়াছে, গ্রীষ্মে অনাবৃত মস্তকে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। যে সকল পাপ-স্মৃতি অন্তঃকরণের সহিত সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, যাহা কোন মতেই দূর করিতে পারা যায় না,—তাহারই নাম সংস্কার। সেই সংস্কারের জন্য লিঙ্গ দেহে এইরূপ ধারণা হইবে যে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, মস্তকের উপর প্রচণ্ডবেগে শিলাপাত হইতেছে, কিন্তু কোথাও আশ্রয় নাই। সেই আশ্রয়হীন স্থানে নিরবচ্ছিন্ন সেই দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ইহাই পারলৌকিক ভোগ। লিঙ্গ দেহের পারলৌকিক ভোগের নামই নরক যন্ত্রণা,—এই যন্ত্রণা অপরিসীম, কারণ স্থূল দেহ না থাকায় দেহ ধ্বংস বা ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহা মানস ভোগ। তবে জীবদ্দশায় স্থূলেন্দ্রিয়গুলির সহিত বিষয় সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া তৎসংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে। অপার্থিব শরীরে সেই জীবদ্দশোচিত স্থূলেন্দ্রিয় কার্য্য মনই সমাধা করে। তবে জীবদ্দশায় স্থূলদেহান্দ্রিয়দিগকে অপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই সূক্ষ্মদেহে তাহারই অনুবর্ত্তন স্বাভাবিক।

সাধারণতঃ জাগ্রদবস্থায় পরিচিত বিষয়ই স্বপ্নে অনুভূত হয়। জাগ্রৎকালীন জগতই স্বপ্নজগতের সৃষ্টি করে। তদ্রূপ ইহকাল পরিচিত ভোগ পারলৌকিক ভোগ। পরকাল,—ইহকালের প্রতিচ্ছবি মাত্র। যে যে ভোগ ইহকালে যেমন ভাবে ভোগ করিয়াছি,—পরকালের ভোগ সেই মত হইবে। তবে ইহকালে যেমন স্বরূপসত্তা, পরকালে তাহা নহে। ইহকালে যাহা, পরলোকে তাহাই। তবে এই সৃষ্টি মনঃকল্পিত "মনোময়াণি হৈ স্বর্গলোকে শরীরাণি।" মনঃকল্পিত সৃষ্ট বলিয়া তৎকালীন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হইয়া থাকে। মিথ্যা নহে, কারণ যতদিন সেই মনঃকল্পিত সৃষ্টির অবসান না ঘটিবে, ততদিন তাহার সত্তার বিলোপ সম্ভব নহে। কাজেই যতদিন সেই সৃষ্টি—ভ্রান্ত হউক, কল্পিত হউক—ততদিন তাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রতীতি হইবে। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও যেমন স্বপ্নে মিথ্যা প্রতীতি হয় না তদ্রূপ ইহলোকে তাহা মনঃকল্পিত সৃষ্টি মাত্র বা সংস্কার ভ্রান্তি মাত্র বুঝিয়া থাকিলেও পরলোকে তাহা বোধ হয় না। এই ভ্রান্তিপ্রবাহ পরলোকে নিয়তই একটীর পর একটী আসিয়া চলিতে থাকে। জাগ্রদবস্থায় কি তাহা ঘটে না। এই দেখ; আমরা ৺কাশীধামে যাইয়া ভাগীরথীকে ভ্রম বশতঃ দক্ষিণ বাহিনী বলিয়াই বোধ করি। উত্তর বাহিনী জানিয়াও মনপ্রাণে ঐক্য করিয়া বুঝিতে পারি না। তাহা হইলে পরলোকে সেই সেই ভোগগুলিকে

মি ্যাবৎ প্রতীত, মনঃকল্পিত সৃষ্ট মাত্র—এরূপ ভাবে বুঝাইয়া দিলেও সে ভ্রান্তি-না পাইবে না! ভ্রমের স্বভাবই এই, প্রথম ভ্রান্তির আকার যেমন হইবে; শেষ পর্য্যন্ত ভ্রান্তি না কাটিলে সেই আকারই রহিবে। তজ্জন্য আমরা যে বস্তুকে যে ভাবে পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি, ভাবিয়া আসিয়াছি,—সেই দেখা বা ভাবার ব্যতিক্রম ঘটে না, এই পারলৌকিক ভোগই সংকল্প মূলক ভোগ নামে উক্ত। "সংকল্প মূলাহি লোকাঃ।"

বেদান্তমতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মনঃকল্পিত সৃষ্টি; মায়া রচিত ভ্রান্তি প্রবাহ মাত্র। যেমন মরুভূমি ব্যতীত মৃগতৃষ্ণার অন্যত্র সত্তা নাই, মরুভূমির সহিত মরীচিকার মত এই ভ্রান্তিধারা অনাদিকাল হইতে যুগযুগান্তর ধরিয়া জীবের উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। মহা প্রলয়ান্তে প্রথম জাত জীব প্রথম যে চক্ষে এই জগত দেখিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত সেই চক্ষেই দেখিবে। পীড়া হইলে রূপ বিকৃতবৎ প্রতীত হয়, সে পীড়া যতক্ষণ না আরোগ্য হয়, ততদিন সেই বিকৃত ধারণা যায় না। তদ্রূপ আমাদের এই অবিদ্যা জাত সংস্কার যতদিন না নাশ পাইবে, ততদিন এই বিশ্বভ্রান্তি ঘুচিবেনা।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, আমি যদি এই অজ্ঞাননাশ করিতে পারি, তাহা হইলে সকল জীবেরই ত অজ্ঞান নাশ পাইবে? উত্তরে বক্তব্য, তোমার ভ্রান্তি কাটিল বলিয়া অপরের ভ্রান্তি কাটিবে কেন? তোমার দিকভ্রম ঘুচিলে কি অপরের দিকভ্রম ঘুচে? বিশ্ব তোমার কাছে কল্পিত ছিল সেই কল্পনাই নষ্ট হইল মতি। এই কারণে একের অজ্ঞাননাশে সকলের অজ্ঞান নাশ পাইবার কোন কারণ নাই। তাহা হইলে দাড়াইল,—অজ্ঞান বর্ত্তমানে যেমন আমাদের নিকট কল্পিত বিশ্ব অভ্রান্ত সত্য, এ সত্তা যেমন অবিলাপ্য; তদ্রূপ পারলৌকিক ভোগ তদানীং কল্পিত হইলেও অভ্রান্ত, সত্য, তাহার সত্তাও অবিলাপ্য।

পারলৌকিক সুখ দুঃখ ইহকালের পাপ পুণ্যেরই ফল। কোন পাপকে তুমি ইহলোকে পাপ বলিয়া না মানিলেও তাহার ফল তোমাকে পাইতেই হইবে। সেই ফল ভোগকালে বুঝিতে পারিবে, ইহা পাপ কি পুণ্য। কাহার মনে কষ্ট দিয়াও তোমার অনুতাপ আসিল না, কাহাকে হিংসা করিয়াও গ্লানি জন্মিল না, সেইরূপ কষ্টই পরলোকে পাইতে হইবে, সেই গ্লানি অনুভব করিতে হইবে।

এই পারলৌকিক দুঃখভোগ এক প্রকার কয়েদ। ইহলোকে কোন দুষ্কার্য্য করিলে দোষী। আইনানুসারে পরিমিতকাল কয়েদ ভোগ করে,—

মিয়াদ ফুরাইয়া আসিলে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিতে পার। ইহলোকে দুস্কার্য্যকারী তাহার স্বকৃত দুস্কার্য্যানুযায়ী ফল পরলোকেই পাইয়া থাকে। পাপ জন্য সেই ফলেরও একটী পরিমাণ আছে,—তাহাই মিয়াদ। পাপী ন্যায়বান্ বিধাতৃ নির্দ্ধারিত চুক্তি পরিমিতকাল নরক যন্ত্রণা রূপ-কারা ভোগের পর পুনরায় গৃহস্বরূপ কর্ম্মভূমে জন্ম গ্রহণ করে।

স্বর্গভোগ যেন কিছুকালের জন্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি। যে কয়বৎসর শান্তিভোগ নির্দ্দিষ্ট;—ততদিন ভোগ করার পর পুনরায় স্বপদ লাভ। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশান্তি। ক্ষীণে পুণ্যে সর্ব্বলোকাচ্চিবন্তি।" ইষ্টক উপরদিকে ছুড়িয়া দাও, তাহার যতদূর বেগ ততদূরই সে উঠিবে, তাহার পর পৃথিবী তাহাকে আকর্ষণ করিবেই। পুণ্য,—ধরিয়া লও বেগের মত। সেই বেগ ক্ষয় পাইলে পৃথিবীর আকর্ষণে নামিয়া আসিতে হইবে। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও তথায় থাকিতে পাইবে না।

তবে একের পাপ পুণ্যের ফলভোগ কখন কখন ইহলোকেও ভোগ হইয়া যায়। পাপীর উৎকট পাপ কখন কখন জীবদ্দশায় ফল প্রসব করে। সে ভোগ ভুগিলেও পরলোকের ভোগ যে ভুগিতে হইবে না তাহা নহে, যে বহ্নি জ্বলিয়াছে তাহার ত স্ফুলিঙ্গ মাত্র দেখা দিয়াছে, অনুতাপ আসিলেই যে পাপ ক্ষয় পাইবে তাহা নহে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তবে অনুতাপ প্রায়শ্চিত্তের কারণ। অনুতাপ না আসিলে মুক্তকণ্ঠে পাপ স্বীকার কে করিবে? পাপ স্বীকার পুরঃস্বর তবে ত প্রায়শ্চিত্ত বিধি। কৃতকর্ম্মের ফলভোগ ত করিতে হইবে! অনুতাপ সেই ফলভোগের প্রথম সোপান মাত্র। অনুতাপ পাপীর মন দ্রবীভূত করে, আর ভবিষ্যতের জন্য পাপ হইতে নিবৃত্তি করে।

এই স্বর্গনরকের ভোগ শেষ হইলেও মন বাসনা বিমুক্ত হয় না। বাসনাবহ্নি স্বর্গভোগরূপ চন্দন কাষ্ঠ পাইয়া আরও দীপ্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। সুগন্ধি পবিত্র হইলেও সে অগ্নির দাহকত্ব শক্তি নষ্ট হয় না। শৃঙ্খল স্বর্ণময় হইলেও বন্ধনের ক্ষতি হয় না। স্বর্গভোগান্তে পুণ্যের অবশেষ থাকিয়া যায়। সেই পুণ্যের অবশেষ হেতু জন্মগ্রহণ অনিবার্য্য। তবে সেই পুণ্যাবশেষানুযায়ী জন্ম লাভ ঘটে।

পাপীর পাপও নিঃশেষে ভোগ হয় না। সেই পাপানুযায়িক জন্মলাভ করিতে হয়। পাপী স্থাবর, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ বা নিকৃষ্ট মনুষ্য জন্ম লাভ করিতে পারে "যথা প্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ।"

ইহলোকে মানব যেমন প্রকৃতি চালিত হইয়া প্রাক্তন কর্ম্ম করিয়া যায়, পারলৌকিক জীব তদ্রূপ স্থূলদেহোচিত কর্ম্মানুযায়িক ফল ভোগ করিয়া যায়। ইহলোকে জীব প্রকৃতি চালিত হইয়া প্রাক্তন ভোগ করে, বলিয়া পরাধীন হইলেও ক্রিয়মান্ কর্ম্মে তাহা স্বাতন্ত্র থাকে। ভবিষ্যতে সৎকার্য্য অসৎকার্য্য করিবার স্বাতন্ত্র লোপ পায় না। কিন্তু পরলোকে স্বাতন্ত্র একেবারেই নাই। কারণ তথায় আর ক্রিয়মান্ কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই। সে স্থলে কেহ নূতন কর্ম্ম করে না, মাত্র ফল ভোগই করে। এই কারণে ইহলোকের নাম কর্ম্মভূমি। এই কর্ম্মভূমি হইতেই মানব মুক্তিলাভে অধিকারী হয়; স্বর্গনরকে গমন করে।

আর এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু আছে,—যাহারা তাদৃশ পাপ করে না; কেবল অবিদ্যাবশবর্ত্তী হইয়া জন্ম মৃত্যুই ভোগ করে। কয়েক জন্ম কেবল একজন্মের অনুষ্ঠিত পাপের ফলই ভোগ করিয়া যায়। তাহারাই তৃতীয় জন্তু। "অদন্দশূকাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি" "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" ইহাই তাহাদের পক্ষে বিধান। ইহারা দংশ মশকাদি জন্মই সাধারণতঃ পাইয়া থাকে।

পাপীরা যে স্থাবর জন্ম লাভ করে, তাহার অর্থ—স্থাবরাদির অভ্যন্তরে পাপীর জীবাত্মা প্রবিষ্ট হয়। কারণ মনোপাধিক প্রাণ সর্ব্বজ্ঞ জীবাত্মা ত পার্থিব বস্তু নহে যে, স্থাবর হইবে। তবে স্থাবরাদির ভিতর থাকিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে।

পশু স্থাবরাদি জন্মে নূতন করিয়া কর্ম্ম সঞ্চিত হয় না। মানব জন্মেরই পাপ ফলে এই সমস্ত জন্মে। তবে মহাত্মাকৃপা সাধুস্পর্শ ইত্যাদি দ্বারা সেই ভোগের কম বেশী হইয়া থাকে।

মনুষ্য বিধাতার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। মানবের এক হস্তে মুক্তি, অপর হস্তে সংসার; এক হস্তে স্বর্গ, অপর হস্তে নরক। মানব মনে করিলে দেবতা অথবা অসুর হইতে পারে। যে মানব হেলায় মানবত্বের অবমাননা করে, একজন্মেই পাপময় শতজন্ম সৃষ্টি করে, তাহাদের না জন্মানই ভাল। তাহাদের অপেক্ষা পশুজন্ম শ্রেয়। কারণ পশুজন্মে কৃতকর্ম্মের ভোগ হয়, কিন্তু পাপীর পাপজন্মে কৃতকর্ম্মের ভোগ ত হয়ই উপরন্তু নূতন করিয়া পাপকর্ম্মের সঞ্চার হইয়া থাকে।

"ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।"

এক্ষণে লোকের আর স্বর্গ নরকে, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই। স্বর্গে বিশ্বাস পুণ্যকর্ম্ম করিবার একটী প্রলোভন। সে শ্রদ্ধা বিশ্বাসের অন্তর্দ্ধানের সহিত পুণ্যকর্ম্ম প্রবৃত্তিও লোপ পাইয়াছে। তজ্জন্যই আর সরোবর প্রতিষ্ঠা, কূপখনন,

বৃক্ষরোপন, প্রভৃতি সৎকর্ম্ম দৃষ্ট হয় না। স্বর্গকামনায় লোক ধার্ম্মিকও পাপকর্ম্মে বিরত হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম খুবই ভাল, কিন্তু নিষ্কামও হইতেছে না, সকাম অনুষ্ঠিত অর্থের দাস আমরা,—অর্থ লালসায় ন্যায় অন্যায় বিচার করি না, স্বার্থ দ্বারা চালিত হইয়া কত অপরাধই করিতেছি,—তখন কামনা পরবশ প্রাণ লইয়া নিষ্কামের দোহাই দিতেছি। এক্ষণে সকলেই যে স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে ভাসমান; ধর্ম্মকর্ম্মেও কিছুমতে অনুরক্তি নাই,—তাহারও ত একটী কৈফিয়ৎ দিতে হইবে,—কাজেই অনেকে নিষ্কামের দোহাই দিতেছেন। "ফলৌ বেদান্তিনঃ সর্ব্বে।"

নরকে বিশ্বাস পাপীর পক্ষে বড় ভয়ানক। নরকে যন্ত্রণার উপর বিশ্বাস থাকিলে, লোকে পাপ কর্ম্ম করিতে সাহস পাইত কি? মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে বাধ্য হইতে হইলেও পরক্ষণেই অনুতাপ আসিত; আর পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত না, উপরন্তু অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই পাপমলা ধুইয়াই যাইত। কিন্তু এক্ষণে নরকের উপর সে বিশ্বাস না থাকায় পাপকর্ম্ম অবাধে চলিতেছে; সুরাপান ব্যাভিচার ইত্যাদি করিয়াও কেহ অনুতপ্ত বা সঙ্কুচিত হইতেছে না। নরকের যন্ত্রণাময়ী ছবি যদি মানব চক্ষুর উপর অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে জগত হইতে অনেক পাপকর্ম্ম দুরীভূত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিত না। রাজ দণ্ডের ভয়ে অনেকে পাপকর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় না,—আর এই পাপকর্ম্ম না করিতে পারিয়া অনেকে পরিণামে ভাল হইয়া যায়। তদ্রূপ নরক ভয় থাকিলে পাপী তাহার পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইবে, ক্রমে পাপ কর্ম্মে সঙ্কোচ ও ভয় জন্মিবে, আর ইহজন্মে পুণ্যকার্য্যে অনুরক্তি আসিয়া মানবকে পুণ্যবান্ করিয়া তুলিবে। প্রাচীন ভারতীয়েরা ঋষি আদর্শে পরিচালিত, ব্রাহ্মণ অনুশাসনে অনুশিষ্ট, শাস্ত্র নিয়মে আবদ্ধ ছিল, কাজেই ধর্ম্ম প্রাণতা ছিল। এক্ষণে সেই ধর্ম্ম প্রাণতার উচ্চ আদর্শ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে; এখনও লোপ পায় নাই। এখনও আশা আছে, শিক্ষা, উপদেশ, অনুরোধের এখনও সময় আছে।

———:০:———

গীতোক্ত ধর্ম্ম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কর্ম্ম-বাদ।

এইবার গীতোক্ত কর্ম্মবাদ বুঝাইতে চেষ্টা করিব, কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-বিমুখ অর্জ্জুনকে কর্ম্মপথে আনয়ন করাই গীতার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য অপিচ এই উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়াই গীতাশাস্ত্র মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন।

জ্ঞাতি-বধ-ভয়ে অর্জ্জুন কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়াছেন। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং যুদ্ধব্যবসায় অর্জ্জুনের ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম, মহাভারতে দেখা যায়, যুদ্ধের নাম শুনিলে অর্জ্জুনের বড়ই আনন্দ, এমন কি অনাবশ্যক হইলেও ধর্ম্মত কর্ত্তব্য-বোধে এই অর্জ্জুন বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়াও অতি লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিয়া বিরাটের গোধন মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুন আজ যুদ্ধ বিমুখ হইতেছেন, তাই ভগবান্ প্রথমেই বলিলেন, অর্জ্জুন! এই অনার্য্যজনিত অকীর্ত্তিকর নীচত্ব এবং ক্লীবত্ব তোমার কোথা হইতে আসিল? তোমার মত যুদ্ধপ্রিয় ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী ক্ষত্রিয়ের মুখে এসকল কথা কেন? ভিক্ষান্নে উদর পূরণ কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, এই যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই তোমার পক্ষে মঙ্গল দায়ক।

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥" ২।৩৭

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিতেছেন, যে কর্ম্মে জয়ে রাজ্য এবং পরাজয়ে স্বর্গলাভ এবম্বিধ হিতকর কার্য্যে পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই বিরত হয়েন না, তবে তুমিই বা কেন বিরত হইবে? *

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা যাউক।

সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে কর্ম্মই যে একমাত্র জীবজগতের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াও জীবন ধারণ করাও দুস্কর হইয়া উঠে, এই যে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন যাহা জীবদেহের সাধারণ ধর্ম্ম, তাহাও যখন কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তখন কর্ম্মকে কিরূপে

---

* একাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন, "নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচীন্" এ কথা পরে হইবে, পাঠক! তখন এই "হতো বা প্রপ্স্যাসি" শ্লোকটি মনে করিবেন তখন এ রহস্য প্রকাশ পাইবে।

পরিত্যাগ করিবে? তর্ক শাস্ত্র বলেন,—আহার করিতে আহার্য্য সংস্থান এবং নিদ্রাজন্য যখন শয়ন জনিত কর্ম্মের আবশ্যক হয়, আবার অন্যদিকে আহার নিদ্রার বশীভূত না হইয়াও যখন যোগী ঋষিগণ তপস্যা করিয়া থাকেন, তখন আহার নিদ্রা প্রভৃতিকে কর্ম্ম ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

এক্ষণে এই কর্ম্ম কোথা হইতে আসিতেছে? কে এই কর্ম্মকে নিয়োগ করিতেছে? গীতা বলেন,—বাসনা হইতে এই কর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। বাসনার কণামাত্র থাকিতে এই কর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কিন্তু বাসনাইবা কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারি? মনে কর আমি শ্রীভগবানকে পূজা করিব, বা তাঁহার নাম জপ করিব, ইহাও ত আমার মনের বাসনা? ইহাতেও কিন্তু শেষ হইল না, কেননা এই বাসনা সম্বন্ধেও পূর্ব্ব কথিত তর্কশাস্ত্র যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, যে বাসনার দ্বারা কর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, সেই বাসনা কিন্তু আশা কর্তৃক পরিচালিত। যদি এই যুক্তি গ্রহণ করা যায়, তবে আশা বাসনার, নতুবা একমাত্র বাসনার হাত হইতে নিস্কৃতিলাভ করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। মানুষ এই আশা বাসনার হাতে পড়িয়া দিবা রাত্র যন্ত্রণায় ছট্ পট্ করিতেছে, কাহারও বা আত্মগ্লানীর তুষানলে হৃদয় পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে, কেহ বা অনুতাপের দীর্ঘ নিশ্বাসে অতি বড় মহাপাপ আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত হইয়াছে, তথাপি এই দুর্দ্দমণীয় আশা বাসনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে না, জীব এই আশা বাসনার প্ররোচনায় কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু সেই কর্ম্ম জনিত ফল না পাইলে প্রাগুক্ত আশা বাসনার অতৃপ্ত বশতঃ জীবন যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিতেছে, অথচ শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, তাই গীতা বলিতেছেন,—

"কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মাণি॥" ২। ৪৭

কর্ম্মেই তোমার কেবল অধিকার আছে, কিন্তু ফলে নাই। যেহেতু ফলদাতা শ্রীভগবান্, তিনি না দিলে তুমি পাইবে না, তুমি এই কর্ম্ম জনিত ফল পাও আর নাইই পাও, তথাপি কর্ম্ম তোমাকে করিতেই হইবে। যদি বল ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিব, এ আবার কিরূপ কর্ম্ম? অপিচ ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে সে কর্ম্ম করিতেই বা কেন প্রবৃত্ত হইবে?

গীতা বলিতেছেন, কর্ম্ম তোমার স্বহস্তে সুতরাং তোমাকে করিতে হইতেছে, কিন্তু ফলতো তোমার স্বহস্তে নয়, স্বহস্ত দূরের কথা দৃষ্টও নয়, এই জন্য

একমাত্র দৈবানুগ্রহ ব্যতীত এই কর্ম্মফলকেই—যোগবাশিষ্টে অদৃষ্ট বলা হইয়াছে, বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিতেছেন, হে রাম! জ্ঞান শূন্য মূঢ় লোকেরাই অদৃষ্ট মানিয়া থাকে, নতুবা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলই ইহ-জন্মের সুখ দুঃখাদির কারণ।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক,—মনে কর, তুমি শুনিয়াছ,—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" তোমার পুত্রের আবশ্যক, সুতরাং তুমি বিবাহ করিলে, ইহাও তোমার কর্ম্ম,—তার পর বিধি অনুযায়ী স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম্ম করিয়াও বিবাহ কর্ম্মের ফল যে পুত্র তাহা তোমার হইল না, এমন কি তারপর আরও ২। ৩ টী বিবাহ করিয়াও তোমার পুত্র হইল না, এক্ষণে তোমাকে হয় বলিতে হইবে ভগবান পুত্র দিলেন না, অথবা তোমার পুত্রভাগ্য অদৃষ্টে নাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে হইবে। কিন্তু বিবাহ কর্ম্ম না করিয়াই পুত্রের আশা করিতে পার না, সুতরাং বিবাহরূপ কর্ম্ম তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেহেতু ইহা কর্ম্ম কিন্তু এই কর্ম্মের ফল পুত্র, অতএব বুঝাগেল ফল দাতা শ্রীভগবান, অথবা ইহা অদৃষ্ট।

এই কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে বৌদ্ধেরা দৃষ্টান্ত দিয়া যাহা বলেন তাহা এই,—তাঁহারা বলেন, যেমন ধান্যাদি শস্য সমূহ, মরিয়া গেলেও, তাহারা যে ধান্য (বীজ) রাখিয়া যায়, ঐ ধান্যবীজই ভাবী ধান্য বৃক্ষের কারণ হইয়া মৃত্তিকায় যোগ হইলেই আবার জন্মাইয়া থাকে, একটী মাত্র বীজ থাকিলেও উহার ধ্বংসের আশা নাই, সেইরূপ জীবের মৃত্যু হইলেও উহার কর্ম্মবীজের অস্তিত্ব হেতু লিঙ্গশরীর সেই কর্ম্মবীজ অবলম্বন করিয়া জলোকাবৎ অন্যত্র আবার জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে যতক্ষণ কর্ম্মবীজের ধ্বংস না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনরূপেই এই জনন মরণের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার উপায়ন্তর নাই। এই কর্ম্মবীজ ক্ষয় করাই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য সাব্যস্থ্য করিয়া বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব হইয়াছেন। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, যখন আত্মোৎকর্ষ এবং আত্মানুশীলনই নির্ব্বাণ লাভের একমাত্র পন্থা, তখন তদ্ব্যতীত অন্য একটী অনির্দ্দেশ্য এবং অপ্রত্যক্ষ বস্তুর চিন্তা লইয়া ব্যপৃত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পরিণামে কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এই নীরবতাই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া চির দিনের জন্য ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। নতুবা বুদ্ধদেব যে কর্ম্মবাদ প্রচার করিয়া ছিলেন বাস্তবিক পক্ষে উহাও গীতোক্ত কর্ম্মবাদ ভিন্ন নূতন কিছুই নহে, তবে বুদ্ধের কর্ম্মবাদের সহিত ভগবান নাই, গীতায় আছে,

এই মাত্র প্রভেদ।

যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ছাড়িয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি, কথাটা হইতেছে, শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিতেছেন।

শ্রীভগবানের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, সখে! তুমি যে আমাকে বারংবার এই হিংসা-প্রচুর নিষ্ঠুর কার্য্যে উৎসাহিত করিতেছ, জিজ্ঞাসা করি, এই শত সহস্র প্রাণী এবং আত্মীয় স্বজন বধজনিত মহাপাপের ফলভোগী হইবে কে ?

ইহার উত্তরে গীতাশাস্ত্র যাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহাই প্রকৃত গীতোক্ত কর্ম্মবাদ, গীতা বলিতেছেন,—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মণি"

যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, অর্থাৎ লাভালাভ জয় পরাজয় ইত্যাদিকে সমত্ব বোধ করিয়া কর্ম্ম করাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ, প্রথমতঃ বিচার করিয়া দেখ, আমি হাতে কার্য্য করি, কিন্তু এই হাত কি কর্ত্তা ? কখনই নয়, তবে কর্ত্তা কে ? না, এই হাতকে যে চালাইতেছে সেই কর্ত্তা। যদি বল মন প্রাণ হস্ত এই তিনে মিলিয়া কর্ম্ম হয়। তাহাতেও বলিব যে তোমার মন, প্রাণ এবং হস্তই বা কাহার দ্বারা পরিচালিত ? কাহার তৃপ্তির জন্য, কাহার সুখের জন্য বা কাহার দুঃখ অপনোদনের জন্য কর্ম্ম করি ; ইহার উত্তরে অবশ্য বলিতে হইবে যে, আমার আত্মার তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করি, পূর্ব্বে আত্মতত্ত্বে বলা হইয়াছে যে, এই আত্মাই শ্রীভগবানের প্রকট মূর্ত্তি। তা হ'লেই হইল যে আমি কর্ম্ম করিয়া শ্রীভগবানকেই সন্তুষ্ট করিতে চাই। আবার অন্যদিকে সেই আত্মদেব শ্রীভগবানই আমাকে কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছেন, অতএব যিনি আমাকে এই কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিতেছেন তিনি, এবং যাঁহার তৃপ্তির জন্য যাঁহার সুখের জন্য এই কর্ম্ম করিতেছি তিনি, যখন জানা যাইতেছে যে, এই উভয়ই আমার আত্মদেব শ্রীভগবান এবং ফলদাতাও তিনি, তখন সমত্ব বুদ্ধিই বা না হইবে কেন ?

আরও পরিষ্কার করিয়া বলি,—

মনে কর এক খানি শানিত অস্ত্র পড়িয়া আছে, এই অস্ত্র খানি লইয়া যদি আমি কোন দ্রব্য চ্ছেদন করি, তা হলে অবশ্য অস্ত্রকে কর্ত্তা বলিতে পারিনা, আবার ঐ অস্ত্রে বৃক্ষ চ্ছেদনই হ'ক বা নর হত্যাই হ'ক, উভয়বিধ কার্য্যেই অস্ত্র সমানভাবে সম্পাদন করিবে। সেইরূপ আমি, শ্রীভগবানের অস্ত্র স্বরূপ, সুতরাং আমি কর্ত্তাও নহি, বা আমার কর্ম্মও নহে। জয় পরাজয় লাভালাভে

আমার কিছুই আসিয়া যায় না। এই সমত্ববুদ্ধি বা পরমাত্ম বুদ্ধি লইয়া কার্য্য করার নামই প্রকৃত গীতোক্ত কর্ম্ম যোগ।

অনেকে আবার এই তত্ত্বটি বুঝিতে না পারিয়া,—

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽহস্মি তথা করোমী॥"

শ্লোকটি বলিয়া থাকেন, অবশ্য স্বীকার করি যে ইহা নিস্কাম কর্ম্মযোগের শেষ অবস্থা, কিন্তু কোন সাধনা না করিয়া বা কোন প্রকার তপস্যা না করিয়া এমন কি কোন উপযুক্ত গুরু আনুগত্য গ্রহণ না করিয়াও একেবারে প্রথমেই অবিদ্যাশ্রিত অহং জ্ঞান লইয়া আমি যাহা কিছু করি তাহা সকলই ভগবান করিতেছেন, আমার দোষ কি? এমন অতি বড় দুস্কর্ম্ম করিয়াও তাহা ভগবানের উপর আরোপ করা অতি মূঢ়তার কার্য্য। উল্লিখিত "ত্বয়া হৃষিকেশ"—বলিবার উপযুক্ত হইতে হইলে প্রথমত শাস্ত্র এবং গুরু উপদেশকে শ্রীভগবানেরই বাক্য মানিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম করিতে হয়, এই সকল কর্ম্ম করিবার সময়, তার পর তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানাদি কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবানের দয়া আকর্ষণ করিতে হয়, তার পর আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া বুঝিতে পারা যায় যে, "যথা নিযুক্তোঽহস্মি তথা করোমী" ইহা সত্য বটে, *

তাই গীতা বলেন,—

"বুদ্ধিযুক্ত জহাতীহ উভে সুকৃত দুস্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥"
২। ৫০

বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এই জন্মেই সুকৃতি দুস্কৃতি এই উভয়ই ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, সেই হেতু—তুমি যোগ অর্থাৎ নিস্কাম কর্ম্মযোগ করিতে উদ্যোগী হও। কেন না কর্ম্ম করিবার যে কৌশল তাহার নাম যোগ। (ক্রমশঃ)

* গীতোক্ত ভক্তিযোগ বুঝাইবার সময় এ বিষয় বিষদ রূপে বলিবার কথা আছে।

পাপ ও পুণ্য।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ গুপ্ত।

(১)

রামজী দাসের অবস্থা ভাল নয় রামজী বৃদ্ধ হইয়াছে, সংসারে আপনি, পত্নী এবং জগন্নাথ নামে একটী পুত্র। জগন্নাথের বয়স ষোল সতের বৎসর—সে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখা পড়ে করে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে গ্রাম্য পাঠশালায় বটতলার ছাপা শিশুবোধক বই আর কোন পুস্তকের চলন ছিল না. গৃহস্থ গৃহে কেহ কেহ ছাপার মহাভারত, রামায়ণ যত্ন করিয়া কিনিয়া রাখিত, তাহাও সকল ঘরে মিলিত না, শিশুবোধকও সেইরূপ। সকল বালকের অদৃষ্টে ছাপার শিশুবোধকে দপ্তর সাজাইতে পারিত, যাহাদের বাপ খুড়া, জেঠা, দাদা, কলিকাতায় থাকিত বা সেখানে আসা যাওয়া করিত তাহাদেরই এই সৌভাগ্য ঘটিত, নতুবা অপর সাধারণ বালককে গঙ্গার বন্দনা, গুরু দক্ষিণা প্রভৃতি কবিতা ও চাণক্য শ্লোক হাতে লেখাইয়া লইয়া পড়িতে হইত। জগন্নাথকেও তাহাই করিতে হইয়াছিল। জগন্নাথ এই বয়সে কসামাজা শিখিয়াছিল, তেরিজ, জমা-খরচ, কাঠাকালি, জমাবন্দী. সেরকসা, মণকসা মুখে মুখে করিতে পারিত ৭।৵০ মণ ৵০ তিন ছটাক জিনিষের মূল্য অবধারণ করিবার জন্য তাহাকে কাগজ পেন্সিল লইয়া ত্রৈরাশিক (Rule of three) কসিতে হইত না, সে মুখে মুখেই তাহা বলিয়া দিতে পারিত, ইহা দেখিয়া গ্রামের একজনের কলিকাতায় কারবার ছিল, সে জগন্নাথকে সেখানে লইয়া গিয়া দোকানদারার শিক্ষানবিশীতে বাহাল করিল। জগন্নাথ বিনা খরচায় খাইতে পরিতে পাইল আর শিক্ষানবিশী করিতে লাগিল। রামজী দাসের কতকটা কষ্ট দূর হইল। পর বৎসর জগন্নাথের বার্ষিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতন ধার্য্য হইল। জগন্নাথের বিষয় বুদ্ধি বেশ ছিল, তৃতীয় বৎসর হইতে সে বৎসরে একশত টাকা খরচ করিতে পাইল, এখন রামজীর দুঃখ নিশার অবসান হইল সুখের দিন আসিল। চতুর্থ বৎসর বার্ষিক দেড়শত টাকা বেতন হইল। রামজী দাস পুত্রের বিবাহ দিবার আয়োজন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল—রূপার খেয়ে সুয়া, রূপার পৈঁচা, রূপার তাবিচ গড়াইল, পঞ্চম বৎসরে জগন্নাথের বার্ষিক দুইশত টাকা বরাদ্দ হইল। রামজী বধূর জন্য সোনার সিঁথি. সোনার ফুল, ঝুমকা কণ্ঠমালা গড়াইল, নানা স্থান হইতে বিবাহের কথা আসিতে লাগিল। বৈশাখে নূতন খাতার পর জগন্নাথ বাড়ী আসিল, এই সময় দোকানদারের কর্ম্মচারীরা

মাতুলালয়ে গেল সেখানে একজন তাহাকে ধরিয়া তাহার একটী সুন্দরী কন্যা ছিল তাহার সহিত বিবাহ দিল, জগন্নাথ মাতুলালয় হইতে চৌপালা চাপিয়া বাদ্যভাণ্ড করিয়া বাড়ী আসিল। রামজীর অনেক খরচপত্র বাঁচিয়া গেল। পুত্রবধূ লইয়া গৃহে আসিতেছে শুনিয়া রামজী অগ্রসর হইয়া গ্রাম্য দেব দেবীকে এক একটী সিকি প্রণামী দিয়া পুত্র ও পুত্রবধুকে লইয়া ঘরে আসিল, জগন্নাথের মাতা আজ আপনার মনুষ্য জন্ম সার্থক জ্ঞান করিয়া প্রতিবাসিনীদিগকে লইয়া বরকনে ঘর ঢুকাইলেন, তাহার পর কুলাচার মত শঙ্খধ্বনি ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধা করিল। পুরোহিত আসিয়া নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একটী আধুলি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। অষ্টমঙ্গলার পর বধূকে পিত্রালয় পাঠাইয়া কর্ম্মস্থানে গেল।

সেই বৎসর জগন্নাথ প্রভুর কারবারে শূন্য বখরাদার হইল। জগন্নাথ এই বৎসর হইতে দু আনার অংশে প্রায় হাজার টাকা পাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক পরম্পরায় নববধূর সৌভাগ্য সূচনা করিয়া তাহার সুখ্যাতি করিতে ক্ষান্ত হইল না—সকলেই বলিতে লাগিল—"নূতন বৌ খুব পয়মন্ত" এই কথা শুনিয়া জগন্নাথের মাতা জগন্নাথের কল্যাণ কামনায় গ্রাম্য দেব দেবীদিগকে পুজা মানং করিল। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের নব-পরিণীতা কামিনীগণকে আশীর্ব্বাদ করিবার রীতি এই যে, পুরুষের যৌবনের ভাবী সুখের অনেক আশা থাকে সে অবস্থায় তাহারা আশীর্ব্বাদ করে—"স্বামীর সোনার দোয়াত কলম হোক, সাত বেটার মা হও" ইত্যাদি আর যখন সেই যুবতীর সুখের আশা ভরসা ফুরাইয়া যায়, সাত পুত্রের সম্ভাবনা থাকে তখন সেই স্ত্রীলোককে "হাতের লোহা ক্ষয় পাউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে। এখন জগন্নাথ পত্নী গুরুজনকে প্রণাম করিয়া স্ত্রীমহলে প্রথমোক্ত বিবিধ আশীর্ব্বাদ পাইয়া থাকে। এতদিন জগন্নাথের মাতা আপনি হাট বাজার করিত এখন আর তাহাকে তাহা করিতে হয় না, জগন্নাথ মালের জমি জমা লইয়াছে দুই এক বিঘা লাখেরাজ জমিও কিনিয়াছে। জগন্নাথের দুইখানা লাঙ্গলের চাষ—দুইটা চাকর আছে, তাহারাই হাটে বাজারে যায়। দুঃখের বিষয় রামজী এ সকলের কিছুই ভোগ করিতে পায় নাই—জগন্নাথের বিবাহের পর বৎসরই তাহাকে পরলোক প্রস্থান করিতে হইয়াছিল।

দুই আনা হইতে জগন্নাথ প্রভুর কারবারের আট আনা অংশ বসাইল, তাহাতে বার্ষিক তিন চারি হাজার টাকা আয়ের সংস্থান হইল।

(২)

এতাবৎ জগন্নাথ প্রভুর বিশ্বস্তভাবে কাজ কর্ম্ম করে—একটী পয়সা তঞ্চক হয় না—প্রভুও তাহাকে কারবারটী ছাড়িয়া দিয়া কখন দেশে কখন বা কলি-কাতায় অবস্থান করেন। প্রভুর নামেই কারবার চলে কিন্তু জগন্নাথকেই সকলে প্রভু মনে করে—জগন্নাথ প্রভুর সহিত একাসনে বসিয়া থাকিলে জগন্নাথকেই অনেকে প্রভুর নামে সম্ভাস করে। জগন্নাথের বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব হয়, পূজায় প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ হইতে বিজয়া দশমীর দিন পর্য্যন্ত গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা লুচি মণ্ডায় উদরকে পরিতুষ্ট করেন আর দুই হাত তুলিয়া জগন্নাথকে আশীর্ব্বাদ করেন।

পিতৃমাতৃদায় বা কন্যাদায় গ্রস্ত ব্রাহ্মণ-সজ্জন জগন্নাথের নিকটস্থ হইলে তাহার নিকট কেহ বঞ্চিত হয় না, জগন্নাথ সকলেরই প্রার্থনা পরিপূরণ করে ক্রমে জগন্নাথের সাধু সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক খ্যাতি লাভ হইল। তাহার বাসায় পাঁচ সাতটী ব্রাহ্মণ সজ্জনের সন্তান থাকিয়া স্কুল কালেজে পড়ে, জগন্নাথ তাহা-দের সমস্ত খরচ যোগায়, এরূপ কাজে নারাজ নহে। এরূপ লোকের সুনাম সুখ্যাতি কত দিন না হইয়া থাকিতে পারে।

জগন্নাথের কর্ম্মস্থানে প্রসার প্রতিপত্তি খুবই—আমাদের দেশীয় কারবারে চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা নাই, কর্ম্মচারীরা শতরঞ্চের উপর জাজিমে বসে, সকলেরই পশ্চাতে অন্ততঃ আধমণ তুলার একটা তাকিয়া, তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তাহার আসন মধ্যস্থলে, তাকিয়াটাও অপেক্ষাকৃত বড়—জিনিষপত্রের দরদস্তর, দেনাপাওনার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সবই তাহার সহিত। দেখিলেই কর্ত্তা চিনিয়া লওয়া যায়। জগন্নাথ গদীতে বাবু, গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে গিয়া উড়ে বামুণের কাছে জগন্নাথ বাবু—সওদাগর আফিসেও জগন্নাথ বাবু—কারবারের কয়াল, চাঁপাদার, কুলি, মজুর, সর্দ্দারের কাছে ত বাবু উপাধি আছেই। তদ্ব্য-তীত কলিকাতা সহরে যে একখানা ধুতির উপর একটা লংক্লথের কামিজ আর একখানা উড়ানী, সে খানা আজি কালি রেশমের হইলে ত কথাই নাই। পায়ে জুতাটার উল্লেখই বাহুল্য—সেই বাবু কিন্তু আমাদের এ হেন জগন্নাথ গ্রামে আসিলে জগন্নাথ বই আর কেহ নহে। তাহাও অবস্থাগুণে তাহা না হইলে জগে দাস বই আর কিছু নহে—জগন্নাথের স্বগ্রামের জমিদারের বাস সেই গ্রামেই তিনি পুরুষানুক্রমে জমিদার, গ্রামে বাবু বলিলে সকলে তাহাকেই বোঝে।

গ্রামবাসীর একটা মহা ক্রটী যে জগন্নাথের ন্যায় একটা ক্রিয়াবান্ পুরুষ কাহার মুখে বাবু বলিয়া সম্ভাষিত নহে—জগন্নাথের মনে এতদিনের পরে দেখা দিল। তজ্জন্য জগন্নাথের মনে একটা ক্ষোভও যে জন্মিল না, এমন নহে। জগন্নাথ স্বগ্রামে বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার যাতায়াত করে, যখনই যায়, তখনই জমিদারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে—জমিদারও আপনার অবস্থাপন্ন প্রজাকে যেমন আদর যত্ন করিবার তাহা করিয়া থাকেন, কখন কোন জিনিষপত্রের প্রয়োজন হয় জগন্নাথকে লিখিলে জগন্নাথ তাহা পাঠাইয়া দেয়, জমিদার মূল্য দিতে চাহিলেও তাহা লয় না। ধনগরিমা অনেক জ্ঞানবান লোকের মনকেও গরম করিয়া তোলে, জগন্নাথের নীতিশিক্ষা ত চাণক্যের শ্লোকে এরূপ স্থলে জগন্নাথ যে তাহা হইতে দূরে থাকিতে পারিবে তাহা নিতান্ত অসম্ভব নয় কি—গ্রামের কেহ কেহ তাহার মনের ভাবটা কতক কতক বুঝিয়াছিল। একদা একজন নীচ লোকের গরুতে জগন্নাথের জমির ধান খাইয়াছিল বলিয়া জগন্নাথের ভৃত্য সেই গরুটীকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যাহার গরু সে জগন্নাথের নিকটস্থ হইয়া তাহাকে বাবু সম্বোধনে তাহার প্রতি আনুগত্য দেখাইয়া যথা--"বাবু, আপনি গ্রামের একজন বড়লোক, আমি আপনার আশ্রিত চাকর বই আর কিছুই নহে, আপনি মনে কল্লে কেবল গরু বাঁধিয়া রাখিয়া কেন, কত রকমে আমাকে কষ্ট দিতে পারেন।" এই কথা বলিয়া স্তব স্তুতি করিয়া গরু লইয়া যাইতে পারিয়াছিল।

জগন্নাথ গ্রামের মধ্যে যে একজন ক্রিয়াবান সে পক্ষে সন্দেহ নাই—কিন্তু এপর্য্যন্ত মাটির বাড়ীতেই বসবাস। পাকা বাড়ী করিতে হইলে খিড়কীতে একটী পুষ্করিণী কাটাইতে এবং বাড়ীটিও একটু প্রশস্ত করিতে হয় কিন্তু নিকটে একটুকুও খালি জায়গা নাই—কেবল সুখময় নামক একটী বালকের বাস্তুভিটা ও একটী ডোবা আছে—সুখময়ের সেই জমিটুকু লাখেরাজ। সুখময়ের সংসারে তাহার মা বই আর কেহ নাই—তাহার বয়স সতের আটার বৎসর, লেখাপড়া খুব কম জানে মায়ের এক পুত্র বলিয়া সুখময়ের মা তাহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে পাঠায় নাই, আপনি দুঃখ মেহনৎ করিয়া আপনার ও পুত্রটীর ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করে। এরূপ আদুরে ছেলেরা প্রায় বওয়াটে হইয়া যায়, সুখময় সেরূপ নহে—সৎসঙ্গে থাকে, সদ্বিষয়ের চর্চ্চা করে, অধ্যাপকদের টোলে বসে, কাশীদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়ে, আর খায় দায় থাকে।

জগন্নাথের মনে পাপ বুদ্ধির সঞ্চার হইল, সুখময়ও আর এখন বাড়ী ঘর জোর করিতে পারিতেছে না;- দুকাঠা চারিকাঠা জায়গা হইলেই তাহার চলে,

এই ভাবিয়া সে সুখময়ের মাকে একদিন আপনি বাড়ীতে ডাকিয়া বলিল—"সুখোর মা, তুমি এতটা জায়গা নিয়ে কি করবে, আমাকে দাও—আমি বাড়ীটা একটু বড় করি—খিড়কীতে একটা পুকুর কাটাই, তায় তোমাদেরও জল খাওয়া চলবে।"

সুখোর মা কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল—কোন উত্তর করিল না।

জগন্নাথ বলিল—"উত্তর দিচ্চ না যে, আমি দ্বিগুণ দাম দিব। এক বিঘা জমির দাম একশ টাকা, তার জায়গায় আমি দুশ দিব, তাতেও তোমার মন না উঠে, চারিশ দিব—কাজ নাই অত কথায় তোমাকে পাঁচশ টাকা দিচ্চি, জমিটুকু আমাকে দাও—ঐ টাকা কোন কারবারী খাতায় জমা রাখলে মাসে তিন চারি টাকা সুদ পাবে. তোমাদের মা বেটার গুজরান চলে যাবে।"

সুখোর মা—এইবার উত্তর করিল সে বলিল—"দেখো জগু, মানুষ খেতে না পেলেও পৈতৃক ভদ্রাসন বিক্রী করে না—অদৃষ্টের কথা বলা যায় না, এমন দিন আস্‌তে পারে সে দিন আমার সুখোরও জায়গার দরকার হবে। তখন সুখোকে জায়গা জায়গা ক'রে বেড়াতে হবে। তুমি বাবা আপনাকে দিয়েই দেখ না!"

এরূপ উত্তরে জগন্নাথ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, বরং শেষের কথাটা শুনিয়া বিশেষ বিরক্তই হইল। জগন্নাথ বলিল—"আচ্ছা, তবে সেই ভাল।"

জগন্নাথ মুখে একথা বলিল বটে, কিন্তু কাজে বিপরীত ঘটাইল, একজন পাটোয়ারকে কিছু টাকা দিয়া আদালতে সে সুখময়ের নামে এক জাল হাতচিঠা প্রস্তুত করিয়া তাহার নামে আদালতে নালিশ করিল, পেয়াদাকে দিয়া সমন গোপন করিল, একতরফা ডিক্রী হইল, সেই ডিক্রী জারি হইল, সুখময়ের বাড়ীটা ক্রোক হইল, নিলামও হইয়া গেল, সুখময় বা তাহার মাতা কিছুই জানিতে পারিল না। এক দিন দিবা দ্বিপ্রহরে সুখময় আহারে বসিয়াছে, তাহার মা পরিবেশন করিতেছে, এমন সময় বাড়ীর বাহিরে ডুল ডুল করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে বাড়ীর মধ্যে জন সঙ্ঘ জুটিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে একজন লাল পাগড়িওয়ালা ও তিন চারি জন চৌকিদার সুখময়ের ঘরে ঢুকিয়া জিনিষপত্র বাহির করিতে লাগিল—আর লাল পাগড়িওয়ালা লোকটা সুখময়কে বলিল—ভাত ক'টা শিগ্‌গির খেয়ে নাও। এখনি বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হ'বে, আজ থেকে এই বাড়ী রামশরণ সরকার মহাশয়ের হ'লো. (রাম-শরণ গ্রামবাসী একজন পাটোয়ার,) তিনি সুখময়ের দেনা ডিক্রীতে এই বাড়ী কিনিয়া লইয়াছেন আজ খাসদখল লইলেন। সুখময় ভাতের গ্রাস একটী মুখে তুলিতে যাইতেছিল, সেটী আর মুখে উঠিল না—সে সংসারে কোনও তত্ত্ব রাখিত না, সজল নয়নে মার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—"মা কার দেনা করে ছিলে?"

সুখময়ের মা উত্তর করিল—"কোন দিন দুপয়সার জন্য কারো কাছে হাত পাতি না, নিত্তি আনি নিত্তি খাই। অনেক দিন হ'লো জগু একদিন আমাকে

আমাদের এই ভিটে বেচবার কথা বলে—তা আমি তায় রাজি হইনে। এসকল তারি খেলা।"

পেয়াদাকে বলিল,—"গ্রামের জমিদার আছে, মোড়োল গোমস্তা আছে, সবাই থেকে বিচার হোক কোন্ দিন কিসের হুকুম, কার কাছে আমি কত টাকা নিয়েছিলাম, তার তজবিজ বিচার, হোক, বাড়ী ছাড়বার কথা বল্লেই ছাড়বো।

প্যায়। তবে তুমি সরকার বাহাদুরের হুকুম মানছ না, আমাকে তাড়িয়ে দেখ—বস আমাকে এক কথা বল্লেই আমি চলে যাই।

পাড়া প্রতিবাসী পাঁচজন ঢোলের শব্দ পাইয়া তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা সুখোর মাকে বুঝাইয়া বলিল, তাহাতে বিপদ আছে,—জেল খাট্‌তে হবে। এখন আস্তে আস্তে বাড়ী ছেড়ে দাও, প্যায়দা চাবি বন্ধ করিয়া সরকারি হুকুম তামিল করুক, তার পর গ্রামের জমিদারের কাছে গিয়ে রফা নিষ্পত্তি যাহা হয় একটা ক'রে ফেল।

সুখময়ের মা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পুত্রকে লইয়া বাড়ীর বাহির হইল। প্যায়দা ঘরে চাবি বন্ধ করিল।

———:•:———

(৩)

জগন্নাথের নির্ম্মল চরিত্রে কালী লাগিল—পল্লীগ্রামের কোন ঘটনাই পল্লীবাসীর অগোচর নহে, গোপনেই হউক, আর প্রকাশ্যেই হউক যে যাহা করে অন্যের তাহা জানিতে বাকী থাকে না। গ্রামবাসীর মুখে এত দিন জগন্নাথের সুখ্যাতি ধরিত না—এখন হইতে অনেকে তাহার নাম শুনিয়া কাণে হাত দিতে লাগিল।

যে সময়ে উপরি উক্ত ঘটনা ঘটে তখন জগন্নাথ বাড়ীতেই ছিল। জমিদার মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই একথা জানিতেন। পল্লীগ্রামে জমিদারের সর্ব্বতোমুখী শক্তি—গ্রামের জমিদারের অগোচর এমন কাজ হইতেই পারে না। সুখোর মা কাঁদিতে কাঁদিতে জমিদারের নিকটস্থ হইয়া সকল কথাই জানাইল, জমিদার তাহাকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া তখন বিদায় করিয়া বলিয়া দিলেন—সন্ধ্যাকালে জগন্নাথকে ডাকিয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিবেন।

সন্ধ্যার দীপ জ্বলিল, সুখের মা সুখকে লইয়া জমিদারের বৈঠক খানায় হাজির হইলেন। জগন্নাথ তখনও আইসে নাই। জমিদার সুখের মাকে ভদ্রাসন বাড়ী ছাড়িয়া দিবার জন্য সুযুক্তি দিতে লাগিলেন—আরও একশ টাকা জগন্নাথকে দিয়া দেওয়াইবার আশ্বাস দিলেন, আর যে বাড়ী আছে তাহার অপেক্ষা একখানি ভাল বাড়ী করিয়া দিবার কথাও বলিলেন। সুখোর মা যখন বুঝিল, জমিদার জগন্নাথের দিক—তখন সে একটী মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জমিদারের প্রস্তাবে সম্মত হইল।

তখন জগন্নাথ আসিয়া জমিদারকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। জমিদার তাহাকে বসিতে বলিলেন, জগন্নাথ বসিল। সুখোর মার সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল জমিদার জগন্নাথকে সব শুনাইলেন। জগন্নাথ একশ টাকা বেশী এবং একখানি ভাল বাড়ী করিয়া দিবার কথায় কৃত্রিম নারাজি প্রকাশ করিয়া পশ্চাত সম্মাত জানাইল। তাহার দুই দিন পরে ষ্টাম্প কাগজ আনাইয়া জমিদারের কাছারিতেই লেখা পড়া হইয়া গেল। জমিদারও কিছু পাইলেন। সুখোর মা সুখময়কে লইয়া জগন্নাথের দেওয়া নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গেল। কিন্তু বহুকালের পুরাতন পূর্ব্ব পুরুষের ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া যাইবার যে একটা মায়া তাহা তাহাদের দুই জনেরই মনে শেলসম বিধিয়া রহিল।

টাকা ছয় শত পাইয়া সুখময়ের মাতা তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সুখময় তাহাতে নিতান্ত নারাজ হইল, বিবাহ দিলে সে সংসারি হইবে না, দেশান্তরী হইবার কথা বলিল, মাতা ভয় পাইয়া অগত্যা একজন কারবারীর খাতায় জমা দিল মাস মাস সাড়ে চারিটী করিয়া টাকা সুদ পাইতে লাগিল, তাহাতে তাহাদের সংসার অনেকটা সচ্ছল হইল। আত্মীয় স্বজনে সুখময়ের মাকে বুঝাইয়া বলিত মানুষের মন সব সময় এক রকম থাকে না, এক দিন না একদিন সুখময়ের সুমতি হইবে, তখন আপনিই বিবাহের কথা বলিবে। সুখময়ের মাতা তাহাতেই আশ্বস্ত হইয়া কাল জাপন করিতে লাগিল। ইহার দুই তিন বৎসর পরেই সে মারা গেল—সুখময় মাতৃহীন হইয়া তাহার শ্রাদ্ধে সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া দিয়া দেশান্তরিত হইল কোথা চলিয়া গেল কেহ তাহার খোজ খবর পাইল না। জগন্নাথ সুখময়ের বাস্ত ভিটা পাইয়া আপনার বাড়ী বৈঠক খানা পূজার দালান প্রস্তুত করিয়া খিড়কীতে একটী পুষ্করিণী ও কাটাইল এই সময়ে জগন্নাথের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন করিল। গ্রামে যখন দশজন একত্র হয় কথায় কথায় জগন্নাথের কথা উঠিলে আগে সকলে এক বাক্যে সুখ্যাতি করিত এখন প্রায়ই দুইটা দল হইয়া যায়, এক দলে কেবল তাহার সুখ্যাতি করে, আর এক দলে সুখ্যাতি কুখ্যাতি দুই করে। যাহারা সুখময়ের কথা তোলে তাহারা জগন্নাথের পুত্র জন্মিবার পুণ্যের পরিচয় দেয়। "রাণাৎ প্রত্যাগতং শুরং" no one can be pronounced happy till the time of his death ইহাই বিজ্ঞের বচন। ফলকথা পড়তার মুখে কিছুই আটকায় না—পড়তাও আবার চিরদিন থাকে না, অতিমাত্রায় উঠিলে সাততুরুপে বিগড়াইয়া যায়, পুনঃ পুনঃ তিনবারের সাততুরুপে হাতের পাঁচ পর্য্যন্ত হারাইতে হয়।

জগন্নাথ ধনীর কারবার চালায় খুব লাভও হয়। ধনী দেশেই থাকেন, কারবার নিজ চক্ষে অনেক দিন হইতেহ দেখেন নাই, তাহার তিন চারিটী পুত্র—দুই এক জন প্রায়ই কলিকাতায় থাকিয়া গদীতে বসেন, সে কেবল ধনীর সম্মান লাভের জন্য, বিলাস ভোগই প্রধান লক্ষ্য। জগন্নাথ আপন মনে চিন্তা করে—ধনীর পুঁজি মাত্র—যে কিছু লাভ তাহার হইতেই এই ভাবিয়া আপনার প্রাপ্য

অংশ অপেক্ষা বৎসর বৎসর দুই এক হাজার বেশী খরচ করে। এ বৎসর জগন্নাথ স্বস্ত্রীক তীর্থ যাত্রা করিল—গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, কনখাল, গোমুখী, হরিদ্বার বদরিনারায়ণ, কেদারনাথ, দ্বারকা, কোন তীর্থই বাকী রহিল না—ফিরিয়া আসিতে তিন চারি মাস গেল, সঙ্গে পাঁচ সাত জন লোক ও দাসদাসী আশ্রিত অনুগত ছিল, খরচ লাগিল প্রায় পাঁচ হাজার টাকা—সমস্তই কারবারের। এ সকল দেখিবার বা বুঝিবার শক্তি সামর্থ্য ধনী সন্তানদের ছিল না। তাহাদেরও খরচ আটকায় না—যখন যাহা চায় তাই পায়, বাড়ীতেই মাস মাস দুইশত করিয়া টাকা দিতে হয়।

—:০:—

(৪)

জগন্নাথ খুব ধুম ধামে কলিকাতা হইতে ইংরাজী বাজনা নাচ তয়কা লইয়া গিয়া দেশে পুত্রের বিবাহ দিল, তাহাতেও বহু অর্থ ব্যয় হইল। ইহার অল্পদিন পরেই এক অপরাহ্ন সময়ে জগন্নাথের খিডকীর পুষ্করিণীর নীচে দিয়া যে একটী রাস্তা ছিল তাহাতে একটী লোক আসিয়া বসিল, একদৃষ্টে জগন্নাথের বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। থাকিতে থাকিতে সূর্য্যাস্ত হইল, গাছে গাছে পাখী ডাকিয়া উঠিল, সুখস্পর্শ দক্ষিণানিল ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, সে সকলের কিছুই আগন্তুকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিল না। সে একমনে এক ধ্যানে জগন্নাথের বাড়ীর দিকে কখন বা পুষ্করিণীর জলের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে রাত্রি হইল। পরদিন তাহাকে সেইরূপে থাকিতে দেখা গেল—তাহাকে দেখিবার জন্য লোকও জুটিতে লাগিল—কেহ কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসিলে উত্তর পায় না, কেবল দুই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে মাত্র। এ সংবাদ ক্রমে জমিদারের কর্ণগত হইল, তিনি লোক পাঠাইয়া তাহার পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া পুলিশে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। জমিদারের লোক আসিয়া আগন্তুককে শুনাইল, রাত্রি প্রভাতে সে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া না যাইলে তাহাকে পুলিশে দেওয়া হইবে। তাহাতেও সে কোন উত্তর করিল না। পরদিন প্রাতঃকালে জগন্নাথের পত্নী খিড়কীর পুষ্করিণীর জলে একটা মৃতদেহ ভাসিতে দেখিয়া শোর গোল করিয়া উঠিল, গ্রামস্থ লোক পুষ্করিণীর নিকট আসিয়া দেখিল পূর্ব্বদিনের সেই লোকই মরিয়া জলে ভাসিতেছে। গ্রামের বালক, বৃদ্ধ, যুবা অনেকেই আসিয়া দেখিল, প্রবীণদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল,—সেই মৃতদেহ সুখময়ের, কেহ বা তাহাতে সন্দেহ করিল, ফলে কিছু নিশ্চিত হইল না। পুলিশ আসিয়া আত্মহত্যা বলিয়া চলিয়া গেল।

এই সংবাদ কলিকাতায় জগন্নাথের নিকট পৌছিল, জগন্নাথের এ পর্য্যন্ত তীর্থ শ্রাদ্ধ করা হয় নাই, তাহার আয়োজন অনুমান করিয়া সে দুই তিন দিন মধ্যেই বাড়ী আসিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট হইতে পুষ্করিণীতে অপঘাত

হত শব সংস্পর্শ জন্য ব্যবস্থা পাওয়া গেল, পুষ্করিণী পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠানে জগন্নাথ অগ্রণী সে সমস্ত আয়োজনই করিল। জ্ঞানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলেন, যাগ যজ্ঞ যাহা কিছু করিবার সবই হইয়া গেল, কিন্তু জগন্নাথের পত্নীর তাহাতে মনতৃপ্তি জন্মিল না, পুষ্করিণীতে অপঘাত মৃত্যু বড়ই অমঙ্গলজনক—তাহাতে আবার কেহ কেহ বলিল—অপঘাত মৃত ব্যক্তি সুখময়, সেই স্থানটীতে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের বাস্তু ভিটা ছিল, এতদিনেও সে তাহার মায়া মোহ ভুলিতে পারে নাই, মরিয়াও পারিবে না, ঐ পুষ্করিণী আশ্রয় করিয়া বরাবর থাকিবে, যতদিন তাহার মুক্তি না হয়, ততদিন সে সেই পকুর ছাড়িবে না।

খিড়কীর পুষ্করিণীতে "ঝুপ ঝাপ" শব্দ হয়, কেহ যেন জলে সাঁতার দিতেছে বলিয়া মনে হয়। জগন্নাথ স্থির থাকিতে পারিল না শ্রীশ্রী৺গয়াধামে লোক- পাঠান হইল, সে সেখানে গিয়া সুখময়ের প্রেতাত্মার পরিত্রাণ জন্য বিষ্ণু পাদপদ্মে ও প্রেত শিলায় পিণ্ড দিয়া ফিরিয়া আসিল, পুষ্করিণীতে উপদ্রব নিবারণ হইল বটে, কিন্তু গৃহস্থের ভয় ঘুচিল না। রাত্রিকালে কেহ খিড়কীর পুকুরে যাইতে পারিত না।

জগন্নাথ কলিকাতা গেল—সেখানে গিয়া শুনিল তাহার ধনী মারা গিয়াছে। তাঁহার দুই তিনটী পুত্র উপস্থিত, তাহারা পিতৃশ্রাদ্ধে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ের ফর্দ্দ করিয়াছে—জগন্নাথের ইচ্ছা নয় এত টাকা ব্যয় করা হয়, কিন্তু সে কথা মুখে ফুটিবার নয়। ধনীর কনিষ্ঠ পুত্রটী সর্ব্বাপেক্ষা চালাক চতুর—সে জগন্নাথের মতলব কতকটা বুঝিয়াছিল, আপনি ভূতের শ্রাদ্ধে হাজার টাকা খরচ করে আর ধনীর শ্রাদ্ধে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিতে যাহার মন না উঠে, নিশ্চিত তাহার মনে পাপ আছে। যাহাই হউক ধনীর শ্রাদ্ধ তাহার পুত্রদের মনের মতই হইয়া গেল, সাত হাজার টাকা ব্যয় হইল। এতদুপলক্ষে জগন্নাথ ও কারবারের অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মচারী চাকর বামুন সকলেই ধনীর দেশে গিয়াছিল, ক্রিয়া সমাপনান্তে জগন্নাথ কলিকাতায় ফিরিয়া বাড়ী হইতে বড়ই দুঃসংবাদ পাইল—তাহার একমাত্র পুত্র মারা গিয়াছে। জগন্নাথ পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিল, দুইদিনকাল কেবলই বিছানায় পড়িয়া কাঁদিল, বাড়ী যাইবার জন্য উপর্য্যুপরি পত্র আসিতে লাগিল, তিন চারি দিনের পর সে বাড়ী আসিয়া পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা করিল, কিন্তু সহজে শান্তি মিলিল না, বিপদের বিকট মূর্ত্তি যেন তাহার বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—দেশে থাকিয়া জগন্নাথ মনের জ্বালা জুড়াইতে পারিল না, পত্নী ও পুত্রবধূকে লইয়া সে কিছুদিন বৈদ্যনাথে গিয়া রহিল, কিন্তু জগন্নাথের অভাবে কারবার অচল হয়, কাজেই কলিকাতায় আসিতে হইল, পত্নী ও পুত্রবধূও আসিল, তাহারা কিছুকাল দেশে যাইতে চাহিল না।

—:•:—

(৫)

ধনীর কনিষ্ঠ পুত্রটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারবারে লিপ্ত না থাকিলেও পিতার জীবিতাবস্থায় মাঝে মাঝে আসিয়া কারবারের কাজ দেখা শুনা করিত, তাহাতেই তাহার কারবার বুদ্ধি অনেকটা জন্মিয়াছিল। বার তের বৎসর কারবারের হিসাব নিকাশ হয় নাই বলিয়া তিনজন রেওয়ার মুহুরী নিযুক্ত হইয়া কাগজ পত্রের নিকাশ হইতে লাগিল, ছয়মাস মধ্যে হিসাব ঠিক হইল, জগন্নাথ আপনার প্রাপ্য অপেক্ষা বিশ হাজার টাকা বেশী খরচ করিয়াছে। সেই বিশ হাজার টাকার জন্য জগন্নাথকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল, জগন্নাথ বলিল খাটিয়া শোধ দিবে, মহাজন পুত্র তাহা শুনিল না, বেবাক টাকা কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া না দিলে কাজে রাখা হইবে না বলিয়া জবাব দিল, জগন্নাথ দেশে চলিয়া গেল।

দুই এক মাস মধ্যে সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিবার কথা ছিল, ছয় মাস গেল মহাজন একটী পয়সা পাইল না, জগন্নাথের নামে নালিশ হইল ডিক্রী হইল, দেনার দায়ে জগন্নাথের বাড়ী ঘর পুষ্করিণী, বেড় বাগিচা যাহা কিছু সব বিকাইল, ক্রমে তাহার অন্নাভাব উপস্থিত। একজন জ্যোতিষী জগন্নাথের নিকট আসা যাওয়া করিতেন, বৎসরান্তে তাঁহাকে একবার আসিয়া বর্ষ প্রবেশ গণনা করিয়া যাইতে হইত, তাহার জন্য তিনি পাথেয় বাদে আটটী করিয়া টাকা পাইতেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় তিনি এ বৎসরও আসিলেন, জগন্নাথের দুঃখ দেখিয়া জ্যোতিষী অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না, জগন্নাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল— "ঠাকুর বলুন দেখি, আমি এত পুণ্য, ধর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান করেও কেন শোকতাপে কষ্ট পাই, অর্থাভাবে দিন যায় না।" জ্যোতিষী যখন জীবিকার জন্য সত্যের অপলাপ করেন না, অপ্রিয় সত্য বলিতে তিনি যখন কুণ্ঠিত নহেন, তিনি উত্তর করিলেন,—'জগু বাবু, পাপ পুণ্যের জমা ওয়াশীল চলে না যে, পুণ্য হইতে পাপ বাদে অবশিষ্ট পুণ্য ভোগ করিবেন। ভগবানের রাজ্যে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার সকলকেই ভোগ করিতে হয়। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখা এবং তাঁহারই নিয়োগে "হত ইতি গজ" বলিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। অধিক আর কি বলিব।"

জ্যোতিষী রিক্ত হস্তে এবার বিদায় লইলেন। তাঁহার আতিথ্য সৎকার অতি কষ্টেই নির্ব্বাহ হইয়াছিল। এই ঘটনার একমাস মধ্যেই জগন্নাথ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু শয্যাশায়ী, মৃত্যুর পূর্ব্বে জগন্নাথ ছানার সন্দেশ খাইতে চাহিয়া তাহা পাইল না, নিতান্ত অনাথ দীন দরিদ্র অপেক্ষাও হীনাবস্থায় তাহাকে এই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইল। সুবুদ্ধি পাঠক জগন্নাথের চরিত্র হইতে যেন পাপ ও পুণ্যের প্রভাব বুঝিয়া লয়েন।

সম্পূর্ণ।

ভারতেশ্বরী ও ভারত সম্রাট।



রাজপরিবার।

Engraved and Printed at the FINE ART PRINTING SYNDICATE,—JORASANKO, CALCUTTA.



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"
মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। } ১৩২০ সাল, জ্যৈষ্ঠ। { ২য় সংখ্যা।

মূলে-ভুল।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

মূলে যাহার ভুল,—গোড়ায় যাহার গলদ, তাহার সমস্তই ভুল,—সমস্ত কার্য্যেই গলদ। সমস্ত জীবন তাহাকে ভুলের অনুসরণ করিয়াই অতিবাহিত করিতে হয়। সমস্ত জীবন ভুলের অনুসরণ করা যে কি কষ্টকর, তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে? এইরূপ লোকের জীবন বিড়ম্বনাময়। ব্যক্তিগত ভাবে একজনের সম্বন্ধে যে কথা বলা যায়, জাতীয়তার হিসাবে সমষ্টিগত ভাবে জাতির সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। একজনের সম্বন্ধেও যে নিয়ম, একটা জাতির সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। একজনের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে, যেরূপ সে ব্যক্তি মানুষের মত মানুষ বলিয়া পরিচিত হয়, জাতির পক্ষেও তদ্রূপ। কারণ জাতি কতকগুলি মানুষের সমবায়। অতএব একটি মানুষের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া যেমন তাহার অমনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, একটা জাতির অধঃপতন

দেখিয়াও সে জাতির মধ্যে যে মানুষের মত মানুষ নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়।

"জনমিলে একদিন অবশ্য মরণ" ইহা সকলেই জানে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও কেহ সৎপথে চলে না বা চলিতে চেষ্টাও করে না। অন্য প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, আমাদিগের ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমাদিগের মুলেই ভুল, মূলেভুল বলিয়াই আমরা লক্ষ্য শূন্য তীরের ন্যায় আজীবন ঘুরিয়া বেড়াই এবং ঘুরিতে২ অবশেষে প্রাণত্যাগ করি, সুতরাং আসা যাওয়াই মাত্র সার হয়। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, সংসারে আমরা কোন প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত আসিয়াছি, তাহার উত্তর করিতে পারি না। কিজন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম কি, কর্ত্তব্য কি, নিজেই তাহা জানি না, সুতরাং অন্যের প্রশ্নের উত্তর কি করিয়া দিব? এইরূপ ব্যক্তি বা জাতি জীবন্মৃতের পর্য্যায়ভুক্ত। জীবন্মৃতের একটি লক্ষণ এই—তাহার বাসনা লক্ষ প্রকার, কিন্তু লক্ষ্যশূন্য, এই লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনার ফলে একটিও পূর্ণ হয় না, আর অপূর্ণবাসনা লইয়াই প্রাণত্যাগ করিতে হয় এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করিতে হয়।

সংসার ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেই আসা, এবং কর্ম্মেতেই দেহ ক্ষয়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ও মানুষ সকলেই কর্ম্ম করিতে আসে, আর কর্ম্ম করিয়া চলিয়া যায়, এই আবর্ত্তন জগতের মহাধর্ম্ম, কিন্তু এমন কর্ম্ম করা চাই যেন মরিলেও কর্ম্ম গৌরবে অমর করিয়া রাখিতে পারে।

মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিসে শ্রেষ্ঠ? জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিবেকে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং কার্য্যাকার্য্য স্থির করিতে বা ভাল মন্দ নির্ণয় করিতে কেবলমাত্র মানুষই সক্ষম। মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া তৎ প্রতিপালনে প্রত্যেক মানুষেরই যত্নবান হওয়া উচিত। ভাল মন্দ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারের উপায় সত্যের উপাসনা ও অসত্যের পরিবর্জ্জন। যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম বা যাহা ধর্ম্ম, তাহাই সত্য, সত্যের উপাসনাই ধর্ম্মের উপাসনা বা ধর্ম্মের উপাসনাই সত্যের উপাসনা। সত্য বা ধর্ম্মের উপাসনা করিলেই প্রকৃত গন্তব্য পথ নির্ণীত হয়। এক্ষণে প্রশ্ন এই—কি করিয়া সত্যের বা ধর্ম্মের উপাসনা করিতে হয়? তাহারও উপায় আছে, সত্যবাক্য, সুসঙ্কল্প এবং সাধু ব্যবহার দ্বারা সত্য বা ধর্ম্মের উপাসনা করা যায়।

সত্যবাক্য, সুসঙ্কল্প ও সাধুব্যবহারই মানুষকে সৎপন্থা দেখাইয়া দেয়, সুতরাং সত্যপরায়ণ মানুষের মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে ক্লেশ হয় না। সত্য—

ধর্ম্ম, অসত্য—অধর্ম্ম. সত্য—মহান, অসত্য—অমহান, সত্য—উচ্চ, অসত্য—নীচ, সত্য—আলো, অসত্য—অন্ধকার। সত্যের সেবা করিলে, লক্ষ্যস্থির, উচ্চ এবং মহান্ হয়। সত্যের সেবা ব্যতীত মানুষের মত মানুষ হওয়া যায় না।

ভুল নানাপ্রকার, জাতিগত, সমাজগত, ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত ইত্যাদি। জাতিগত ভুল—অযোগ্য উচ্চবর্ণের অযথা সম্মান। সমাজগত ভুল—দশজনে যে কার্য্য করে, অকার্য্য জানিয়াও সমাজের খাতিরে তাহা করা। শিক্ষাগত ভুল অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাশিক্ষা। যে বিদ্যা অর্থোপার্জ্জনের ব্যপদেশে মানুষকে অনুগত ভৃত্যে পরিণত করে, তাহা প্রকৃত বিদ্যা নহে—অবিদ্যা। ব্যক্তিগত বা জাতিগত ভাবে এইরূপ শত শত ভুলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ভুলের সংশোধন না করিলে, ভুলেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়,—ভুলই ব্যক্তিগতভাবে মনুষ্যত্ব বিনষ্ট এবং সমষ্টিগতভাবে জাতীয়ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে;—ইহাকেই বলে—"মূলে ভুল।"

রাজভক্তি। *

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজদ্বিভুঃ॥"

আর্য্যশাস্ত্রকারগণের মতে রাজা অষ্ট দিক অংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

"ইন্দ্রানিল যমার্কাণাং অগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য, শাশ্বতীঃ॥"

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, সূর্য্য, অগ্নি ও কুবেরের সারাংশে জগতের রক্ষার জন্য রাজার সৃষ্টি। ইন্দ্রের প্রতাপ, চন্দ্রের কোমলতা, বায়ুর জীবোপকারিতা, যমের ন্যায় পরায়ণতা, সূর্য্যের তীক্ষ্ণতা, অগ্নির সর্ব্বভূতস্থিতি ও কুবেরের দানশীলতা, একাধারে রাজায় বর্ত্তমান। দুর্ব্বলের উপর সবলের স্বতঃসিদ্ধ অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত, দস্যু তস্করাদি অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, পররাজ্য লোলুপ, নিরীহ প্রজার উষ্ণ রক্তে ধরণী-পরিপ্লাবী, অত্যাচারের করাল হস্ত হইতে গ্রাম নগর দেশ মহাদেশ রক্ষার নিমিত্ত, নিরীহ প্রজার মান সম্ভ্রম ধন সম্পত্তি বাঁচাইবার জন্য প্রতাপশালী রাজার প্রয়োজন।

---

* করোনেশান দরবারে পঠিত ও পারিতোষিক প্রতিযোগিতায় প্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত।

রাজার একহস্তে ন্যায় পরায়ণতার সূক্ষ্ম সূত্র, অপর হস্তে নির্দোষীর সান্ত্বনা স্থল অত্যাচারীর ভয়প্রদ দণ্ড বিরাজ করে, এইরূপ গুণশালী রাজা তাই সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। আর যে রাজদ্বেষী সে শাস্ত্রমতে দণ্ডার্হ। "তং যস্তু দ্বেষ্টি সম্মোহাৎ স বিনশ্যত্য সংশয়ং।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "আমি মনুষ্যদিগের মধ্যে নরপতিরূপে বিরাজ করি।" দেবতার আদেশ, দেবতার নিয়ম, যেমন কায়মনোবাক্যে পালন করা উচিত; রাজার আদেশ, রাজার নিয়মও সেইরূপ ভাবে পালন করা উচিত, কারণ রাজার জন্ম দেবাংশে।

পাশ্চাত্য জাতিদিগের মতে সাধারণ হিতের জন্য গঠিত, রাজ নিয়মাবলী পালন করাই রাজ-ভক্তি। এ নিয়ম পালন ভিন্ন রাজার প্রতি প্রজার যে একটা স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য আছে; তাহা তাঁহারা বুঝেন না। দেবাংশে জন্ম বলিয়া রাজার আদেশ, রাজার নিয়ম, ন্যায় বুঝিয়া থাক বা অন্যায় বুঝিয়া থাক দেবতার প্রত্যাদেশের মত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সকলেরই মান্য করা উচিত। ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের বিধান।

ভগবানের মঙ্গলপ্রসূ নিয়ম, সমদর্শিনী নীতি, সদুদ্দেশ্য আমাদেরই মঙ্গলার্থে নিবদ্ধ বলিয়া যেমন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি, দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া, সহস্র বিপদে জড়িত থাকিয়াও তাঁহাকে ভক্তি করে, তাঁহার পূজা করে, তাঁহার নাম স্মরণ করে, সেইরূপ রাজার আইন, রাজার আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করা, তাঁহার কৃত শাসন ব্যাপার সহানুভূতি চক্ষে দর্শন করা সমস্ত প্রজারই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে পালনীয়। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভিতর থাকিয়া সাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করা যেমন ধর্ম্ম; সেইরূপ মানব সাধারণের পক্ষে রাজ ভক্তিও একটি সাধারণ ধর্ম্ম।

মানবের স্বাভাবিক ভ্রান্তির জন্য, নিয়মের কদাচিত ব্যতিক্রম ঘটিলেও, যাহাতে প্রজার মনে কোনরূপ অসন্তোষের উদয় না হয় ও রাজভক্তির ক্রটি না ঘটে, তজ্জন্য সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যঋষিগণ রাজাকে ভগবান বলিয়া লোক চক্ষে দাঁড় করাইয়াছেন। রাজার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে প্রজাদের পরামর্শ দিবার অধিকার থাকিলেও, রাজার কার্য্যে বাধা দিবার তাহাদের কোনও অধিকার নাই। প্রজার হস্তে তদ্রূপ অধিকার প্রদানের ফল, ষোড়শ লুই ও চার্লস ফাষ্টের জীবনের শেষ অঙ্কে সুস্পষ্ট ভাবেই অঙ্কিত রহিয়াছে।

ভগবানের সকল কার্য্যই জীবের হিতের জন্য স্থাপিত। দেখ, সূর্য্য চন্দ্র তারকা ও বিদ্যুৎ আলোক প্রদান করিতেছে, পর্ব্বত নদ নদী খাল বিল আমাদের কত উপকারে আসিতেছে, সামান্য তৃণের সৃষ্টিও নিষ্ফল নহে। ভগবানের কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে সমদর্শী ন্যায়বান ও দয়ালু বলিয়া ভক্তি করি; তাঁহার হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, একদর্শিতা নাই; তথাপি যখন আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া রোগ যন্ত্রণায় কাতর হই, আত্মীয় স্বজনের মরণ জনিত শোকে মুহ্যমান হই, অবিমৃষ্য কারিতার ফলে বিপদগ্রস্ত হইয়া দিশাহারা হই, তখন আমরা সমদর্শী সর্ব্বজীবের দয়াবান্ ভগবানের মঙ্গলময় নীতির কথা, সদুদ্দেশ নিবদ্ধ নিয়মের উপকারিতা ভুলিয়া যাই ও তাঁহার কার্য্যে দোষারোপ করিয়া থাকি। প্রাকৃতিক নিয়মের মত রাজার নিয়মাবলী অপরিবর্ত্তনশীল হওয়া সম্ভব নহে, কারণ স্থান কাল ও পাত্র ভেদে মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তন প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য, অমঙ্গলের জন্য নহে। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কথনও কুসুম অপেক্ষাও কোমল, কথনও বা বজ্র অপেক্ষাও কঠোর; সময় ও কার্য্যের অনুরোধে কথনও মৃদু কথনও তীক্ষ্ণ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—"তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ। তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ ॥"

যাঁহাকে গুরুর মত স্নেহ পরায়ণ ও নিয়ন্তা হইতে হয়; আমরা ভাল কাজ করিলে যাঁহার ক্রোড়ে স্থান পাই, মন্দ কাজ করিলে যাঁহার হস্তে দণ্ড পাই, আমাদের হিতের নিমিত্ত, আমাদিগকে সুখে শান্তিতে রাখিবার জন্য তিনি যাহা করেন, তাহাতে দোষানুসন্ধান করা দূরের কথা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে, সহানুভূতির চক্ষে দর্শন করাই সন্তান স্বরূপ প্রজার কর্ত্তব্য।

রাজা মানব ধর্ম্ম বিশিষ্ট। সর্ব্বজ্ঞ বা সমদর্শী হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব নহে; আন্তরিক ইচ্ছা, ঐকান্তিক আগ্রহ, নিয়ত চেষ্টা থাকিলেও সকলকে সমান ভাবে পালন করা, বা সমান ভাবে সন্তুষ্ট রাখা, মনুষ্য রাজার পক্ষে সকল সময়ে সাধ্যায়ত্ত নহে।

যে বৃষ্টি আমাদের জীবন রক্ষার উপায়, যে বৃষ্টি না হইলে চারিদিক ব্যাপিয়া মর্ম্মভেদী হাহাকার ধ্বনি উত্থিতে থাকে, শান্তিময় গ্রামে অশান্তি ও ভাবনা আসিয়া দেখা দেয়; আলোকচ্ছটায় শোভান্বিতা নগরীর মধ্যে অন্ধকারের করাল ছায়া দেখা যায়, সে বৃষ্টি কি সকল স্থানে পড়ে? নিদাঘ তাপিত দেশে বৃষ্টি হইলে, যাহার বাটীতে কোন উৎসব, সে কি সন্তুষ্ট হইবে? মানব এমন স্বার্থ

পরতায় জড়িত, এমন ঈর্ষা দ্বেষ চালিত, যে স্বকীয় সামান্য মাত্র ক্ষতিতেও সর্ব্ব-হিতকর কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকে; সহস্র উপকারের মধ্যে আপনার সামান্য ক্ষতিটুকু অধিকতর উজ্জ্বল দেখে।

ধান্য প্রচুর জন্মিলে সকলেরই সুখী হওয়া উচিত; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, সকলে সন্তুষ্ট নহে। অসন্তোষের কারণ—আমাদের দেশের ধান্যে হয়ত অপর দেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের জীবন রক্ষা হইতেছে; এবং তজ্জন্য আমাদের দেশের ধান্যের কিঞ্চিৎ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহস্র সহস্র লোকের জীবন রক্ষার কথা না ভাবিয়া কিঞ্চিৎ লাভ লোকসানের কথাই আমরা ভাবিয়া থাকি। তাই বলি, সকলকে সমান ভাবে সন্তুষ্ট রাখা একরূপ অসম্ভব।

নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইলে কোন স্থানের উপকার এবং কোন স্থানের অপকার অবশ্যম্ভাবী। একের অবনতি না ঘটিলে অপরের উন্নতি হয় না। এ জগতে কোনও জাতি, বিদ্যা বুদ্ধি, ধন ধান্য বল ও ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে আরূঢ় হইয়া সদর্পে পৃথিবীবক্ষে বিচরণ করে; আবার কোনও জাতি বা অপর জাতি কর্তৃক উন্নতি দ্বারে প্রতিহত হইয়া তাহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া উচ্চ মহীরুহ তলে তৃণের মত ক্ষীণ হইয়া নিরাশায় অবশেষে দুঃখে কষ্টে কাল যাপন করে; অথবা বন্য জন্তুর মত ক্রমশঃ লয় পাইতে থাকে, ইহাই প্রকৃতির মর্ম্ম-স্তুদ পরিণাম। ইহাতে কাহারও অহঙ্কার জনিত গর্ব্ব করিবার বিষয় নাই বা বিপদে ক্লিষ্ট হইবারও কিছুই নাই।

ভগবানের সৃষ্টি বৈষম্যভরা, তজ্জন্য আমরা মনুষ্যের নিয়মে, মনুষ্যের পালনে মনুষ্যের কার্য্যে সম্পূর্ণ ন্যায়বত্তা বা সম্পূর্ণ সমদর্শিতার আশা করিতে পারি না, মানবপ্রণীত নিয়মে বা তৎ কর্ত্তৃক রক্ষণে, কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি, কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য থাকিলেও, সদুদ্দেশ্য হেতু আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত বলিয়া, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করায় বা দুষ্ট চক্ষে দেখায়, কর্ত্তব্য অপালন জন্য পাপ সম্ভাবনা আছে। আমরা যখন নিজকৃত কর্ম্মফলের জন্য ফল ভোগ করি, তখন ভগবানেরও দোষ দিয়া থাকি; তাঁহার চিরন্তন সত্যের অপলাপ করিয়া থাকি।

প্রজা সন্তান স্বরূপ। সন্তানেরা কখনও কখনও পিতার কার্য্যে আপন আপন মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে; তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে; তথাপি অভিমান দৃপ্ত মুখ হইতে যাহাতে কোন অসন্তোষ কর, সন্তানের সীমাবহির্ভূত কথা বাহির না হয়, সে পক্ষে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, মিলনে যেমন সংসারের সুখ, সেইরূপ রাজায় প্রজায় মিলনে

রাজ্যব্যাপী আনন্দ কোলাহল ফুটিয়া উঠে। "সদানুকূলেষু হি কুর্ব্বতে রতিং।"

সকল প্রাণীর উপকারের জন্য দুষ্ট দমক, শিষ্ট পালক দণ্ডের সৃষ্টি,—

"দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বাঃ দণ্ড এবাভিরক্ষতি।"

দণ্ড যদি না ধরেন নৃপতি কখন,
সবল দুর্ব্বলে পীড়া দিত অনুক্ষণ।
ভুজঙ্গ যেমতি দংশে পরাণী দুর্ব্বল,
আপন হিংসাগ্নি জ্বালা করিতে শীতল॥

মানব যে ইচ্ছামাত্র কোন অপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময় সেই কার্য্য হইতে ফিরিয়া আইসে, তাহার কারণ,—

"দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগত ভোগায় কল্পতে।"

দণ্ড ভয়ে মানবেরা সুখে বাস করে,
দণ্ড ভয়ে ত্যজে পাপ মানব নিচয়।
সকলি ঘুমায়ে পড়ে নিশীথ সময়,
দণ্ড শুধু জেগে রয় জন হিত তরে॥

ধর্ম্মে প্রবৃত্তির জন্য সাধুরা পাপ কার্য্য করে না, সাধুদের জন্য দণ্ড নহে; সংসারে সাধু কয়জন? কাহারও দোষের দণ্ড না দিলে ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা অনেকের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, না থাকিলেও লোকে কুশিক্ষা পায়; হইতে পারে কোন কোন স্থলে ঠিক মত দণ্ড হয় না, অল্প বা অধিক হয়, তাহা বলিয়া ত অসংখ্য মানবের চিত্তবৃত্তি ভেদে দণ্ড অসংখ্য প্রকার হইতে পারে না?

ভগবানের সৃষ্টি পর্য্যাবেক্ষণ করিলে, শাস্ত্র উপদিষ্ট বিধি পালন করিলে, মানুষ, মানুষ হইয়া দাঁড়াইলে, আকাঙ্ক্ষা অভাব পূর্ণ এ মর পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে। কলিকালের অন্ধকারময় গহ্বরে সত্যযুগের আলোক রশ্মি ফুটিয়া উঠিবে। ইহা করিতে হইলে আমাদের জঘন্য স্বার্থ পরতা ও হিংসা বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া, সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব লইয়া, রাজার কার্য্যে সহায় হইতে হইবে, এবং সে সহায়তা করিতে যাইয়া, নিজেদের স্বার্থ পরতা, অপূরণীয় অভাব প্রভৃতি ভুলিয়া যাইতে হইবে। অধিকারের অননুরূপ প্রার্থনায় রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া সন্তানোচিত বিনয় সদাচার ও ভক্তি বিস্মৃত হইলে আমরা কখনই অভিপ্রেত অধিকারের যোগ্য হইব না।

হৃদয় উন্নত কর, আপনার নিকট আপনি উন্নত হও, অভিমান, আকাঙ্ক্ষা, অভাব জনিত মনোভঙ্গ থাকিবে না। ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কার্য্য

করিতে অভ্যাস করিলে বারম্বার প্রার্থনা অপূরণ জনিত দুঃখ পাইতে হইবে না। অথচ অভিপ্রেত সকল অধিকারই ক্রমশঃ আপনা হইতেই আসিবে।

মনুষ্য হৃদয়ে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, অনিবার্য্য ভ্রান্তি, দূর দৃষ্টির অভাব ও আমাদের দুরাকাঙ্ক্ষা হেতু, হিতকর নীতি ও কখনও কখনও আমাদের নিকট অহিতকর বোধ হয়, এবং তজ্জন্যই মধ্যে মধ্যে অভিমানের জ্বালা যন্ত্রণা, বিদ্যা বুদ্ধি জাত সৎসাহস, মনুষ্যোচিত আকাঙ্ক্ষার কথা কহিয়া থাকি, ব্যথাও পাইয়া থাকি। স্থির চিত্তে ভাবিলে ইহা স্পষ্ট্যক প্রতীয়মান হইবে যে এই রাজা যদি ভগবান হইতেন, তথাপি আমরা নিজকৃত কর্ম্ম ফলের জন্য প্রকৃতির স্বভাবনিয়ত প্রতারণার জন্য, তাঁহার উপর দোষারোপ করিতাম।

আরও দেখ, আমরা আত্মীয় পরিবারস্থ কয়েকজন মাত্র লোককে সন্তুষ্ট রাখিতে পারি না; আর এই সসাগরা ধরার অধীশ্বর সাতকোটী প্রজাকে সমান ভাবে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবেন বা, পারা সম্ভব, এরূপ ধারণা করা, আর মানব প্রকৃতির চিরন্তন স্বাভাবিকতার উপর অবিশ্বাস করা একই কথা। আমরা যতটা সুখে শান্তিতে আছি, তজ্জন্য রাজাকে ধন্যবাদ দেওয়া, তাঁহাকে ভক্তি করা, তাঁহার কৃত আইন শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পালন করাই মনুষ্য সাধারণের ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম পালনের জন্য, পুষ্প চন্দন চর্চ্চিত করিবার আবশ্যক নাই, বিল্বপত্র চয়নের প্রয়োজন নাই, এ ধর্ম্ম পালনে শুধু চাই রাজভক্তি। রাজভক্তি, অন্তঃকরণের নিভৃত কন্দরে প্রস্ফুটিত একটী ভাব কুসুম; এ কুসুম চয়নে কণ্টক নাই, ভ্রমর দংশনের ভয় নাই, তবে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে একটু আয়াস চাই; অথবা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টারও কোন প্রয়োজন নাই। অগ্রে অন্তঃকরণে রাজভক্তি কুসুম প্রস্ফুটিত কর; সৌরভ স্বতঃই বাহির হইবে। কার্য্য যখন ইচ্ছার বিকাশ, চেষ্টার অবস্থান্তর, তখন কার্য্য করিতে না পারিলেও মনের ভক্তিই তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের মত হইবে।

রাজার উপর প্রজার ভক্তির উদাহরণ পুরাণ ও ইতিহাসে যথেষ্ট, দুর্য্যোধনের মত অহঙ্কারী রাজার পক্ষেও কত লোক অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। নন্দবংশের শেষ নৃপতি মহানন্দের জন্য, রাক্ষস আপনার স্ত্রী পুত্র ও বন্ধু এমন কি প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। ধাত্রী পান্নার আত্ম ত্যাগের ইতিহাস কে না জানে? রাজভক্তির মাহাত্ম্য, মনু হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্তও ভারতবাসীর অস্থি মজ্জায় জড়িত।

যেখানে রাজা উপস্থিত নাই, সেখানে রাজ প্রতিনিধি রাজপদ বাচ্য;—

রাজ প্রতিনিধি রাজার প্রথম ও পূর্ণ বিকাশ। অবান্তর বিকাশ রাজানুশাসন প্রাপ্ত রাজপুরুষগণ। সকলেই এক সূর্য্যতেজে জ্যোতিষ্মান; সকলেই এক মহামহীরুহের শাখা প্রশাখা। আমরা সেই মহীরুহচ্ছায়াতলে সুখে শান্তিতে বিরাজমান্ থাকিয়া সকলপ্রকার দুঃখ কষ্ট বিপদ হইতে দূরে থাকিতে পাই; সিংহাসন রাজচ্ছত্রের অন্তরালে থাকিয়া যেন অতুলনীয় শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারি। ফল কথা রাজায় প্রজায় পরস্পর বিশ্বাস ও সৌহৃদ্য থাকিলে প্রজার পক্ষে মঙ্গল ও উন্নতি অনিবার্য্য ইহা বিশ্বাস না করিলে প্রকৃতিকে অবিশ্বাস করা হয়।

এ ভারতভূমি হ'ক শান্তিময়।
অশান্তি নিভিয়া যাক্, পরাণী আনন্দে থাক্,
রাজায় প্রজায় সদা থাকুক্ প্রণয়॥

আমরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, রাজভক্ত সকল প্রজা সমবেত হইয়া পরম কারণ পরমেশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ভক্তিগদ্গদ হৃদয়ে প্রার্থনা করি,—

ক্ষীরিণ্যঃসন্তু গাবো ভবতু বসুমতী সর্ব্ব সম্পন্নশস্যা,
পর্জ্জন্যঃ কালবর্ষী, সকল জনমনো—নন্দিনো বান্তুবাতাঃ।
মোদন্তাং জন্মভাজঃ সততমভিমতা ব্রাহ্মণাঃ সন্তু সন্তঃ
শ্রীমন্তঃ পান্তু পৃথ্বীং প্রশমিতরিপবো ধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চভূপাঃ॥

——:•••:——

জামাইষষ্ঠী।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি, এ,।

জামাই ষষ্ঠী। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে যত ব্রতপূজা আছে, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম—আত্মজন্য; দ্বিতীয়—সমাজজন্য; তৃতীয়—সম্বন্ধজন্য। আত্ম রক্ষা ও আত্মার উন্নতির জন্য যে সকল ব্রত পূজা তাহা আত্মজন্য; যেমন কালীপূজা, শিবচতুর্দ্দশী প্রভৃতি। সমাজ রক্ষা ও সমাজের পুষ্টির জন্য যে সকল ব্রত নিয়ম তাহাকে সমাজ জন্য বলে; যেমন দোল-দুর্গোৎসব নন্দোৎসব প্রভৃতি। সংসারের বা পরিবারের সম্বন্ধ যাহাদের সহিত আছে, তাহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া যে সকল ব্রত পূজা করিতে হয়, তাহাদের সম্বন্ধজন্য বলে; যেমন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, সাবিত্রীচতুর্দ্দশী, জামাই ষষ্ঠী, বীরাষ্টমা

প্রভৃতি। এই তিন শ্রেণীর ব্রতপূজায় সাক্ষাতে বা পরোক্ষে আত্মার উন্নতি চেষ্টা আছেই, তবে বিনিয়োগ কখনও বা জগদ্ধিতায়, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণায়, কখনও বা ব্যক্তিবিশেষের নাম করিয়া বলিতে হয়। জামাইষষ্ঠী খাঁটি সম্বন্ধজন্য ব্রত বা উৎসব। ষষ্ঠী পূজা পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া করিতে হয়; জামাতাও পুত্রবৎ, তাই জামাতার কল্যাণজন্য একটা ষষ্ঠীর ব্রত স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। আজ প্রত্যেক বিবাহিতা কন্যার জননী নিজ-নিজ কন্যার পতিকে পুত্রের আসনে বসাইয়া, পুত্রোচিত আদর ও পূজা করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। প্রথমে ষষ্ঠীর পূজা তাহার পর মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও কথা; শেষ ফলপূর্ণ অর্ঘ্যপাত্র দিয়া জামাতার আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ এই যে জামাতা পুত্রতুল্য হউক—পুত্রের স্থানীয় হউক এবং স্বয়ং বহু পুত্রকন্যার জনক হইয়া আমার মাতৃত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখুক। পুত্র যেমন পিতার আত্মজ, কন্যা তেমনি জননীর আত্মজা। পুত্রের সাহায্যে পিতার পিতৃত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে; কন্যার সাহায্যে মাতার স্ত্রীত্বের বা জননী ভাবের ধারা অব্যাহত থাকে। কেননা স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্ব এই দুয়ের সমবায়ে মনুষ্যত্ব; সেই মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটাইবার জন্য জামাইষষ্ঠী ব্রত। কেবল ইহাই নহে। পিতৃকুলে ও মাতৃকুলের সামঞ্জস্য না ঘটিলে কোন বংশের ধারা অব্যাহত থাকে না। কেন না মনুষ্যত্বের অভাবেই বংশনাশ ঘটে। জামাইষষ্ঠী এই মনুষ্যত্ব পোষণের ব্রত—মানবতার উন্মেষকারী ব্রত।

যতদিন কন্যা-জামাতা জীবিত থাকিবেন, অথবা যতদিন দৌহিত্র-দৌহিত্রী এবং জামাতা জীবিত থাকিবেন ততদিন বর্ষে বর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীর দিন জামাতার পূজা করিতেই হয়। বিশেষতঃ জামাতা পুত্রপৌত্রাদির পরিবৃত হইলে তেমন জামাতার পূজা সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার তাড়নে জামাইষষ্ঠীটা কেবল নূতন জামাতা লইয়া জমাইয়া তোলা হয়। পুরাতন জামাতা, যাহার পুত্রপৌত্রাদি হইয়াছে তাহার আদর ও পূজা হয় না। অথচ শাস্ত্রের আদেশ মান্য করিতে হইলে যে জামাতার পুত্রপৌত্রাদি হইয়াছে, কন্যাসহ তাহারই পূজা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কেননা সে যে বহুপোষী হইয়া কল্যাণকামনা পূর্ণতা সাধন করিয়াছে! তাহার দ্বারা মাতামহ-কুলের ধারা সুরক্ষিত হইয়াছে!—জননী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মাতৃত্বের ধারা সে অব্যাহত রাখিয়াছে! জামাইষষ্ঠী বাবুয়ানীর উৎসব নহে—ইয়ারকীর নহে—বংশানুক্রমের বা Heredityর উৎসব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কালবশে এমন উৎসবটা বিলাসের

উৎসবে পরিণত হইয়াছে। নূতন জামাতা দুইবৎসর কাল শ্বশুরবাড়ীর আদর যত্ন পাইয়া থাকেন; তাহার পর চিরজীবনটা জামাতার সহিত শ্বশুরগৃহের কোনও সম্পর্ক থাকে না;—শ্বশুর শ্বাশুড়ী কোন সম্বন্ধ রাখেন না, জামাতা ত রাখেনই না। কন্যাদান করিলে শ্বশুর শ্বাশুড়ী মনে করে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল; জামাতা মনে করেন, যা পারিলাম জন্মের মতন আদায় করিলাম। যাহাতে উভয়ে সদ্ভাব থাকে—আত্মীয়তা বজায় থাকে—দুইটি সংসার এক হয়, সে চেষ্টা কাহারও নাই। তাই মনে হয় যে, এখনকার দিনে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লইয়া সংসারসুখে কেহ সুখী হইতে পারে না; বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে পারিবারিক আনন্দ-উল্লাস আর নাই, সব দোকানদারী, সব লেন-দেনের কাণ্ড হইয়াছে। কন্যা বিবাহের পণ কমাইবে কেমন করিয়া? তুমি চাও যত সস্তায় পারি কন্যা পাত্রসাৎ করি; পুত্রের পিতা চাহে, যত পারি গামোছা নিঙড়ানর মত কন্যার পিতার নিকট হইতে টাকা আদায় করি। ফলে উভয় পরিবারের কোন মতেই আত্মীয়তা স্থাপন হইতে পারে না; জামাইকে দেখিলে কন্যার বাপ ভয়ে কাঁপেন। আবার ইংরেজিনবীশ জামাই বাবুরা পত্নীকে লইয়া কেবল নায়িকার সাধ মিটান, নভেলী নভেল মক্স করেন। ভাব লইয়া সংসার; এই ভাবকে মধুময় করিতে পারিলে সংসারযাত্রাটাও মধুময় হইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্র মধুময় ভাব দিয়া জীবন যাত্রাকে মধুময় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জামাইষষ্ঠী এই ভাবের মাধুরী বিস্তারের ব্রত—পরকে আপন করিবার—প্রাণের প্রাণ করিয়া রাখিবার—পরের মাকে মা বলিয়া জননীর আসনে বসাইবার ব্রত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় সহজ মাধুরী। জামাইষষ্ঠীতে সৃষ্ট মাধুরী—একের খাতিরে শতেক জনকে আপনার করিবার মাধুরী নিত্য বিদ্যমান। শাস্ত্রের সে মাধুরী বর্জ্জন করিয়াছ, তোমাদের জীবনটাও তাই কঠোর হইয়াছে, সদা হাহাকারে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; তোমরা কিছুতেই সুখী ও তুষ্ট হইতে পারিতেছ না। আবার মধুময় ভাবের যদি চাষ করিতে পার তবে এ হিন্দু জীবনে সুখী হইতে পারিবে।

———:-:*:-:———

হৈমবতী।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি,এ, এল,এম,এস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ফুল ফুটা।

—:o:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বেলা ৩টা হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, অবিশ্রান্ত ধারাপাতে পথ ঘাট সমস্ত জলমগ্ন। স্কুলের ছুটী হইয়াছে, ছেলেরা বহু যত্নে আপনাদের পুস্তকগুলি কোনরূপে বুকের ভিতর রক্ষা করিয়া জল ভাঙ্গিয়া পদব্রজে ধীরে ধীরে বাটী ফিরিতেছে; কাহারও হাঁটু পর্য্যন্ত জলমগ্ন কাহারও বা তদূর্দ্ধে। আশা ছোট ছেলে—কি করিয়া বাটী ফিরিবে, কমলা তাই ভাবিতেছেন। দীননাথ কোন বিশেষ কারণে আজ সকালে সকালে বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে—কখন গৃহে ফিরিবে, ঠিক নাই। কমলাকে চিন্তিত দেখিয়া শশিভূষণ বলিলেন, "ভাবিবার কারণ নাই কমলা! আশার মাষ্টারকে লোকে পাগল বলিলেও আমি দীনুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি হৃদয়বান্ পুরুষ। তিনি নিশ্চয়ই ইহার একটা সুব্যবস্থা করিবেন। দীনুরও আসিবার আর বিলম্ব নাই। আর একটু দেখি। পুত্রের বিপদের আশঙ্কায় জননীর হৃদয় সহজে প্রবোধ মানে কি? কমলার এক একবার মনে হইতেছে—'দীনুর যদি বুঝিতে ভুল হইয়া থাকে—তাহা হইলে"—কমলার কত কথাই মনে আসিতেছে। একবার মনে করিতেছেন, তিনি নিজেই একটু এগিয়ে যান—গিয়া দেখেন, আশার কোন সন্ধান পান কি না? কিন্তু আজ কাল যে সময়, তাহাতে বাঙ্গালীর মেয়ের—সহরের অপরিচিত পথে একা যাওয়া সহজ কি? পীড়িত হইলেও শশিভূষণ কমলাকে ব্যস্ত দেখিয়া লাঠি ধরিয়া বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, কমলাও পাশে আড়ালে। কমলা এতক্ষণ ব্যস্ত হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, হঠাৎ শুনিলেন, রাস্তায় একজন জল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গাহিতেছে, "তুমি দীন শরণ, তুমি দীন শরণ হে।" কমলা চক্ষু মুদিত করিলেন। প্রাণের কথা প্রাণে থাকিতে থাকিতে শশিভূষণ আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "কমলা কমলা—ঐ দেখ দূরে ঐ আশার মাষ্টার ——" কমলা ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিলেন; দূরে নিরীক্ষণ

করিতে দেখিলেন,—একজন দীর্ঘাকৃতি যুবা পুরুষ আশাকে স্কন্ধে করিয়া—অপর স্কন্ধে আর একটী ছেলে—পৃষ্ঠে আর একজন সেইরূপ—জল ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া কমলা উন্মত্তের মত ছুটিয়া বাহিরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। দূর হইতে আশা তাহার মাতাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "সার! ঐ দরজা! ঐ আমার মা!" যুবক দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া—মস্তক অবনত করিয়া কমলাকে প্রণাম করিয়া স্মিতি মুখে বলিলেন, "মা! আমি শরীর অবনত করিতেছি, আপনি আমার স্কন্ধ হইতে আপনার আশাকে ক্রোড়ে করিয়া নামাইয়া লউন।" কমলা একবার যুবকের মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন নেত্র সংযত, মুখ প্রশান্ত—চাঞ্চল্য বিহীন। কমলা ধীর স্থিরভাবে অগ্রসর হইয়া পুত্রকে যুবকের স্কন্ধ হইতে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন; করিয়া বলিলেন, "আপনি ভিতরে আসিবেন কি? একটু বিশ্রাম করিয়া—" কমলার কথা শেষ না হইতে যুবক উত্তর করিলেন, "মা! আমার বিশ্রাম কবিবার সময় কোথায়? ইহাদের জননীও আপনার মত ব্যস্ত হইয়াছেন। এখনও আমাকে এইরূপ আরও চার পাঁচবার হয়ত যাওয়া আসা করিতে হইবে।" এই বলিয়া যুবক হস্ত তুলিয়া কমলাকে পুনরায় প্রণাম করিলেন। কমলা কেন জানিনা, ধীরে মস্তক অবনত করিয়া যুবকের পদস্পর্শ করিলেন; করিয়া বলিলেন,—"আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি আপনার নিকট অপরাধী! আজ আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে।" যুবক কমলার কাতর নিবেদন শুনিয়া সহাস্যে কমলার মস্তক স্পর্শ করিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "মা! এ সংসারে কে পাগল নয়? কেহ পুত্রের জন্য পাগল, কেহ"—যুবক কি বলিতে যাইতেছিলেন; সহসা বাক্য সংযত করিয়া মুহূর্ত্তেক নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন,—"বল মা! আমার আসিতে আর একটু বিলম্ব হইলে তুমি পাগলের মত রাস্তায় বাহির হইতে কিনা? আমার পদ স্পর্শ করা তাও কি মা তোমার পাগলামি নয়?" মস্তিষ্ক বিকারে মানুষ পাগল হয়, আবার বিবেক—কর্ত্তব্য বোধও মানুষকে পাগল করিয়া দেয়। এ দেশে স্বদেশের সেবা এখন পাগলামি মা। যুবকের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। কমলারও বিস্ফারিত নেত্র যুগল হইতে দুই বিন্দু অশ্রু দুই গণ্ড বহিয়া নামিয়া আসিল। হৃদয়বেগ সংগোপন এখন উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজন। কমলা আশাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন—আশার শিক্ষকও লোকের চক্ষে, সমাজের চক্ষে, যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদের চক্ষে—পাগলের মত—পাগল সাজিয়া আপনার

স্কন্ধের বোঝা স্কন্ধে করিয়া, মুষল ধারাপাতের মধ্যে, লোকদৃষ্টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিয়া, নিজ কর্ত্তব্যের সমাধানে পুনরায় পথ অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। কমলার অশ্রুসিক্ত নেত্র—কোমল কণ্ঠের কাতর নিবেদন—এই ধারাপাতের মধ্যে যুবকের মনে পড়িতেছিল কিনা—জানি না—কিন্তু কমলার কোমল প্রাণের নিভৃত কক্ষে যুবকের সেই বিষাদপূর্ণ সরল গম্ভীর কাতোরোক্তি—"এখন এ দেশে স্বদেশের সেবা মা পাগলামি"—সেই দিন, সেই দণ্ড হইতে যে অহরহঃ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাহা সুনিশ্চিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মক্ষেত্র।

যখন ফুল ফুটিবার সময় হয়, তখন দুই একটি মুকুল আগে দেখা দেয়। লোকে তাহা দেখিয়া মনে করে, দেশ জুড়িয়া ফুল ফুটিবার আর বহু বিলম্ব নাই।

কমলার মুখে শশিভূষণ আশার মাষ্টারের করুণ উক্তি শুনিয়া সোৎসাহে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন। বলিলেন, কমলা! যখন দীননাথের মত ভৃত্য—আশার মাষ্টারের মত গুরুমহাশয় এ দেশে উদয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন জানিও আমাদের সমাজে সুদিন সমুদিত হইতে আর বহু বিলম্ব নাই। দীনুর মুখে শুনিয়াছি, ডাক্তার যোগেন্দ্র বাবুর প্রকৃতি নাকি আশার গুরুমহাশয়ের প্রকৃতির মত—আমার অসুখের জন্য কত ঔষধ দিতেছেন, কিন্তু দীনু বলে বিনা পয়সায় এমন প্রফুল্ল মুখে ঔষধ দেওয়া সে আর কোথায় দেখে নাই। "আমার মনে হয়, আমাদের অভাবের জন্য দীনু অনেক জায়গায় ঘুরে, অনেক ভাল ভাল লোক তাহার চেনা। ইহাদের কাছে ভিক্ষা করিতে যে সে যায়, এমন মনে হয় না,—মনে হয় দীনু স্থান বুঝিয়া লোক বুঝিয়া তাহাদের কাজের কোন সহায়তা করে,—নিজের কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে সে যাহা পায়, তাহার দ্বারা আমাদের সংসারের সাহায্য করিবে এই উদ্দেশ্য। দীনু আমাদের বাটীতে অবস্থান করে বটে, কিন্তু আরও অনেক পরিবার আছে, যেখানে তাহার কায়িক পরিশ্রম সমাদরে পরিগৃহীত হয়। দেখনা, দীনু এক ঘণ্টায় যে কাজ করে, অন্যের তাহা একদিনের সমান।"

স্বামীর কথায় প্রোৎসাহিত হইয়া কমলা বলিলেন, আমারও ঐরূপ অনুমান হয়। আমি মনে করি দীনু, সময় সময় মোট মাথায় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না!

সেদিন তাহার মাথার চুল গুলি উচু উচু দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, দীনু যেন এখনই কোথা হইতে মোট মাথায় করিয়া আসিল। আচ্ছা! তোমার কি মনে হয় না, অল্পদিন হইল প্রচ্ছন্নভাবে এখানে কোথা হইতে এমন কতকগুলি লোক আসিয়াছে, যাহাদের উদ্দেশ্য এক—প্রতিজ্ঞা এক—কার্য্য ক্ষেত্র এক—কেহ দীনুর মত ভৃত্য ভাব অঙ্গীকার করিয়া আছে; কেহ,—আশার গুরুমহাশয়ের মত—কেহ বা ডাক্তার—কেহ বা আর কিছু। সমাজের সেবা, স্বজাতির সেবা দীন দরিদ্র, আতুর ও বিপন্ন সেবা, ইহাদিগের প্রত্যেকের ধর্ম্মই মূল মন্ত্র। সেবক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ইহারা সকলেই। দীনুর ডান হাতে যে স্থানে "তবাস্মি"র উল্কী আছে, সেদিন আশার গুরুমহাশয়েরও হাতে সেইখানে সেই ভাবের "উল্কী" দেখিয়া সত্য সত্যই আমার এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে যে, ইহারা সকলেই এক সম্প্রদায়ভুক্ত কোন আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীর দল। আশার গুরুমহাশয় যে একজন ভাল লোক, তাঁহার কথার ভাবে সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই।

যদি সত্যই এমন কোন দল থাকে—"তবাস্মিত" যাহাদিগের সিদ্ধি—সেবা ধর্ম্ম সাধনা এবং আত্মসুখবাঞ্ছা ত্যাগ—জপ মন্ত্র, তাহা হইলে আমার একান্ত ইচ্ছা যদি গৃহীর সে দলে প্রবেশ করিতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আমরা পতি পত্নীতে সেই দলে দীক্ষিত হই! "তবাস্মিত" কথাটি আমার প্রাণে বড়ই লাগিয়াছে।

পত্নীর কথা শুনিয়া শশিভূষণ ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে কি চিন্তা করিলেন—পরে কমলার কোমল হস্তদ্বয় নিজ করপুটে গ্রহণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, কমলা! প্রকৃত পক্ষে তোমার অনুমিত এইরূপ কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও—আজ হইতে এস না কেন আমরা পতি পত্নীতে এমন প্রতিজ্ঞা করি, যাহাতে স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির সেবা আমাদেরও সাধনা হয়, এবং "তবাস্মিত" এ পূত মন্ত্রে আমরা চির সিদ্ধি লাভ করিতে পারি। ভগবান আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন! শশিভূষণের কথা শেষ হইলে কমলা মস্তক অবনত করিয়া স্বামীর পদ ধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন; করিয়া ধীর স্থির গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তবে তাহাই হউক।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম ক্ষেত্র।

সকলেই বলে এসংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র বলিতে প্রকৃত কি বুঝায়—তাহা আমাদের মধ্যে কয়জন জানেন? আহার বিহার আমোদের পরিপূরণের জন্য সচেষ্ট হইয়া মানুষ রাতিদিন এখানে যে ছুটাছুটি করে, সেই ছুটাছুটি আমরা মনে করি কর্ম্ম সংজ্ঞায় অভিহিত। ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি—সামান্যতঃ, আমাদের এই নাতিদীর্ঘ জীবনসংগ্রাম কর্ম্ম সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও, যে কর্ম্ম লইয়া সংসার আমাদিগের নিকট কর্ম্মক্ষেত্র, তাহা অন্তঃ সলিলা ফল্গু নদীর পুণ্য পূত ধারার ন্যায়, সকলের জানা উচিত, আমাদের জীবন সংগ্রামের—আমাদের আহার বিহার আমোদর পরিপূরণের অন্তস্তলে,—জীবন প্রবাহরূপে চির অবস্থিত। এ জীবন প্রবাহের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি, কোথায়ও কখন যদিও কেহ বিশেষভাবে অবগত নহেন—কিন্তু ইহা যে ইহকাল ভাঙ্গিয়া পরকাল গড়ে, তাহা সুনিশ্চিত।

জীবন সংগ্রামে ক্ষুদ্র বায়ু, ক্ষুদ্র জল, ক্ষুদ্র পার্থিব উপাদান, ক্রমোন্নত হইয়া পশু হইতে মানুষকে পৃথক করে বটে, কিন্তু এ অভিব্যক্তির আরম্ভ ও অবসান, ক্ষণস্থায়ী কুসুমের মত অভিব্যক্তির যেখানে ফুটে, সেইখানেই ঝরিয়া পড়ে।

জীবন সংগ্রামের সহিত জীবন প্রবাহের কোন নিগূঢ় যোগ নাই।

যাহার জন্য মানুষ—পশু হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ,—যাহা সূক্ষ্ম প্রণালীর মত ক্ষুদ্র ইহকালকে বিস্তৃত পরকালের সহিত এক করিয়া রাখিয়াছে, সেই সূক্ষ্ম প্রবাহের বক্ষঃস্থলে স্তরের পর স্তরে আমাদের কর্ম্ম ক্ষেত্র সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাতে বায়ু, জল, ক্ষিতি—পঞ্চভূতের কোন স্থান নাই। আত্মত্যাগের সমষ্টি তাহা—আত্মবলিদানের অভিব্যক্তি তাহা—অহং এর অনন্ত সমাধি—এই জীবন প্রবাহ পরিগঠন করিয়াছে। জীবন-সংগ্রামে আত্মেন্দ্রিয়সুখ বাঞ্ছায় মানুষ—বাঁচিতে চায়; কিন্তু জীবন প্রবাহে মানুষ স্বসুখ বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া ইচ্ছা করিয়া মরিতে থাকে। জীবন সংগ্রামে কাম জয়যুক্ত; জীবন প্রবাহে প্রেমের উজ্জ্বল পতাকা উধাও—উড্ডীয়মান।

প্রেম ও সেবা লইয়া মানবের প্রকৃত কর্ম্ম ক্ষেত্র। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে. মানবের কর্ম্ম ক্ষেত্র সংযোজিত করিতে গিয়া যদিও গীতাকার—জগতের সর্ব্বত্র

প্রখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু ভারতে ও ভাগবতে আজ যে এত পার্থক্য,—এমন কি একের কৃষ্ণ, আজ যে অন্যের নহে; কে না স্বীকার করিবেন—ইহার মূলে জীবন সংগ্রাম এবং জীবন প্রবাহের মিথ্যাযোগ তাহার কারণ? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহাকারে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া, আজ যে এদেশে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ গৃহে গৃহে সমাদৃত ও সম্পূজিত—কে না স্বীকার করিবেন, গীতাকারের পরাজয় এইখানে? প্রেম ও সেবার পরিবর্ত্তে অক্ষৌহিণী সৈন্যের উষ্ণ শোণিত পাতে নিষ্কাম ধর্ম্ম, চিরদিনের জন্য এ দেশ হইতে ভাসিয়া গিয়াছে। গীতা এখন জীবন সংগ্রামের ইতিহাস, ভাগবতে জীবন প্রবাহ উৎসরিত হইয়াছে। জ্ঞানে জীবন প্রবাহ জমাট বাঁধিয়া যায়, প্রেমে হৃদয় প্রস্রবণ ছুটে। তাই বলিয়াছি, মানুষের কর্ম্ম ক্ষেত্র জীবন সংগ্রাম হইতে বহু দূরে—ইহকালের বাহিরে মরণের ঠিক পরপারে—পরলোকে অবস্থিত। তাই বলিতেছি, আহার বিহার আমোদের পরিপূরণের জন্য আমাদের অহরহঃ ছুটাছুটি কর্ম্ম সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও, প্রেম ও সেবা এখান হইতে প্রকৃত কর্ম্ম ক্ষেত্র যাহা তাহা পরিগঠন করে।

শশিভূষণ ও কমলা—প্রতি পল্লীতে যে কর্ম্ম ক্ষেত্র পরিগঠনের জন্য আজ যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ—তজ্জন্য আমরা সকলে প্রার্থনা করি—ঈশ্বর করুন! তাহা যেন তাঁহাদের জীবন সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া—জীবন প্রবাহের অনন্ত উৎসে চির উৎসরিত হয়।

(ক্রমশঃ।)

গীতোক্ত ধর্ম্ম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কর্ম্ম।

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥"

এই নিষ্কাম কর্ম্মে অন্তরায় ঘটিলেও আরব্ধ কর্ম্মের বিফলতা হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ সেই কর্ম্মের অঙ্গহানি হইলেও ইহার অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান দ্বারাও

মৃত্যু সংসার সাগর পার হওয়া যায়, ইহার অঙ্গহানি হইলেও বিঘ্ন হয় না. কথাটা একটী দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক, মনে কর একজন ডাক্তার এক-জন কঠিণ রোগীকে চিকিৎসা করিতেছে, এই প্রকারের বহু রোগী পূর্ব্বে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিয়াছে, কিন্তু এব'র শত চেষ্টা করিয়াও বিফল প্রযত্ন হইল, রোগীর মৃত্যু হইল, মৃত্যুর পরে দেখা গেল ডাক্তারের অনবধানতা বা কম্পাউণ্ডারের ঔষধ নির্ম্মান বিষয়ক ভ্রম বশতঃ এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, সুতরাং-ঐ ডাক্তার এ মৃত্যু সম্বন্ধে অপরাধী (পাপী) ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, কেন না ডাক্তার আত্মশক্তি দ্বারা রোগ আরোগ্য করিতে গিয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার যদি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কায়মনবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিত যে, হে প্রভু! আমি যন্ত্র তুমি-যন্ত্রী তুমি আমাকে শক্তি দাও, আমাকে শক্তি দিয়া আমার এই কর্ম্মটী নিস্পন্ন করিয়া দেও, অর্থাৎ রোগীকে আরোগ্য করিয়া দেও, আমার কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই, জীবন মৃত্যু তোমারই হাত, আমার সাধ্য কি যে আরোগ্য করি, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুতেও তাহাকে অপরাধী হইতে হইত না; কেন না ঐ কর্ম্ম সকাম না হইয়া নিস্কামই হইত, কথাটা হইতেছে যে, কর্ম্ম করিয়া যদি সুখ ও তৃপ্তি, যশ বা সুখ্যাতি চাই তবেই না সকাম, কিন্তু উহা ভগবানের কর্ম্ম আমার দ্বারা করাইতেছেন এ জ্ঞান থাকিলে যশ বা সুখ্যাতির আশা করিতে পারেন না, অতএব এবম্বিধ কর্ম্মে প্রত্যবায় হইলেও দোষ তো নাইই, অধিকন্তু "ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" যখন প্রত্যেক কর্ম্মেই আমাকে সেই কর্ম্মফলদাতা আত্মদেব শ্রীভগবানের শরণোপন্ন হইতে হইল, প্রতি কার্য্যেই আমার কোন ক্ষমতা নাই, তুমি আমাকে শক্তি দেও, আমি কিছুই নই, আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই, যাহা আমি করিব তাহা আমার শক্তিতে হইতে পারে না, তুমি করিয়া দাও বলিয়া একবারেই অহং অভিমান থাকিল না, তখন এ কর্ম্মে প্রত্যবায়ই বা কেন হইবে বাস্তবিকই প্রত্যবায় হইতে পারে না, তবে কর্ম্মারম্ভে অহং অভিমানের উদাশীনবৎ প্রতীয়মান হেতু প্রত্যবায় হইলেও, উহাকে নিস্কাম কর্ম্মযোগই বলা হইয়াছে।

একাধিবার বলা হইয়াছে কর্ত্তব্য বিমুখ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য পথে লইয়া আসাই গীতার মুখ্য এবং গৌণ উদ্দেশ্য অর্জ্জুনের এই কর্ত্তব্যই নিস্কাম কর্ম্ম বা কর্ম্ম সন্ন্যাস, সকাম কর্ম্মের কথা গীতাতে নাই, অবশ্য "হতো বা প্রাপ্সসি স্বর্গ" শ্লোকে সকাম কর্ম্ম জনিত অর্জ্জুনকে স্বর্গ ভোগ বুঝান হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ প্রকার

স্বর্গভোগাদি দেখাইয়া সাধারণ লোককে যেমন কর্ম্মে প্রবৃত্তি লওয়ান হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে যুদ্ধ কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই ঐ কথা বলিয়াছিলেন কেন না, অর্জ্জুন তখন নিম্নাধিকারী, তারপর অর্জ্জুন যখন এই দুর্জ্ঞেয় কর্ম্ম তত্ত্ব বুঝিতে পরিলেন, তখন ভগবান বলিয়াছেন,—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনু প্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

অর্থাৎ তাহারা প্রার্থিত বিপুল স্বর্গ ভোগ করিয়া শেষে পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্তলোকে প্রবেশ করে। ভোগাভিলাষী অর্থাৎ ভোগকর্ম্মী বেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া এইরূপে বারংবার সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে, পাঠক লক্ষ্য করিবেন, বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত কর্ম্মবাদের সহিত গীতায় এই নিস্কাম কর্ম্মের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই, বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিহিত কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করা না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আবার জন্ম, আবার স্বর্গ, আবার মরণ, এইরূপ পুনরপি জনমং, পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নং, বারংবার জন্ম মৃত্যুর ক্লেশই চলিতে লাগিল। শেষ কথাটা কি না—সাংখ্যের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি, গীতার পরমানন্দ প্রাপ্তি এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভ হইল।

এখন কথাটা হইতেছে নিস্কাম কর্ম্ম; কিন্তু এই কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফল বিজড়িত, এই কর্ম্ম ঠিক ঠিক মত করা হইতেছে কি না ইহা যখন বুঝিতে পারিতেছি না, তখন সেই কর্ম্মের উপর নির্ভর না করিয়া সেই কর্ম্ম ঠিক মত করিবার জন্য শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিতে হইবেই, কেন না কর্ম্মকে যখন ছাড়িতে পারিতেছি না, তখন কর্ম্ম না করিয়াই বা ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব কিরূপে? কর্ম্মকালে অত্যন্ত কষ্ট হইলেও, তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার শক্তি প্রার্থনা করিতে হইবে, তবেই হইল সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহার উপর লক্ষ্য রহিল, ইহা শ্রীভগবানেরই কর্ম্ম, তিনিই আমার এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিবেন, সর্ব্বদা এই ভাবনা রহিয়া গেল, সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষাও থাকিল না, পরন্তু তাঁহার জন্য সর্ব্বদা আমার ঐকান্তিক ব্যাকুলতা রহিল, সর্ব্বদা ভগবানের জন্য ব্যাকুল থাকিলে, তিনিই সেই কর্ম্মের কর্ম্মী ইহাই প্রকৃত নিস্কাম কর্ম্ম।

কিন্তু বিষয় ভোগে রুচি থাকিলে এই কর্ম্ম নিস্কাম হওয়া বড়ই সুদূর পরাহত বিষয়, ভগবান ও কর্ম্ম এই তিনটি পরস্পরের বিরোধী হইয়াও ইহারা

সর্ব্বদা একত্রিত, যেমন বিষয় ভোগ থাকিতে নিস্কাম কর্ম্ম এবং এ নিস্কাম কর্ম্ম জনিত শ্রীভগবানে প্রগাঢ় বার্ত্তা হয় না, তদনুরূপ আবার শ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও ভগবান শূন্য বিষয় ভোগ বিষের ন্যায় বোধ হয়, ভোগ্য বস্তু ঈশ্বর দিয়াছেন, ভোগ কর, এই ভোগকরিবার সময়ে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং নিস্কাম কর্ম্মের জন্য সেই আত্মদেব শ্রীভগবানের—কাছে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর যে, হে ভগবান! তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাতেই এই ভোগ্য বস্তু আমি পাইয়াছি, তোমার ইচ্ছাতেই এই ঐশ্বর্য্যের অধিকারি হইয়াছি, দুঃখের সময় বল হে প্রভু! তোমার ইচ্ছাতেই এই দুঃখ এই শোক তাপ পাইতেছি, এই প্রকারে তাহার নাম সর্ব্বদা স্মরণ করিতে করিতে ধারণাভ্যাসী হইয়া দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে। ক্রমে কর্ম্মের গতিও বুঝিতে পারিবে।

গীতা বলিতেছেন,—এই নিস্কাম কর্ম্মের তত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে প্রকৃত জ্ঞান লাভও মানবের ভাগ্যে ঘটে না এই জন্য গীতা প্রথমে বিহিত কর্ম্মের কথা বলিতেছেন, জপ, তপ, গুরুবাক্য, শাস্ত্রালোচনা (এ গুলি ভগবানের অভিলাষিত) প্রভৃতি বিহিত কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে, তৎপরে ঐ সকল কর্ম্ম করিতে করিতে পাপক্ষয় হইলে মনোমালিন্য কাটিয়া ক্রমে প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এই জ্ঞান লাভ হইলে আর কোন কর্ম্মই থাকে না, এই জন্য কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে, পরে কর্ম্মত্যাগ হইয়া, অহং অভিমান দূর হইয়া "সর্ব্বং-খল্বিদং ব্রহ্ম।" জ্ঞান হইবে, এই জ্ঞানই জীবন্মুক্তির সোপান।

বুদ্ধদেবও প্রথমে বিহিত কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। (ক্রমশঃ।)

———:•:———

শঙ্খধ্বনি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত।

(১)

শঙ্খরে! তোমারে আমি বড় ভালবাসি।
সকল মঙ্গল কাজে, আর্য্যগৃহে শঙ্খবাজে,
তোমারে করেচুম্বন যত পুরবাসী॥

(২)

নিত্য নিত্য কর তুমি মঙ্গল আচার।
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, লক্ষ্মীরা প্রদীপ জ্বালে,
আদরে চুম্বন করে অধর তোমার॥

(৩)

পর্ব্বদিনে দেবদেবী অর্চ্চনা বাসরে।
কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি, দেবালয়ে প্রতিধ্বনি,
নিস্বরে মধুরধ্বনি তোমার অধরে॥

(৪)

উষাকালে দেবালয়ে মঙ্গল আরতি।
সুমধুর বাদ্যরোল, উথলে মঙ্গল বোল,
তোমারে চুম্বন করে যত কুলবতী॥

(৫)

যবে জনমিনু আমি সূতিকাগারে।
সবে পুলকিত মন, উলু দিল বামাগণ,
আনন্দে বাজিলে তুমি নিরখি আমারে॥

(৬)

ছ-দিনে ষেঠেরাপূজা হইল আমার।
নানা মঙ্গলাচরণ, আশীসিলা দ্বিজগণ,
তোমার মঙ্গল রবে পুরিল আগার॥

(৭)

আচরিলা ষষ্ঠীপূজা পুরনারীগণে।
অন্তঃপুরে মহোৎসব, সবার আনন্দরব,
আনন্দে বাজিলে তুমি মধুর নিক্কনে॥

(৮)

অন্নপ্রাসনের দিন আনন্দ সবার।
সেইদিন শুভদিন, মাতৃক্রোড়ে আমি লীন,
বাজিল মঙ্গল বাদ্য বদনে তোমার॥

(৯)

কর্ণভেদ সংস্কার হইল যে দিন
আসি কুলপুরোহিত, সাধিলা কুলের হিত,
তোমার মঙ্গল ধ্বনি শুনিনু সেদিন ॥

(১০)

সময়ে যেদিন মম শুভ পরিণয়।
কি আনন্দ সে রজনী, যতেক কুল রমণী,
প্রেমাদরে তবমুখ যতনে চুময় ॥

(১১)

জীবন সংসারক্ষেত্রে মঙ্গল উৎসবে।
বাজিয়াছ তুমি সুখে, কুলাঙ্গনা মুখে মুখে,
সকলেই প্রমোদিত তোমার সুরবে ॥

(১২)

মঙ্গল বাদিত্র তুমি তাই আমি বলি।
আনন্দে আনন্দ পাও, মঙ্গলে মঙ্গল চাও,
বংশীধারি মুখে যথা মধুর মুরলী ॥

(১৩)

কিন্তু শঙ্খ আজি বড় খেদ মম মনে।
আগত চরম কাল, সন্মুখে করাল কাল,
নীরব রয়েছ তুমি বিষণ্ন বদনে ॥

(১৪)

মহাপ্রস্থানের দিন নিকট আমার।
হৃদে জপি আত্মারাম, চলি আমি স্বর্গধাম,
হৃদয়ে আনন্দ শঙ্খ বাজে অনিবার ॥

(১৫)

শঙ্খরাজ কেন তুমি রহিলে নীরব!
শান্তিমূর্ত্তি দেখা দিলা, ফুরাইল মম লীলা,
এই সঙ্গে ফুরাল কি তোমার উৎসব?

(১৬)

ইচ্ছা করি শঙ্খ তুমি বাজ একবার।
বেঁচেছিনু যত দিন, বাজিয়াছ তত দিন,
এইবার বাজ আত্মা জুড়াক আমার!

(১৭)

কৈ বাজো? কেন হেন মৌন হয়ে রও?
অনিত্য সুখের বেলা, বেজে বেজে কর খেলা,
আজি বুঝি নিত্য সুখে বন্ধু তুমি নও!

—:০:—

আশাবটে!

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ গুপ্ত।

(১)

বনমালী মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রগুণে গ্রামের সকলে তাঁহাকে ঠাকুর বলিত। বনমালী এখন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করেন। একদিন তিনি কলিকাতার একটী ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে আপনার সুপ্ত স্মৃতিকে জাগ্রত করিয়া অতীত ঘটনাগুলিকে প্রত্যক্ষবৎ মনে করিতেছেন। বেলা অবসান হইয়াছে, এ সময় কাজ না থাকিলে স্বভাবতঃ নানা ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয়, বনমালীর তাহাই হইয়াছিল। এক কালে বনমালীর সুখের দিন ছিল, সেদিন চলিয়া গিয়াছে। সে সময় সৌভাগ্যের সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি এ সংসারকে স্বর্গ অপেক্ষাও সুখের মনে করিতেন, সুখের পর দুঃখের দশা আসিলে সকলেরই এরূপ হইয়া থাকে, বনমালীর তাহাই হইয়াছিল। একদিন তিনি বৃদ্ধ পিতামাতার উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষায় আপনার অর্থোপার্জ্জনকে সার্থক জ্ঞান করিতেন, দরিদ্র গ্রাম-বাসীর দারিদ্র্যদুঃখ বিমোচনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। যে দিন কোন নিরন্ন ব্যক্তি তাঁহার নিকট অন্ন সংস্থান করিয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে হাসিমুখে চলিয়া যাইত সেই দিন তাঁহার মনে পড়িতেছে। কতদিন কত মাতৃপিতৃহীন অনাথ বালক তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া স্কুলের বেতন, কাগজ কলম পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে, আজি তাহাদের

অনেকেই কৃতবিদ্য হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছে—একে একে সবই তাঁহার মনে আসিতেছে—মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে। এখন সে সুখ সে সৌভাগ্য তাঁহার ফুরাইয়াছে—আছে কেবল স্মৃতি। স্মৃতি মানুষের থাকে, অপর জন্তুর নাই, স্মৃতির সহিত বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই স্মৃতি সুখের বটে—আবার দুঃখেরও বটে। সুখের অবস্থায় দুঃখের স্মৃতি বড় মধুর, দুর্ভাগ্য ক্রমে বনমালীর অদৃষ্টে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার দোষ দেওয়া চলে না।

(২)

বনমালী ঠাকুরের একটী কন্যা—তাহার বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন অতি সুপাত্রে—জামাতা পিতৃ-মাতৃহীন এবং লেখাপড়ায় বিশেষ বুৎপত্তি না থাকিলেও তাহার স্বভাব-চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। কেহকখন তাহার কোন দোষের কথা শুনে নাই। জামাতাটী সওদাগর আপিসে চাকরী করিয়া মাসে পনরটী টাকা পাইত, তাহাতে বনমালীর মনঃপুত হইল না, আরও কিছুদিন লেখাপড়া শিখাইয়া একটী ভাল চাকরী করিয়া দেন। জামাতা শ্বশুর শাশুড়ীকে পিতামাতার তুল্য জ্ঞান করিত। সে বিদেশে চাকরী করিত, শ্বশুর বনমালী জামাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া রওনা হইলেন—পীড়া কঠিন, জামাতার দুইটী আত্মীয়া শুশ্রূষার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্বশুর জামাতায় কথাবার্ত্তার পর জামাতার বাকরোধ হয়, তদবস্থায় তিন চারি দিবস থাকিবার পর একদিন জামাতা সজ্ঞানে শ্বশুরকে বলিল,—"ছোট বৌ রহিল, খোকা রহিল দেখিবেন।" এই কয়েকটী কথা বলিবার পর আবার পূর্ব্বাবস্থা। জামাতার গৃহ মধ্যে বনমালীর কন্যা ছোট বৌ বলিয়া কথিত, কারণ জামাতা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ। সেই দিন জামাতার ইহলোকলীলা ফুরাইল। যে শ্বশুর কাছে আহার নিদ্রা ভুলিয়া তাহার শয্যায় বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তাহার রোগ যন্ত্রণা আপন শরীরে অনুভব করিতেছিলেন, সে শ্বশুরের চক্ষে জল আসিল না। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। বনমালীর অসাধারণ ভগবদ্বিশ্বাস তিনি বুঝিলেন—ভগবান মঙ্গলময়, তিনি যাহা করেন তাহা ভালর জন্যই করিয়া থাকেন, মোহাচ্ছন্ন মানব তাঁহার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাঁহাকে দোষারোপ করে। তাহাতে মহাপাপের সঞ্চার হয়। কি জানি বনমালী ভাল কি মন্দ বুঝিয়াছিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া বনমালীকে কন্যার বিষাদাবনত বৈধব্য বেশ দেখিতে হইল। তাহাতে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইলেও মুখ ফুটে নাই। বনমালীর কন্যার বয়স তখন ষোড়শ বৎসর, প্রবীণা প্রতিবাসিনী ও আত্মীয়গণ প্রথম একাদশীর দিন ব্যবস্থা করিলেন—বনমালীর কন্যা অল্পবয়স্কা এখন কিছুদিন একাদশীতে জল গ্রহণ করিতে পারে—তবে অন্নাহার চলিবে না। বনমালী তাহাতে মত দিলেন না, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হৃদয় ধরিয়া বলিলেন,—"শাস্ত্রে হিন্দুবিধবার একাদশীতে যখন নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা আছে তখন তাহাই করিতে হইবে।" কন্যাও তাহাতে পরাঙ্মুখী—নহে তাহাই করিল। কন্যার মাতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বনমালী তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন।

(৩)

অর্থ আসে, অর্থ যায়—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের হাতে প্রায় সঞ্চিত হয় না—কখন সচ্ছল কখন অসচ্ছল—শরতের আকাশের মত কখন পরিষ্কার কখন আবিল—অথচ সংসারীর অর্থেই সুখ অর্থাভাবেই দুঃখ। বনমালীর সুখের দিন দুঃখের দিন সবই মনে আসিতে লাগিল। কালে জামাতৃবিয়োগ দুঃখের পরিপাক হইল। বনমালীর পুত্র চারিটী ভালকরিয়া লেখাপড়া করিতে লাগিল, কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া, কেহ পদক লাভে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া পিতাকে দেখাইল। বনমালীর মন বড়ই মোহপ্রবণ, পুত্রদের কাহার কোন দিন কালেজ হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইলে তিনি পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, কোন দিন অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে কালেজ পর্য্যন্ত যাইতেন, কোন দিন পথি মধ্যে তাহাদের সহিত দেখা হইলে পথ হইতে ফিরিতেন। কলিকাতা সহরের পথে ট্রাম, মোটর, বাইক, চেরেট, ফিটেন, বগি ও ভাড়াটে গাড়ীতে আচ্ছন্ন, তা ছাড়া ইলেকট্রিক তার ছিড়িয়া মাথায় পড়িবার ভয়, তদরিক্ত দস্যুতস্কর ও প্রবঞ্চক প্রতারক সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়ায়—নিরীহ লোক পাইলে কত রকমে আপনাদের ইষ্টসিদ্ধি করে। বনমালী পুত্রগুলিকে স্কুল কালেজে পাঠাইয়া সদা চিন্তিত থাকিতেন—কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে। বনমালী পুত্রদের কল্যাণ কামনায় ইষ্টদেবতার নিকট সর্ব্বদা পুষ্পাঞ্জলি। কোন দিন কাহারো কোন অসুখ করিলে ভয়ে আড়ষ্ট, কি জানি পাছে তাহার কোন অমঙ্গল ঘটে। প্রতিবাসী বা আত্মীয় স্বজনে বনমালীর শুভাদৃষ্টের সুখ্যাতি করিলে তিনি সুখী হইতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অতি ভয়ে ভয়ে বনমালী আশা করিতেন পুত্রেরা লেখাপড়া

শিখিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিলে সংসারে সুখী হইতে পারিবেন, এবং যে পত্নী বাল্যাবধি মাতৃপিতৃহীনা পতি বই অন্য দেবতাকে জানিতেন না। সেই পত্নীর সকল সাধ মিটিবে, বৌ-ঝি-লইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে পারিবেন। সংসারে আসিয়া মনুষ্য জন্মগ্রহণে সকলেই এ আশা না করিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু মানুষ ভাবে এক, যাঁহার হাতে অদৃষ্টচক্র চলে তিনি করেন আর—এ হেন বনমালীর অদৃষ্টচক্র একটা পালট দিল—উপর্য্যুপরি দুই বৎসরে তিনটী পুত্র গতাসু হইল, চিকিৎসা, সেবা শুশ্রূসার কোন ক্রটী হইল না—বনমালী স্বস্ত্রীক আহার নিদ্রা ত্যাগে যাহাদের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদের প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাস উৎকণ্ঠার সহিত অবলোকন করিতে করিতে আত্মহারা হইতেন—তাহারা সকলেইমৃত্যুকালে "মাতাপিতার কিছু করা হইল না" বলিতে বলিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। বনমালীকে পাষণ্ডই বল আর পাতকীই বল তাঁহাকে চক্ষের জল মুছিতে হইল না, তাহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিয়া সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কাজে মনোনিবেশ করিলেন, গৃহিনীর চক্ষে জল আসিলে বা তাঁহার মুখে আর্ত্তনাদ শুনিলে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন। রহিল কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠটী। বনমালার মায়া মোহ তাঁহারই উপর পুঞ্জীকৃত হইল। পুত্র চাকরী করিতে লাগিল, অর্থাভাব ঘুচিল, কিন্তু বেশীদিনের জন্য নহে, দুই বৎসরের মধ্যে তাহারও সংসারলীলার শেষ হইল, পিতা-মাতার বক্ষে বিষ দিগ্ধ শল্য বসাইয়া সেটীও লোকান্তর আশ্রয় করিল। যে দুর্ঘটনার শঙ্কায় বনমালীর হৃত-পিণ্ডে প্রবল শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, পুত্রের প্রাণ-বায়ু বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মন্দীভূত হইল, কিন্তু একবারে বন্ধ হইয়া গেল না, স্থিরভাবে বহিতে লাগিল। বনমালীর চক্ষে একবারও কেহ অশ্রুপাত দেখিতে পাইল না, তিন দিনকাল পত্নীরচক্ষের জল শুকাইল না, তিনি বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন, বনমালী বলিলেন—"তোমাকে অধীর অস্থির দেখিলে আমি ত স্থির থাকিতে পারিব না"—পতিপ্রাণা পত্নী তাহা বুঝিলেন, পূর্ব্ববৎ পতিসেবায় মনোনিবেশ করিলেন—পূর্ব্ববৎ স্বামীর দেব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দিতে লাগিলেন, ক্রমে সকলই ভুলিলেন। বনমালীর অসাধারণ ধৈর্য্য, কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে?

বনমালীর পত্নী প্রিয়ম্বদা তৎকালে শোক সহ্য করিলেন, সত্য কিন্তু অধিক দিন তাহাতে সমর্থা হইলেন না। দুশ্চিন্তায় তাঁহার দেহ ক্ষয় পাইতে লাগিল, দুই এক বৎসরেই তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত হইল, তিনি পুত্রশোক হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

(৪)

দৌহিত্র তখন প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক, সে মাতা অপেক্ষা মাতামহীকে বোধ হয় অধিক ভাল বাসিত, তাই তাঁহার পরলোক প্রস্থানে সে নিরুদিষ্ট হইল। যাইবার সময় একটু কাগজে লিখিয়া গেল—"বৃদ্ধ অশক্ত মাতামহের গলগ্রহ হওয়া আমার ইচ্ছা নহে, যদি তাঁহার দুঃখ দূরকরিবার অবস্থা হয় তবে ফিরিব।" তাই আজি বনমালীর সংসারে কন্যাটী বই আর কেহ নাই। একটী ভদ্রলোক দয়াপরবশতাপ্রযুক্ত সাতটী করিয়া টাকা মাসহরা দেন, তাহাতে পিতাপুত্রীর ভাল চলেনা বলিয়া তাঁহাকে একটু আধটুকু কাজ করিতে হয়, আর একটী ভদ্রলোক আপনার বাড়ীতে বিনাভাড়ায় একখানি ঘর দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা দুইজনে বাস করেন। বনমালী যখনই নির্জ্জনে থাকেন, তখনই তাঁহার স্মৃতি তাঁহাকে জ্বালাতন করে, যখনই তাহা নিতান্ত অসহ্য হয়, তখনই তিনি ইষ্টদেবতার চরণ চিন্তা করিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার সান্ত্বনা, ইহাই তাঁহার শোকবিস্মৃতির সম্বল, যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন তিনি স্মৃতি যাতনায় অস্থির, এমন সময় কন্যা আসিয়া বলিল—"বাবা আজ একটী পয়সা নাই।" পিতার মুখে গম্ভীর চিন্তার চিহ্ন দেখিয়া কন্যাটী তাঁহার নিকটে বসিয়া বলিল, "বাবা এ অবস্থায় আপনার তীর্থ বাসে ইচ্ছা হয় না?"

বনমালী একটুক্ষণ স্থির থাকিয়া উত্তর করিলেন,—তোমার পুত্র আসিয়া আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া কোথায় খুজিয়া বেড়াইবে মা—তাহাকে সুখী সচ্ছন্দ ও সংসারী হইতে দেখিলেও আমার কতকটা দুঃখনিবৃত্তি হয়।

তাই বলি, আশা বটে—ইহাকেই বলিতে হয় আশা—ধন্য তুমি মোহের ভগ্নি আশা!!!

—:•:—

সতী-ধর্ম্ম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বরদকান্ত ঘোষ বর্ম্মণঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিষ্ণু পুরাণোক্ত পতিব্রতা ধর্ম্ম।

——ঃ০ঃ——

"অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ—

(ক) ভর্ত্তুঃ সমানি ব্রতচারিত্বং।—স্বামী যে ব্রত ও নিয়ম অবলম্বন করিবেন স্ত্রীও তাহাই করিবেন। অর্থাৎ পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী ও সহ-ভোগিনী হইবেন।

(খ) শ্বশ্রূ শ্বশুর গুরুদেবতাথিপূজনঃ।—অর্থাৎ গুরুজনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া ও দেব-দ্বিজে ভক্তি করা।

(গ) সুসংস্কৃততোপস্করতা।—অর্থাৎ পবিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্বামীর ও পরিবারের পূজার আয়োজন বা সাহায্য করিবে।

(ঘ) অমুক্তহস্ততা।—সাবধানে ব্যয়াদি করিবেন। অর্থাৎ আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিবেন না। এবং একেবারে অল্প ব্যয় করিয়া পরিবারস্থ লোকদিগকে কষ্ট ও সাধারণের নিকট কৃপণতার পরিচয় দিবেন না। ব্যয় কুণ্ঠ কৃপণদিগকে লোকে বড়ই ঘৃণা করে। শক্তি থাকিলে যথার্থ দীন ব্যক্তিকে কিছু কিছু দান করা উচিত। ইহাতে ইহকালে ও পরকালে স্বর্গীয় সুখভোগের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

(ঙ) সুগুপ্ত ভাণ্ডতা।—ধন সম্পৎ অতি গোপনে রক্ষা করিবেন।

(চ) মূল ক্রিয়া স্বসভিরিভিঃ।—স্বামীকে বশ করিবার জন্য কদাপি কোনরূপ যাদুমন্ত্র বা ঔষধ (মূলাদি) ব্যবহার করিবেন না।

(ছ) মঙ্গলাচারতৎপরতা।—সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক আচারে যত্নশীলা হইবেন।

(জ) ভর্ত্তরি প্রবাসিতেঽপ্রতি কর্ম্মক্রিয়া।—অর্থাৎ, ভর্ত্তা প্রবাসে গমন করিলে ভার্য্যা স্বীয় শরীরের শোভা-বৃদ্ধি বিষয়ে উদাসিনী থাকিবেন।

(ঝ) পরগৃহেষ্বনভিগমনং।—পরগৃহে গমন করিবেন না।

(ঞ) দ্বারদেশে গবাক্ষকেষ্বনবস্থানং।—দ্বারদেশে বা গবাক্ষ প্রভৃতি স্থানে দণ্ডায়মান নিষেধ।

(ট) সর্ব্বকর্ম্ম অস্বতন্ত্রতা।—বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের বশবর্ত্তিনী থাকা কর্ত্তব্য।

(ঠ) মৃত্যোভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।—ভর্ত্তার মৃত্যুর পর স্ত্রীর হয় ব্রহ্মচর্য্য না হয় সহগমন করা উচিত।

(ড) নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞোনব্রতোনাপ্যু পোষিতং পতিং শুশ্রূষাতে যত্ত তেন স্বর্গে মহীয়তে।—স্ত্রী দিগের স্বতন্ত্র যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাসাদি নিষিদ্ধ কেবল পতি শুশ্রূষা দ্বারাই তাঁহারা অক্ষয় স্বর্গের অধিকারিনী হন।"*

পতিব্রতা শাণ্ডিলার স্বর্গ প্রাপ্তি প্রসঙ্গ।

পতি-ভক্তি পরায়ণা মহাভাগা শাণ্ডিলা সুরলোকে গমন করিলে, গোলক বাসিনী সুষমা তাহাকে বলিলেন,—"দেবী! আপনি কি পুণ্য বলে এই সর্ব্ব-জনবাঞ্ছিত স্বর্গবাসিনী হলেন?"

তদুত্তরে শাণ্ডিলা বলিলেন,—"দেবী! আমি কষায় বসন কি বল্কল পরিধান, শিরোমুণ্ডন কিংবা জটা ধারণ করতঃ এই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া মনে করিবেন না।"

তদনন্তর শাণ্ডিলা যেরূপ আচরণ করিয়া স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। "আমি কখনও স্বামীর প্রতি পরুষ বা অহিত-জনক বাক্য প্রয়োগ না করিয়া, সর্ব্বদা অপ্রমত্তভাবে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃলোক-দিগকে পূজা এবং শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা-পরিচর্য্যা করিতাম; আমার মনে কখনও পৈশুন্য ভাবের উদয় হইত না। আমি কখনও বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কাহারও সহিত অধিকক্ষণ আলাপে লিপ্ত থাকিতাম না; এবং আমার কখনই রহস্যজনক অহিত কর ক্রিয়ানুষ্ঠানে রুচি হইত না। স্বামী স্থানান্তর হইতে বাড়ী আসিলে, আমি তাঁহাকে আসন প্রদানান্তর একান্ত মনে তাঁহার পূজা এবং তদীয় অপরিজ্ঞাত ও অননুমোদিত বস্তুসকল সর্ব্বথা বর্জ্জন করিতাম। আত্মীয় স্বজনের নিমিত্ত যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হইত, আমি প্রভাতে উত্থিত হইয়া সে সমস্ত সম্পন্ন করিতাম। ভর্ত্তা কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে, আমি কেশ-বন্ধন গন্ধদ্রব্যাদি অনুলেপনে শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্দ্ধনে যাত্নিক না হইয়া সর্ব্বদা সংযতভাবে মাঙ্গলিক কার্য্যানুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিতাম। এবং তাঁহার সুষুপ্তিকালে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষেও অন্যত্র যাইতাম না। আর পরিবার প্রতিপালনার্থে সর্ব্বদা তাঁহাকে নিয়োগ দিতাম না। যে সকল রমণী সমাহিত চিত্তে এ সকল ধর্ম্ম পালন করেন তিনি অরুন্ধতির ন্যায় স্বর্গ-সুখ-ভোগিনী হন।"†

* শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার সঙ্কলিত।

† প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে এস্থলের মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত হইল না।

স্কন্দপুরাণোক্তপতিব্রতা-ধর্ম্ম।

পতিব্রতা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশী খণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—

"রমণী পতি-বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না, ইহাই স্ত্রী লোকের ব্রত, ইহাই পরম ধর্ম্ম ইহাই দেব-পূজা। দুরবস্থাপন্ন, ব্যাধিযুক্ত, বৃদ্ধ এবং সুস্থ বা দুঃস্থ পতি যাহাই কেন হউক না, স্ত্রী পতিকে লঙ্ঘন একেবারেই করিবে না। স্বামী হৃষ্ট হইলে স্ত্রী হর্ষে থাকিবে; পতি বিষণ্ণ বদন হইলে পত্নী বিষণ্ণা হইবে;—সতী-নারী সম্পদে—বিপদে স্বামীর সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইবে। ঘৃত, লবণ, তৈলাদি ব্যয়িতা হইয়া গেলেও পতিব্রতা স্ত্রী পতিকে "নাই" বলিবেন না। এবং আয়াস-কর কর্ম্মে পতিকে নিযুক্ত করিবে না। তীর্থস্নানাভিলাষিনী নারী পতি-পাদোদক পান করিবে। একমাত্র পতি স্ত্রীজাতির পক্ষে শিব এবং এবং বিষ্ণু অপেক্ষা উচ্চ। যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত, ব্রতোপবাস-নিয়ম পালন করে, সে পতির আয়ুঃ হরণ করে এবং দেহান্তে নরকে যায়। যে নারী স্বামীকৃত ভৎস্নায় রোষ পরবশ হইয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সে পরজন্মে গ্রাম্য কুক্কুরী ও বন্য শৃগালী হয়। দৃঢ় সঙ্কল্প পূর্ব্বক পতিপদ সেবা করিয়া ভোজন করা স্ত্রীলোকের উচিত। স্ত্রীলোক কখন উচ্চ আসনে বসিবে না বা পর-গৃহে যাইবে না; লজ্জাকর বাক্য কদাচ বলিবে না; কলহ দূরে পরিত্যাগ করিবে। গুরুজন সমীপে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবে না। এবং হাস্য করিবে না।

যে দুর্ব্বুদ্ধি রমণী ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া, অসৎ বৃত্তি চরিতার্থ করে, সে পরজন্মে তরুকোটর বাসিনী ক্রুরা উলুকী (পেঁচকী) হয়। যে স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া স্বামীকে তাড়না করিতে ইচ্ছা করে, সে পরজন্মে ব্যাঘ্রী (বাঘিণী) বা মার্জ্জারী (বিড়ালী) হয়। যে নারী পরপুরুষে কটাক্ষ করে, পরজন্মে সে কেকরাক্ষী (টেরা) হয়। যে রমণী স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া আপনি কেবল মিষ্ট ভোজন করে, সে জন্মান্তরে গ্রাম্য-শূকরী অথবা আত্মবিষ্টা ভোজী বন্য (বাদুড়) পক্ষী হয়। যে স্ত্রী পতিকে তুই তোকারী করে, সে জন্মান্তরে বোবা হয়। যে স্ত্রী স্বপত্নীর প্রতি সর্ব্বদা ঈর্ষা করে, সে পুনঃ পুনঃ (জন্মে জন্মে) দুর্ভাগা হয়। যে স্ত্রী পতির দৃষ্টিশক্তি আবরণ করিয়া পর-পুরুষকে দর্শন করে, সে জন্মান্তরে কাণা কুমুখী এবং কুরূপা হয়। যে স্ত্রী পতিকে বহির্ভাগ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতি সহকারে সত্বর জল আসন ও তাম্বুল প্রদান এবং ব্যজন করিয়া পরে যথাসময়ে

খেদ নাশক উত্তম উত্তম প্রিয়বাক্য এবং পদ সেবাদি দ্বারা পতিকে প্রীত করেন, তিনি ত্রৈলোক্যের প্রীতিকারিণী হন। পিতা পরিমিত সুখদাতা, ভ্রাতা পরিমিত সুখদাতা, পুত্রও পরিমিত সুখ দান করে, আর স্বামী অপরিমিত সুখদাতা; নারী সর্ব্বদা তাঁহাকে পূজা করিবে।

স্ত্রীলোকের ভর্ত্তাই দেবতা, ভর্ত্তাই গুরু, ধর্ম্ম, তীর্থ এবং ব্রত। অতএব স্ত্রীলোক সকল পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র পতিরই অর্চ্চনা করিবে। যেমন দেহ জীবন হীন হইলে তৎক্ষণাৎ অশুচি হয়, তদ্রূপ ভর্ত্তাহীন নারী সুস্নাতা হইলেও সর্ব্বদা অশুচি। সকল অমঙ্গল অপেক্ষা বিধবাই অধিক অমঙ্গল। কোন কার্য্যারম্ভে বিধবা দর্শন করিলে, কোথাও কখন কার্য্য সিদ্ধি হয় না। এক মাতৃ ভিন্ন সকল বিধবাই অমঙ্গলা। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই সকল বিধবার আশীর্ব্বাদ সর্পতুল্য বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন * * * ছায়া যেমন দেহের, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের এবং সৌদামিনী যেমন জলধরের অনুগামিনী, রমণী তদ্রূপ সর্ব্বদা পতির অনুগামিনী হইবে। যে নারী সহমরণোদ্দেশে গৃহ হইতে শ্মশানে সহর্ষে স্বামীর অনুগমন করে নিঃসন্দেহ তাঁহার পদে পদে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যেমন অহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) সর্পকে বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করে, সতীও তদ্রূপ পতিকে যমদূতদিগের হস্ত হইতে মোচন করিয়া স্বর্গে লইয়া যান। যমদূতগণ সতীকে দর্শন করিবামাত্র সতীর পতি দুস্কর্ম্মকারী হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করে। "আমরা যমদূত, পতিব্রতাকে আসিতে দেখিয়া যেরূপ ভয় পাই, বহ্নি বা বিদ্যুৎ হইতেও আমাদের সেরূপ ভয় হয় না" ইহা যমদূতেরা বলে। পতিব্রতার তেজঃ দেখিয়া তপনও অতিমাত্র তাপিত হন, দহন ও দগ্ধ হন এবং সকল তেজঃ পদার্থই কম্পিত হয়। মানব শরীরে যত লোম আছে, তাবৎ অযুত কোটী বৎসর পতিব্রতা, পতির সহিত আমোদ করতঃ স্বর্গসুখ ভোগ করেন।

যাঁহার গৃহে পতিব্রতা কন্যা বর্ত্তমান, সেই জনক জননী ধন্যা; আর যাহার গৃহে পতিব্রতা পত্নী আছেন, সেই শ্রীমান পতিও ধন্য। পিতৃ বংশীয় এবং মাতৃ বংশীয় এবং পতির বংশীয় তিন তিন পুরুষ পতিব্রতার পুণ্যে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। দুশ্চারিনী আপনার চরিত্র দোষে পিতৃ কুল, মাতৃ কুল এবং পতি কুল,—তিন কুলই পতিত করে; আর তাহারা নিজেও ইহ-পরকালে দুঃখ ভোগ করে। যে স্থানে ভূতলে পতিব্রতার চরণ স্পর্শ হয়, সেই সকল

স্থানের ভূমিই মনে করেন,—"আমার এখানে কোন ভয় নাই, এখানে আমি পরম পবিত্রা।" সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ুও ভয়ে ভয়ে পতিব্রতা স্পর্শ করেন,—তাঁহাদের উদ্দেশ স্ব স্ব পবিত্রতা সম্পাদন ;—অন্য কোন প্রকার নহে। জল সর্ব্বদাই পতিব্রতা স্পর্শ অভিলাষ করে ; পতিব্রতা স্পর্শ হইলে জল মনে করে ;—"আজ আমাদের জাড্য দূর হইল ;—অন্যকে পবিত্র করিতে অদ্য হইতে সমর্থ হইলাম। * * * যাহার গৃহে পতিব্রতা রমণী বর্ত্তমান, সেই ব্যক্তিই যথার্থ গৃহস্থ ; অপতিব্রতা রমণী রাক্ষসী জরার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে পতিকে জীর্ণ করে। গঙ্গাস্নানে শরীর যেমন পবিত্র হয়, পতিব্রতা স্ত্রীর শুভদৃষ্টিতে শরীর তদ্রূপ পবিত্র হইয়া থাকে। যদি দৈবাৎ স্ত্রী কোন রূপেই স্বামীর সহ-মৃতা * না হইতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহার বিশুদ্ধভাবে চরিত্র রক্ষা করা উচিত। কারণ চরিত্র নাশে অধোগামিনী হইতে হয়, আর তাঁহার দুষ্কার্য্যের জন্য তাহার পতি, পিতা, মাতা এবং ভ্রাতাবর্গ স্বর্গে থাকিলেও তাহা হইতে চ্যুত হন, ইহার অন্যথা নাই। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে পর বৈধব্যব্রত পালন করেন, সে পরলোকে পুনরায় স্বামীকে লইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করে। বিধবার কবরি (খোপা) বন্ধন, পতির বন্ধনের কারণ ; এই জন্য বিধবা, সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডন করিয়া রাখিবে। বিধবা অহোরাত্রের মধ্যে একাহার করিতে পারিবে ; দুইবার আহার কখনই করিবে না। বিধবা ত্রিরাত্রো-পবাস, পক্ষব্রত, মাসোপবাসব্রত, চন্দ্রায়ণ প্রজাপত্য, পরাগব্রত, করিবে। প্রাণ যাবৎকাল আপনি না যায়, তাবৎকাল, যবান্ন গ্রহণ, ফল ভোজন, শাকাহার কিংবা দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। বিধবা নারী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে, পতিকে অধঃপতিত করা হয়। অতএব বিধবা পতির সুখা-ভিলাষে ভূমিতে শয়ন করিবে। বিধবা স্ত্রী কখনই অঙ্গে উদ্বর্ত্তন (বিলেপন) দিবেন না। এবং গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না। প্রত্যহ পতি, তাঁহার পিতা এবং তাঁহার পিতামহের নামগোত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক কুশ তিলোদক দ্বারা তর্পণ করিবে। § বিধবা পতি বোধে বিষ্ণুর পূজা করিবে,—অন্য বোধে নহে। বিষ্ণুরূপী হরিকে সতত পতিরূপে ধ্যান করিবে। জগতে যে যে দ্রব্য বিধবার অত্যন্ত প্রিয় এবং যাহা যাহা পতির প্রিয় ছিল, সেই দ্রব্য, পতির প্রীতি কামনায় গুণশীল ব্রাহ্মণকে দান করিবে। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ

* এক্ষণ সহমরণ প্রথা নাই ; সুতরাং ব্রহ্মচার্য্যাবলম্বন করাই উচিত।

§ পুত্রাদিহীনা বিধবার এই কার্য্য।

মাসে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিবে। এবং স্নান, দান, তীর্থযাত্রা ও বারংবার বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিবে।"

সতী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনুর মত।

প্রয়োজন বোধে ভগবান্ মনুর স্ত্রী-ধর্ম্ম বিষয়ক দুই চারিটি শ্লোক স্থল বিশেষ ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; এ স্থলে তদতিরিক্ত তাঁহার আরও কতক গুলি অমূল্য উপদেশ উদ্ধৃত হইল। ভগবান মনু লিখিয়াছেন,—

(ক) স্ত্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতীই হউন, বা বৃদ্ধাই হউন, গৃহে থাকিয়াও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র কার্য্য সতন্ত্র ভাবে করা উচিত নহে। স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে,—কিন্তু কখনও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবে না। স্ত্রীলোক পিতা, ভর্ত্তা বা পুত্রের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিতে কখনও চেষ্টা করিবে না। ইহাদের সহিত পৃথক হইলে সে পিতৃ কুল—পতি কুল উভয় কুলই কলঙ্কিত করিয়া থাকে। স্ত্রী লোকেরা প্রহৃষ্ট মনে কাল যাপন করিবে; গৃহ-কর্ম্মে দক্ষা হইবে; গৃহ-সামগ্রী সকল পরিষ্কৃত রাখিবে এবং ব্যয় বিষয়ে অমুক্ত হস্ত হইবে। পিতা যাঁহাকে দান করিয়াছেন, কিংবা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা যাঁহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিত কাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করা ও স্বামীর মৃত্যুর পরও তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন না করা অর্থাৎ ব্যভিচারাদি না করা স্ত্রী লোকের কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ কালে যে পুণ্যাহ—বচনাদি স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করা যায় সে কেবল উভয়ের মঙ্গলার্থ। পরন্তু বিবাহে যে বাগদান করা হয়, তাহাতে স্ত্রীলোক-দিগের উপর স্বামীর সম্পূর্ণ স্বামীত্ব জন্মায়। বিবাহ কর্ত্তা পতি * * * স্ত্রীলোকের পক্ষে নিত্যই সুখ দাতা হন,—এবং কেবল ইহকালে নয়, পরকালেও স্বামী স্ত্রীলোকের সুখ দাতা হইয়া থাকেন। শীল রহিত, * বিদ্যাদি গুণবর্জ্জিত হইলেও পতিকে উপেক্ষা না করিয়া সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা করিবে। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে স্বামী বিনা পৃথক যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই। কেবল পতি সেবার দ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন; সাধ্বী স্ত্রী পতিলোক কামা হইয়া কখনও তাঁহার অপ্রিয় চরণ করিবে না। পতি মৃত হইলে স্ত্রী শুভ পুষ্প-মূল-ফলের দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন। * * যতদিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন তিনি ক্লেশ সহিষ্ণু ও নিয়ম চারিণী হইয়া, মধু

মাংসাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, একমাত্র পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীলোকের যে অত্যুত্তম পরম ধর্ম্ম তৎপালনেই একাগ্র চিত্তা হইবেন। অনেক সহস্র কৌমার ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ, সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বীয় ব্রহ্মচর্য্য বলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায় অপুত্রা হইলেও সাধ্বীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য বলে স্বর্গে গমন করেন। * * নিজের পতিঅপকৃষ্ট অর্থাৎ ধন, মান, কুল-শীলাদিতে হীন বলিয়া যে স্ত্রীলোক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন উৎকৃষ্ট ব্যক্তির আশ্রিতা হয়, সে ইহলোকে নিন্দনিয়া হয়। * * * ব্যভিচারিণীপাপ রোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে, যিনি কায় মনো বাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করেন, তিনিই পতিলোক প্রাপ্ত হন ও সাধু জনেরা তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে স্ত্রী এইরূপে মনোবাক্ দেহ সংযত হইয়া নারী ধর্ম্মে জীবন যাপন করেন, তিনি ইহলোকে পরমা কীর্ত্তি লাভ করেন ও পরকালে পতিলোকে গমন করেন। মনুসংহিতা, ৫ম অধ্যায় ১৪৭ হইতে ১৬৬ শ্লোক। *

(থ) "পতিং যা নাভিচরতিম বাগ দেহ সংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বতীচোচ্যতে॥
ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রীলোকে প্রপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগাল যোনিঞ্চাপ্নোতি পাপ রোগৈশ্চ পীড্যতে॥"

অনুবাদ,—যে কামিনী কদাপি কায়মনোবাক্যেও পতির ব্যভিচার করেনা, সে ইহলোকে সাধুবাদ এবং পরিলোকে স্বামীর সহিত স্বর্গলাভ করিয়া থাকে।

ব্যভিচারিণী ইহলোকে নিন্দিতা অক্ষয় রোগাদি প্রপীড়িতা এবং জন্মান্তরে শৃগালিনী হয়। †

ক্রমশঃ—

* প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে এস্থলের মূল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইল না।

† পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন—অনূদিত "কাশীখণ্ড" ও "মনুসংহিতা" হইতে উদ্ধৃত।

কমলা।

লেখক—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধু বটে!

এখানে রঘুপতি বেশ যত্নের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ম্মে রামরতন বাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি এই বৎসর আবাদে প্রচুর ধান্য পাইয়াছেন। তিনি এখানে সস্ত্রীক দুইবার আসিয়াছিলেন। ধান্য রাখিবার জন্য দুইটী নূতন গোলা নির্ম্মান করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছেন। পুরাতন গোলা ত আছেই। কাজেই তিনি রঘুপতির উপর সন্তুষ্ট হইবেন না কেন? পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী এই সমস্ত ধান্য বিক্রয় করিয়া বিক্রয় লব্ধ অর্থ সমস্তই আত্মসাৎ করিত। ধর্ম্মশীল রঘুপতি ঐরূপ কাজের দিকে দৃকপাতও করিতেন না। তিনি মনিবের অনুমতি লইয়া স্বয়ং দশ বিঘা ভূমি আবাদ করিয়াছেন। তাহাতে যথেষ্ট ধান্য পাইয়াছেন। তাঁহার ও নিজের ধান্য রাখিবার জন্য সতন্ত্র একটী ছোট খাট গোলা করিতে হইয়াছে। বিচালি বিক্রয় করিয়া তাঁহার জমির খাজনা আদায় হইয়াও কিছু টাকা উদ্বৃত হইয়াছে। সেই টাকা তিনি বুনোদের ধার দিয়াছেন। তিনি প্রথমে সুদের প্রত্যাশা করিয়া তাহাদিগকে ঋণ দেন নাই। কিন্তু তাহারা টাকা পরিশোধ করিবার সময় তাঁহাকে সুদ প্রদান করিত। ইহাতেও তাঁহার বেশ আয় হইতে লাগিল। তিনি সুদের জন্য বুনোদিগকে পীড়াপীড়ি করিতেন না। তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা প্রদান করিত তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন।

এইবার তিনি কমলা ও অন্ধা মাতাকে এই স্থানে আনয়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। রামরতন বাবুকে বাটী যাইবার আদেশের জন্য পত্র লিখিলেন। হায়! এমন সময় তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল।

বাটী হইতে কালীভৈরবের প্রেরিত এক খানি পত্র পাইলেন; তাহাতে লেখা ছিল তাঁহার মাতার ওলাউঠা রোগে কাল হইয়াছে। মাতাকে দাহ করিয়া আসিয়া ৪র্থ দিবসে কমলারও ঐ রোগে মৃত্যু হইয়াছে। হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল? যাহাদের জন্য চাকুরী করা তাহারা কোথায় গেল? রঘুপতির মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিনি উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,

হায়! মাগো! রোগের সময় সেবা করা দূরে থাকুক, মৃত্যুকালে তোমার মুখে এক গণ্ডুষ জলও দিতে পাইলাম না। আমার মত মহাপাপী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। কমল প্রিয়তমে! তুমিই আমার মায়ের সেবা করিয়াছ তাঁহার সেবার ত্রুটী হইবে বলিয়া পরলোকেও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছ। যাও, সতি! যাও তোমার অক্ষয় স্বর্গ হউক। কিন্তু হতভাগা রঘুপতির কথা একবারও ভাবিলে না। তোমার বিহনে আমার কি দশা হইবে? মৃত্যু! এস; যে পথে আমার স্নেহময়ী মাতা ও প্রেমময়ী কমলা গিয়াছে, তুমি আমাকে সেই পথে লইয়া যাও। এইরূপ তিনি কতই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নয়ন জলে তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। নিকটে ভৃত্য দণ্ডায়মান ছিল, সে দুই চারিবার জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কাঁদিতেছেন কেন? আপনার কি হ'ল? চিঠিতে কি লেখা আছে যে আপনি পাঠ করিয়াই কাঁদিতেছেন? সে কোন উত্তর না পাইয়া অন্যান্য কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল।

এমন সময় তথায় বুনোদের সর্দ্দার আগমন করিল। সে চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল, নেপাল কি হয়েছেরে? ভৃত্যের নাম নেপাল। নেপাল বলিল কি জানি সর্দ্দার? কোথাথেকে এক খানা চিঠি এসেছে, বোধ হয় বাবুর বাড়ী থেকে; এই চিঠি পড়েই বাবু কেবলই কাঁদছেন। তখন সর্দ্দার বলিল কি চিঠি এসেছে বাবু? শুনিয়া রঘুপতি আরও বালকের মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সর্দ্দারও পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বাবু! কি হয়েছে বলনা? তোর পায়ে পড়ি বাবু! বল। তখন রঘুপতি শোকাবেগ কিঞ্চিৎ নিবারণ করিয়া এবং কোঁচার কাপড়ে নয়নদ্বয় মার্জ্জন করিয়া বলিলেন, সর্দ্দার আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ওরে! আমার মা ও প্রাণসমা পত্নী ওলা-উঠা রোগে মারা গিয়াছে।

সর্দ্দার। কদিন হল?

রঘু। আজ সাত দিন, বলিয়া কালীভৈরবের পত্রের মর্ম্ম তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন।

সর্দ্দার শুনিয়া নিরতিশয় দুঃখে হায়, হায় করিতে লাগিল। রঘুপতি বলিলেন, দেখ সর্দ্দার! তুমি মাঝিদের বলিয়া দাও যেন আমাদের ছোট নৌকা ঠিক থাকে; আমি ভোরেই কলিকাতায় চলিয়া যাইব। কারণ শুদ্ধ ত হইতে হইবে। এখানে ব্রাহ্মণ নাই। কাজেই আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইল।

আমাকে নয়দিনের দিন পঁহুছিতেই হইবে। যদি নয় দিনের দিন যাইতে না পারি, দশদিনের দিন ত পঁহুছিতেই হইবে। সর্দ্দার শুনিয়া নিকটে দণ্ডায়মান একজন বুনোকে বলিল, শীঘ্র মাঝিকে ডাকিয়া আন। সে তাহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল, মাঝি আসিল। রঘুপতি মাঝিকে আপন দুরবস্থার কথা জানাইয়া কলিকাতা গমনের কথা বলিলেন। ঐ স্থান হইতে কলিকাতায় জল ও স্থল উভয় পথেই যাওয়া যায়। স্থল পথে ইঁসনাবাদ হইতে প্রাতঃস্মরণীয় টাকীর জমীদার ৺কালীনাথ মুন্সী মহোদয়ের রাস্তা দিয়া বারাসতে আসিতে হয়, পরে বারাসত হইতে যশোররোড ধরিয়া দমদমা ক্যাণ্টনমেণ্ট পার হইয়া একেবারে কলিকাতার শ্যামবাজারে যাওয়া যায়। আর জল পথে, ইচ্ছামতী নদী ও লোনাখালি দিয়া একেবারে কলিকাতার অন্তর্গত বাগবাজারে আসা যায়।

যশোরে রাজা মাণিকরাম নামে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী একজন ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। একদা তাঁহার মাতা ৺পুরুষোত্তম তীর্থ দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। পথে যাতায়াত তাঁহার অতীব কষ্ট এবং পীড়িত লোকদিগের সেবা শুশ্রূষায় তাঁহার সমস্ত টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। রাজা মাণিকরাম ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ ছিলেন, সে বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি।

সে যাহা হউক, রাজা মাণিকরামের মাতা বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে, মাণিকরাম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! জগন্নাথ কেমন দেখিলে?" মাতা কহিলেন, "বাবা! ঠাকুর অতি সুন্দর দেখিয়াছি। কিন্তু যে রাস্তা!" মাণিকরাম জিজ্ঞাসিলেন, "যে রাস্তা কি?" মাতা বলিলেন, বাবা! এমন দুর্গম পথ কোথাও দেখি নাই। আমার সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা আজিও পথে পড়িয়া আছে। বাবা! যদি তুমি পুরুষোত্তম গমনের একটা পথ নির্ম্মান করিয়া দাও, তাহা হইলে আমার কি যে আনন্দ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। মাতার কথা শ্রবণ করিয়া, মাণিকরাম কাল বিলম্ব না করিয়া রাস্তা নির্ম্মানে মনোযোগী হইলেন। ঐ রাস্তা যশোর হইতে গোবরডাঙ্গা, হাবড়া, দত্তপুকুর, বারাসাত, দমদমা, পাতিপুকুর ইত্যাদি স্থানের মধ্য দিয়া কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামবাজারে আসিয়াছে। শ্যামবাজার হইতে কলিকাতার মধ্যস্থল, (যাহাকে এখন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বলে) গড়ের মাঠের উপর, এবং খিদিরপুর দিয়া বজবজ পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার পর সরস্বতী নদীর (উলুবেড়িয়ার গাঙ) পরপার উলুবেড়িয়া হইতে হুগলী জেলার অধুনা হাবড়া জেলার অন্তর্গত মণ্ডল ঘাট পরগণার মধ্য দিয়া, মেদিনীপুর জেলা ও উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর ও

কটক জেলার মধ্য দিয়া পুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

এই রাস্তা নির্ম্মানের জন্য মাণিকরামকে এক ছটাক জমি ক্রয় করিতে হয় নাই। পুরুষোত্তমের রাস্তা হইবে, শুনিয়া সকলে আনন্দের সহিত নিজ নিজ জমি ছাড়িয়া দিয়াছিল।

রাস্তা নির্ম্মান হইলে, রাজা মাণিকরাম নিজ জননীকে বলিলেন, "মা! এইবার চল, একবার মায়ে পোয়ে জগন্নাথ দেখিয়া আসি।" মাতা বলিলেন, "চল; তীর্থ দর্শনে কাহার অসাধ?" তখন উভয়ে পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। পথে যে যে গ্রামবাসীরা তাঁহার মাতাকে সাহায্য করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অভাবের কথা জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই তাহাদের জল কষ্টের কথা নিবেদন করিল। তিনিও সেই সেই স্থানে বড় বড় দিঘী সরোবর খনন করাইয়া দেন। আজিও মাণিকরামের সরোবর গুলি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু মজিয়া গিয়াছে।

এইবারে মাতা পুরুষোত্তম দেখিয়া এত প্রীতা হইলেন যে, তিনি মাণিক-রামকে "তোমার বংশে যেন পনর্জ্জন্ম না হয়," এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। রাজা মাণিকরাম শুনিয়া বলিলেন, "তথাস্তু"। রাজা মাণিকরামের বংশ নাই। কেবল তাঁহার একটী দৌহিত্র ছিল; তাঁহারই বংশ আছে। আমরা মূল কথা পরিত্যাগ করিয়া কতকটা অন্য কথা বলিয়া ফেলিলাম এখন মূল কথা ধরা যাউক।

মাঝি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। সে বলিল, আল্লা! তোর বিচার নাই। এমন লোকেরও এমন সর্ব্বনাশ করিতে হয়? ইত্যাদি কত কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। তখন নেপাল রঘুপতি স্নানের নিমিত্ত তৈল আনয়ন করিল। রঘুপতি বলিলেন, আঃ বোকা! তেল কি মাখিতে আছে? এখন তেল মাখিতে নাই, মাছও খাইতে নাই। তাহার পর সর্দ্দারকে কাচার কাপড়, মালসা ও আতপ তণ্ডুল আনিতে বলিলেন। সর্দ্দার চলিয়া গেল। তখন তিনি নেপালকে বলিলেন, নেপাল! তুইও সর্দ্দারের সঙ্গে যা। যদি আলো চাল না পাস আমাদের বাড়ী থেকে ধামা খানেক সরু ধান লইয়া গিয়া সর্দ্দারের বাড়ী থেকে আলো চাল প্রস্তুত করিয়া আন। সর্দ্দারের বাড়ীতে ঢেঁকি আছে। নেপাল সর্দ্দারের সঙ্গে গমন করিল এবং তাঁহার আদেশ মত সমস্ত করিয়া আনিল। রঘুপতিও স্নানের পর কাচা ধারণ করিয়া যথারীতি হবিষ্যাদি করিলেন। (ক্রমশঃ।)

—:০:-:০:—

চূড়া করণ। *

লেখক,—শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

কিহে লুসী, § বড় খুসী,
দেখ্‌ছি যে আজ তোরে।
(বলি) ব্যাপারটা কি? বিয়ে নাকি,
এত দিনের পরে॥

কে ঘটালে? কে যোটালে?
কেথাকার সে বর।
আমায় যে ঠিক করা আছে
ফোগলা দিগম্বর॥

লুক্‌য়ে আমায়, মাথায় মাথায়,
এমন কাজ কি হবে?
কথনই নয়, তাও কি হয়!
ব্যাপারটা কি তবে॥

ওহো বটে, ভুল হয়েছে;
হয়ে পড়েছি বুড়ো।
সকল কথা, রয়না মনে;
আজকে যে তোর চূড়ো॥

তা বেশ বেশ, আমি এখন
কি কর্‌বো ভাই!
বাজে কাজে, থাক্‌বো নাকো;
আসল কাজে যাই॥

ভাঁড়ার ঘরে, জাঁক্‌য়ে বসে,
ছহাতে যা পাবো।
মণ্ডা মিঠাই, গোটা গোটাই,
মজা করে খাবো॥

দু-হাত তুলে, পরাণ খুলে,
কর্‌বো আশীর্ব্বাদ।
(তোর) বিয়ের সময়, এম্নি ক'রে
পুরাই যেন সাধ॥

---

* লেখক মহাশয়ের পৌত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী মমতা দেবীর চূড়াকরণ উপলক্ষে।

§ আদরের নাম।

অন্ন প্রাশন।

লেখক—শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

দেখন হাসি, রূপের রাশি;
* নাকের জোরেই মাত।
আজ আমাদের, বড় সাধের—
এই তমসার ভাত॥
পাঁচ ব্যান্নন, পায়েস পিটেয়,
সাজয়ে দেবে ভাতি।
ফোগলা মুখে, খাবে সুখে,
আজ তমসার ভাত॥
(আমি ত) হেঁসে হেঁসে, বস্‌ব ঘেঁসে,
ধুয়ে পাঁখালে হাত॥
একদিনেতে, তুই ফোগলার,
হ'য়ে যাক্‌না ভাত।
আমায় নিয়ে, গেলে পরে,
ও তমসা মণি!
(তুমি) আমার মত, পাকা চুলে,
পর্‌বে সিন্দুর ধনি॥

———:○•○:———

সমালোচনা।

দেব-গীতি।—ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত সেবক স্বর্গীয় মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের সেবকমণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত মূল্য চারি আনা মাত্র।

কলিকাতা ইটালী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের মর্ম্মগাথা; প্রত্যেক সঙ্গীত ধর্ম্মভাব পূর্ণ সুস্পষ্ট, ভক্তের সরল ব্যাকুলপ্রাণের আবেগময় উচ্ছ্বাস; দেবেন্দ্রনাথ স্বরচিত এই "দেব-গীতি" পুস্তকে প্রকাশিত গীতিলহরী আবৃত্তি করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়িতেন, দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত; দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ও অনুরক্ত ভক্তগণের "দেব-গীতি" বড় আদরের সামগ্রী। ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ ঈদৃশধর্ম্মসঙ্গীতের আলোচনায় বিমলানন্দ উপভোগ করিবেন। আমরা "দেব-গীতি" পুস্তক পাঠে বস্তুতই মুগ্ধ হইয়াছি। স্বধর্ম্মানুরাগী প্রত্যেক নরনারীর "দেব-গীতি" পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুস্তকের প্রথমেই মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের একখানি সুন্দর হাফটোন্ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী তমসার অন্ন প্রাশন উপলক্ষে।

* টিকলো।



The Late Bhai Amrita Lal Bose.

Printed by K. V. Seyne & Bros.



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। | ১৩২০ সাল, আষাঢ়। | ৩য় সংখ্যা।

শব্দ-বিজ্ঞান।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।

আত্মা হইতে আকাশের প্রকাশ, আকাশ হইতে বায়ুর প্রকাশ। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। আমরা শব্দ দ্বারা সকল ভাব প্রকাশ করি। মূক শব্দোচ্চারণ করিতে পারে না, কিন্তু লিখিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, লিখিয়া এবং বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, মনের ভাব ব্যক্ত করিবার আর কোন উপায় নাই এব শব্দ পর্য্যন্তই পৌছিবার অধিকার মানুষের আছে, বলা বাহুল্য, এই খানেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য শেষ, অতঃপর অব্যক্ত, ব্যোমেই উৎপত্তি এবং ব্যোমেই লয়। যেহেতু সৃষ্টির সূচনাতেই প্রথমে শব্দের উৎপত্তি, শব্দোৎপত্তির কারণ আকাশ, আত্মা হইতে আকাশের প্রকাশ. আত্মা অব্যক্ত বা অবাঙ্মন সো গোচরঃ অর্থাৎ বাক্য এবং মনের অতীত। স্থির

মহাকাশ হইতে বায়ুর প্রকাশ মাত্রই আকাশের সহিত স্পর্শগুণবিশিষ্ট, গতিশীল ও চঞ্চল বায়ুর সঙ্ঘর্ষণ অথবা আকাশে স্থানাভাব বশতঃ একের মধ্যে অপরের প্রবেশ-লাভের চেষ্টায় দ্বন্দ্ব। এই সঙ্ঘর্ষ, দ্বন্দ্ব বা কম্পন হইতেই শব্দের উৎপত্তি। আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষ কি প্রকারে ঘটে, তৎসম্বন্ধে একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। আকাশ—শূন্যস্থান, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আকাশব্যতীত স্থান নাই। যেখানে আকাশ, সেইখানে বায়ু, সুতরাং যেমন পৃথিবীর সর্ব্বত্র আকাশ বিদ্যমান, তদ্রূপ আকাশের সর্ব্বত্র বায়ুপূর্ণ। ঘটাকাশের ন্যায় জীবের দেহেও আকাশ অর্থাৎ শূন্য স্থান আছে। গর্ভস্থ ভ্রূণে যাবৎ জীব সঞ্চার না হয়, তাবৎ ভ্রূণ অচল থাকে, জীব সঞ্চার হইলেই ভ্রূণ সচল হয়। এই যে জীবের সঞ্চার, ইহাকে বায়ুর সহিত দেহাকাশের সঙ্ঘর্ষ বলা যাইতে পারে। এই সঙ্ঘর্ষ প্রত্যেক জীবে আমরণ বর্ত্তমান থাকে। প্রাণবায়ু জীবদেহকে আশ্রয় করিলেই দেহাকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। যেখানে সঙ্ঘর্ষ, সেইখানে শব্দ, জীবদেহে প্রাণ ও অপানের উর্দ্ধাধোগতিতে যে শব্দোৎপন্ন হয়, সেই শব্দই হৃৎপিণ্ড বা ফুস্‌ফুসে যন্ত্র স্থাপন করিলে শুনা যায়। যেমন বায়ুর অবস্থানের জন্য আকাশের প্রয়োজন, তদ্রূপ জীবদেহে বায়ুর অবস্থানের জন্য অগ্রেই আকাশের সৃষ্টি, কারণ শূন্যস্থান-ব্যতীত বায়ুর সঙ্ঘর্ষণ উত্তম রূপে চলিতে পারে না। এই রূপে প্রতি মুহূর্ত্তে যে কত প্রকারে কত শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা বলা যায় না। আমরা মুখ দ্বারা যে শব্দোচ্চারণ করি, তাহার মূলেও সঙ্ঘর্ষণ বিদ্যমান। মুখ গহ্বর-মধ্যে প্রাণবায়ু বিচরণ করে, কণ্ঠে উদান বায়ুর স্থান। জিহ্বার সহিত যে ক্ষুদ্র জিহ্বা সংলগ্ন থাকে, তাহাকে অলিজিহ্বা বা আলজিব বলে। কণ্ঠদেশে জিহ্বার সহিত ইহা সংলগ্ন। কথা বলিতে হইলেই, জিহ্বা চালনা করিতে হয়, জিহ্বা চালনা করিলেই, অলি জিহ্বা চালিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুখ-মধ্যে প্রাণবায়ুর স্থান, সুতরাং জিহ্বা- চালনা করিলেই, জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা প্রাণবায়ু আঘাত প্রাপ্ত হয়, প্রাণবায়ু যে মুহূর্ত্তে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণবায়ু কণ্ঠদেশস্থ উদানবায়ুকে আঘাত করে, এই জন্য শব্দোচ্চারণ হয়। এই কার্য্য এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে, সহজে অনুভব করা যায় না। এক্ষণে প্রশ্ন এই যদি বায়ুতে বায়ুতে ঘাত প্রতিঘাত হওয়াতেই শব্দোচ্চারণ হয়, তবে জিহ্বার প্রয়োজন কি? এতদুত্তরেবক্তব্য এই—বায়ুতে বায়ুতে যে শব্দোৎপন্ন হয়, তাহা শ্রুতি-গোচর হয় না। পুষ্করিণীর পারে বা বড় বড় অট্টালিকার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শব্দ করিলে, বায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে এবং যে শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল

ও মধ্যসপ্তক, সুতরাং স্বরও উচ্চনিম্নাদি ভেদে সর্ব্বসমেত একুশ প্রকার।

ব্যোম্ ব্যোম্ বলিয়া ভবানী পতি ভূতভবেন মহেশ্বরকে আপ্যায়িত করা হয়। এই শব্দে শ্মশানবাসী পাগল দিগম্বর পরম সন্তোষ লাভ করেন। তিনি সংহার কর্ত্তা, লয়স্থান শ্মশান, তাই শ্মশানে বসিয়া উদাসীন ভাবে উলঙ্গ হইয়া সর্ব্বদা লয়কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। শ্মশানবাসীর বস্ত্রের প্রয়োজন নাই, আহার নিদ্রার প্রয়োজন নাই, তাই তাঁহার উলঙ্গাবস্থা, পরিধেয় বাঘছাল, গলে মুণ্ডমালা, মস্তকে জটা, জটায় সর্প, পাগলের বেশ! এই বেশেই দিগম্বর সন্তুষ্ট! কেবল একটি ব্যোম্ শব্দের প্রত্যাশী! ব্যোম শুনিলেই পাগল খুসী! মানুষ সৃষ্টির প্রথমে যেমন অগ্রে দেহাকাশের সৃষ্টি, পশ্চাৎ তন্মধ্যে বায়ুর বা জীবাত্মার সঞ্চার, মৃত্যুকালেও তদ্রূপ অগ্রে মহাকাশে আকাশগুণ বিশিষ্ট শব্দের লয় অর্থাৎ বাক্ রোধ হয়, পরে প্রাণবায়ু দেহপরিত্যাগ করে, তাই শেষের দিন স্মরণ করিয়া পাগল দিগম্বরের সন্তুষ্টির জন্য আমরা বলি ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্!

শব্দোৎপত্তি ও শব্দোচ্চারণের মূলতত্ত্ব এই। এখন দেখা যাউক, নামের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়। সৃষ্টির আদিতে গুণ অনুসারে নাম কল্পিত হইত। বর্ত্তমানে যেমন কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন, কুলীনের পুত্র কুলীন, নির্গুণ গুণবান, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক, বিদ্যাহীন বিদ্যারত্ন, মূর্খ পণ্ডিত, কবিত্বহীন কবিরাজ, উপাধ্যায়ের অযোগ্য মহামহোপাধ্যায় এবং রাজ্যহীন ব্যক্তি রাজা প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত এবং সমাজে পূজিত ও সম্মানিত হয়, পূর্ব্বে কিন্তু তদ্রূপ ছিল না, তখন গুণানুসারে নাম দেওয়া হইত, কিন্তু এই ভাব বিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিলে, বুঝিতে পারা যায়, আমাদিগের সমাজও অতি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাই সমধর্ম্মার, সমগুণের আদর সম্মান করিতেই সমাজ ভাল বাসে! ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, বায়ু, বাত, জগৎ, পৃথিবী; এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ বিবেচনা করিলে, বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, কোন্ গুণের জন্য কে কিরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে!

মূর্খ বৈদ্য।

লেখক,—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণঃ।

প্রাচীনকালে চিকিৎসক বৈদ্যগণ প্রায়ই—নিষ্ঠাবান্ চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দিগের মতই ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া ঋষি প্রণীত চরক প্রভৃতি গ্রন্থ যথারীতি অধ্যয়ন করিতেন, বৃদ্ধ চিকিৎসকের নিকটে ঔষধের পরিচয় প্রস্তুত করণ ও দেশকাল পাত্রানুসারে মাত্রানুসারে তাহার প্রয়োগ এবং রোগ নির্ণয়াদি শিক্ষা করিতেন। এবং সেই বৃদ্ধ বৈদ্যের চিকিৎসার প্রণালী দেখিয়া দেখিয়া দৃঢ়তর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া চিকিৎসায় প্রবর্ত্ত হইতেন।

বেশ-ভূষায়ও বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মতই ছিলেন। মস্তকে শিখা, ললাটে তিলক, পরিধেয় ত্রিকচ্ছ, উত্তরীয় নামাবলী, ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা এবং আহ্নিক পূজা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদেরই অনুকরণে করিতেন। শিবপূজা না করিয়া প্রাণান্তেও জল গ্রহণ করিতেন না। দেখিতে যেন ঋষির মত, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরির মতন দেখাইতেন। সেই দেবমূর্ত্তির মত বৈদ্যকে দেখিলেই রোগীর জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি হইত, জীবনে আশার সঞ্চার হইত, বিশ্বাসের শক্তিতে রোগ-যাতনা তখনই শিথিল হইয়া আসিত। তাহারা মন্ত্রপূর্ব্বক ঔষধের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেন। মন্ত্র পূত না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতেন না।

এখনকার কবিরাজ চিকিৎসকদিগের রীতি নীতি পঠন পাঠন সমস্তই পূর্ব্বের বিপরীত। এখন চিকিৎসক হইতে আর বিশেষ কষ্ট করিতে হয় না। অল্পতেই চিকিৎসক হইয়া উঠেন।

কোন এক সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের জমা খরচ লেখক একজন নাপিত কর্ম্মচারী ছিল। "নরানাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ" তাহার পূর্ব্ব হইতে অভিসন্ধি ছিল যে, সে চিকিৎসক হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে। ইহা বড়ই সুবিধার কর্ম্ম, কেননা পরের প্রাণ, বনের ঔষধ, নিজের অর্থোপার্জ্জন, এতদপেক্ষায় অর্থার্জ্জনের সুগম পন্থা আর কি আছে?

এই ভাবিয়া নাপিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইল (অবশ্য সে অল্প বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিত) তাহার সম্মুখে বাক্স, জমাখরচের খাতা দোয়াত কলম ইত্যাদি। কবিরাজ মহাশয়ের প্রাত্যহিক প্রিস্কৃপ্‌সন্ গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিত, কবিরাজের মুখে রোগীগণের রোগের নাম শুনিত ঔষধের নাম শুনিত। এবং কবিরাজের ভৃত্যেরা যে সকল লতা পাতা চূর্ণ করিত, পেষণ করিত, তাহা সে দেখিত। এবং কবিরাজ মহাশয় যখন রোগির নাড়ী পরীক্ষা করিতেন,

তখন সে ভাবি কবিরাজ নাপিত এক দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, নাপিত ভাবিল—আর কেন ? আমার যাহা উদ্দেশ্য তাহা পূর্ণমাত্রায় শিক্ষা হইয়াছে, এখন আমি চিকিৎসার ফেরফার সমস্তই বুঝিয়া লইয়াছি। নাড়ীজ্ঞান বোধ হয় আমার মত কাহার হইয়াছে কিনা সন্দেহ। নাড়ী পরীক্ষা কাযটাই বা কি ? আমাদের ৺কৃষ্ণঠাকুর যেরূপে অঙ্গুলী গুলি নাচাইয়া নাচাইয়া বাঁশী বাজাইতেন, সেইরূপে বাঁ হাতে রোগীর ডান্ হাতের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ আস্তে ধরিয়া ডান হাতে রোগির ডানহাত চিত করিয়া কব্জির নিম্নভাগে তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলি পুনঃ পুনঃ পাঁচ সাত বার নাচাইয়া নাচাইয়া হাতটা ছাড়িয়া দিলেই নাড়ী পরীক্ষা হইল, এই ত নাড়ীজ্ঞান, ইহা ত কিছুই নহে। এবং বড়ী প্রস্তুত করাও শিখিয়াছি। উহার অনুপান এই,—আদা মধু মুথা, তুলসীর পাতার রস, বেলপাতার রস সন্ধ্যব-লবণ এই মাত্র।

অতএব আর এই বৈদ্যের চাকুরী কেন করিব ? এখন স্বদেশে নিজ বাড়ীতে বসিয়াই ডিস্পেন্সরী খুলিব, চিকিৎসা করিব, ঔষধের মূল্য লইব, বাহিরে গেলে আপাততঃ ভিজিট চার টাকা বসাইব, ক্রমে যশ বিস্তার হইলে একদমে আট টাকা করিব, ইহাই নীতি। এ সম্বন্ধে আমার কোন নিয়মই অবিদিত নাই, তবে আর অপরের অধীনে থাকিয়া অপমানে ম্রিয়মান হইব কেন ? ইত্যাদি চিন্তা করিয়া স্বদেশে যাওয়াই স্থির করিল।

দৈবাৎ সেই দিনেই কবিরাজ মহাশয় কতকগুলি জয়পাল সংযুক্ত বিরেচনের বড়ী প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছিলেন। আহারান্তে সকলে নিদ্রিত হইলে গুণধর ভাবি কবিরাজ নাপিত সেই বিরেচনের বড়ী চুরী করিয়া অপরের খান কতক বৈদ্যশাস্ত্রের পুস্তক লইয়া চম্পট।

স্বদেশে আসিয়া সে প্রকাশ করিল,—আমি আয়ুর্ব্বেদ রীতিমত অধ্যয়ন, ঔষধ করণ, রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমার অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় অমুক সেন কবিরত্ন মহাশয়। আমার নিজের উপাধি কবিভূষণ।

উক্ত নাপিত কবিভূষণ বাড়ীতেই সাইন্‌বোর্ট্ লাগাইল। প্রাতঃকাল ৮টা যাবৎ সমাগত রোগিগণকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয় ইত্যাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ত্রুটী হইল না।

দেশে নাম পড়িয়া গেল, কলিকাতা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া কৃতবিদ্য

হইয়া নূতন কবিরাজ আসিয়াছে, গ্রামে হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

ঈশ্বরেচ্ছায় একদিন গ্রামে একটা উদরী রোগীর চিকিৎসার জন্য ডাক্ হইল। নূতন নাপিত কবিরাজ যাইয়া রোগীর হাত কৃষ্ণের বাঁশী বাজাইবার মত করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা বাজাইয়া বাজাইয়া নাড়ী দেখিল। এবং নিজের পাণ্ডিত্য বিস্তারের জন্য দুই একটা বচন শুনাইল যথা—"কচিৎ শীত কচি গীষ্ম কচিৎ ঘর্ম্ম মাথা বেথা" গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকে শুনিয়া ভাবিল, এই কবিরাজ, বড় পণ্ডিত।

তৎপরে প্রাতে মধ্যাহ্নে এবং সায়ং কালে সেই বিরেচন বড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিল। রোগী সেই বড়ী ত্রিসন্ধ্যা খাইয়াই দাস্তের উপর দাস্ত হইতে হইতে দূষিত মল বর্ণ রক্ত নিঃসারিত হইয়া উদরী রোগ ভাল হইয়া গেল। নূতন কবিরাজের দেশে ধন্যবাদ পড়িয়া গেল।

লোকে কথায় বলে "উদরী বাদুরী (মুখ দিয়া বিষ্ঠা বমন) যক্ষা এই তিনে নাই রক্ষা" নূতন কবিরাজ সেই অসাধ্যব্যাধি উদরী চিকিৎসা করিল, সুতরাং ধন্যবাদ অসঙ্গত নহে। নূতন-কবিরাজও মনে করিলযে, আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল, কালে আমিও অদ্বিতীয় কবিরাজ হইব. ইত্যাদি চিন্তায় এবং আনন্দের উৎপীড়নে সেই রাত্রিতে নূতন কবিরাজের নিদ্রা হইল না।

দৈবের গতি বিচিত্র, সেই সময়ে গ্রামে ওলাউঠা দেখাদিল, বিনা প্রতিবাদে সেই নূতন নাপিত কবিরাজকেই ডাকা হইল। তাহার কিন্তু সেই দাস্ত করাইবার চোরিত ঔষধই সম্বল। কবিরাজ আসিয়া নাড়ী সেইরূপে ধরিয়া প্রাতে মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে সেই বিরেচনের বড়ীই সেবন করিতে দিল। একেই অতীসার রোগ, তাহার উপরে আবার দাস্তের ঔষধ দিনে তিন বার, আর কি রক্ষা আছে? ঔষধের প্রভাবে রোগীর সুদূরবর্ত্তী মৃত্যুও শীঘ্র শীঘ্রই নিকটবর্ত্তী হইল।

ক্রমে রোগীর আসন্ন সময় উপস্থিত হইলে একটা হুল স্থূল পড়িয়া গেল, তখন তাড়াতাড়ি রোগীকে বাহির করিবার চেষ্টা হইল, কেহ তাহার শিরের দিক ধারণ করিল, "দৈবের কিল বাপে কিলায়" আস্তে আস্তে বন্ধুভাবে বৈদ্যরাজ পাছার দিগ ধরিল, উচ্চৈঃস্বরে সকলে রাম নাম শুনাইতে শুনাইতে বাহির করিতেছে, সেই সঙ্গে বৈদ্যপুঙ্গবও রাম নামে শুনাইতেছিল, বারান্দা হইতে নিচে নামিবার সময় বৈদ্য রাম নাম শুনাইতে যেই "রা" বলিতে হা করিয়াছে, অমনি রোগীর এমনি পিচকিরির বেগে একটা দাস্ত ছুটিয়া বৈদ্যের হা'র ভিতরে ঢুকিল, অমনি "ম" বলিতেই হা বুজিয়া গেল, আর সমস্ত দাস্তই বৈদ্যরাজ উদরস্থ

করিল, অবশিষ্ট দাস্তে বৈদ্যের নাসারন্ধ্র ও চক্ষু ধোয়াইয়া দিল। বৈদ্য বিরক্ত হইয়া রোগীকে ফেলিয়া নিজগৃহে ধাবিত হইল, স্নান করিল, বেজার হইয়া গাল ফুলাইয়া ক্ষুব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

অতীসার রোগটা সংক্রামক, সে জন্য সেই গৃহে আরও দুই এক জন অতীসার রোগে আক্রান্ত হইল। কোন কারণে এক জনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হইলে সহসা সেই বিশ্বাস টুটিতে চাহে না, ইহাই মনুষ্যের স্বভাব। সুতরাং এবারও অতীসার চিকিৎসার জন্য সেই নাপিত কবিরাজকে আনিতে লোক গেল। যাইয়া বৈদ্যকে বিনয় পূর্ব্বক কহিল,—মহাশয়! সেই বাড়ীতে আরও দুইটী লোক অতীসার রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনাকেই যাইতে হইবে। পূর্ব্বে যে মরিয়াছে, তাহার আয়ু নিঃশেষ হইয়াছিল, চিকিৎসকের রোগ চিকিৎসাতেই অধিকার আছে, আয়ু দিতে চিকিৎসকের অধিকার নাই, সে জন্য আপনি মনে কিন্তু করিবেন না। অতএব আপনি ইতস্তত না করিয়া শীঘ্রই চলুন।

কবিরাজ গম্ভীরভাবে কহিল,—যখন চিকিৎসা বিষয়ে নিপুন হইয়াছি, তখন যাইতেই হইবে। না গেলে লোকে দুর্ণাম, এবং অধর্ম্ম হইবে। অতএব আমি যাইব নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনাদের একটা কথা স্বীকার করিতে হইবে।

কথাটা এই,—আমি চিকিৎসা করিব নিশ্চয়ই—পরন্তু বাহির করিবার সময় আমি রোগীর পাছার দিগ ধরিতে পারিব না।

এ কথা শুনিয়া যে নিতে আসিয়াছিল সে জিজ্ঞাসা করিল যে "পাছার দিগ ধরিতে পারিব না" এটা কি কথা হইল? এর অর্থ কি?

নাপিত বৈদ্য কহিল,—ওটা এমন কিছুই নয়, তবে কি জানেন—যখন রোগীকে ঘরের বাহির করিতে হইবে, তখন তাহার পাছার দিগ ধরাটা সুবিধা নহে, অতএব ঐ বিষয় আমায় মাপ করিবেন।

এইখানেই নাপিতের প্রকৃত বিদ্যা বাহির হইয়া পড়িল। নাপিত বৈদ্যের ওরূপ কথা শুনিয়া যিনি ডাকিতে আসিয়াছিলেন, তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে, এ কবিরাজটি নিরেট মূর্খ ইহা নিশ্চয় করিয়া কহিলেন,—

"মূর্খ বৈদ্য নমস্তভ্যং যমজ্যেষ্ঠসহোদর।
যমঃ প্রাণহরো নিত্যং ধনপ্রাণহরো ভবান্॥"

অর্থ,—ওহে মূর্খ বৈদ্য! তোমাকে আমাদের নমস্কার, (তোমার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় ঢের পাইলাম আর না) তুমি যমের বড় দাদা, কেন না যম কেবল

লোকের প্রাণ মাত্র হরণ করে, আর তুমি লোকের ধন এবং প্রাণ দুই হরণ করিয়া থাক।

তদবধি উক্ত নাপিত কবিরাজের ওরূপে বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া গ্রামের লোকের হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল, ঐ চিকিৎসাই নাপিতের শেষ চিকিৎসা হইল, পরিণামে পুনর্ব্বার কবিরত্নকে ক্ষুর ধরিতে হইল।

অতএব সকলেরই ইহা মনে রাখা উচিত যে, মূর্খের চিকিৎসায় প্রাণরক্ষা অপেক্ষা বিজ্ঞের হাতে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর।

—:•:—

স্মার্ত্তপ্রবর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীমদ্ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সময় নির্ণয়।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ।

এই বিশাল বঙ্গদেশ মধ্যে ন্যূনাধিক অনেকেই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীরঘুনন্দনের নাম শ্রুত আছেন। ইহাঁরই অনুগমনে বর্ত্তমান বঙ্গীয় স্মার্ত্তসমাজ দাঁড়াইয়া আছে। এই বিবুধ চূড়ামণি কোন্ কালে কোথায় উদ্ভূত হইয়াছিলেন তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই ইচ্ছা হইতে পারে। বর্ত্তমান নিবন্ধে ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বিদ্বৎসমাজে কিম্বদন্তী এই যে, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীচৈতন্যদেবের সম সাময়িক। উভয়ই নবদ্বীপ নিবাসী, এই জনশ্রুতি মূলে অনেক গুলি আখ্যায়িকাও শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীরঘুনন্দনের অধস্তন বলিয়া পরিচয় দিবার এখন কেহ না থাকিলেও তিনি যে বিদ্বজ্জন-নিবাস নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু কালবিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অনেক পরে শ্রীরঘুনন্দনের আবির্ভাব কাল। বহু কালের ধারণার প্রতিকূলে কোন সত্য ঘটনা সাধারণের হৃদয়ে হঠাৎ স্থানাধিকার করিতে পারে না। সেই জন্য নিরপেক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত ধারণাবিপর্য্যয় করিবার অবকাশ নাই। দেখা যাউক এ বিষয়ে কতগুলি সমর্থবান্ প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে।

শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যক্তিগত জীবনী সম্বন্ধে কোন প্রাচীন লেখক কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী প্রায় ১০। ১২ দশ বার খানি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি শ্রীচৈতন্য দেবের সময়ে রঘুনন্দন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে কোন না কোন কথা প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী মধ্যে রঘুনন্দনের নাম উল্লেখ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কোন গ্রন্থ হইতে শ্রীরঘুনন্দনের কোন প্রসঙ্গ দেখিতে না পাওয়া তাদৃশ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না।

যদিও কোন গ্রন্থে রঘুনন্দনের বিষয়ে কালের নির্ণয় নাই তথাপি তাঁহার নিজ সঙ্কলিত অষ্টাবিংশতি (স্মৃতি) তত্ত্বগ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি রচনার মধ্যে কয়েক স্থলে কাল উল্লেখে তাহার সাহায্যে গণনার প্রণালীর উপদেশ দিয়াছেন। জ্যোতিস্তত্ত্ব গ্রন্থে আমারা দেখি রঘুনন্দন রাঢ়দেশবাসী শুদ্ধিদীপিকার লেখক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চাঙ্গ গণনা করিবার যে সকল গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্ব্বিদ-গণের দ্বারা রচিত হইয়াছে তাহাতে অঙ্ক পাতের সুবিধার জন্য নিকটবর্ত্তী গতকাল গৃহীত হইয়াছে। এই বিধি অতিক্রম করিয়া কেহই ভাবীকাল হইতে গণনা করিবার প্রণালী গ্রহণ করেন নাই। কারণ তাদৃশ বিলোম পন্থা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিলে ঋণধন বিচার সহজ-গণনাকে কঠিন ও বিচার সাপেক্ষ করিবে। রাঢ়ীয় শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই সহজ বিধি অনুগমন পূর্ব্বক সংক্রান্তি গণনা কালে নির্দ্দিষ্ট গতকাল ১৪৮৯ শকাঙ্ক গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ১৪৮৯ শকাব্দায় বা তৎপরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের তদীয় গ্রন্থ লিখন কাল। মহামহো-পাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত দেশ কাল প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীয় গ্রন্থ হইতে সংক্রান্তি গণনা প্রণালী নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিবাসের লিখিত গ্রন্থ দেশ বিদেশে প্রচারিত হইবার কিছু পরে ঐ গণনা প্রণালী শ্রীরঘু-নন্দনের হস্তগত হয় এবং তিনি নিজ গ্রন্থে উহাই সংবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং রঘুনন্দনের জীবিত কাল ষোড়শ শক-শতাব্দীর প্রারম্ভে বলিতে হইবে।

শকাব্দ ১৪৮৯ সালের পূর্ব্বে কি প্রকারে সংক্রান্তি গণিত হইত বা হইবে তাহা শ্রীরঘুনন্দনের গ্রন্থে উল্লিখিত নাই বা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ দম্ভের সহিত পাণ্ডিত্য প্রচার মানসে শ্রীরঘুনন্দনকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সম-সাময়িক মনে করেন তাহা হইলে রঘুনন্দনের সময় অর্থাৎ ৬০। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে সংক্রান্তি কিরূপে গণিত হইত অথবা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গণনা করিতেন তাহার

উল্লেখ রঘুনন্দনের গ্রন্থ হইতে দেখাইতে বাধ্য।

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৩২ শকাব্দে যে কালে দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ৪ মাস কাল শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে বাস করেন তৎকালে বৈষ্ণব-স্মৃতিলেখক শ্রীগোপালভট্ট বালক ছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চদশ শক শতাব্দীর চতুর্থ পাদে শ্রীবৃন্দাবন ধাম আশ্রয় করেন। সেইকালে তিনি শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনা করেন। এই শ্রীহরিভক্তি বিলাস হইতে শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নিজ স্মৃতি নিবন্ধে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। অথচ শ্রীগোপালভট্ট শ্রীহরি ভক্তিবিলাস বা সংক্রিয়া সারদীপিকা গ্রন্থে অনেক গুলি স্মার্ত্তের নাম উল্লেখ করা সত্ত্বেও তাঁহার ভাবী-কালের নবীন স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের উল্লেখ করিবার অবকাশ পান নাই।

উপরিউক্ত আলোচনা আমাদিগকে শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকে ষোড়শ-শক-শতাব্দীর সুধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য করিতেছে।

জীবন—ধর্ম্ম—দিন।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শাস্ত্রি সারস্বতরত্ন।

এই চরাচর বিশ্বে প্রকৃতির অনন্ত লীলার অবিরাম স্রোত চলিয়াছে, কাল-বক্ষে প্রকৃতির লীলার প্রারম্ভ বা অবসান—চিন্তায় নির্ণয় করা দুরূহ। যদি বিশ্বের আবির্ভাব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, তাহার তিরোভাবের অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশ্বের-উৎপত্তির পূর্ব্বে যে কালের বিদ্যমানতার কল্পনা করা যায়, আবার বিশ্ববিলয়ের পরেও সেই কালের অস্তিত্বের কল্পনা না করিবার কারণ দেখা যায় না। সুতরাং কাল অনাদি ও অনন্ত। যাহার জন্ম নাই, তাহার মৃত্যু নাই। কালবক্ষে প্রকৃতির কত প্রবৃত্তি—কত নিবৃত্তি হইতেছে,—সৃষ্টির কত সমাধান তিরোধান হইতেছে,—কত লীলার প্রকটন হইতেছে, তাহার কার্য্যকারণের বিচার বিতর্ক করিলে সকলকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

যেমন উদ্ভব থাকিলেই বিলয় থাকে, তেমনই সংযোগ থাকিলেও বিয়োগ থাকে। সংযোগের কালে যাহার উদ্ভব, বিলয়ের কালে তাহারই কারণাভাব হইতে পারে, কিন্তু উৎপন্নের কাল পরিণতির সহিত তাহার তিরোধানের সময় অপেক্ষা করে। যেমন স্ত্রী-পুরুষে সংযোগে জীবের উদ্ভব হয়, সেইরূপ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভে পুংকেশর-রেণুর প্রবেশে ফলোৎপত্তি হয়; কিন্তু পুং-

কেশরের অভাবে স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভাধান হয় না,—তাহাতে ফলোৎপত্তির অন্তরায় হইতে পারে সত্য, কিন্তু উৎপন্ন ফলের বিলয় বা নাশ হয় না। কারণের বিলয়ের ফলে কার্য্যের বিলয় হইতে পারে, কিন্তু কৃতের বিলয় হয় না, সে যতক্ষণ প্রকৃতির অঙ্কে থাকিয়া, তাহার পোষণ পাইবে, ততক্ষণ তাহার বিদ্যমানতার বা বর্দ্ধমানতার অভাব ঘটিতে পারে না। এই একই নীতি বিশ্বব্যাপিনী—বিশ্বপ্রকটনপরা।

কালয়তি যঃ সঃ কালঃ। যাহা বিশ্বের কলন বা সৃষ্টি করে, তাহার নাম কাল। কালের নিজের যে ধর্ম্ম, কালসৃষ্ট বিশ্বের—জীবের—সেই ধর্ম্ম। আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কালবিভেদে—যুগাদির যে ধর্ম্ম, বর্ষমাসদিনাদির সেই ধর্ম্ম ;—বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বরের অসীম রাজ্যে—এক সন্নীতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ। এক সত্যময়ী নীতির প্রভাব—অপ্রতিবেধ্য। এক্ষণে দেখা যাউক, সে সত্য-মূলক ধর্ম্ম কি ?

সত্য কাহাকে বলে ?—সৎ বা অবিনাশীর ভাব সত্য। যাহার পূর্ব্বে অস্তিত্ব ছিল, যাহা এখনও আছে, যাহা পরে থাকিবে, তাহার নাম সত্য ; তাই সাধক-হৃদয়ে—সত্যং শিবং সুন্দরম্। তাই, ভাবুক-হৃদয়ে—সত্যং পরং নিষ্কলম্। তাই জগৎপ্রসবিতা ব্রহ্ম অবিনাশী, তাহার স্বাভেদ উপাদান—স্থূল কারণও অবিনাশী—সত্য-নিমিত্তেরই কামকল্পনাবশে—বিশ্ব-সৃষ্টি। এই সৃষ্টির বিধি নিত্যপ্রবৃত্ত সত্য। ভগবান্ বলিয়াছেন,—যথাপূর্ব্বমকল্পয়ম্। পূর্ব্বে যেমন কল্পনা করিয়াছিলাম পরে সেই কল্পনায় সৃষ্টি করিতেছিলাম। সর্ব্ববিষয়ে পূর্ব্ব-পরের অনুসৃতি। এই যে কামকল্পনায় সৃষ্টির নিত্যত্ব—ইহাই সত্য।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?—নিরুক্তি দ্বারা ধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। "ধরতি য আত্মানং বিশ্বঞ্চেতি স এব ধর্ম্মঃ"—যাহা আত্মার ও বিশ্বের ধারণ করে, তাহার নাম ধর্ম্ম। আত্মার ধর্ত্তা—বায়ু। দেহে যে আত্মার অবস্থান, তাহা ত বায়ুর অস্তিত্বে—শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিদ্বারা উপলভ্য। আয়ুর সহিত—বায়ুর বা শ্বাসের নিত্য সম্বন্ধ। সুতরাং বায়ুর সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাসের বিধানুসারে রেচক, পূরক, কুম্ভক,—ক্রমে অনুশীলনে তদ্ধৃতির উৎকর্ষসাধন—আত্মধারণ বা ধরিরক্ষণের একমাত্র কারণ। অপরতঃ যজ্ঞাদি দ্বারা বিশ্বহিতসাধন হয় বলিয়া, তাহাও ধর্ম্ম। যথা মানবশাস্ত্রে,—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥"

অগ্নিতে অর্পিত ঘৃতাহুতি আদিত্যে উপনীত হয়, আদিত্য হইতে তদ্বিপরিণামে

বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। প্রজাহিতকল্পে যে হোম-মূলক বেদবিহিত যজ্ঞ, তাহাই বিশ্বধৃতির অনুকূল,—তাহাই ধর্ম্ম। এই জন্য ধর্ম্ম ও সত্য অভিন্ন ভাবে বিশ্বরক্ষক।—"সত্যংহি ভূতহিতং যদেব।" অপরতঃ—"যো ধরতি স এব ধর্ম্মঃ।" যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। দ্রব্যে যে গুণাদির আধান স্বতউপলব্ধ, তাহাও ধর্ম্ম। যেমন—এরণ্ডের ধর্ম্ম বাতপ্রশমন, বিরেচন, স্নেহন; পিপ্পলির গুণ কটুস্বাদ, কফহরণ, বাতপ্রশমন, মধুরবিপাক-হেতুক পিত্ত সংশমন; ইত্যাদি দ্রব্যগুণের বা গ্রহাদির আবিষ্ট ভাবগুণেরও আধানে ধর্ম্ম প্রকটীকৃত হয়। ধর্ম্মই কর্ম্মের প্রবর্ত্তনে কারণ; আর তাই কারণের নিত্যত্ব সত্য। আবার প্রথমটী কর্ম্মবাচ্যের পদনিষ্পত্তিহেতুক কর্ম্ম-প্রকটনপর—ও দ্বিতীয়টী কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তৃনিষ্পত্তি-নিমিত্তক কর্ত্তৃবিকাশপর। অপিচ কর্ত্তৃকর্ম্মের অভেদকল্পনায়—উভয়ের একত্ব বা সমত্ব দর্শনজ্ঞানসিদ্ধ কিন্তু এই ধর্ম্মের মূলে যে কারণরূপী কাল নিষণ্ণ, সেই কালের ধর্ম্ম উৎপন্নে সংক্রমিত হওয়াও অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। সুতরাং জীবজীবনের সহিত কালবিভেদের যে রীতি নীতি, তাহার আলোচনা করিয়া, তৎতদ্বিষয়ে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাউক।

কল্পনার বশেই পুরুষের মনে প্রকৃতির স্মরণ,—এই স্মৃতিযোগেই সৃষ্টি-প্রকটন। যে কল্পনায় প্রকৃতির সংযোগসংঘটনে একবার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই পুনরনুবর্ত্তনে পুনঃসৃষ্টিসংবর্ত্তন,—এইরূপ অবিরাম সৃষ্টির ক্রমাবর্ত্তন! এই লইয়াই শূন্যের আকর্ষণে—প্রেমের টানে বিশ্বরচনা!

তাহার পর স্থূলদেহেও সেই নীতির অভেদ বিধান!—শুক্রশোণিতের বিপরিণাম,—অগ্নিষোমীয় দেহের উৎপত্তির মূলে—সেই স্মৃতিযোগের প্রীতির টানে—ভ্রূণোৎপত্তি—তৎপ্রতি রক্তের গতিতে—মাতৃহৃদয়ের সম্প্রসারণ-বিধানে রক্তের গতির ক্রমবৃদ্ধিতে ভ্রূণের উপচয়—তাহার সাহায্যে হৃদয়ের গতির ক্রমান্তর ঘটায়,—গর্ভিনীর নাড়ীর গতি দ্বিমুখী হওয়ায়, গর্ভিনীকে দ্বিহৃদিনী বলিয়া অভিহিত করা যায়। যে রক্তের পরিক্রমণে ভ্রূণের উপচয়, সেই রক্তই জীবের প্রাণধারণে—শিববিধানে সমর্থ। প্রকৃতির অনুরাগবশে গর্ভের অনুকূলতাহেতুক যে রক্তের অতিপরিক্রমণ, আবার সেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইলেই, জগৎপাতা জগদীশ্বরের সন্নীতিবশে মন্ত্রাভিষেকীকরণ! একাক্ষর মা মন্ত্রের অব্যক্ত স্বর—ক্রন্দনের সাহায্যে—হৃদয়ের দ্বারোদ্ঘাটন পরমপুরুষের স্বাধিষ্ঠানে জীবত্বগ্রহণে কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দ্বারোদ্ঘাটন—স্বতই হয়। আর সেই সময় হইতে শিবদাতার শিবময়

বিধিবশে পুরুষ-প্রকৃতির দৃঢ়ালিঙ্গনে—স্বজনস্বজনে—জীবের রক্ষণ-ধারণ-কল্পে রক্তের পরিক্রমণ—তাহার ফলে তন্মাত্র ভাবপদার্থের অধিষ্ঠানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

"দেগ্ধি প্রতিদিনংযত্তু দেহস্তত্তু নিগদ্যতে।"

যাহা প্রতি দিন বৃদ্ধি পায়, তাহার নাম দেহ! আর—

"শীর্য্যতে যদনুদিনং শরীরং তন্নিগদ্যতে।"

যাহা প্রতিদিন শীর্ণ হয়, তাহার নাম শরীর। এই দেহের বা শরীরের—এই ক্ষয়বৃদ্ধিমূলক ধর্ম্ম নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান। শরীরের ক্ষয় জন্যই ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আর প্রত্যেক অঙ্গচালনাদি দ্বারা—প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে—দেহের ক্ষয় নিত্যই হইতে থাকে। আর তাহার পূরণ জন্য, আহারের প্রয়োজন! আর আহারজাত রসের বিপরিণামে সপ্তধাত্বাত্মক দেহের বর্দ্ধন হয় বলিয়া দেহ নামের সার্থক্য।—আর সেই প্রকৃতি রাগরঞ্জিতরক্তে পুরুষের উপাধি দেহের রক্তিমা—আর সেই রক্ত উপাধি বসনেই তাহার প্রীতি।

যে রাগে জীব দেহের সৃষ্টি—সেই রাগের ক্রমপ্রসারণে তাহার ধৃতি আর অতিসংপ্রসারণে বিলয় ইহাতে যে রাগের বশে উৎপত্তি, তাহাতেই স্থিতি, তাহাতেই বিলয়।—এই সৃষ্টি স্থিতি বিলয়—কালের কলনকৌশলের ক্রমাবর্ত্তন। জীবনেও যে সৃষ্টি স্থিতি বিলয়ের বিধি,—বর্ষশতকালপুরুষের বক্ষেও অয়নভেদে আদান বিসর্গ—সৃতি ধৃতি—অপরতঃ ঋতুভেদে উৎপত্তি ধৃতি বিলয়ের খেলা চলিতেছে। আবার সম্বৎসর পুরুষের বক্ষে যেমন সৃষ্টি স্থিতিলয় সম্যক্ পরিদৃশ্যমান, দিনরূপী কাল পুরুষের হৃদয়ে তেমনই দিবারাত্রি রূপে ধারণ মরণ—অপরতঃ প্রাহ্ন মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন প্রদোষ, নিশীথ নিশান্তে,—ষড়্ভাবের লীলা বিদ্যমান। এতৎসংক্রান্ত ভাববিচারাদি প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শনের আশা রহিল।

—:•:—

গুরুস্তোত্রম্।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক স্বর্গীয় হরচরণ তর্কচূড়ামণি বিরচিত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ, দ্বারা অনুবাদিত।

অধারিমৃৎ পিণ্ডতয়া ময়া পুরা—
বপুঃ প্রসাদেন চ যস্য দীপিতং॥
গুরুং জগল্লোক বিমুক্তি মন্ত্রণা—
নিসর্গমন্ত্রং প্রবদন্তমাশ্রয়ে॥ ১

মৃত্তিকার পিণ্ডসম ছিল মোর কায়।
আলোকিত আজি তাহা যাঁহার কৃপায়॥
জগতে মুক্তির মন্ত্র যাঁহার বচন।
সেই গুরু পাদপদ্মে করিনু শরণ॥

ত্বমেক নাথোঽসি বিরূপকে ত্বয়ি
পরামরার্চ্চাপি বৃথা ভবেন্মম।
তথাচ রুষ্টে সতি ভর্ত্তারি স্ত্রিয়া
বিশেষ বেশেন ফলং ন লভ্যতে॥২

তুমি একমাত্র প্রভু বিরূপ হইলে।
কি ফল হইবে মোর দেবতা পূজিলে?
স্বামী রুষ্ট যার প্রতি সেই ললনার।
নিষ্ফল যেমন সজ্জা বিশেষ ভুষার॥

গুরোস্ত্বয়া শ্রীচরণার বিন্দয়োঃ
বিধীয়তাং মহ্য মসাধবে দয়া।
অসৎ সুতার্থং বদ দুগ্ধসঞ্চয়ো
ন কিং জনন্যা স্তনয়ো র্বিধীয়তে॥ ৩

যদিও সন্তান আমি হই দুরাচারী।
তব পাদকমলের দয়া অধিকারী॥
কুপুত্র হলেও মাতা তাহার কারণ।
দুগ্ধ সঞ্চয়েতে নহে বিরত কথন॥

ত্বদীয় দাসো বিদিতো ধরাতলে
সুরক্ষিতোহহং ভবতা ন চেদ্ গুরো।
ভবেত্তদৈকং নিজ দাস পোষণা
লসেন দোষেন যশোদ তেহ যশঃ ॥৪

তোমার সেবক আমি বিদিত ধরায়।
রক্ষা নাহি কর গুরু যদ্যপি আমায় ॥
নিজ দাস রক্ষণেতে অলস মানস।
যশোদ ! তোমার এক হইবে অযশ ॥

দলৈঃ সহস্রৈর্ধবলৈঃ সুনির্ম্মলৈঃ
মনোরমে সৎকমলে সুকোমলে।
কদোত্তমাঙ্গে নিলয়ে পবনং পদং তব
সমাশ্রয়িষ্যে শবনং পরাৎপরং ॥ ৫

সহস্র ধবল দলে শোভিয়া নির্ম্মল।
সুকোমল শিরোদেশ রম্য শত দল ॥
কবে তায় পরাৎপর পাবন চরণ।
স্থাপিয়া, করিব তার আশ্রয় গ্রহণ ॥

যদাগতো মূল সরোজতো ভবান্
সুধাময়ীং কুণ্ডলিনীং সরোজিনীং।
তদাভবন্তং বিহসন্তমাশ্রয়ে
সদাত্র খেলন্তমনন্ত লীলয়া ॥ ৬

মূলপদ্ম হ'তে তুমি হইয়া নির্গত।
কুণ্ডলিনীপদ্মে যবে হইবে উদিত ॥
হাসিবে খেলিবে সদা অনন্ত লীলায়।
তোমার আশ্রয় গুরো ! লইব তথায় ॥

বসন্ সহস্রার সরোজিনী মপি,
সুদূরতো মূল সরোজতো ভবান্।
মার্গর্যথায়ঃ স্বমুখং নয়ত্য সৌ
তথৈব হৃন্মে নয়তূর্দ্ধ মূর্দ্ধকম্ ॥ ৭

সহস্রার কমলেতে হয়ে অধিষ্ঠিত।
মূল সরোজিনী হতে দূরে প্রতিষ্ঠিত॥
লৌহে নিজমুখে টানে চুম্বুক যেমন।
তেমনি হৃদয় মন কর আকর্ষণ॥

ত্বমেব বিদ্যাকর তর্ক পূর্ব্বয়া
সুবিদ্যয়া জ্ঞানতমো নিহত্যমে।
প্রকাশয় জ্ঞানমহঃ শুচিস্বতা
প্রকাশ্যতে নৈশ তমঃ ক্ষয়ে যথা॥ ৮

তর্ক বিদ্যাসনে নাশি অজ্ঞতান্ধকার।
জ্ঞান প্রকাশিতকর বিদ্যার আধার॥
রজনীর অন্ধকার করিয়া বিনাশ।
দিবাকর করে যথা দিবস প্রকাশ॥

সম্মার্জ্জনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র।

(১)

শ্রীরামপুরের সংলগ্ন চাতরায় চন্দ্রকান্ত বিদ্যানিধির বসতি। দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ যযমানের বাটীতে শালগ্রাম শিলার নিত্য পূজা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর দেব-দ্বিজের প্রতি যেরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সকল সময়ে সেবায়তের গ্রাসাচ্ছাদনের সম্পূর্ণ সঙ্কুলান হয় না, অভাব থাকিয়া যায়। বিদ্যানিধির অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

চন্দ্রকান্তের সংসারে পরিজন সংখ্যা অল্পমাত্র, তিনি এক মাত্র পুত্র ও একটী কন্যার পিতা হইয়াছিলেন, খরচপত্রের অনটন প্রযুক্ত দুঃখে কষ্টে বিদ্যানিধির দিনপাত হইত। পাট ঝাঁট, রান্না বান্না, গৃহস্থের অন্তঃপুরে যে কোন কার্য্যের প্রয়োজন, তৎসমুদয় চন্দ্রকান্তপত্নী মাতঙ্গিনী নির্ব্বাহ করিতেন, বাজার হাট, যাওয়া-আসা বাহ্যিক কার্য্য বিদ্যানিধি মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত।

সঙ্গতিপন্ন লোকের দৈনিন্দন খরচপত্রের জন্য ভাবিতে হয় না, কিন্তু দৈনাবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে অহোরাত্র এই কারণ উদ্বিগ্নচিত্তে কালক্ষেপ করিতে হয়। সহধর্ম্মিনী ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদন একে কষ্টকর, তাহাতে পুত্র কন্যার লালন পালন জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়কেই ভাবিতে হইয়াছে। পুত্র গোবর্দ্ধন অপেক্ষা কন্যা শৈলবালা বয়োধিকা, পুত্রটীকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে, কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিতে হইবে। দেখিতে দেখিতে যত দিন যাইতে লাগিল, কর্ত্তা গৃহিনীর সেই দুইটী অতিরিক্ত চিন্তা আসিয়া জুটীল। শৈলবালা নবম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দশমে পদার্পণ করিয়াছে, এ সময়ে তাহার পাণিগ্রহণ প্রয়োজন, অন্য পক্ষে গোবর্দ্ধন ষষ্ঠ বর্ষ বয়স্ক, বালকের বিদ্যা শিক্ষার ইহাই উপযুক্ত সময়। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় এককালে সম্বলহীন, কর্ত্তব্য পালনে ইচ্ছুক হইলেও তাঁহাকে মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে, অথচ এই দুইটী দুর্ভাবনায় তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মণ সন্তানের পরের কাছে হাত পাতিতে লজ্জা নাই—কিন্তু যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে লোকের মুখাপেক্ষী হইয়া যে বিদ্যানিধি মহাশয় দায়োদ্ধার হইবেন, সে আশা দুরাশা মাত্র। তথাচ ব্রাহ্মণের যখন অন্য উপায় নাই, অগত্যা তিনি ভিক্ষাই সার অবলম্বন বুঝিলেন এবং পরিচিত অপরিচিত সকলের নিকটেই মনোভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

গোবর্দ্ধনের লেখাপড়ার জন্য তাঁহাকে বিশেষ বিচলিত হইতে হইল না, যেহেতু বালক এক্ষণে বর্ণ-পরিচয় পড়িতেছে, বিদ্যালয়ে মাসিক যৎসামান্য বৃত্তি যোগাইতে পারিলেই আপাততঃ ব্রাহ্মণ সে দায়ে উদ্ধার হইতে পারেন—অধিকন্তু তিনি স্বয়ং গোবর্দ্ধনকে পড়াইতে লাগিলেন। সাংসারিক কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে, বিদ্যানিধি গোবর্দ্ধনকে লইয়া চাণক্যশ্লোক হিতোপদেশ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া সদুপদিষ্ট করিতে লাগিলেন।

(২)

অধ্যবসায় সহ কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে, সময়ে তাহা সুসম্পন্ন হয়। শৈলবালার বিবাহ জন্য চন্দ্রকান্ত বিচলিত হইয়াছিলেন, সুযোগ্য পাত্রে কন্যাকে সম্প্রদান করিতে ব্রাহ্মণের একান্ত ইচ্ছা, কয়েক স্থান সন্ধান করিয়া ব্রাহ্মণ মনোমত পাত্র পাইলেন, তাহাকে জামাতৃপদে বরণ করিতে ব্রাহ্মণের ঐকান্তিক ইচ্ছা হইল, কিন্তু পাত্রের অভিভাবকগণের দাবীর ফর্দ্দ দেখিয়া মনক্ষুণ্ণ হইলেন। কাহাকেও সে কথা ব্যক্ত করিলেন না, যে প্রকারে হউক দায় উদ্ধার হইতে

হইবে। অবস্থা হীনতা প্রযুক্ত বরপক্ষীয়ের প্রার্থনা মত টাকার সংস্থান না থাকায়, বিদ্যানিধি মহাশয় বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন, লোকের নিকট যাচিঞা করিয়াও আবশ্যকীয় টাকার যোগাড় হইল না, এ কারণ চন্দ্রকান্ত সহধর্ম্মিনী সমক্ষে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। মাতঙ্গিনী স্বামীর অবস্থা পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত ছিলেন, দরিদ্রের কন্যা দীনঘরণী মাতঙ্গিনীর তাদৃশ অলঙ্কারাদি বিশেষ কিছুই ছিল না, যে তাহা বিক্রয় করিয়া অথবা বাঁধা দিয়া দায়োদ্ধার হইবেন; বিদ্যানিধির কাতর ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণী ব্যথিতা হইলেন, গলার হার ও হাতের বালা ভিন্ন বিদ্যানিধি পত্নীর অন্য কোন অলঙ্কার না থাকায় তিনি সহাস্য বদনে সেই দুইখানি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া স্বামীর হাতে দিলেন। স্ত্রী ধনে স্বামীর কোন অধিকার নাই,—তবে মাতঙ্গিনী স্বেচ্ছায় যখন অলঙ্কার দুইখানি চন্দ্রকান্তের হাতে দিয়াছেন এবং বিদ্যানিধি মহাশয় বিপন্ন, সে যুক্তির মীমাংসা করিতে তাঁহার অবসর হইল না। সুবর্ণ বলয় হার হস্তগত করিয়া বিদ্যানিধি কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু সে দুইখানি বিক্রয় করিয়াও শুভকার্য্য সম্পাদনে অভাব থাকিবে জানিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের জন্য ব্যস্ত হইলেন। মাতঙ্গিনী স্বামীর অবস্থা সম্যক বুঝিয়াছিলেন, এ সময়ে বিপন্ন পতিকে কথঞ্চিৎ সহায়তাকারণ রমণী নিজের গাত্র হইতে গহনা দুইখানি উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেও স্বামীর ম্লান বদন লক্ষ্য করিয়া তিনি সহানুভূতি দেখাইলেন এবং বিনয় নম্র বচনে বলিলেন,—স্বামী! জন্ম মৃত্যু বিবাহ অনিবার্য্য। শৈলবালার পাত্র জন্য বিচলিত হইয়াছেন, হিন্দু সমাজের বন্ধন জনিত পণের টাকার জন্য প্রাণ পণ করিতেছেন, লোকের মুখাপেক্ষী হইয়া যাহা কিছু সংগ্রহ হইতেছে, জানি বটে ইহাতে সকল বিষয় সঙ্কুলন হইবে না, আপদ বিপদের জন্য রমণীর ভূষণ, দাসীকে যাহা দিয়াছিলেন, এ দায়ে সেই দুইখানি বিক্রয় করিয়া খরচ করুন, শুভ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে অবশ্য আরো ব্যয় হইবে, কিন্তু যখন সে টাকার সংস্থান নাই, ঋণ-জালে আবদ্ধ হইয়াও এ দায়ে উদ্ধার হইতে হইবে। শৈলবালা আমার একমাত্র দুহিতা, যোগ্য পাত্রে কুমারীকে সম্প্রদান করিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব, ঘর বর দেখিয়া আপনার পছন্দ হইয়াছে, যে কোন উপায়ে হউক, এই বিবাহ দিতে হইবে। সংসারের আয় কম, গোবর্দ্ধন বালক মাত্র, আপনার মুখাপেক্ষী সে দুই বালকবালিকার ভবিতব্য আমাদের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে, শৈলবালার বিবাহের সময় উপস্থিত, দেশকাল যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। এ সমাজ বন্ধনের ব্যতিক্রম হইবে না।

যাহা হইবার অবশ্য হইবে, আপনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিবেন?

মাতঃ! আমার অবস্থা শোচনীয়, পুত্র কন্যার বিবাহে ব্যয় করিতে কোন পিতা মাতা অনিচ্ছা করে? আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট, নতুবা একটা মেয়ের বিবাহ জন্য এত বিচলিত হইতে হইয়াছে, তোমাকে দশখানা গহনা পরান আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি এমনি হতভাগ্যের হাতে পড়িয়াছিলে যে, এয়তির লক্ষণ—হাতের বালা পর্য্যন্তও খুলিয়া লইতে হইল! তুমি কি মনে করিতেছ—আমি তোমার অলঙ্কার দুইখানি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিয়াছি? আজকাল সমাজের যেরূপ শ্রীছাঁদ দাঁড়াইয়াছে, পরিণীতা ভার্য্যাও অনেক সময়ে স্বামীর বিপদ দেখিয়া স্ত্রীধন হস্তান্তরিত করিতে ইচ্ছা করেন না। তুমি পতিপরায়ণা সাধ্বী সতী আমার উপস্থিত বিপদের কথা স্মরণ করিয়া প্রসন্ন মনে গাত্রের অলঙ্কার দুইখানি খুলিয়া দিয়াছ। যদি কখন সময় ফিরে, সেই দিন এই দানের প্রতিশোধ দিব, নতুবা মুখের অঙ্গীকার মুখেই থাকিয়া যাইবে, পূরণ করিবার আমার আর সুযোগ ঘটিবে না। এই কথা কয়েকটী বলিয়া শশব্যস্তে চন্দ্রকান্ত মাতঙ্গিনীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

(৩)

সঙ্কল্প করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সময়ে তাহা সুসিদ্ধ হইয়া যায়। শৈলবালার পরিণয়োৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে, বিদ্যানিধি দুহিতা পিতৃ গৃহ ত্যাগ করিয়া শশুরালয়ে আশ্রয় লইয়াছেন, ভগবানের কৃপায় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য শৈলবালাকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। পতি সহবাসে মনের সুখে সদানন্দে তাহার দিন কাটিতেছে।

চন্দ্রকান্ত পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ সযত্ন, বিদ্যালয়ের মাসিক বৃত্তি দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত নহেন, প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিদ্যানিধি গোবর্দ্ধনকে পড়াইতে বসেন, গৃহস্থালীর বহির্ভাগের কাজ কর্ম্ম সমস্তই বিদ্যানিধি মহাশয়কে করিতে হয়, তদ্ব্যতীত নিত্য সেবাদিতে তাঁহার দৈনিক কতক সময় ব্যয় হইয়া থাকে, তথাচ অপত্য স্নেহের এমনই মহিমা, তিনি নিরূপিত সময় হইতে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা পুত্রের জন্য নিয়োজিত রাখেন, গোবর্দ্ধন বালসুলভ চপলতা বশতঃ লেখাপড়ায় প্রথমে আদৌ মনোযোগী হয় নাই, কিন্তু পিতার পুনঃপুনঃ তাড়নায় এক্ষণে তদ্বিষয়ে তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, সুশিক্ষকের সংশিক্ষায় স্বল্পদিনেই উন্নতি লাভ করিতেছে। পুত্র লেখাপড়া শিখিতেছে, কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বিদ্যানিধি মহাশয় ভাবনা চিন্তার হাত হইতে কতকটা পরিত্রাণ

পাইয়াছেন, যোগেযাগে সংসার চলিতেছে, কিন্তু শৈলবালার বিবাহ সময়ে তিনি যে ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে পূর্ণ দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তিনি তাহার এক কপর্দ্দকও পরিশোধ করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু সুদের হিসাবেও উত্তমর্ণের অনেকগুলি টাকা পাওনা হইয়াছে. তিনি কিরূপে ঋণ পরিশোধ হইবে, এই চিন্তায় আকুল হইয়াছেন। পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে একখানি সুদীর্ঘ পর্ণ কুটীর, তৎসংলগ্ন কয়েক বিঘা নাখরাজ জমী, সুদে আসলে পাওনাদারের যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, পরিশোধ করিতে হইলে পুত্র কলত্র সহ বিদ্যানিধি মহাশয়কে পথে দাঁড়াইতে হয়, তৈজস পত্র ব্রাহ্মণের গৃহে তাদৃশ নাই যে; সেগুলি বেচিয়া কিনিয়া ঋণের কতকটা শোধ করিতে পারেন, সময়ে সময়ে বিদায় আদায়ে যাহা সংগৃহীত হয়, সংসারের অভাবে সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিক্রয় হইয়া যায়।

দুর্ভাবনায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে, সংসারের প্রতি অনিচ্ছা জন্মে, ক্ষুধা তৃষ্ণা হ্রাস হইয়া যায়, রাত্রে নিদ্রা হয় না, পণ্ডিত চন্দ্রকান্তের এক্ষণে এই অবস্থা, ঋণজালে জড়িত হইয়া যতক্ষণ না তিনি তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন, কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না, অবকাশ মতে এই দেনার কারণ তিনি আকাশ পাতাল ভাবিতে বসেন, দরদর ধারে তাঁহার নয়ন ধারা বিগলিত হইতে থাকে, যে সংসারে আয়ের অপেক্ষা ব্যয় অধিক, ভগবানের কৃপা ভিন্ন সে সংসার কিরূপে ঋণ-মুক্ত হইতে পারে? সংসারের সাধ আহ্লাদ তাঁহার সকলই অপূর্ণ রহিয়াছে, গোবর্দ্ধন এখনও বালক, তাহার লেখাপড়ায় এতাবৎকাল বিশেষ যত্ন হয় নাই, বিদ্যানিধি মহাশয়ের পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় তাহার পাঠে সামান্য মাত্র অনুরাগ জন্মিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আস্থা স্থাপন করিয়া ভবিতব্যের সুমঙ্গল আশা করা যায় না। একমাত্র দুহিতার বিবাহ দিয়াছেন, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই একমাত্র কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া দশজনের একজন হইবে, তিনি তাহার বিবাহ দিয়া বধূমাতাকে গৃহে আনিয়া সংসারের লক্ষ্মীশ্রী বৃদ্ধি করিবেন, কত আশা বুকে ধরিয়া বিদ্যানিধির দিনপাত হইতেছে, কিন্তু যাঁহার ইঙ্গিতে এই ব্রহ্মাণ্ড চালিত হইতেছে, তাঁহার অনভিপ্রায়ে কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় না, গোবর্দ্ধনের উপনয়নে চন্দ্রকান্ত বিশেষ খরচপত্র করিতে পারেন নাই, কন্যার বিবাহ কারণ যে ঋণজালে জড়িত হইয়াছেন, সে দায়হইতে যতক্ষণ না উদ্ধার পাইতেছেন, তিনি কি প্রকারে অন্য হিসাবে ব্যয় করিতে পারেন? গোবর্দ্ধন এক্ষণে দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইয়াছে,

দুঃখে কষ্টে বিদ্যানিধি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, এমন সময়ে চন্দ্রকান্ত পীড়াগ্রস্থ হইলেন, জ্বরের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিদ্যানিধি মহাশয় বুঝিলেন, তাঁহার সংসারের লীলা সাঙ্গ হইয়া আসিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিল, চন্দ্রকান্ত স্ত্রী পুত্রকে নিঃসহায় অবস্থায় রাখিয়া চির দিনের মত বিদায় লইলেন।

স্বামীর মুখাপেক্ষী হইয়া মাতঙ্গিনীর দিনপাত হইতেছিল, সহসা চন্দ্রকান্তের মৃত্যুতে তিনি সংসার অরণ্য দেখিলেন, নাবালক গোবর্দ্ধনকে লইয়া মাতঙ্গিনী পতিকে জন্মের মত বিদায় দিয়া ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন, বহু কষ্টে বিদ্যানিধি মহাশয় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, সংসারে তিনিই একমাত্র উপায়ক্ষম পুরুষ ছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে বিধবা ও নাবালকের কি প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইবে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে পরের গলগ্রহ হইতে হইবে, স্বামী-শোক বিধুরা মাতঙ্গিনী পুত্রের ভরণ পোষণ জন্য বিশেষ বিচলিত হইলেন।

(ক্রমশঃ।)

ভক্তি-বিশ্বাস।

লেখক,----শ্রীযুক্ত বরদকান্ত ঘোষ বর্ম্মণঃ।

"ধর্ম্মস্য তত্বং গুহায়াং নিহিতং।
দেবাঃ ন জানান্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥"

চৈত্রমাস। বুধাষ্টমী যোগ। ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থে লোকে লোকারণ্য। সাধু-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব-উদাসী, ধনী-নির্ধন, বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত-মূর্খ, স্ত্রী-পুরুষ, ব্যবসায়ী, মহাজন,—সকলেই আজ দান-ধ্যান ও স্নান-পূজায় নিরত। পুণ্য-সলিল ব্রহ্মপুত্রবক্ষঃ বহু সংখ্যক জলযানে সমাচ্ছন্ন। পুণ্য-ক্ষেত্র লাঙ্গলবন্ধে,—সেই মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র নদের সুবিস্তীর্ণ পুলিন প্রদেশে, লোকের আর সঙ্কুলন হইতেছে না। জলে, স্থলে যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় কেবলই লোক। লোকের পর লোক, তাহার পর লোক; শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোক যাতায়াত করিয়া যেন এক অভূতপূর্ব্ব লোক-সমুদ্র প্রবাহিত করিতেছে। যাত্রী সমূহের কথোপকথন-জনিত কোলাহল ধ্বনিতে সমুদ্র-নিঃস্বনকেও পরাভব করিয়াছে। এ পুণ্য-ক্ষেত্রের মহাজনতার মহাদৃশ্য চিত্রাঙ্কন করিয়া বুঝাইবার জিনিস

নহে। যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সেই জানে—এ মহাজনতার মহাদৃশ্য কত মধুর, কত মিষ্ট, কত হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণ-মন-মোহকর।

এমন সময় কৈলাস ভূধরে—বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরের ঘরে ভগবতী ভবানীর মনে এক অভিনব অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি সেই ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বদর্শী মহাযোগী মহেশ্বরকে সসম্ভ্রম প্রিয় সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ ভগবন্! শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এ মহাযোগে মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র-জলে স্নান করিবে, মহাপাতকী হইলেও সে পাপ-মুক্ত এবং অন্তিমে দিব্যধাম বৈকুণ্ঠ বাসের উপযুক্ত হইবে। তবে কি নাথ, ঐ যে লক্ষ লক্ষ লোক ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে আসিয়াছে, উহারা সকলেই স্বর্গবাসী হইবে? তবে ত দেব স্বর্গরাজ্যে আর লোক ধরিবে না। শেষে কি অমরাবতীবাসীদিগকে সর্ব্ব-সুখ নিকেতন ত্রিদিব ধাম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও স্থানে যাইতে হইবে? বল—বল, দেব! এ অধিনীর প্রতি সানুকূল হইয়া এ রহস্যটি খুলিয়া বল।" এই বলিয়া পর্ব্বত-রাজ-তনয়া হৈমবতী, সরল বুদ্ধি বালিকার ন্যায় সোৎসুক নয়নে ভগবান কৈলাসেশ্বরের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। যেন তিনি নিজে কিছুই জানেন না! মায়াবিনী মা আমার এমনই ছলনাময়ী বটে!

সর্ব্ব-মঙ্গল-প্রদায়িনী জগজ্জননী জগদম্বার এবংবিধ আগ্রহাতিশয্য সন্দর্শন করিয়া ভগবান্ ব্যোমকেশ ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন,—"অয়ি পর্ব্বত-রাজ-তনয়ে! তুমি যে অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া এবম্ভূত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছ, তাহার সবিশেষ রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছি; সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পূত-সলিল ব্রহ্মপুত্র অতি পুণ্যদ মহাতীর্থ। এক সময় মুনি-বীর-ব্রতাচারী মহাবীর ও উগ্র-তপা পরশুরাম এ মহাতীর্থে স্নান করিয়া মাতৃহত্যাজনিত ভীষণ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বৎসরে একদিন—এক তিথির নিমিত্ত এটি তীর্থরাজ আখ্যায় অভিহিত। ঐ দিন ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তীর্থের এস্থলে একত্র সমাবেশ হয়। এ মহাতীর্থ সংসারের পাপ-দগ্ধ ক্লিষ্ট মানবের পক্ষে বস্তুতঃই এক সুমহান্ শান্তি-পাদপ-স্বরূপ। যে ব্যক্তি এবংবিধ শুভযোগে এ মহাতীর্থে স্নান করিবে, তাহার পাপ মুক্তি ও স্বর্গবাস প্রভৃতি কথাও ধ্রুব সত্য বটে। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ যে লক্ষ লক্ষ লোক পরম পবিত্র ব্রহ্মপুত্র জলে স্নান করিতে আসিয়াছে, উহারা সকলেই যে স্বর্গবাসী হইবে তাহা নহে। ব্রহ্মপুত্র-সলিল এই নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পরম পুণ্যদ এবং সর্ব্বপাপঘ্ন হইলেও কেন যে ঐ সকল ব্যক্তিই পাপ মুক্ত এবং স্বর্গবাসী হইবে না, তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।" এই বলিয়া

ভগবান্ চন্দ্রশেখর, পর্ব্বত-রাজ তনয়া ভগবতী ভবানীসহ কি যেন কি পরামর্শ করিয়া, স্বয়ং এক অশীতিপর পলিত-কেশ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শবরূপ ধারণ করিলেন, এবং ভগবতীও অনতি বিলম্বে এক বর্ষীয়সী রমণীরূপ ধারণ করতঃ সেই শব-রূপ ধারী সদাশিবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে—সেই জনাকীর্ণ স্থানে, পুণ্যক্ষেত্র লাঙ্গলবন্ধের স্নান ঘাটে—সমাসীনা হইলেন।

"কে ঐ বৃদ্ধা এক শব-দেহ সম্মুখে করিয়া ক্রন্দন করিতেছে?" শত শত লোক পুত সলিল ব্রহ্মপুত্র জলে স্নান করিতেছে, আর ঐ কথা বলিয়া অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সেই শব সন্নিহিত হইয়া ক্রন্দন পরায়ণা বৃদ্ধাকে শব সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া স্বীয় স্বীয় কৌতূহল নিবৃত্তি করিতেছে।

বৃদ্ধা-রূপিনী মহামায়া সমাগত লোক সমূহকে সম্বোধন করিয়া করুণ স্বরে বলিলেন,—"বিধি বিপাকে পড়িয়া আজ আমার স্বামী জনৈক উগ্রতপা তাপসের নিদারুণ অভিসম্পাতে প্রাণ হারাইয়াছেন। কিন্তু আমি অবলা জাতি, তায় আবার একাকিনী, কিরূপে ইঁহার অগ্নি সংস্কার ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিব? সৎকার অভাবে আমার পর-লোক-গত স্বামীর সদ্গতি হইতেছে না। তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, স্ত্রী কি পুরুষ যে হও, কৃপা করিয়া অভাগিনীকে এ বিষম দায় হইতে মুক্ত করিলে বড়ই উপকৃত হইব।"

বৃদ্ধার কাতরোক্তি শ্রবণে কতিপয় পরোপকারী যুবা পুরুষের হৃদয় দ্রব হইল। তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"আমরা এ শব-দেহের সৎকার করিব।"

যুবকগণের আগ্রহ দৃষ্টে বৃদ্ধা বলিলেন,—"বৎসগণ! এ শব দাহ করা সম্বন্ধে একটুকু অন্তরায় আছে। কারণ, সেই স্বামীহন্তা নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী ঠাকুরই বলিয়া দিয়াছেন যে, পাপ মুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ এ শবদেহ দাহ করা দূরের কথা, স্পর্শ করিতেও পারিবে না। কোনও পাপাত্মা মানব এ শব স্পর্শ করিলে তাহারও অচিরে এই দশায় পতিত হইতে হইবে। অতএব তোমরা কেহ নিষ্পাপ থাকিলে এ শব সৎকার করিয়া অভাগিনীকে বিপদ হইতে ত্রাণ কর। অন্যথা নিরর্থক যত্ন করিয়া বৃথা কেন আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতে আসিবে? এ শব-দেহ স্পর্শ করিও না।"

মনের অগোচর পাপ নাই। বুঝি বা থাকাও সম্ভব নহে। যদি থাকে, সে পাপ মানুষের পারলৌকিক নরকের পথ প্রদর্শক হইলেও ইহজীবনে মানব-হৃদয়কে দগ্ধ করিতে সমর্থ নয়। আমি আপনাকে যত বড় সাধু—সন্ন্যাসী

বলিয়াই কেন পরিচিত করিতে প্রয়াস না পাই, মৎকৃত গুপ্ত পাপ অবশ্য অন্ততঃ সেই সর্ব্বদর্শী জগৎপতি জগদীশ্বর এবং আমার নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। এইরূপ সমাগত যুবকবৃন্দের সকলেই স্বীয় স্বীয় পূর্ব্বানুষ্ঠিত সুগুপ্ত পাতক রাশি স্মরণ করতঃ বিমর্ষ মনে ম্লান মুখে পশ্চাৎপদ হইল। সেই বহু সংখ্যক লোক মধ্যে জন প্রাণীও আপনাকে নিষ্পাপ শরীর মনে করিয়া শব স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না! মুহূর্ত্ত মধ্যে সমাগত লোক মণ্ডলী স্বীয় স্বীয় গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল।

একদল চলিয়া গেল, আর একদল আসিল। সে দল চলিয়া গেল, পুনরায় নূতন দল উপস্থিত হইল। এইরূপে কত শত লোক আসিল এবং চলিয়া গেল। কিন্তু কেহই নিজকে নিষ্পাপ-শরীর মনে করিয়া সেই শব দেহ স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না। হা! দুর্ব্বল হৃদয় মানব! তুমিই না আপনাকে ধার্ম্মিক ও পুণ্যশীল বলিয়া লোক সমাজে কত গর্ব্ব করিয়া থাক। আজ কোথায় গেল তোমার তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা?—আর কোথায় গেল তোমার হরিনামের তিলক বা ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যা-আহ্নিক।

দিবা অবসানপ্রায়। আর অধিক বেলা নাই। মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র তট ক্রমশঃ জন-শূন্য হইতে চলিল। কিন্তু কৈ?—কেহই ত আপনাকে পাপহীন বিশ্বাস করিয়া সেই শব দেহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তবে কি এ পাপ-তাপ-ময় ও প্রলোভন পূর্ণ ধরাধামে একটিও নিষ্পাপ লোক নাই? সকলেই কি আজীবন শুধু পাপের তাণ্ডব অভিনয় করিয়া চরমে সেই অনন্ত দুঃখময় ভীষণ রৌরবে আশ্রয় গ্রহণ করিবে? কেহই কি তবে সেই অনির্ব্বাচনীয় সুখ-নিকেতন নিরাময় স্বর্গধামে গমন করিয়া চির বিমল স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগে অধিকারী হইবে না? তবে বৃথা আর কেন এত ব্রত নিয়ম—বৃথা আর কেন এত দান, ধ্যান, তপানুষ্ঠান ও তীর্থ ভ্রমণ! যাউক, সে সকল কর্ম্ম শালার অতল সলিল-তলে ডুবিয়া যাউক। মানব! তুমি সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলই ঐহিক সুখে প্রমত্ত থাকিতে যত্ন কর! নশ্বর জীবন একবার চলিয়া গেলে আর যে এ সুখ পাইবে না। পরকালে কেবলই যে নরক—ভীষণ নরক! অথবা পাপ নাই, পুণ্য নাই, স্বর্গ নাই, নরক নাই; আছে কেবল অবিশ্বাস আর অহঙ্কার। খাও দাও, মজা কর, জল স্রোতের মত জীবন স্রোত চলিয়া যাউক।

কিন্তু এ সব কথাও সত্য নহে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত বাক্য গুলি বস্তুতঃই বড় গভীর সত্যময়। পাপ আছে, পুণ্য আছে, স্বর্গ আছে,

নরকও আছে। বিশ্বাসীর নিকট ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুরই অভাব নাই ; সকলই সত্য। বিবেক বিহীন অবিশ্বাসী মানব, শত যুক্তি-তর্কেও ইহা বুঝিবে না, অথবা বুঝিলেও স্বীকার করিবে না। তবে বৃথা আর কেন, সে সকল বিচার তর্কের পথানুসরণ করিতে যাইয়া,—অনধিকারী আমি—অযথা সময় নষ্ট করিব ?

ইদানীন্তন সমাজের প্রায় অধিকাংশ মানবই হুজুগে মত্ত হইয়াই প্রায় প্রতি কর্ম্ম করিয়া থাকে। কেহই স্বীয় হৃদয়জাত সরল ভক্তি বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কর্ম্ম করে না। ঐ যে শত সহস্র নরনারী আজ পুণ্য-সলিল ব্রহ্মপুত্র জলে স্নান করিয়াও আপনাকে নিষ্পাপ ও পুণ্যাত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না ? ইহার কারণ কি ? ইহার মূলেও কি সেই ঘৃণিত অবিশ্বাস ও অভক্তিই [illegible] বিস্তার করিতেছে না ? উহারা প্রায় সকলেই দশজনের দেখাদেখি হুজুগে মত্ত হইয়া অথবা লোক নিন্দা ভয়ে তীর্থ স্নান করিতে আসিয়াছে। কেহই স্বীয় হৃদয়জাত সরল ভক্তি-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া—ব্রহ্মপুত্রকে প্রকৃতই সর্ব্বপাপঘ্ন ও পুণ্যদ তীর্থ মনে করিয়া, তীর্থস্নান করিতে আসে নাই। সুতরাং তাহারা নিজকে পাপশূন্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে কিরূপে ? বরং এরূপ বিশ্বাস হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ঐ দিনমণি অস্ত যায়। আর বেলা নাই। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। এমন সময় জীর্ণবাস পরিহিত কৃষ্ণকায় সরল বুদ্ধি জনৈক নিষাদ চৈত্রের সেই ভীষণ মার্ত্তণ্ড-কিরণে স্বীয় ব্যবসা করিয়া, আতপ-তাপ-ক্লিষ্ট দেহকে শীতল করিবার নিমিত্ত শ্রান্তভাবে ব্রহ্মপুত্র জলে স্নানার্থ উপস্থিত হইল। নিষাদ ঘাটে আসিয়াই সেই শব-সন্নিহিত রোদন-পরায়ণা অশ্রুমুখী বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল —"মা ! তুমি একাকিনী এই সন্ধ্যাবেলা এ কাহার শব ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছ ? তোমার কি আর কেহ সঙ্গী নাই মা ? মা, তোমার সকল কথা খুলিয়া বল ; আমার দ্বারা কোনও প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকিলে এ অধম প্রাণ-পণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

নিষাদের এরূপ সহানুভূতি সূচক মিষ্ট বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধা-রূপ-ধারিণী ভগবতী তাহাকে পূর্ব্ববৎ স্বীয় অবস্থা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা আমুল বর্ণনা করিলেন।

সরল বুদ্ধি নিষাদ নিবিষ্ট মনে বৃদ্ধার সকল কথা শ্রবণ করিল ; শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল মাত্র মৌনী ভাবে কি যেন চিন্তা করিল। অনন্তর বলিল,—"আমিই এ মৃত দেহ সংকার করিব।"

নিষাদ কি ভাবিল ? সে মুহূর্ত্তে ভাবিয়া নিল, সত্য বটে আমি মহাপাপী ;

সত্য বটে আমি তপ জপ, দান-ধ্যান, কিছুই জানি না। কিন্তু লোক মুখে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আজ এই ব্রহ্মপুত্র জলে স্নান করিবে, সে মহাপাতকী হইলেও তাহার শরীরে আর কোন পাপই থাকিতে পারিবে না। আমি যতই কেন মহাপাপী না হই, ব্রহ্মপুত্র জলে একবার স্নান করিলেই ত আমার সর্ব্বপাপ বিদূরীত হইবে। নিষাদ এইরূপ চিন্তা করিয়া সরল বিশ্বাসের সহিত ভক্তি পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ "জয় কলুষ নাশন ব্রহ্মপুত্র" বলিয়া সানন্দে ব্রহ্মপুত্র বক্ষেঃ নিমজ্জমান হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে স্নান করিয়া উঠিয়া নিজকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ-শরীর মনে করিয়া সহর্ষে সেই শব দেহ স্কন্ধে করিয়া শ্মশান ঘাটে চলিল।

একি বিচিত্র কাণ্ড! একি অলৌকিক ঘটনা! এমন সময় মুহূর্ত্ত মধ্যে, সৈকত প্রদেশ এক অত্যুজ্জ্বল প্রভায় প্রভান্বিত হইল। দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল মধ্যে শিব-পার্ব্বতী কৃত্রিম বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহাদের অলৌকিক রূপ-প্রভায় দশদিক আলোকিত হইল। স্বর্গ হইতে মুহুর্মুহুঃ শঙ্খনাদ ও পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। স্বর্গীয় কামিনীগণের তান লয় সঙ্গত সুমধুর সঙ্গীত-নিঃস্বনে সে প্রদেশ ভরিয়া গেল। আহা! কি মধুর!—কি মধুর!

তখন কোথায় গেল নিষাদের রুক্ষমূর্ত্তি!—আর কোথায় গেল তাহার ছিন্ন বসন! মরি! মরি! কিবা তাহার দেবোপম সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি!—কিবা তাহার অনির্ব্বাচনীয় অপূর্ব্ব রমণীয় রূপ-মাধুরী! দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে স্বর্গ হইতে এক দিব্য রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। নিষাদ সেই রথে হর-পার্ব্বতীর যুগল মূর্ত্তিসহ একত্র একই আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই নিত্য-সুখ-নিকেতন নিরাময় স্বর্গধামে গমন করিল।

সুদীর্ঘ জটা-জুট-ধারী ভস্ম-বিলেপিত অঙ্গ কত শত সাধু-সন্ন্যাসী, রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত তনু সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম জপে রত কত শত বৈষ্ণব চূড়ামণি, ত্রিসন্ধ্যা জপ-তপ-পরায়ণ দীর্ঘ-পুণ্ড্রধারী কত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং দান-ধ্যান-রত কত শত সংসারী সজ্জন যে কার্য্য করিতে সাহসী হইল না, এক সরল বুদ্ধি নিরক্ষর নিষাদ নিমিষের সরল ভক্তি-বিশ্বাসের গুণে অনায়াসে সে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইল!—নিষাদ নিমিষের ভক্তি-বিশ্বাসের গুণে পার্থিব সকল যন্ত্রণার হাত হইতে ত্রাণ পাইয়া অনন্ত স্বর্গীয় শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দেবাদিদেব মহাদেব মহেশ্বরীকে এ দৃশ্য দেখাইয়া বলিলেন,—"এক্ষণে বুঝিলে, একমাত্র তীর্থ স্নানাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই লোক মুক্তি-মার্গে অগ্রসর হইতে পারে না। ভক্তিহীন অবিশ্বাসী মানব শত তীর্থস্নান বা অসাধ্য সাধনায়ও সর্ব্ব-সুখ-নিকেতন স্বর্গধামে গমন করিতে সমর্থ নহে।" "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।" একমাত্র ভক্তি-বিশ্বাসই মুক্তির প্রকৃত পথ-প্রদর্শক।

———:০:———

আহার।*

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী।

মনুষ্যের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহার নির্ণয় প্রণালী লইয়া প্রাচ্য ঋষি বাক্যের সহিত আধুনিক বিজ্ঞান বিদ্ দিগের মতের তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে বুঝা যাইবে যে, একের অনুসন্ধান প্রণালী অপর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আধুনিক স্বাস্থ্য বিদ্যাবিদ্‌গণ Chemistry. রাসায়নী বিদ্যার সাহায্যে পরীক্ষা-দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের শারীরিক বা মানসিক কোনপ্রকার পরিশ্রম বা চেষ্টা করিলে আমাদের শরীরের উপাদানভূত ছানা, মাখন, চিনি, লবণাদি জাতীয় অনেক প্রকার পদার্থ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং শরীরের যে জাতীয় উপাদান পরিশ্রমে বা রোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আহারের সহিত সে জাতীয় উপাদানে আহার করিলে ঔষধরূপে সেবন করিলে আমাদের শরীর ক্ষয়াংশ পূরণ হইয়া সুস্থ হয়। সহজ বিচারে এই যুক্তি অতি শ্রুতি মধুর বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু কার্য্যে ইহার দ্বারা কতদূর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বিচার সাপেক্ষ। মেডিকেলকলেজের ছাত্রদিগকে যে সমস্তস্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-গ্রন্থ অধ্যয়ন করান হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, মনুষ্যদিগের কার্য্যানুসারে একটি একটি আহারের তালিকা অতি সাবধানতার সহিত নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা পাশ্চাত্য স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-বিদ্যা-বিদ্‌গণ রাসায়ণী শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া জগৎকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ডিম্ব, মৎস্য, মাংস, ঘৃত, চর্ব্বি, ডাউল, ভাত, রুটি, তরকারী, দুগ্ধ, ফল চিনি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার খাদ্য এক কথায় Mixtdiet. বিমিশ্র খাদ্য মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, কেন না. পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, যে কোন কারণে শারীরিক উপাদানের ক্ষয় হউক না কেন, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য বিমিশ্রভাবে আহার করিলে তাহার নিশ্চয় পূরণ হইবে।

এদিকে আর্য্যঋষিদিগের রোগের কারণ অনুসন্ধান এবং আহার নির্ব্বাচন প্রণালী বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তি সকল বিশেষ ভ্রমসঙ্কুলন বলিয়া মনে হইবে। আর্য্যঋষিগণ ষট্‌কৌষিক (Cells) প্রাকৃতিক দেহ বলিয়া আমাদের শরীরকে বর্ণনা করিয়াছেন, আর প্রকৃতিকে সত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং শরীরস্থ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় আমাদের দেহ সুস্থ থাকে, আর দেহে এই গুণত্রয়ের যতই বৈষম্য হইতে থাকে ততই আমাদের শরীর অসুস্থ হয়। এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণ মনুষ্য-

* চুঁচুড়া "সাহিত্য সম্মিলনী" সভায় অধিবেশনে পঠিত।

জাতিকে তাহাদের আচার, ব্যবহার, অভ্যাস এক কথায় তাহাদের প্রবৃত্তি অনুসারে সাত্বিক রাজসিক এবং তামসিক এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। আবার আমাদের আহার নির্ব্বাচন করিতে গিয়া আর্য্যঋষিগণ সাধারণ ভাবে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, "জীব জীবস্থ জীবনম্" অর্থাৎ কোন জীবের উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে গেলে খনিজ বা ভৌতিক পদার্থ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিজ পদার্থ সকলের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আবার এই প্রাণিজ পদার্থের মধ্য হইতে ব্যক্তি বিশেষের সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ধাতু বা প্রকৃতির অনুরূপ সাত্বিক, রাজসিক তামসিক আহার নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আর্য্যঋষিগণ উদ্ভিদকেও প্রাণী মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এক্ষণ যাহা কিছু বর্ণনা করা হইল,—তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, মনুষ্যের ধাতু বা প্রকৃতি অনুকূল খাদ্য জীবন অর্থাৎ উদ্ভিদ অথবা জন্তুর পদার্থ মধ্য হইতে আহার নির্ব্বাচন করিতে আর্য্য ঋষিগণ উপদেশ দিয়াছেন, আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদগণ শরীরের ক্ষয়িত অংশ রাসায়ণী বিদ্যার সাহায্যে নির্ণয় করিয়া তাহাকে উদ্ভিদ জান্তব বা খনিজ ইত্যাদি যে কোন উপকরণ দ্বারা হউক পূরণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে, স্থির করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এই দুই মতের মধ্যে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা তাহা বিচার করিয়া বুঝা অতি কঠিন কার্য্য, কারণ আর্য্যঋষিগণ কি প্রকার পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের মত সমর্থন করিয়াছেন, তাহার ধারাবাহিক পরীক্ষার প্রণালী জ্ঞাত হইবার কোন উপায় নাই, এদিকে পাশ্চাত্য খাদ্য বিজ্ঞান অতি জটিল এজন্য উপযুক্ত শিক্ষক অভাবে এ দেশস্থ মেডিকেল কলেজে তাহার তত্ত্ব, শিক্ষা দেওয়া হয় না, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিশেষজ্ঞ দিগের দ্বারা নানা প্রকারে ইহার বহুল-ভাবে সমালোচনা হইতেছে। তাহার ফল স্বরূপ যে সকল সত্যের আবিষ্কার হইতেছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া আর্য্যঋষিদিগের প্রদর্শিত পন্থাবলম্বী হইয়া বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, অতি আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারই আর্য্যপথের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমান করিতেছে। ইহার মধ্যে সেন্ট পিটর্সবর্গের জগদ্বিখ্যাত ডাঃ পাউলো সাহেব তাঁহার পাউলোর Pouch পাউচ নামক এক প্রকার "থলি" আবিষ্কার করিয়া আহার পরিপাক ক্রিয়ার অনেক গূঢ়রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সর্ব্বদেশবাসী বিশেষজ্ঞগণ বারম্বার নানা স্থানে তাহার পরীক্ষা করিয়া তাঁহার আবিষ্কার সমর্থন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কএকটী

বিষয় উল্লেখ করা গেল যথাঃ—

১। যে খাদ্য দেখিতে, আঘ্রাণ করিতে এবং আস্বাদন করিতে যত অধিক লোভনীয় হয়, তাহা পরিপাক করিতে পাচক যন্ত্র সকল হইতে তত অধিক পরিমানে এবং তত অধিক বীর্য্যবান পাচক রস বহির্গত হয় এবং আহার্য্যও শীঘ্র পরিপাক হয়।

২। যে খাদ্য দেখিতে, আঘ্রাণ করিতে এবং আস্বাদন করিতে অরুচিকর হয়, অথবা খাদ্যের ঘ্রাণ আস্বাদনাদি না লইয়া গিলিয়া খাইলে পাচক যন্ত্র সকল হইতে অল্প পরিমাণ হীন বীর্য্য পাচক রস বহির্গত হয়, সুতরাং পরিপাক ক্রিয়া সমাধা হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে।

৩। অভ্যস্থ খাদ্য যত শীঘ্র পরিপাক হয়, অনভ্যস্থ বা নূতন খাদ্য তত শীঘ্র পরিপাক হয় না।

৪। পাচক যন্ত্র সকল হইতে পাচক রস নিঃসৃত হইয়া পাক ক্রিয়া সমাধা হয় বটে, কিন্তু এই পাচক যন্ত্র সকলের পাচক রস নিঃসরণ ক্রিয়া মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে, কেননা পাউলো সাহেব বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, আগ্রহের সহিত আহার করিতে করিতে এবং প্রচুর পরিমাণ বীর্য্যবান পাচক রস নির্গত হইতে হইতে যদি মস্তিষ্কের সহিত পাচক যন্ত্রের সংলগ্ন স্নায়ু (vagus) ব্যবচ্ছেদ করা যায়, তবে তৎক্ষণাৎ পাচকরস নির্গম বন্ধ হয়।

পাউলো সাহেবের এই চারিটি পরীক্ষার দ্বারা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, আহার পরিপাকের মূল কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্ক সংলগ্ন স্নায়ুগণ, এই বিষয়টি আর্য্য-ঋষিদিগের ভাবে বুঝিতে গেলে বুঝিতে হইবে, যে তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু উপস্থ এবং ইহাদের অধিপতি মন এই একাদশ স্নায়বীয়কে ইন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং সমস্ত voluntary nerves. ইচ্ছানুগ স্নায়ু সকল এবং objective mind. এই ইন্দ্রিয়গণের অন্তর্গত, আর তাহারা আমাদের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সমস্ত ক্রিয়াকে অন্তঃকরণের অন্তর্গত বলিয়া বুঝেন সুতরাং Involuntry nerves. ইচ্ছার অনধীন স্নায়ু সকল এবং Subj ective mind. ইহার অন্তর্গত। আবার শরীরের হৃদয় এবং মস্তিষ্ক এই দুইটি স্থানের মধ্যবর্ত্তীস্থানে অন্তকঃরণের অধিষ্ঠান বলিয়া তাহার নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা আরও বলেন যে, আবার এই জন্ম ও পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার সকলের সমাবেশ হইয়া আমাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল গঠিত হয়, আর এই গঠন অনুসারে আমাদের প্রবৃত্তি, রুচি, স্বভাব এবং চরিত্র গঠিত হয়। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, কেবল আহার পরিপাক

কেন আমাদের শরীরের সমস্ত কার্য্য অন্তঃকরণের অন্তর্গত মন, বুদ্ধি এবং অহংকার তত্ত্ব হইতে সম্পন্ন হয়, ইহার দ্বারা বিচারক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, স্বভাবের অনুকূল আহার করাই আমাদের প্রশস্ত আহার, এবং আমাদের স্বভাবের প্রতিকূল আহারই নিরুদ্ধ সুতরাং রোগের এবং অকাল মৃত্যুর কারণ। এজন্য সিংহ মহিষ বানর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত জীবের আহার, তাহাদের শরীরের উপাদানের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া কখনই স্থির হইতে পারে না, যথা গরু বা ছাগলের শরীরের Nitrogen অভাব হইলে তাহাকে ডিম্ব কিম্বা মাংস আহার দেওয়া যায় না, ঠিক সেই প্রকার মনুষ্যের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া রসায়ণ শাস্ত্র অনুসারে খাদ্য নির্ব্বাচন করা যুক্তি এবং বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, এই জন্য যুক্তি ও বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত আর্য্যঋষিগণ বহু-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অবগত হইয়া জীবগণের স্বভাবকে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনটিবিশুদ্ধ মূল প্রকৃতি বা স্বভাবে বিভক্ত করিয়াছেন, পরে এই তিন প্রকার বিশুদ্ধ স্বভাবের বিমিশ্রণে বহু সংখ্যক স্বভাব গঠিত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এদিকে আর্য্যঋষিগণ আমাদের খাদ্য সকলকে প্রথমে স্বাত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ভেদে মৌলিক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, ইহাদের সংমিশ্রণে গুণের তারতম্য অনুসারে এই খাদ্য বহু প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, ইহার সার কথা এই যে, আর্য্যঋষিগণ জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহার যে প্রকৃতি তাহার পক্ষে সেই প্রকৃতির আহার উপযুক্ত, কিন্তু বিরুদ্ধ প্রকৃতির আহার করা অকাল মৃত্যুর কারণ।

এক্ষণে আর্য্য ঋষিদিগের এই যুক্তি মনে রাখিয়া আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে মনুষ্যের শারীরিক গঠন এবং স্বভাব পর্য্যালোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, মাংসভোজী জীবের ন্যায় মনুষ্যের Canine দন্ত, শস্যভোজী জীবের ন্যায় Grinder দন্ত এবং ফলভোজী জীবের ন্যায় Incisor দন্ত আছে, ইহার দ্বারা আমার Gvolution জন্মান্তর পরিণতি বিচারে বুঝিতে পারি যে, সর্ব্বপ্রকার নিম্নশ্রেণীর জীবের স্বভাব সমাবেশ হইয়া মনুষ্যের স্বভাব গঠন এবং তদুপযোগী শরীর নির্ম্মান হইয়াছে, এই যুক্তির পোষকতায় দেখা যায় যে, মধ্যভারতবর্ষের গণ্ড জাতি সর্ব্বপ্রকার জীবের পচামৃত শরীর আহার করিয়া ১৪০।১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং তাহাদের দাঁত নড়ে না। গুরখা জাপানী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধাগণ পর্য্যন্ত শস্য আহার করিয়া দীর্ঘজীবী হয়, ফল মূল ভোজী আর্য্যঋষিদিগের কথার উল্লেখ দূরে থাক, আজ কালও অনেকে বেলপাতার রস বা ফল আহার

করিয়া দীর্ঘজীবন ধারণ করেন। আমি দেখিয়াছি একটি অতি বৃদ্ধা নিরাশ্রয়া বৈষ্ণবী জীবনের শেষ অবস্থায় চাউল অর্থাৎ রন্ধন না করিয়া আহার করিয়া ৯৫ই বৎসর জীবিত ছিল, তাহার এত বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দন্ত পড়ে নাই। ভদ্রলোকের বাড়ীর এবং অন্যান্য স্থানের অনেক দ্বারবান আছে, তাহারা ১০। ২০। ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত রুটি এবং অড়হরের ডাইল আহার করিয়া সুস্থ এবং সবল আছে। ইহার বিপরীত যাহারা আর্য্যঋষি-বাক্য অবহেলা করিয়া আধুনিক কঙ্কাল বিদ্যাবিদ্‌দিগের মত অনুসারে আমাদের মাংস ভোজী শস্য ভোজী এবং ফলভোজী এই তিন শ্রেণীর পশু সুলভ দন্ত আছে বলিয়া মৎস্য, মাংস, ডাল, রুটি, ভাত, তরকারী, দুগ্ধ, ঘৃত, মিঠাই, সন্দেশ এবং ফলাদি অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার Mixed diet খাদ্য মিশ্রভাবে আহার, কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছেন বা এই প্রকার মিশ্রভাবে আহার করিতেছেন, তাঁহারাই রোগ প্রবণ হইয়া অকালে কাল কবলে পতিত হইতেছেন। ইহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য অতি বিস্তৃত, তবে সংক্ষেপে যুক্তিদ্বারা এই বুঝা যায় যে, এক মনুষ্য বহুকাল অভ্যাস দ্বারা সাত্ত্বিকাদি কোন একটি মাত্র স্বভাবযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা নানা প্রকার বিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার বিরুদ্ধ আহার করিয়া কেহ কখন সুস্থ থাকিতে পারে না, মনে করুন কাঁচা মাংস ভোজী পশু ১৪০।১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহাকে হঠাৎ ফল মূল বা রুটি তরকারী বা দুগ্ধ, কলা আহার করিতে দিলে অতি অল্প কালের মধ্যে রুগ্ন হইয়া অকালে মৃত্যু হইবে। ঠিক সেই প্রকার যাহারা বেলপাতার রস বা দুগ্ধ বা ফল আহার করে, তাহাদিগকে হঠাৎ মাংস আহার করিতে দিলে মৃত্যুর কারণ হয়, এই প্রকার যাহার যে স্বভাব বা প্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধ আহার করিলে মৃত্যুর কারণ হয়। তবে ইহার মধ্যে একটী সূক্ষ্ম বিচার আছে তাহা এই যে, মাংস ভোজী পশু অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া অভ্যাস করিলে শস্য ভোজী বা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকৃতির ফল মূল ভোজী হইয়া দীর্ঘ জীবি হইতে পারে, কিন্তু মিশ্র ভোজী হইয়া সর্ব্ব প্রকার প্রকৃতির খাদ্য আহার করিয়া, কখন সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবি হইতে পারে না।

এক্ষণে বিচার্য্য বিমিশ্র ভাবে, যাহারা সকল প্রকার খাদ্য বহুকাল হইতে আহার করিতেছেন, তাহাদের পক্ষে কি নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য? এই বিচারে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বে পাচক রসের Composition. প্রকৃতি প্রথম বুঝা আবশ্যক। শিশি বোতলে যে প্রকার জল থাকে, আমাদের উদরে সেই প্রকার পাক রস থাকে না পরন্তু যে জাতীয় আহার উদরস্থ হয়, তাহাকে পরিপাক করিয়া

উপযোগী পাক রস আমাদের পাচক যন্ত্র সকল হইতে ঘর্ম্মের ন্যায় বিন্দু বিন্দু ভাবে নিঃসারিত হয়। ডাক্তার পাউলো সাহেব অভ্রান্তভাবে জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে, মাংস আহার করিলে আমাদের পাচক রসে অত্যাধিক ভাবে অম্লবীর্য্য (Hydrochloric Acid.) নিঃসরণ হয়, ভাত কিম্বা গমের রুটী অর্থাৎ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য আহার করিলে পাচক রসে Pepsin, নামক বার্য্যের অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পাচকরসের অম্লবীর্য্যের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়, এদিকে ভাত রুটি আদি শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য পাকস্থলীস্থ পাচক রসে আদৌ পরিপাক হয় না, পরন্তু মুখের ভিতর ক্ষার ধর্ম্মযুক্ত লালাবীর্য্যে এই প্রকার খাদ্যের কতক অংশ Dentrine এবং Dentose আদি রূপে বিপাক পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া পাকস্থলীর মধ্যে যতক্ষণ পাচক রসের অম্লবীর্য্য অধিক পরিমাণ নির্গত হইয়া তাহার Ackatine ক্ষারত্ব ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে নষ্ট করিয়া না ফেলে ততক্ষণ লালাবীর্য্যের বিপাক পরিণতি পাকস্থলীর ভিতর চলিতে থাকে। পরে যখন পাকস্থলীস্থ পাচক রস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত আহারীয় অম্লাক্ত করিয়া ফেলে। তখন আর শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পাকস্থলীতে পরিপাক হয় না, অথচ অম্লবীর্য্যে পরিপাক উপযোগী খাদ্য পরিপাক হইতে যত দীর্ঘ সময় লাগে ততক্ষণ পাকস্থলীতে শ্বেতসার খাদ্য অবস্থান করিয়া পরিশেষে সমস্ত আহারীয় নিম্ন উদরে Small Intistine ক্ষুদ্র অন্ত্রে আইসে তথায় ক্ষার ধর্ম্ম যুক্ত Pancreatic Inice ক্লোমের রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়। এদিকে মাংসের জন্য অধিক পরিমাণ অম্লরস পাকস্থলী হইতে নিঃসরণ হয়, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য উদরস্থ হইলে তদপেক্ষা অনেক কম অম্লরস নিঃসৃত হয়, কিন্তু দুগ্ধ উদরস্থ হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অতি অল্প অম্লরস পাকস্থলীতে নিঃসরণ হয় এমন কি দুগ্ধ উদরস্থ হইলে পাকস্থলী হইতে অম্লরস নিঃসরণ হইবার পূর্ব্বেই Rennet নামক পাচক বীর্য্যের সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত হইয়া Lactic Fermentation দধিবিকার পরিণতি হয়, তখন এই দধিবিকার পরিণত দুগ্ধ পাকস্থলীর অল্প অম্লরসে পরিপাক হয়, আর মাংস কিম্বা মৎস্য ভোজন করিলে পাকস্থলীস্থ অম্লরস যখন অধিক পরিমাণে নিঃসৃত থাকে, তখন দুগ্ধ সেবন করিলে দুগ্ধ আর পরিপাক হয় না অর্থাৎ Rennet fermentation এর কার্য্য আর হয় না, কিন্তু দুগ্ধের Caseinogen পুষ্টিকারী অংশ অম্ল সংযোগে Pricipitati অধঃস্থ হইয়া এক প্রকার দুষ্পাচ্য পদার্থে পরিণত হয়, এই প্রকার যাহারা পাশ্চাত্য খাদ্য বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া নানা প্রকারে রন্ধন করা নানা

প্রকার মাংস, ডাল, তরকারী, ঘী, দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, সন্দেশ, লুচি, মিঠাই এবং নানা প্রকার ফল মূল নিত্য নৈমিত্তিক রূপে বা নিমন্ত্রণের সময় আহার করেন তাহাদের উপায় কি? একবার চিন্তা করিয়া বুঝুন, নিমতলা, কেওড়াতলা প্রভৃতি শ্মশান ঘাটের মৃত্যুর তালিকা দৃষ্টি করিলে বুঝিবেন যে, দীন ভিখারী এবং গরীব দুঃখি লোক ব্যতীত দীর্ঘজীবী লোক সহরে আদৌ নাই। এক্ষণে এই জাতিগত অকাল মৃত্যুর কারণ নিবারণ করিতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আর্য্যঋষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে,—

১। মৎস্য কিম্বা মাংসের সহিত ভাত, রুটি, ডাল অতি উত্তম সংযোগ।

২। ভাত, রুটি, ডালের সহিত দুগ্ধ কিম্বা ফল কিম্বা তরকারী অতি উত্তম সংযোগ।

৩। দুগ্ধের সহিত তরকারী কিম্বা মৎস্য, মাংস, অতি অম্লজাতীয় ফল বিরুদ্ধ আহার।

৪। কোন কোন তরকারীর সহিত মাংস, ফল দুগ্ধ বিরুদ্ধ আহার।

ইহার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য বলিতে গেলে বহু বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, এজন্য সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে মাংসের সহিত ভাত রুটি ইত্যাদি শ্বেতসারযুক্ত পদার্থ এক সঙ্গে আহার করিলে পূর্ব্বের বিচারে পাকস্থলীর অম্লনিঃসরণ যদিও কম হয়, কিন্তু পাচকরসে পেপ্‌সিন্ অংশ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এজন্য মাংসাদি Protid ছানা জাতীয় অংশ যে খাদ্যে আছে, তাহা শীঘ্র পরিপাক করিয়া দেয়, সুতরাং মাংসের সহিত ভাত, রুটি প্রশস্ত কেন না Pepsin বীর্য্যে Profeid জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়। আর ভাত রুটি ইত্যাদি যে খাদ্যে শ্বেতসার জাতীয় অংশ অধিক আছে, তাহার সহিত দুগ্ধ আহার করিলে তাহার প্রভাবে পাকস্থলী হইতে আস্তে আস্তে অল্প পরিমাণে অম্লরস এবং অধিক পরিমাণে পেপ্‌সিন নামক বীর্য্য নিপতিত হয়, তাহার ফলে দুগ্ধ পরিপাকের Lactic Fermentation অর্থাৎ দধি বিকার পরিণতির কোনও প্রকার বাধা হয় না বরং সহায়তা করে, কারণ শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য মুখের লালা বীর্য্যে তাহার কতক অংশ Dentrin কতকাংশ Dentrin বা Dentose ইত্যাদি পদার্থে পরিণত হইয়া উদরস্থ হয়, তাহার প্রভাবে পাকস্থলীতে অম্লদোষ থাকিলেও দুগ্ধের পুষ্টিকারী অংশ Pricepitati অধঃস্থ হইয়া শক্ত শক্ত ছানার ন্যায় হইতে পারে না। অথচ তাহার গুণে পাচক রসে অধিক পরিমাণে Pepsin নিঃসৃত হইয়া দুগ্ধের ছানার অংশ শীঘ্র পরিপাক হয়, সুতরাং ভাত, রুটি ডাল অতি উত্তম আহার। এই প্রকার বিচার করিতে গেলে অনেক বিষয় মীমাংসা করা যায়, বাহুল্যভাবে তাহার অবতারণা করা হইল না।

———*———

স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু।

অমৃতলাল বসু।—কলিকাতা হাটখোলা ৩৫ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম ৺গুরুচরণ বসু। যৌবনে অমৃতলাল স্বর্গীয় মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মময় কর্ম্মবহুল জীবনের ছায়ায় অমৃতলালের অভ্যুদয়। অমৃতলালের সাধুজীবন বস্তুতই ব্রাহ্মসমাজের নরনারীগণের আদর্শস্থানীয়, ধর্ম্মবিশ্বাসে, উৎসাহের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ,—রোগে, শোকে দারিদ্রতার নিস্পেষণে সে উৎসাহ কখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, বার্দ্ধক্যে তাহা তিরোহিত হয় নাই, পরমাত্মীয়গণের বিয়োগেও তাহা দমিত হয় নাই, তিনি কর্ম্মময় জীবনে সর্ব্বদাই কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। মৃত্যুকালেও তাঁহার কর্ম্মের বিরাম ছিল না; অবশদেহে জাগিয়া জাগিয়া নামসাধন করিতে করিতে গত ১৪ই বৈশাখ (বাঁকীপুরে) অনন্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন।

অমৃতলালের কীর্ত্তি ও স্মৃতি কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ইষ্টকে ইষ্টকে, চুণের পরলে পরলে লিখিত, এবং ভারতবর্ষের বিখ্যাত বিখ্যাত সমস্ত স্থানের ব্রাহ্মসমাজের নরনারীর চিত্তে ও চরিত্রে অনুকীর্ত্তিত। অমৃতলাল কপটতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, কাপুরুষতা তাঁহার অন্তরে স্থান পাইত না, এমন স্বাধীন পুরুষ ছিলেন যে, স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া অমৃতলাল ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদী খালি রাখিবার বিরুদ্ধে মত প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

অমৃতলাল আজীবন রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়াছেন, কিন্তু যখনই তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছি, কখনও বুঝিতে পারি নাই যে, তাঁহার জীবনে কোন ক্লেশ বা দুঃখ আছে।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার ৺গোপালচন্দ্র বসু এল, এম, এস, জামাতা ৺শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল, ব্যারিষ্টার ৺নগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইলে, সে সব নিদারুণ শোকে তিনি অধৈর্য্য হইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার ব্রত-ভ্রষ্ট হন নাই।

শেষজীবনে অমৃতলাল অন্তরঙ্গ ব্রাহ্ম বন্ধুগণের নির্ম্মম ব্যবহারে কিছু দুঃখ পাইয়াছিলেন বটে, তথাপি প্রচার ব্রত জীবনে পরিত্যাগ করেন নাই। স্বর্গীয় উপাধ্যায় মহাশয়ের শব সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া অমৃতলাল প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন,—"তাঁহার ললাটে চন্দনে লিখিত আছে, "যোগ"; আমার ইচ্ছা হয়, তাহার ধারে লিখিয়া দেই "যোগ ও ভক্তি," মা তুমি যোগ ও ভক্তির অবতারকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও।"

অমৃতলাল ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুপরিচিত ছিলেন; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, স্বীয় জীবনে ধর্ম্মবিশ্বাসে তাহার সফলতা লাভ করিয়া ৭৪ বৎসরবয়সে একমাত্র পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু ও দুইটী বিধবা কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী এবং সহধর্ম্মিণী রাখিয়া মহানিয়তির আহ্বানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

শ্মশান।

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত।

(১)

শ্মশান পবিত্র স্থান,
সবাই তথা—সমান,
শ্মশানেতে ভেদা-ভেদ কিছু নাহি রয়।
ঘুচে যায় ভিন্ন-ভাব,
দ্বেষা-দ্বেষ তিরোভাব,
স্বদেশী বিদেশী সবে একে লীন হয়॥

(২)

সধন নির্ধন জন,
মূরখ পণ্ডিতগণ,
ভেদা-ভেদ কিছুমাত্র থাকে না এখানে।
সুরূপ কুরূপ ক্ষুদ্র,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র,
সবে হয় সম ভাব আসিলে শ্মশানে॥

(৩)

এ বাজারে এক দর,
নাহিক আপন পর,
এমন সুখের স্থান না হেরি কোথায়।
সেক্সপীর কালিদাস,
মহাকবি বেদব্যাস,
সকলেই একদরে বিকাইয়া যায়॥

(৪)

কেন বল আপনার,
কিছু ত নহে তোমার,
কেন তবে কর সবে বৃথা অভিমান।
সকলি বিলীন হবে,
কোন চিহ্ন নাহি রবে,
মাটিতে মাটির দেহ হবে অবসান॥

(৫)

কোথা যায় কত ধনী,
সুন্দর রূপের খনি,
অনলে—পুড়িয়া সব হয় ছারখার।
কোথা রূপ কোথা ধন,
সব গ্রাসে হুতাশন,
কোনকালে থাকে কোথা গরব তাহার॥

(৬)

তুমি আমি কেবা কার,
শুধু রব মাত্র সার,
আসা যাওয়া বিড়ম্বনা কেবলি এ ভবে।
দু' দিনের তরে আসি,
সংসার সাগরে ভাসি,
মিছামিছি অহঙ্কার কেন কর তবে।

(৭)

এ দেহের অহঙ্কার,
কেন কর অনিবার,
মাটির পুতুলে দর্প শোভা নাহি পায়।
জীবের চরম স্থান,
মনেতে পাইলে স্থান,
অহঙ্কার অভিমান দূরেতে পালায়॥

(৮)

দেখিনি স্বর্গের মুখ,
কিবা সে স্বর্গের সুখ,
নশ্বর মানব আমি সে সুখ কি কব।
অন্তিম শ্মশান ক্ষেত্র,
হেরিয়ে জুড়ায় নেত্র,
যে ভাবিবে, সেই পাবে সুখ অভিনব॥

(৯)
শান্তিদাতা এ শ্মশান,
অনন্ত—পবিত্র—স্থান,
হেন স্থান অবনীতে কোন স্থান নাই।
জীবের যন্ত্রণানল,
সব হয় সুশীতল,
শ্মশান অনলে যবে দেহ হয় ছাই॥

(১০)
ভাল মন্দ সদসৎ,
কিবা নীচ কি মহৎ,
সংসার তেয়াগি যায়—এই পথ দিয়ে।
এখানে শুইলে পরে,
শোক তাপ সব হরে,
পাষাণ হৃদয় যায় অনলে গলিয়ে॥

(১১)
যে অনল জ্বলে হেথা,
তাহে পোড়ে সরলতা,
সকলি গ্রাস করে কিছুই ত রাখেনা॥
সর্ব্ব ভুক সদাশয়,
চিরদিন জেগে রয়,
যে অনল জ্বলে হেথা—কিছুই থাকেনা॥

(১২)
স্নেহ প্রেম দয়ামায়া,
সুন্দরী কামিনী কায়া,
শ্মশানের হুতাশনে সব দগ্ধ হয়।
মানবের সুখ আশা,
প্রফুল্লতা ভাল বাসা,
কিছুই থাকে না শেষ থাকিবার নয়॥

(১৩)
তাই বলি এই স্থান,
যথা সব সমাধান,
দেহ-দাহে এই স্থানে শান্তি পায় প্রাণ।
সাঙ্গ হয় কর্ম্মভোগ,
কি যে সেই শান্তির যোগ,
বুঝিতে পারেন যিনি চলি যান॥

(১৪)
শিবদাতা শান্তিদাতা,
যিনি জগতের পাতা,
শ্মশানে দহেনা তিনি সুখ-দুঃখ-রাশি।
দহনে জুড়ায় তাপ,
ঘুচে যায় পুণ্য পাপ,
তাই রে শ্মশান তোরে বড় ভালবাসি॥

—:•••:—

কমলা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা।

পরদিন প্রত্যুষে রঘুপতি নেপালকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে নেপালকে বলিলেন, নেপাল! আর চাকুরী করিব না। যাহা কিছু আছে বেচিয়া কিনিয়া ৺কাশীবাস করিব। প্রথমে একবার সব তীর্থগুলি ঘুরিতে হইবে। তার পরে, কাশীবাস! নেপাল শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, আমি কার কাছে থাকিব? আপনিই আমার বাপ, আপনিই আমার মা; আপনিই আমার সব। আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। আপনি যেখানে যাইবেন, আমিও সেইখানে যাইব; আর আপনার চরণ সেবা করিব। নেপালের কাঁদিবার কারণ আছে। পিতৃ-

মাতৃহীন বালক রঘুপতির নিকট আগমন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিল। রঘুপতিও তাহাকে আশ্রয় দিয়া রামরতন বাবুকে পত্র লিখিয়া ভৃত্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। নিজে খরচ দিয়া প্রথম বৎসরে তাহার পাঁচবিঘা জমি আবাদ করিয়া দিয়াছেন। এইবৎসরে তাহার দশবিঘা জমি আবাদ হইয়াছে। রঘুপতি নিজে ৩০/ ত্রিশ বিঘা আবাদ করিয়াছেন। প্রচুর ধান্য হইয়াছে। তিনি নেপালের এক জ্ঞাতি খুড়াকে আনাইয়া তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখিতেছেন। তাই নেপাল কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, ভগবান! সব পণ্ড করিলে! নেপালকে কাঁদিতে দেখিয়া, রঘুপতি বলিলেন, না নেপাল! একবৎসর কালাশৌচ; একবৎসর আর কোথায়ও যাইব না। এই সময়ের মধ্যে তোর বিবাহ দিয়া তোকে সংসারী করিয়া নেপালের বিবাহের জন্য যাইব। নেপালের জ্ঞাতি খুড়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে; কারণ নেপাল তাহাকে আবাদের পর ধান্য ঝাড়িয়াই ১০।১৫ আড়ি ধান্য অকাতরে দেয়।

নয়দিনের রাত্রি সাতটার সময়ে রঘুপতি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। রঘুপতির এরূপ বেশ দেখিয়া, রামরতন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, একি? এরকম বেশ কেন?

রঘুপতি তাঁহাকে কালীভৈরব লিখিত পত্রের বৃত্তান্ত বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামরতনবাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজি কয়দিন?

রঘু। আজি নয়দিন; রাত্রি প্রভাত হইলে কালি দশদিন হইবে। দশপিণ্ড দিতে হইবে। পরশ্ব শ্রাদ্ধ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে।

রামরতন। তাহা হইলে, শ্রাদ্ধাদি এইখানেই করিতে হইবে। দেশে কি করিয়া হইবে?

রঘু। তাহা আর কেমন করিয়া হইবে? দেশে আর কি করিতে যাইব? কার কাছেই বা যাইব?

রামরতন। তা ত বটে? তবে এইখানেই যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করিয়া গুটি কতক ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া শুদ্ধ হও।

রঘু। যে আজ্ঞা।

ভৃত সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিল; দ্রুত বাটীর মধ্যে গিয়া সৌদামিনীকে সংবাদ প্রদান করিল। সৌদামিনী শ্রবণমাত্র য়্যাঁ বলিস কি? য়্যাঁ বলিস কি? বলিয়া, দ্রুত দালানের পার্শ্বস্থিত ঘরে আসিয়া ভৃতকে বলিলেন, রঘুপতিকে ডাকিয়া আনো। ভৃত শ্রবণমাত্র তাঁহার আদেশ পালন করিল। রঘুপতি তথায় উপস্থিত হইয়া, মায়ের নিকট পুত্রে যেরূপ মর্ম্মবেদনায় রোদন করে, রঘুপতিও সেইরূপ সৌদামিনীর নিকট কাঁদিতে লাগিলেন। সৌদামিনীও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, বাবা! কাঁদিও না। আমি তোমার পরমাসুন্দরী বউ করিয়া দিব। তাহাকে দুই হাজার টাকার গহনা দিব; মা কাহার চিরদিন থাকেনা; তিনি গিয়াছেন,

ভালই হইয়াছে, অন্ধ মানুষ, তাঁহার বাঁচা মরা দুইই সমান। রঘুপতি শুনিয়া বলিলেন, মা! আমি এমনই মহাপাতকী—যে মৃত্যুকালে তাঁহার মুখে এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল দিতে পারিলাম না! বলিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। এই রোদনশব্দ শুনিয়া রামরতন বাবুর মাতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষুদ্ধা হইলেন; এবং নিজ অঞ্চল দ্বারা রঘুপতির নয়ন মার্জ্জন করিয়া দিলেন। বলিতে লাগিলেন, ভাই! কাঁদিও না, কাঁদিও না, তোমার যে বউ গিয়াছে, তাহার চেয়ে শতগুণে সুন্দরী বউ আনিয়া দিব। রঘুপতি বলিলেন, ঠাকুর মা! সে রকমটী আর পাওয়া যাইবে না। তেমন গুণবতী ভার্য্যা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। রঘুপতি খুব ক্রন্দন করিতেছেন, শুনিয়া রামরতন বাবু তাঁহাকে নিজের নিকটে আহ্বান করিলেন। রঘুপতিও তাঁহার নিকটে গমন করিয়া বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্ট হইলেন। তার পর উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাত্রি দশটার পর রামরতন বাবু অন্তঃপুরে আহার করিয়া শয়ন করিতে গেলেন। যাইবার সময়ে রঘুপতিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সৌদামিনী রঘুপতিকে বড় একবাটী ঘন দুগ্ধ ও সন্দেশ গঙ্গাজল খাইতে দিলেন। রঘুপতিও জলযোগ করিয়া বাহিরে বৈঠকখানায় আসিয়া কম্বলাসনে শয়ন করিলেন।

পরদিন গঙ্গাতীরে দশপিণ্ড প্রদান করিয়া তৎপরদিন মাতা ও জায়া কমলার শ্রাদ্ধ করিলেন। শ্রাদ্ধে প্রায় দেড় শত ব্রাহ্মণ ভোজন করিল। সমস্ত ব্যয়ভারই রামরতন বাবু লইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের পর দুই চারি দিবস কলিকাতায় থাকিয়া, রঘুপতি নেপালকে সঙ্গে লইয়া আবাদস্থিত কাছারি বাটীতে আগমন করিয়া পূর্ব্বের মত কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

—:•:—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কালীভৈবের খেলা।

রঘুপতি আবাদে গমন করিয়া কর্ম্ম গ্রহণ করিবার চারি পাঁচ মাস পরেই প্রতারক কালীভৈরব তাঁহার মাতা ও স্ত্রী কমলাকে সংবাদ দিয়াছিল যে, রঘুপতিকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া রঘুপতির মাতা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। কমলা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইল। সরলা সহসা এইরূপ ক্রন্দনশব্দ শুনিবামাত্র দ্রুতপদে নিজ বাটী হইতে আগমন করিয়া কমলার মুখে ও চক্ষে শীতল জলসিঞ্চনে তাহার চৈতন্য সম্পাদনে রত হইল। সরলার মাতাও দ্রুত আগমন করিয়া রঘুপতির মাতাকে ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। কালীভৈরব প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া হায়, হায়! কি সর্ব্বনাশ হল, কি সর্ব্বনাশ হল, ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া স্ত্রী পুরুষ অনেক আসিয়া জুটিল; স্ত্রীলোকের ভাগই অধিক। আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন কালীভৈরবকে জিজ্ঞাসা করিল, হাগা—কি করিয়া কি হইল?

কালী। আর কি হল, রঘুপতির প্রথম পত্র পাইয়াই বলিছিলাম, স্থানটা ভাল নয়। পদে পদে বিপদ হইতে পারে। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। চাকরী করিতে গিয়া অমূল্য জীবনটাই গেল।

আগন্তুক স্ত্রীলোক। হ্যাঁগা! কিসে মারা গেল? জ্বর বিকারে নাকি?

কালী। না, না, তাহা নহে; তাহা হইলে ত আমরা যাইতে পারিতাম; দুই চারি দিন সেবা হইত,; মৃত্যুকালে দেখা হইত। এ কিছুই হইল না। হায়, হায়, হায়, কি হল? বলিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিল।

আগন্তুক স্ত্রীলোক। তবে কি?

কালী। বাঘে লইয়া গিয়াছে।

আগন্তুক স্ত্রীলোক। অ্যাঁ! বলকি? কেমন করিয়া লইয়া গেল?

কালী। একদিন ধান কাটা হইতেছিল, কি রকম কাটিতেছে রঘুপতি তাহা তদারক করিতে গিয়াছিল। সকলে অন্যমনস্ক হইয়া কাজ করিতেছিল, এমন সময়ে সকলে দেখিল, রঘুপতির মাথার উপর একখানা নামাবলী উড়িয়া পড়িল; ব্যাঘ্র যখন দূর হইতে তাহার শিকারের উপর পড়ে, দূর হইতে ঐরূপই দেখায়; সে নামাবলী নয় প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র; রঘুপতিকে লইয়া গেল। ওঃ! হায়, হায়!

আগন্তুক স্ত্রীলোক। হ্যাঁগা! অত লোক ছিল, কেউ তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না?

কালী। ওরে বাপরে! কার দুটা মাথা আছে যে সেই যমের কাছে যায়।

আগন্তুক স্ত্রীলোক। আহা! এমন সর্ব্বনাশও হয় গো? এরকম বিপদ যেন শত্রুরও না হয়।

ক্রমে ক্রমে আগন্তুক নর নারীগণ স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। এখানে শাশুড়ী ও বধু আবাসে বসিয়া ক্রন্দন করিতেই থাকুন। যাইবার কালে, কেহ কেহ বলিতে লাগিল, বউ ছুঁড়ী ওর বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে। কি করিতে এখানে থাকিবে? মাগীরই মহাকষ্ট, চক্ষে দেখিতে পায় না। ভগবানের বিচার দেখ? আর একজন বলিল, ভগবানের বিচার ঠিকই আছে। যার যেমন সাধনা; পূর্ব্বজন্মে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে এ জন্মে তাহারই ফলভোগ করিতেছে। আহা! ছেলে নয় ত যেন কার্ত্তিক। সকলে চলিয়া গেলে, কালীভৈরব ও আপনার বাটীতে চলিয়া গেল। কেবল সরলা ও তাহার মাতা তথায় রহিল।

কতক্ষণ পরে রোরুদ্যমানা কমলা সরলাকে জিজ্ঞাসিল, সই? আমার কি হল? সরলা তাঁহার কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না, কেবল নীরবে নেত্র জল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সমুদ্রের পার আছে, কিন্তু কমলা ও তাঁহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর দুঃখের পার নাই। কমলা ও তাঁহার শাশুড়ী উভয়ে স্নান করিয়া আসিয়া বিছানায় পড়িয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ।)

———:০:———



স্বর্গীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

জন্ম ১৮২০ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৯১ খ্রীঃ।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

"Lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime."

Janmabhumi Press,—Calcutta.



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। | ১৩২০ সাল, শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

পাপিয়া।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

পাপিয়া তুমি পাখী—পাখি! তোমার কণ্ঠ অতি মধুর এজন্য তোমাকে আমি বড়ই ভালবাসি। কোকিল—বসন্ত সখা। যখন প্রকৃতি নব পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া, নব কিশলয়, পল্লব, কুসুম, মুকুল কলিকায় কবরী সুসজ্জিত করিয়া হাসিতে হাসিতে মলয় বাতাসে নবোঢ়ার ন্যায় বিলাসবতী, যখন সংসারের সকলই সুন্দর, সকলই সুখের শ্বাসপ্রশ্বাসে শান্তিসুখ ভোগ করে, সকলই আহ্লাদে ঢল-ঢল, টল-টল,—সরোবরে সরোজ, তাহাতে ভ্রমর গুঞ্জন,—অন্তরীক্ষ নির্ম্মল, ঝর ঝরে, তক্ তকে, সেই সময় কোকিল সহকার শাখায় বসিয়া পঞ্চমে সুর চড়াইয়া "কু" বই "সু" শব্দ উচ্চারণ না করিলেও প্রাণ তর করিয়া দেয়, মনকে আহ্লাদের তরঙ্গে তুলিয়া হেলাইতে দোলাইতে যেন কোন অনন্ত সুখের ধামে ধাবিত করে। অতএব বলিতে হইবে কোকিল বড়র আশ্রয়ে বড় হই-

য়াছে। আশ্রয়গুণে না হয় কি ? এই সংসারে সহায়বলে সকলই হয়, শিবাঙ্গে থাকিয়া সর্প শিখী শিরে পুচ্ছাঘাতে সমর্থ. সহায়গুণে আপিশের বড় বাবুর শ্যালক অন্যান্য বাবুদের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে হীন হইলেও কর্ত্তৃত্বশালী, সহায়গুণে ধ্রুব দেবলোকের সর্ব্বোচ্চস্থানের অধিকারী, মহতের সহায়তাতেই কেকিলের শ্রেষ্ঠত্ব। নতুবা তুমি কোকিল অপেক্ষা কিসে হীন, তাহা বুঝিতে পারি না। কোকিল পরপুষ্ট পর-পরিপালিত, তুমিও তাহাই। কেকিলের জন্মও মাতৃগর্ভে, কিন্তু শৈশবশয্যা বায়সের কুলায়। বায়স চঞ্চুসংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালন, পরিপোষণ, বয়স পাইলে বেইমানী, কাকের কোন ব্যবহার রাখে না, কোন ধর্ম্ম পালেনা, কবিকল্পনা এই,—কাকের প্রতি ক্রোধ প্রযুক্ত সর্ব্বদাই তাহার রক্তচক্ষু। তোমারও তাহাই—তুমিও মাতৃগর্ভবাস ত্যাগ করিয়া ছাতারিয়ার কুলায়াশ্রিত, ছাতারিয়া দ্বারা পালিত, কিন্তু বয়স পাইয়া বেইমান নও, ছাতারিয়ার প্রতি তোমার রক্তচক্ষুও দেখি না। অতএব তুমি কোকিল অপেক্ষা মহৎ। কোকিল বসন্তের সাথী—বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাহার—বসন্তের সঙ্গেই উহার পরিহার। তোমাকে আমি বারমাস পাই, তুমি দুমাসের নও, বারমাসের—যখন ধরিত্রীবক্ষে ঋতুনাথ বসন্তের বিহার তখনও তোমাকে দেখিতে পাই, তখনও তোমার স্বর শুনিতে পাই। আবার যখন বসুমতী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে তপ্তা, সায়াহ্নে ঝড়বৃষ্টি অশনিপাতে উৎপীড়িতা, তখন তোমার মধুর রবে সকলে মোহিত হয়। পুনরপি শীতাগমে যখন প্রকৃতির অঙ্গ অনাবৃত, শীতল-বাতাসে তরুলতিকা শুষ্ক, শীর্ণ, উলঙ্গ, তোমাকে আশ্রয় দিতে অসক্ত; তখনও তুমি আমার চিত্ত-রঞ্জনে নিবৃত্ত নহ—গগনস্পর্শী রবে দিঙ্মণ্ডল অমৃতধারায় আপ্লুত কর। তোমার মহত্ত্ব কত ? সুখে দুঃখে উৎসবে, আপদে বিপদে সম্পদে সকল অবস্থাতেই তোমাকে পাই, তোমার মধুর স্বরে মত্ত হইয়া সকলই ভুলিয়া যাই। তুমি আমার সুখের সাথী, ব্যথার ব্যথী, —তোমার মহত্ত্ব আমি শতমুখে গাইব। কিন্তু ভাই পাখী! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বলিবে কি ? কেনই না বলিবে তোমার মন যেমন সরল, মুখ যেরূপ মধুর, স্বভাব যেরূপ ধীর—নাই বা বলিবে কেন—বল দেখি যখন প্রকৃতির হাসিভরা মুখখানি ঢল ঢলে, বাসন্তী পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকর রজত রবে জগৎ রৌপ্যময় করে,—দক্ষিণানিলে বৃক্ষ পল্লীগুলি উৎসবের নাচ নাচিতে থাকে, গ্রাম পল্লী নগরাদি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ঢলিয়া পড়ে, সাগর সরোবর আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয়, যখন সন্তাপিতের তাপ দূর হয়—এমন সুখের সময়ে, উৎসবের সমাবেশে তুমি পাখী শাখায় বসিয়া উহু-উহু-উহু রবে উত্তরোত্তর

অধিকতর আর্ত্ততার সূচনা করিয়া "চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল" বলিয়া বারম্বার চীৎকার কর! তুমি জাতিতে পক্ষী—জীব মধ্যে নিরীহ নির্জ্জীব, কাহার ভালয় মন্দে নাই, কেহ তোমাকে যাতনা দিবে, কেহ তোমার চক্ষে শেল বসাইবে, ইহাতো বিশ্বাসই হয় না,—তবে তুমি অতীব আর্ত্তের ন্যায় কেন এরূপ আর্ত্ততা প্রকাশ কর? দেখিতে পাই, তুমি অতি নির্জ্জনে, অতি সঙ্গোপনে বৃক্ষের আবরণে আবৃত থাক, সদাই আত্ম গোপন যেন ভালবাস, তোমাকে লোক চক্ষুর গোচর হইতে অতি অল্পই দেখি,—তবে তোমায় কে যন্ত্রণা দিবে, কে তোমার সুখে বাদ সাধিবে, কেনই বা সাধিবে, কিছুতো বুঝিতে পারি না। তুমি সুখের পাখী, সুখে থাকিবার জন্য লোকালয়ের সম্বন্ধসংস্রব পরিত্যাগ করিয়া কেবলই নির্জ্জন-বাসের অভিলাষী, তবে কেন তোমার এ দুর্গতি, এত দুঃখ বুঝিতে পারি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাখী তুমি মহৎ—মহতের মহত্ত্ব কেবল মাত্র পরদুঃখকাতরতায়—তাই আমার মনে হয়, তুমি আত্মদুঃখে আর্ত্ততা প্রকাশ কর না, তোমার মধুর কণ্ঠে যে কাতরতা সে কেবল পরদুঃখ হেতু। এখন দেখি, কি এমন পরদুঃখ আছে, যাহাতে তোমার কোমল মন এত কাঁদিতেছে যে একবার একক্ষণের জন্য তাহার বিরাম নাই, সকল কথা ভুলিয়া, সকল কাজ ছাড়িয়া, অবিশ্রান্ত কণ্ঠে কেবল সেই কষ্টের কাহিনী জগতের কাণে তুলিতেছ, প্রাণ মন কাঁদাইতেছে। কিন্তু আমার প্রিয় পক্ষি! একটী বড় আশ্চর্য্য দেখিতেছি, তুমি আপনার কাতর কণ্ঠে কষ্টের কাহিনী গাইতেছ, কিন্তু জগৎ শুদ্ধ যেন সেই কান্নায় কাতর নহে, বরং সুখের তরঙ্গে সন্তরণ দিতে দিতে যেন কোন অনন্ত সুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তোমার কাতরতা কই কেহই ত বুঝিতেছে না। তোমার কিন্তু তাহার দিকে লক্ষ্য নাই—যদি থাকিবে তবে আর মহতের মহত্ত্ব কি? মহৎ আপনি কাঁদেন, পরকে কাঁদিতে দেন না, তাহার হইয়া তিনিই কাঁদেন, তোমারও সেই দশা,—তোমার জন্য কেহ ভাবে না, তোমার দুঃখে কেহ কাণ দেয় না,—দেয় কেবল তাহাতে, যাহার আত্ম স্বার্থ আছে, তোমার স্বরটী সুমধুর বলিয়া তাই তোমার কান্নায় তাহারা কাণ দেয়, তুমি হাসিতেছ—কি কাঁদিতেছ তাহার তত্ত্ব রাখে না, জগৎ ঘোর স্বার্থপর, তোমাকে কাঁদাইয়াও আপনার শ্রুতিসুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে। বরং তোমার কান্নার প্রতিকারে যদি সুখভোগের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে তাহাতে নিরস্ত বই প্রস্তুত নহে। তোমার কথায় কথায় আসল কথা ছাড়িয়া আসিয়াছি—এখন নেত্র যাতনার কারণ,—বল কি যাতনায় তোমার এ কাতরতা পাখি! তুমি খুলিয়া বল,—তুমি পক্ষীজাতীয়—শুনিয়াছি পূর্ব্বে তোমরা জাতিস্মর ছিলে, কথায়

সকল বিষয় আমাদিগকে জানাইতে পারিতে। আজিকালি তোমরা সে শক্তি হারাইয়াছ, কিন্তু আপন মনে বোধ হয় সকলই বুঝিতে পার, ভাবভঙ্গিতে সব প্রকাশ করিতেও অসমর্থ নহ। তোমার ভাবে আমি বুঝিতে পারি—তুমি সংসারের সকল তত্ত্বদর্শী—জগৎ সংসারের চরিত্রজ্ঞান তোমার চমৎকার—ইহ সংসারে ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব বেশী,—পাপীর প্রাধান্য নিষ্পাপের অধোগতিই সর্ব্বত্র, অধর্ম্মের আদর, ধর্ম্মের অনাদর যত্রতত্র—নিরীহের নির্য্যাতন, পীড়কের প্রসাদন নিত্য নৈমিত্তিক। উপকারীর পুরস্কার অপকার সাধনে, সরলতার পুরস্কার কপটতার অনুষ্ঠানে, সাধুতার পুরস্কার অসাধু আচরণে, সতীত্বের পুরস্কার সতীনিপীড়নে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও দিনান্তে সাধুর অন্ন মিলে না। অসাধু প্রতারণা জালে অর্থ রাখিতে স্থান পায় না। গোপ এ সংসারে স্বাস্থ্যপোষক ক্ষীর লইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়াও তাহার গ্রাহক মিলাইতে পারে না, আর স্বাস্থ্য প্রাণনাশক সুরার জন্য শৌণ্ডিকালয়ে মাথার উপর মাথা। কুলটাগণ মণিমাণিক্য ভূষিতা সৌধশিখরবাসিনী বিলাসে বিভোরা, সুখের তরঙ্গে গা ঢালিয়া ব্যসনসুখে সুখিনী, শত শত প্রণয়পিপাসু প্রণয় সুখের ভিখারী হইয়া প্রত্যাখ্যাত, আর সাবিত্রী সদৃশী সতী অন্তঃপুরের অন্তরালে অতৈলকেশী চীরধারিণী একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িতা, স্বামী সোহাগে-বঞ্চিতা, নেত্রনীর মুছিতে মুছিতে নিশাযাপন করেন। পুত্রগতপ্রাণ স্নেহময় জনক জননী অকাতরে অনশন উপবাস ক্লেশ সহ্য করিয়া পুত্রকে লালন পালন করেন, বিদ্যা শিক্ষা দেন, একমাত্র পুত্রকেই জীবনের আশ্রয় ও অবলম্বন জ্ঞানে অপর চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দেন নাই, সঞ্চয়সংস্থান মনে না করিয়া যাহার জন্য কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছেন, সেই পুত্র বধুবিড়ম্বনায় শ্বশুর শ্বশ্রূ শ্যালক শ্যালিকা লইয়া সংসারী, আর স্থবির পিতামাতা মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য নেত্রনীরে নিসিক্তি, প্রাণান্তেও সেই পুত্রের অকল্যাণকামনাকে মনের মধ্যে স্থান দিতে পারেন না। আর মানব শিক্ষা লাভ করিতেছেন, শিক্ষিত হইতেছেন, শিক্ষিত বলিয়া অভিমানে অস্থির হইতেছেন, জগতের কার্য্যকারণ সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম সকল বিষয়ে জ্ঞানবান হইতেছেন, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি করিতেছেন, বুদ্ধি ও বিবেচনা বলে শূন্যে রথ চালাইতেছেন, চপলা চমকাইতেছেন, কিন্তু যাঁহার কৃপায় পাপীর প্রাণবায়ু বহিতেছে, বহির্ব্বায়ুতে শরীর জুড়াইতেছে, তৃষ্ণা দূর করিতে নদী হ্রদ তড়াগাদিতে সুপ্রচুর সলিল সঞ্চিত রহিয়াছে, ক্ষুন্নিবারণ জন্য শস্যসম্ভার স্তূপীকৃত রহিয়াছে, চিত্তরঞ্জনার্থ তরুগুল্ম ও লতিকার অঙ্গে নানা ও

ছায়া দান করিতেছে, ইহজগতের যাবতীয় সুখসচ্ছন্দতা সম্ভোগ হইতেছে, সেই অসীম করুণাকর অক্ষয় অব্যয় পুরুষকে নিশ্চিন্ত মনে একবারও চিন্তা করিবার সময় হইতেছে না। ইহা দেখিয়া হৃদয়বান হইয়া কাহার চক্ষে না বিষদিগ্ধ শর আরোপিত হয়,—কাহার না দৃষ্টিপীড়া জন্মে, কে না সেই মর্ম্মভেদিনী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তোমার ন্যায় উহু—উহু—উহু করিয়া বারম্বার "চোক গেল। চোক গেল চোক গেল!" বলিয়া চীৎকার করিতে ক্ষান্ত হয়। ভাই প্রাণের পাখি! আমাদের হৃদয় নাই, অমর সংসারাঙ্গনে অভিনেতার বেশে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মস্বার্থেই অন্ধ হইয়া রহিয়াছি, অপর কিছুই চিন্তা করিবার সময় পাই নাই, সুবিধাও করিতে পারি নাই। পাখি! মনুষ্যের অপেক্ষা তোমার হৃদয় প্রশস্ত, মনও উচ্চতর তাই তুমি জীবধর্ম্ম রক্ষা করিতে করিতে,—উড়িতে, বসিতে খাইতে ঘুমাইতে সদা সর্ব্বদাই এই সংসারে মোহান্ধ মানবকে দেখিয়া, উহু—উহু—উহু! চোক গেল, চোক গেল, এই রবে আপনি চীৎকার করিয়া আপনিই তাহাতে অস্থির হইতেছ। আমার প্রাণের পাপিয়া! আমাকে তোমার সুপ্রশস্ত, সুপরিষ্কৃত হৃদয়টী দাও, আমিও তোমার ন্যায় উহু—উহু—উহু! চোক গেল, চোক গেল, চোক গেল, বলিয়া চীৎকার করিয়া সকল কথা সকলকে বুঝাইয়া বলি।

———:•••:———

বিদ্যাসাগর।

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ এম, এ,)

(এই বক্তৃতা দ্বাবিংশ বার্ষিক বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় প্রদত্ত হইয়াছিল।)

বিদ্যাসাগর যাহার নিত্যারাধ্য বস্তু, স্নানকালে এবং বহুবার বিদ্যাসাগর-স্মৃতি যাহার চিত্তে জাগরূক হয়, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কালে :—

"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"

এই শ্লোকের সঙ্গে

"হরি র্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো
মহেশ্বর স্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ।
তথৈব বিদ্যাপয়সো হি সাগরঃ
স বীরসিংহোদ্ভব এক ঈশ্বরঃ॥"

ইহা যাহার চিত্তে উদিত ও মুখে উচ্চারিত হয়, তাহার পক্ষে সভায় আগমনের সমধিক আবশ্যকতা বোধ হয় নাই। তবে বিদ্যাসাগর-স্মৃতির-সম্মান জন্য যাঁহারা সভার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই মহাপুরুষের পূজা ও স্তুতি-গানের অভিপ্রায়ে সভায় উপস্থিত প্রাত্যহিক আরাধনার ব্যাঘাত নহে। বিদ্যাসাগর একদিন শ্রোত্রের বিষয় ছিলেন, পরে নেত্রের গোচর হইলেন; এখন তিনি আরাধনার বস্তু। তাঁহার এইরূপ আরাধ্যতার হেতু ও উপদান কি, ইহা নির্ণয় ও প্রকাশ করিতে হইলে বিদ্যাসাগরতা পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ বিশ্লেষণের সামর্থ্য আমার আছে কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়। গোলদীঘীর ধারে অথবা সংস্কৃত কালেজে যে, তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি আছে, সজীব বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছে তাঁহারা ঐ প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া বলিলেন,—"এই কি সেই? শিল্পী স্মৃতি-প্রতিষ্ঠ বিদ্যাসাগরকে যথাতথারূপে হাতে উঠাইতে পারিয়াছেন কি?" একটি মধুর সঙ্গীত প্রাণ কাড়িয়া লইল, স্মৃতি অধিকার করিল, অনুক্ষণ কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল; কিন্তু, যখন গাইতে যাই, তখন দেখি সঙ্গীতটি মনে ফুটিতেছে, মুখে ফুটে না। আবার মৃদঙ্গবাদ্য শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম, আশা হইল বাদ্যটি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি, কিন্তু একটি মৃদঙ্গ লইয়া দেখি স্মৃতিস্থিত বোল হাতে ফুটিল না। বিদ্যাসাগরের আরাধ্যতা ব্যাখ্যা করিতে গেলে বা তাদৃশ অবস্থা ঘটে। তাঁহার জীবনের স্থূল স্থূল কতকগুলি ঘটনা ও কার্য্য চিন্তা করিতে যাই ত তাহা বিদ্যাসাগর চিন্তা হইল না। মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল ইহাদের এক একটিকে পৃথক্ ভাবে ও তন্মাত্ররূপে দর্শন করিলে যেমন বৃক্ষ দর্শন হয় না, বিদ্যাসাগরের ভিন্ন ভিন্ন লীলাও পৃথকরূপে বিদ্যাসাগরতা প্রকটনে অসমর্থ। এখনকার বাবুদের—গাড়োয়ান এবং নৌকার মাঝিদেরও—কেশ মুণ্ডনের এক রীতি দাঁড়াইয়াছে যে, ঘাড়টী প্রায় যায় যায় আর কি। বাবুরা যদি সম্মুখভাগেরও সেইরূপ ব্যবস্থা করেন এবং শিরোমধ্যদেশে একটি শিখা রাখেন, তবেই ত বিদ্যাসাগরের বেশ, ভদ্র ব্রাহ্মণের বেশ হয়। কেশমুণ্ডনে এবং দেহসজ্জায় বিদ্যাসাগর পিতাপিতামহের রীতি, জাতীয় ভাব, পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতেন। একবার তিনি বঙ্গের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সর্ সিসিল বিডনের সহিত সায়ংকালে দেখা করিতে যান। উভয়ের মধ্যে এমনই সখ্য ছিল যে, সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র সর্ সিসিল তাঁহাকে ডাকিয়া নিলেন। তিনি তখন একটি অন্ধকার কক্ষে নগ্নপ্রায় গাত্রে দাঁড়াইয়া একটি কৃত্রিম হস্তদ্বারা খচর খচর করিয়া ঘামাচি চুলকাইতেছিলেন; বলিলেন,—

"বিদ্যাসাগর, তোমাকে আমার হিংসা করিতে ইচ্ছা হয়। তোমাদের পোষাকই এদেশের উপযুক্ত।" বিদ্যাসাগর বলিলেন, "যদি হিংসাই কর, আমার পোষাক অবলম্বন কর না কেন?" সর্ সিসিল উত্তরে বলিলেন, "কি বল, বিদ্যাসাগর? তা ও কি হয়? আমার জাতীয় ভাব কি আমি রক্ষা না করিয়া পারি? সেই জন্য অসুবিধা স্বীকার করিয়াও, জাতীয় পোষাক পরিধান করিয়া থাকি।" এই ব্যাপার উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "দেশের লোক গুলি এমন বাঁদর হইয়াছে যে, অসুবিধা স্বীকার করিয়াও হ্যাট্ কোট পরিয়া ইংরাজ সাজিতে চায়, কিন্তু প্রকৃত অনুকরণের বস্তু যাহা, ইংরাজের স্বজাতিপ্রিয়তা ও জাতীয় গৌরব, তাহা ধরিতে পারে না।" বিধবা বিবাহ আইন সঙ্গত করিবার জন্য বড়লাটের নিকট যাওয়া আবশ্যক হয়, এবং বন্ধুজনের উপদেশে, অনিচ্ছায়, বিদ্যাসাগর চাপকান পরিধান করেন। কার্য্য সাধন করিয়া যখন গৃহে প্রত্যবর্ত্তন করিবেন, তখন বড়লাট বাহাদুরকে বলিলেন, "সাহেব, আপনার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা।" লাট বাহাদুর বলিলেন, "কেন? আমার কি কোন ক্রটি হইয়াছে? আপনি কি আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন?" বিদ্যাসাগর বলিলেন, "বিধবা বিবাহ-আইনসঙ্গত করিবার অনুরোধে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম। সেই জন্যই একটি অপকর্ম্ম, চাপকান পরিধান করিয়াছি, যাহা জীবনে আর কখন করি নাই, করিব না।" লাট সাহেব বলিলেন, "আপনি ধুতি চাদর পরিয়া আসিবেন।" এইরূপ জাতীয় ভাব এবং এইরূপ তেজস্বিতা আর কোনও বাঙ্গালী কখন দেখাইতে পারিয়াছেন কি? এই পুরুষ,—এই মহাপুরুষ থানের ধুতি ও থানের চাদর এবং চটিজুতা এই সাজ গ্রহণ করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া বেড়াইতেন। ঐরূপ চাদরের নামই দাঁড়াইয়াছে "বিদ্যাসাগরী চাদর।" তিনি বিলাস বাবুগিরীর সম্পর্ক রাখিতেন না, পিতাপিতামহের আচার চিরদিন অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের কতক গুলি ঘটনা আমূল আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার কিরূপ তেজস্বিতা, নিরপেক্ষতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা ছিল। আবার কতক গুলি কার্য্যে তাঁহার অলোক-সামান্য করুণা ও লোকহিতচিকীর্ষার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য তিনি কত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, যাহা এখনও দেশের সেবায় নিযুক্ত আছে, হয়ত চিরদিন থাকিবে! তিনটাকা মাত্র বেতনে, বহুস্থলে বিনা বেতনে, এই দরিদ্র দেশের ছাত্রেরা শিক্ষা পাইতে পারে, এই জন্য তিনি যে কালেজ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং তাহার অনুকরণে কালে বহু কালেজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

ইহাদিগকে বিদ্যাসাগরের কালেজ বলা যাইতে পারে। কেন না তিনি ইহাদের পথ প্রদর্শন ও জন্মদান করিয়াছেন। নিজ দেশের লোকদ্বারা এবং বৈদেশিকের গন্ধ না রাখিয়া উচ্চাঙ্গের অধ্যাপনা চলিতে পারে, ইহা তিনিই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার লোক-হিতৈষণা নানা প্রকারে ক্রিয়া করি[illegible]। পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ আকুল হইত। সমাজ পরিত্যাক্তা গণিকাও তাঁহার করুণা বেষ্টনের বহির্দ্দেশে অবস্থিত ছিল না। উদরাময়রোগে সর্ব্বাঙ্গ মলদ্বারা লিপ্ত, এমন বারবনিতাকে মাথায় করিয়া তিনি চিকিৎসালয়ে বহিয়া নিয়াছেন এবং তাহার চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বহুবিবাহবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার পাষাণ ভেদিনী মহাপ্রাণতা কাহার নেত্র না অশ্রুজলে আপ্লুত করিবে? বহুবিবাহ শাস্ত্রাদিষ্ট নহে, তাহা একটি সামাজিক সদাচার, ইহা প্রদর্শন করিয়া তিনি কত সময়, শক্তি ও অর্থ ঐ প্রথার উন্মূলনের জন্য ব্যয় করিয়াছেন! রঘুরাজ, ইন্দ্রের বাধার ফলে, শতক্রতু হইতে পারেন নাই, একোনশতক্রতু হইয়াছিলেন। বিবাহ যদি ক্রতু হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ও একোনশতক্রতু সংজ্ঞালাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শেষজীবনে এই প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন ও সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি বিদ্যাসাগরের অতিপ্রিয় হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর অর্থদ্বারা তাঁহার কত আনুকূল্য করিয়াছিলেন! বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মাতিয়া গিয়াছিলেন। কোন বন্ধুজনের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইলে তিনি কন্যাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন,—"শীঘ্র বিধবা হও; আমি আবার তোমার বিবাহ দিই।" আত্মীয়ারা বলিয়া উঠিতেন, "ওমা! ওকি অলক্ষণে আশীর্ব্বাদ গো?" রসিক চূড়ামনি বিদ্যাসাগর প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া বলিতেন,—"বন্ধুবান্ধবের মেয়ে বিধবা না হইলে, আমি বিধবাবিবাহ চলিত করিব কিরূপে? রাস্তার লোকেরা কি আমার কথা শুনিবে?" মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগরের মাতৃদেবী করুণার মূর্ত্তি ছিলেন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বরে, তোদের পোড়া শাস্ত্রে কত কি আছে, বালবিধবার কি কোন ব্যবস্থা নাই? আমি যে ইহাদের দুঃখ আর সহিতে পারি না, বাপ!" এই মাতৃবাক্য বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া বিদ্যাসাগরের প্রাণকে আকুল করিল। তিনি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া মহর্ষি পরাশরের বচন আবিষ্কার করিলেন,—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

এইশাস্ত্রবাক্য অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর বালবিধবার দুঃখ মোচনার্থে, কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সহকারে, উপদেশ ও দৃষ্টান্তদ্বারা, বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন! পতিব্রত্যের ভিন্ন ভিন্ন স্তর এবং বিধবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। মহাপুরুষের মুখে শুনা গিয়াছে,"পাতিব্রত্য অতি উচ্চ ও দুর্লভ বস্তু। প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে যেমন ছায়াও বিলুপ্ত হয়,পতির দেহত্যাগে পতিব্রতার দেহ সেইরূপ স্বতঃই জীবনহীন হইয়া থাকে।" কোনও সতী মরণোন্মুখ পতির চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া পতির অগ্রে বা সঙ্গে দেহমুক্ত হইয়াছেন। এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে যে, মৃত্যুশয্যাগত বৃদ্ধ পতি বলিতেছেন,—"তোমরা সকলে বুড়ীকে দেখিও; সে রহিল।" "বটে? তুমি আমার আগে যাইবে?" ইহা বলিয়া বৃদ্ধা অন্তঃপ্রকোষ্ঠে শয্যায় শয়ন করিলেন। বৃদ্ধ "বুড়ীকে দেখিনা কেন," জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে বুড়ী পীড়িতা। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, বুড়ী দেহত্যাগ করিয়াছেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "আমাকেও বাহিরে নেও;" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও দেহত্যাগ হইল। আর এক শ্রেণীর বিধবা আছেন, যাঁহারা মৃতপতির অনুগমন করিয়া থাকেন। ভারত গৌরবে অবিশ্বাসী সংশয়াত্মা লোকেরা ইহা অবিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল হইলেও, তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছেন এমন লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। অবশ্য কুলগৌরব বৃদ্ধির জন্য এমন বিধবাও, হয়ত, পতির অনুগমন করিত, যে চিতারোহণের যোগ্য নহে। লর্ড বেণ্টিঙ্কের বিধান দ্বারা ঈদৃশ ব্যাপার বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু অনলপ্রতাপবিজয়ী দেহক্লেশবিস্মারী পতিব্রত্যধর্ম্মের লীলা যে ভারতভূমিতে প্রকাটিত হইত, ইহা নিঃসন্দেহ। এখনও এইরূপ দৃষ্টান্ত কি হিন্দুর ঘরে দেখা যায় না, যে পতিকে মৃত দেখিয়া সতী পুকুরে নামিলেন, আর উঠিলেন না; কেহবা কেরোসিন বা ঘৃত শরীরে মাখিয়া দগ্ধ হইলেন! দুই বৎসর অতীত হয় নাই, এই কলিকাতা নগরীতে একটী ব্রাহ্মণের কন্যা পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া, শ্মশানঘাটে মৃত পতির দেহদাহ দেখিতে দেখিতে পুত্রটিকে রাখিয়া, প্রজ্বলিত চিতায় দেহ আহুতি দিয়াছিলেন। তাঁহাকে টানিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়; কিন্তু, কএক দিন পতিবিরহানলে দগ্ধ হইয়া, সেই সতীর আত্মা পতির অনুসরণ করিয়াছিল। অপর এক শ্রেণীর বিধবা আছেন, যাঁহারা পতিকে বিদায় দিবার মুহূর্ত্ত হইতে সুখবিলাসে পরাঙ্মুখী ও নিরাভরণা হইয়া, পতিপূজা, দেবপূজা,ব্রতচর্য্যা,শাস্ত্রপাঠ, অতিথিসৎকার, জীবসেবা, তীর্থদর্শন ইত্যাদি কার্য্যে দিনপাত করেন এবং ভোজ্যবস্তু পতির উদ্দেশে নিবেদন করিয়া

প্রসাদ গ্রহণ করেন। এতদপেক্ষা নিম্নস্তরের বিধবা, পত্যভাবে ক্লিষ্টা, চতুর্দ্দিকে ভোগবিলাসের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভোগসুখে স্পৃহাবতী,এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসমর্থা। ইহাদিগের দুঃখ মোচন করিবার জন্য দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর তাঁহার শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কলির জীবের শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া পরাশর দেব-সমাজদেহের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য পাঁচটী অবস্থায় বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। উল্লিখিত স্তর সমূহ হইতে আরও নিম্নতর স্তর আছে, যথা (ক) কপট ব্রহ্মচর্য্য, অর্থাৎ বাহিরে বিধবার আচার কিন্তু আহার বিহারাদি সম্বন্ধে ব্রতস্খলন, পাপাচারণ এবং হয়ত, ভ্রূণহত্যা। (খ) কুলত্যাগক্রমে পূর্ণ প্রকটিত স্বৈরাচার। এই দুইস্তরে সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যাহত করিবার জন্য এবং কতকগুলি বালিকার দুঃখ নিবারণের জন্য, পরাশর ঋষির সমর্থন লাভ করিয়া, বিদ্যাসাগর কি তুমুল সংগ্রাম করিয়া ছিলেন এবং জর্জ্জর ক্ষত বিক্ষত হইয়াও, শেষপর্য্যন্ত কিরূপ অবিচলিত ভাবে দয়াবৃত্তির সেবা করিয়া গিয়াছেন! তাঁহার এই জীবনব্যাপী ব্যাপারের মূল করুণা, কেবলই করুণা। বিদ্যাসাগরের কার্য্যাবলী অপক্ষপাতে বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে, ইহাই দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান কালে কি ন্যায়পরতা ও তেজস্বিতায়, কি কারুণিকতা ও লোকদুঃখ জিহীর্ষায় বিদ্যাসাগর এক প্রকার অদ্বিতীয় ও অনুপম। লোকে জ্ঞানবীর বা মস্তিষ্কবীর, কর্ম্মবীর বা কর বীর হইতে পারে; কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তি যে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, স্বার্থান্ধ, অসাধু বা জুয়াচোরও হইতে পারে না, তাহা নহে; অতএব পাণ্ডিত্য অথবা কর্ম্মিত্ব দেখিয়াই কাহাকেও আরাধ্য বলিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য, বিদ্যা-সাগরের কর্ম্মিতা ও কার্য্যোদ্যম হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, উন্নত বিশাল হৃদয়ের সহিত যুক্ত ছিল। তিনি জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর ছিলেন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয় বীরতার গুণে তিনি নিত্যস্মৃতির ও নিত্যারাধনার বস্তু হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহামহীরুহের দুইটী শাখা,—একটী উৎকট জগদভিভাবিণী তেজস্বিতায় প্রদীপ্তা, [illegible] পরদুঃখ হারিণী করুণাময় স্নিগ্ধা, কমনীয়া। বোধ হয় বহু-[illegible] একক্ষেত্রে বিরাজিত, এই বস্তুদ্বয়ের সম্মিলন ও সমন্বয়ই বিদ্যা-[illegible]রাধনীয়তার স্বরূপ ও নিদান।

তেজোহন্যৎসমুৎকটঃ প্রকটিতঃ কিং তাপনো বিগ্রহঃ
কারুণ্যামৃতবর্ষিণী তনুরসাবাবিষ্কৃতা বৈন্দবী।
বিদ্যাসাগর আদধৎ মতিমিমামর্কেন্দুযুগ্মোদয়ং
কুর্য্যা ঈশ্বরচন্দ্রভূস্সুর সদা চেতোঽম্বরে সন্নিধিম্॥

সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

লেখক,—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

কাশী যাই? না মক্কাযাই?

কোন এক গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সদাচার-পূত এবং ব্যবহার কার্য্যেও বিশেষ বিচক্ষণ ছিলেন। অথচ লোকে তাঁহাকে অসমক্ষে "খিট্‌ খিটে ভট্টাচার্য্যি" বলিত। তাঁহার অপরাধ এই যে, স্নান করিতে গেলে কি জানি কার হাতের ছিঁটা, গামছার ছিঁটা পড়িল? পথে চলিতে কি জানি কোথা কি থুথু গয়ের ছুইল? কোথা কি মুর্গীর গু না বিড়ালের গু মাড়াইল? ইত্যাদি লইয়া প্রায়ই খুঁৎ খুঁৎ করিতেন। অনেক ছেলে পিলে তাঁহাকে চটাইবার জন্য তামাসা করিয়াও বলিত,—ভট্টাচার্য্যি মহাশয় ঐ দেখুন আপনি কি মাড়াইলেন ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ শুচি বায়ুর আক্রমণে সর্ব্বদা অস্থির থাকিতেন। অনেকে আবার তাঁহাতে "অগ্নিশর্ম্মা"ও বলিত। কোন বিষয় একচুল অন্যায় দেখিয়াছেত আর রক্ষা নাই,—অমনি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে শাস্ত্রীয় সুকঠিন বিষয় মীমাংসা ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শুনিলে অনেক বড় বড় পণ্ডিত-গণ স্তম্ভিত হইতেন। তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবীপুত্র বলিয়া মনে করিয়া ভয় ভক্তিতে জড় সড় হইত। আর কি শীত কি গ্রীষ্ম, যখন তিনি অনাবৃত শরীরে বিল্বমূলে জপ-তপস্যায় বসিতেন, তখন প্রচণ্ড রৌদ্র বা ভীষণ বর্ষার প্রতিও লক্ষ্য থাকিত না, তখন লোকে মনে করিত,—যে ইনি সাক্ষাৎ শিব ধ্যানযোগে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে বসিয়াছেন। আবার ওদিকে ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি কুটুম্ব বর্গে পরিবৃত বিশুদ্ধ গার্হস্থ্যধর্ম্মে পরম সুখী ছিলেন। গার্হস্থ ধর্ম্মে উক্ত যত কিছু সৎকর্ম্ম আছে, ব্রাহ্মণ শক্তিসত্বে বাধ করিতেন না। দৈনিক কৃত—সন্ধ্যা বন্দনাদি অধ্যা-পনা পঞ্চমহাযজ্ঞগোগ্রাস এবং কাক কুকুরকে অন্নদান করিতেন, কোন মতেই অনুষ্ঠানের ত্রুটী করিতেন না।

একদা তিনি আহারান্তে ভুক্তাবশিষ্ট এক মুষ্টি অন্ন গৃহপালিত কুক্কুরের জন্য হাতে করিয়া বাহির হইলেন। এবং কুকুরটাকে "আ তূ তূ" করিয়া ডাকিতে ছিলেন। ঐ শব্দ শ্রবণ মাত্রই কুক্কুর দৌড়িয়া আসিল, ন্যাজ নাড়িতে নাড়িতে অব্যক্ত "কেঁউ কেঁউ" শব করিয়া ঐ অবস্থায়ই ব্রাহ্মণকে ন্যাজ দিয়া ছুঁইয়া দিল।

ব্রাহ্মণ "মহাভারতম্" "মহাভারতম্" বলিতে বলিতে অন্নমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আচমন করিলেন। তৎপরে—

"শ্ব-কুক্কুট-বরাহাংশ্চ গ্রাম্যান্ সংস্পৃশ্য মানবঃ ॥
সচেলং সশিরঃ স্নাত্বা তদানী মেব শুধ্যতি ॥"
(প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে শাতাতপ)

অর্থ,—কুক্কুর, কুক্কুট এবং গ্রাম্য শূকর স্পর্শ করিলে মানব সবস্ত্র ডুব দিয়া স্নান করিলে তখনই শুদ্ধ হইবে।

এই বচনানুসারে ব্রাহ্মণ স্নান করিলেন। এবং

"অপবিত্রঃ পবিত্র বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
সঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥" (স্মৃতি।)

অর্থ,—মানব পবিত্রই হউক, আর অপবিত্রই হউক, যে কোন অবস্থাতে থাকুক না কেন? যে ৺নারায়ণ হরিকে স্মরণ করিবে, সে অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ হইবে। হরি স্মরণ কিন্তু এইরূপ,—

"সর্ব্বং জগদিদং বিষ্ণু র্বিষ্ণুঃ সর্ব্বস্য কারণং।
অহঞ্চ বিষ্ণুরিতিষ্ণ ভুদ্ধি য়েতাঃ স্মরণং স্মৃতং॥"

অর্থ,—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই বিষ্ণু, বিষ্ণু সকলেরই কারণ, এবং আমিও সেই বিষ্ণুরই একটি শুঁড় অন্য নহি। এইরূপ চিন্তাকেই বিষ্ণুর স্মরণ কহে।

ব্রাহ্মণ উক্ত রূপে বিষ্ণুর স্মরণ করিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে খুঁৎ খুঁৎ রহিল। অজীর্ণের উপরে আহার করিলে যেমন পেটের মধ্যে পট্ পট্ করে, ব্রাহ্মণেরও মনে ঐরূপ করিতে লাগিল। যেন তখনো ব্রাহ্মণের সেই স্থানে কুত্তার ন্যাজ লাগিতেছে, যেন ঐ স্থানে তখনো সুড় সুড় করিতেছে, বারংবার ঐ স্থান হাত দিয়া মুছিতেছে, কিন্তু কুত্তার ন্যাজের শুড় শুড় লাগিয়া রহিয়াছে। "কি আপদ?" কিছুতেই মন শুদ্ধ হইল না।

"তুলসী পত্র তোয়েন সর্ব্বংজাতি পবিত্র তাং"

তুলসী পত্রোদক স্পর্শে সকলেই পবিত্র হয়। ব্রাহ্মন কতবার যে, তুলসীপত্রের জল মস্তকে চক্ষুতে ও বক্ষে ধারণ করিল, কিন্তু মন শুদ্ধ হইল না, সংশয় রহিয়া গেল যে, "আমি পবিত্র হইলাম কিনা? তৎপর বিষ্ণুপাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন পান করিলেন। আহা সেই বিষ্ণুপাদোদক—

"অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং।
বিষ্ণুপাদোদকং পুণ্যং কোটী জন্মাঘ নাশনং॥"

অর্থ—বিষ্ণুপাদোদক অতি পবিত্র, বিষ্ণুপাদোদক যে পান করে, তাহার অকালে মৃত্যু হয় না, বিষ্ণুপাদোদক পান করিলে সকল রোগই বিনষ্ট হয়, অধিক কি

বলিব? বিষ্ণু পাদোদক পান করিলে কোটি জন্মের পাপ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতেও সংশয় নিবৃত্তি হইল না। খুঁৎ খুঁৎ রহিয়া গেল। ব্রাহ্মণের পোড়া কপাল, বিষ্ণুপাদোদকেও খুঁৎ খুঁৎ। তৎপরে মনে মনে বিচার করিয়া ৺গঙ্গাস্নানের যাত্রা করিল। গঙ্গা সর্ব্বপাপ হরা, কুত্তার হ্যাণ্ডের পাপ কি আর হরণ করিবেন না? তখন রেলওয়ে ছিল না। পাদ যানেই ব্রাহ্মণ চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের গ্রাম হইতে গঙ্গা পনের দিনের পথ। কএক দিন পরে ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণের গৃহে মধ্যাহ্ন কালে অতিথি হইলেন। দৈবযোগে গৃহস্বামী তৎকালে গৃহে ছিল না, ছিল কেবল গৃহস্বামীর বৃদ্ধা মাতা, পত্নী এবং একটি ৮।১০ বৎসরের পুত্র। বৃদ্ধা নিজেই অতি ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মণের পাকের যোগাড় করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ স্নান সন্ধ্যাদি শেষ করিয়া পাক করিল।

পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণ পথিপর্য্যটনে এবং ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়াছিল। অত্যুষ্ণ অন্ন একটু জুড়াইলেই আহার করিব, ইহা ভাবিয়া ঘরের একটী খুটিতে হেলান্ দিয়া চোক্ বুজিয়া আছেন, ইতিমধ্যে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। এমন সময় হঠাৎ একটা কুক্কুর নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ উষ্ণ অন্ন এক গ্রাস মুখে করিয়া দৌড়িল, বাহিরে গৃহের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া ঐ মুখস্থ অন্ন ভূমিতে ফেলিয়া পুনঃ তাহা খাইল, আর "ঘেউ ঘেউ" করিয়া ডাকিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কুক্কুরের শব্দে জাগরিত হইয়া হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া আহারে বসিলেন, (অতি সংশয়াত্মার এইরূপই গতি হয়) গৃহস্থের স্ত্রী ঐ কুক্কুরের কাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ খাইতে বসিয়াছে দেখিয়া আর শাশুড়ী ছাড়া তাহা ব্রাহ্মণকে জানায় নাই। যে ব্রাহ্মণের কুত্তার হ্যাজ পায় ঠেকিয়াছিল বলিয়া পায়ের এবং মনের সুড় সুড় এখনো যায় নাই, তাহারই উদরে এখন কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

উক্ত গৃহস্থের স্ত্রীটি অতি সুশীলা ও ধর্ম্মভীরু। অতিথি ব্রাহ্মণ কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট না জানিয়া ভোজন করিয়াছে, কিন্তু আমি জানিয়াও নিষেধ করিবার অবসর পাইলাম না, বিবেচনা করিবার অবসর পাইলাম না। এই কুক্কুরের বৃত্তান্ত ব্রাহ্মণকে জানান উচিত? না, নাজানান উচিত? যদি না জানাই—তবে যদি আমারই অধর্ম্ম হয়? আর যদি জানাই তাহাতেও ব্রাহ্মণের মনে নানারূপ গ্লানি হইবে, দুঃখ হইবে, তাহাতেও আমারই পাপ হইবে, ইত্যাদি নানারূপ চিন্তায় ঐ দিন গৃহস্থের স্ত্রী আহার করিল না, কাহারও সঙ্গে কথাও কহে না, নিস্তব্ধে বিষণ্ন ভাবে বসিয়া রহিল। শাশুড়ী বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে বৌটী কাঁদিতে কাঁদিতে

ঐ কুকুরের ঘটনা কহিল। তখন শাশুড়ীও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল যে, কুকুরের ঘটনা ব্রাহ্মণকে বলাই উচিত। কেননা তাহা হইলে ব্রাহ্মণ অজ্ঞান-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। না বলিলে আমাদেরই পাপ হইবে। ইত্যাদি চিন্তা করিয়া আদ্যোপান্ত কুকুরের বৃত্তান্ত কহিল।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া শিরে করাঘাত করিয়া রাম রাম, মহাভারত, মহাভারত বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। ভাবিল,—হায় আমি কি দুর্ভাগা? হা ভগবান্! হা নারায়ণ! যে আমি উচ্ছিষ্ট মুখে কুকুরের স্পর্শদোষে দূষিত হইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছি;—সেই আমার,—এই দগ্ধোদরে কুকুরের উচ্ছিষ্টও অধিকার করিল। ক্ষুধায় পরিশ্রমে কাতর হইয়া এই জীবন রক্ষার জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিলাম, ভাগ্যদোষে আমার বিপরীত ফল ফলিল—অথবা ইহা অসম্ভব নহে,—

"বিষম প্যস্থতংকচিত্তবে—
দস্থতং বা বিষমী খরেচ্ছয়া॥"

দেখা যায় ঈশ্বরের ইচ্ছায় কখনও বিষেও অমৃতের কার্য্য করে। আর কখনও বা অমৃতও বিষে পরিণত হয়।

এই গৃহস্থেরা আমার আতিথ্য সৎকার ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে করিল, কিন্তু মন্দ-ভাগ্য আমারই অবিমৃষ্য কারিতার ফলে জাজ্বল্যমান দুস্কৃতির ফল ঘটিল। সংপ্রতি আমি মনে করি কুকুরোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া জীবন অপেক্ষা মরণই শ্রেয়স্কর।

এখন কি কর্ত্তব্য—গঙ্গাস্নানে এই কুকুরোচ্ছিষ্ট ভক্ষণের পাপ নষ্ট হইবে কিনা? এইরূপ বদ্ধমূল সন্দেহে বারাণসীতে গমন করা উচিত। যেহেতু,—

"গঙ্গায়াস্তু কৃতং পাপং বারাণস্যাং বিনশ্যতি।"

এইরূপ শাস্ত্র আছে।

গঙ্গাতে পাপ করিলে বারাণসীতে সেই পাপ বিনষ্ট হয়। এখন কপালে যা থাকে তাই হইবে,—এখন আমি ৺কাশীধামেই যাইব এইরূপ স্থির করিয়া পদব্রজে তথা হইতে ৺কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

কতিপয় দিনের পথ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ বিবিধ দুশ্চিন্তায় এবং দীর্ঘপথ অতিক্রমণে কাতর হইল। তখন অপরআর এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি ভাবে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তুলসী তলা লেপন করিয়া এক অর্দ্ধবৃদ্ধা বিধবা আহ্নিকে বসিয়াছে, বিধবার পরিধানে সাদা তসর, গায়ে নামাবলী, হাতে হরিনামের

মালা, গলায় তুলসীর মালা, পার্শ্বে ফুলের সাজি, সম্মুখে পঞ্চপাত্র ইত্যাদি। দেখিলে বোধহয় যেন সতী সাবিত্রী বা অরুন্ধতী স্বর্গচ্যুতা হইয়া ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণের বিধবা সমাগত ব্রাহ্মণ অথিতিকে দেখিয়া (আহ্নিকে বসিয়াছেন কথা কহিবেন না) অঙ্গুলি সঙ্কেতে বসিতে বলিলেন। আহ্নিক শেষ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—আহা আজ আমার সুপ্রভাত, সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ্যদেব অথিতি উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিল যে, "মা! তোমার পুত্র আছে?" বিধবা কহিল "আছে, নিকটেই কোথায় গিয়াছে।" এইমাত্র আলাপ।

ব্রাহ্মণের শরীর কতক দুর্ব্বল, বিধবা অতিথি ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া পাক করিয়া পরিতুষ্ট মতে ভোজন করাইল।

কেননা পতি ও পুত্র না থাকিলে সে অবীরা হয়। অবীরার অন্ন খাইতে নাই।

ব্রাহ্মণের ভোজনাবসানে সেই বিধবা কহিল,—"মহাশয়! আমার একটা ব্যবস্থা জিজ্ঞাস্য আছে। বোধহয় আপনি একজন ভট্চায্ পণ্ডিত হইবেন?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"হাঁ, কি ব্যবস্থা বল।" এমন সময় ব্রাহ্মণ দেখিলেন একটি ১৭।১৮ বৎসর বয়স্ক যুবক গৃহে প্রবেশ করিল। যুবকটির মুখে একটু একটু শ্মশ্রু ও গোঁপের রেখা দিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! এই বালকটি কে আসিল?" গৃহকর্ত্রী কহিল—"এই আমার পুত্র।"

ব্রাহ্মণ তাহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া কহিল,—"এখনো কি তোমার পুত্রের উপনয়ন হয় নাই?" গৃহকর্ত্রী কহিল "না।" ব্রাহ্মণ কহিল—"কি সর্ব্বনাশ? আমার বোধ হইতেছে, ইহার বয়স ১৭।১৮ বৎসরের ন্যূন হইবে না, তবে ত ইহার উপনয়নের কাল অতিক্রম হইয়াছে, এখন ত ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত আর উপনয়ন হইতে পারে না। কি সর্ব্বনাশ? করিয়াছ কি? কেন এমন করিয়াছ?"

গৃহকর্ত্রী কহিল,—"বাবা! এই বিষয়ই আপনাকে একটা ব্যবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিব পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম। এখন আপনি স্বয়ংই সেই কথা উঠাইলেন, ভালই হইল। তবে কারণ শুনুন,—

এই গ্রামের অনতি পশ্চিম ভাগেই ইহার একখুড়া আছেন। তিনি বলেন,—আমার এই ভ্রাতুস্পুত্রকে আমি যথাবিধি যজ্ঞোপবীত দেওয়াইব। আবার এই গ্রামেরই অল্প দক্ষিণে মিঞা খোদা বকস কাজী বাস করেন। তিনি বলেন (এই

সময় ঐ বিধবা মুখপুড়ি একটু ঘোমটা টানিয়া মুচ্‌কে হাসিয়াছিল, বোধহয় ব্রাহ্মণ তাহা লক্ষ্য করে নাই।) ইসলাম্ ইমান্ মতে এই বালকের "সুন্নত" (ত্বক্‌চ্ছেদন) করাইব। এই দুজনের বিবাদেই এখনো ইহার পৈতা হয় নাই। এস্থলে আমার এই জিজ্ঞাস্য যে, এখন কি কর্ত্তব্য? ভট্‌চায্যি মহাশয় কিন্তু এখনো ইহার অন্তর রহস্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিয়া বিস্ময় সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি? ব্রাহ্মণের ছেলেকে ত্বক্ ছেদন করিবে কেন? এই ম্লেচ্ছ প্রধান গ্রামে কি এতই অরাজক? ইহার শাসন কর্ত্তা কেহই নাই? কি সর্ব্বনাশ?

ব্রাহ্মণী মনে মনে ভাবিল,—দেখিতেছি এই ব্রাহ্মণ নেহাত বোকা অরসিক, একটু পোড়ারমুখে হাসিয়া কহিল,—মহাশয়! শুনুন—এ গ্রামে কোন শাসক নাই বা অরাজকতা তাহা নহে। কিন্তু আমার স্বামীর সহিত মিঞা খোদাবক্‌সের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এমন কি আমার স্বামী বাড়ীতে না থাকিলেও সময়ে অসময়ে খোদা বক্‌স আমার তত্ত্ব তলাস লইতে আসিতেন। এই পুত্র যখন গর্ভস্থ, তখন এই বালকের পিতা অথবা আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিনা যে এই বালক * * * হইতে না আমার স্বামী হইতে হইয়াছে? এই সংশয়স্থলে কি করা কর্ত্তব্য? কি পৈতা করাই? না, সুন্নত করাই? কি করিলে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হয়? শাস্ত্রের বিধান কি আছে? এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণী একটু অধিক করিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই ব্যাভিচারিণীর কথা শুনিয়া হায় হায়, রাম, রাম করিয়া হাত মাথায় চাপড়াইতে লাগিলেন। হা অদৃষ্ট! হা অদৃষ্ট! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আর ভাবিলেন,—হায় আমি কি মূঢ়তম? আমি এই দগ্ধ উদরের জন্য অজ্ঞান কুলশীলার হস্ত পাকান্ন খাইলাম। আমি অমৃত ভ্রমে গরল খাইলাম। আমি বেশভূষা দেখিয়া তপস্বিনী ব্রাহ্মণী ভ্রমে মুসলমানীর ভাত খাইলাম। হায় রে আমার অদৃষ্ট!—

আমার যে কুক্কুর স্পর্শের পাপ একবার মাত্র বিষ্ণু স্মরণে কোথায় পালাইয়া যাইত। হায়, আমি তাহাতে কেন বিশ্বাস না করিলাম? আমি অতি তুচ্ছ পাপের আশঙ্কায় অপার পাপ-সাগরে ডুবিলাম। হা বিশ্বনাথ! এখন তুমি দয়া না করিলে আর আমার নিস্তার নাই।

তৎপরে সেই যবনী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয়! আমার কি উত্তর দিবেন দিন। আমার অনেক কায আছে, আমি আর বসিয়া থাকিতে পারি না।

ব্রাহ্মণ কহিল—বেশ—লক্ষ্মী মণি! যদি তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর করিতে পার,তবে আমিও তোমার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারি।

তখন হিন্দু-বিধবার বেশধারিণী মুখপুড়ী যবনী কহিল—বলুন আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে?

ব্রাহ্মণ কহিল—বল ত লক্ষ্মী মণি! এখন আমি "কাশী যাই? না মক্কা যাই?" "সন্ধ্যা করিব না নমাজ পড়িব?"

নির্লজ্জা ভ্রষ্টা কহিল—মহাশয়! হিন্দু আর মুসলমান ত মনের ধাঁদা, সকলই ঈশ্বরের সৃষ্ট। মক্কা বহুদূর এবং খরচান্তের পথ। যদি পারেন ত মক্কা যাওয়াই বা মন্দ কি? যেমন কাশীতে বিশ্বেশ্বর আছেন, তেমন সেথাও ৺মক্কেশ্বর শিব আছেন। মহাশয়! আপনি পণ্ডিত জ্ঞানী, রাম আর রহিমে কি ভেদ আছে? আপনি কি অমর কবি গিরিশচন্দ্রের গীতে শোনেন নাই?

"রাম রহিম্ না জুদা করো
দিল কো সাচ্চা রাখো জী"

ব্রাহ্মণ শুনিয়া অবাক্। অদৃষ্টকে নানারূপ তিরস্কার করিতে করিতে ৺কাশী ধামে চলিলেন।

অতএব অত্যন্ত সংশয় শুচিবাই খুঁৎ খুঁৎ ভাল নহে। তাহার পরিণাম ঐরূপ। তাই ঋষি বলিয়াছেন,—

"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"

প্রতিফল।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

যখন আমি—সমর কুশল ঘোটকের মত সগর্ব্ব পদক্ষেপে পরীক্ষা গৃহের দুরারোহ সোপানগুলি অতিক্রম করিতে ছিলাম। আশা যে সময়ে—হিমাদ্রির কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গকে উপহসিত করিয়া ঊর্দ্ধদেশে বিচরণ করিত; কল্পনা যে সময়ে—স্বপ্নময় কাব্যময় বিশ্বে, ভোগময় প্রাণময় স্বর্গে খেলিয়া বেড়াইত; মন যখন পিঞ্জর মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীনভাবে মেঘাকাশের চারিধারে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত—সে এক সময় গিয়াছে! সে এক বয়স গিয়াছে—যখন কাব্যের কল্পনামূর্ত্তি ধরিয়া হৃদয় রাজ্যে রাণী হইয়া বসিত, বাছা বাছা কবিত্বময় বিশেষণ দিয়া প্রেমকথা কহিত, কোন অজ্ঞাত স্বপ্নময় স্রোত ধারায় ভাসাইয়া অগাধ অনন্ত প্রেমসমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া যাইত!

একদিন পাঠ গৃহে বসিয়া অনুসূয়া চরিত্রটি সংসারের উপযোগিনী কিনা—এ বিষয় চিন্তা করিতেছি—এমন সময় চির পরিচিত কণ্ঠে কে ডাকিলেন, "রমণ রমণ!" সম্মুখে আমার ভগ্নীপতি। তাঁহার মুখে শুনিলাম, তিনি তাঁহার ভ্রাতার জন্য কন্যা দেখিতে যাইবেন ও বাবাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আমাদের বাটী আসিয়াছেন। শুনিলাম আমাকেও নাকি ইঁহাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। বনচ্ছায়া সঙ্কুলপল্লীগ্রাম, কর্দ্দম সিক্ত গ্রাম্যপথ কিরূপ—তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইল। আর আমি একটু আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছিলাম। কারণ আমি জানিতাম যে,—আমার জন্ম—কেবল পরীক্ষা দিবার জন্যই, আমার কার্য্য—পরীক্ষকের কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই; আমি যে অন্য কার্য্যেও লাগিতে পারি ইহার জন্য আনন্দও হইল।

ভগ্নীপতির অনুরোধে পিতার অনুমোদনে আমি সঙ্গের সাথী হইলাম। শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠা হইল। পথের শষ্প শ্যাম ধান্য-বৃক্ষগুলির স্নিগ্ধ চিক্কণছবি আমার বড়ই ভাল লাগিল, তাহের উপর উপবিষ্ট পাখি গুলির মধুর স্বর বড়ই তৃপ্তি দিল। "এইটি কোন গ্রাম ঐটি কাহার বাড়ী" এই প্রকার প্রশ্ন করিয়া ভগ্নীপতিকে জ্বালাতন করিতে লাগিলাম। একটি বিশাল হর্ম্ম্য দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—"রমণ, এই বাড়ীটি সাহিত্য-সম্রাট, বঙ্কিমচন্দ্রের, এই গ্রামের নাম কাঁঠালপাড়া।" সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্র ভাবিয়া আমি সাগ্রহে নমস্কার করিলাম। বঙ্গদর্শনের মন্দির দেখিয়া সার্থক হইলাম।

চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া যখন দুইখানি গো-যান ভাড়া করা হইল; ভাবিলাম, নূতন রকমের গাড়ী চড়িয়া একটি নূতনত্বের আস্বাদ পাইব! কিন্তু যাহা পাইলাম, তাহার জন্য জীবনে আর কখন উদ্‌গ্রীব হই নাই। সেই মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকী সেই দেহে দেহে অযাচিত তীব্র আলিঙ্গন, সেই এক সঙ্গেই অবরোহণ আমার স্মৃতিপটে চির জাগরূক আছে। ভগ্নীপতি ও আমি এক গাড়ীতে। তাঁহার মুখে "কন্যা পছন্দ আমিই করিব" শুনিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইলাম। আমার মত কল্পনা নিপুণ ভাবুকের পছন্দ কাব্যে উপন্যাসে যেমন সহজে ঘটে, সংসারে তেমন সহজে ঘটে না। হা অদৃষ্ট বঙ্কিম বাবুর কুন্দ তিলোত্তমা কপালকুণ্ডলা যাহার আকাঙ্খিত, আয়েষা, সূর্য্যমুখী, লবঙ্গ যাহার স্ফীত—পল্লীগ্রামের নিরক্ষরা বালিকায় তাহার মন উঠিবে কি?

(২)

. পল্লীর দৃশ্য বড়ই মনোরম লাগিল। কাঁচা পথ গুলি, পথের ধারের বৃক্ষ-

শ্রেণীর ছায়াগুলি মকমলের শয্যা ও কোমল চাঁদোয়ার কায করিল। গ্রাম্যপ্রান্তে ক্ষুদ্র নদী—সেই নদী তীরে ভ্রমণ সূর্য্যোদয় দর্শন কত প্রীতি-প্রদ ও সুন্দর।

কন্যা দেখিলাম। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা শৈশব ও কৈশরের সন্ধ্যার গোধূলির মত জীবন্ত একখানি চিত্রপটের মত সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সৌন্দর্য্যের মোহময়ী প্রতিমা—আপনার অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছলিত রূপ লাবণ্য ধারায় আমাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। নীলেন্দীবর কৃষ্ণ চক্ষু একটি স্নিগ্ধ মধুর জ্বালাবর্ষী শিখারপানে চাহিয়া চাহিয়া আমি মুগ্ধ—দগ্ধ হইলাম। আপনা হারা—তন্ময় হইয়া—সেই রূপরাশির তড়িল্লীলা দেখিতে লাগিলাম। নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, এস্রাজ কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল "বিজলী।" কাব্যে যাহা আদর্শ ভাবিতাম, কল্পনায় যেমনটিকে সঙ্গিনী করিব ঠিক করিয়া ছিলাম, মানস পটে যে ছবি চিত্রিত করিয়া জীবনকে স্বর্গরাজ্যের সুখময় ক্রোড়ে তুলিয়া দিব ভাবিয়াছিলাম—তাহাই আজ বাস্তব দেখিলাম।

কন্যা পছন্দ হইল। দেনা পাওনা বাদ প্রতিবাদ, জল্প বিতণ্ডা, অনুরোধ উপরোধ সমস্তই যথারীতি সমাপন হইল। কন্যাকর্ত্তা উদার, দাতা, কোন বিষয়ে কৃপণতা করিলেন না। সর্ব্বশুদ্ধ ৩ হাজার টাকা দেয় স্থির হইল। সুখে দুঃখে আশায় নিরাশায় ভগ্নীপতি ও আমি গৃহে ফিরিলাম। যে প্রাণ লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, সে প্রাণ লইয়া আর ফিরিলাম না। পথের হরিৎক্ষেত্র আর তেমন শোভন ও নয়নরঞ্জন বোধ হইল না; শূন্যতায় মন ভরিয়া উঠিল। কি জানি কেন, অন্তরের নিভৃততারে বিষাদময়সুর থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল। পিতৃদেব আমাদের সহিত ফিরিলেন না, তথায় থাকিয়া গেলেন। কারণ পরে বুঝিলাম।

(৩)

কয়েকদিন পরে পিতৃদেব বাটীতে ফিরিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম—কন্যার পিতা ভগ্নীপতির ভ্রাতার অপেক্ষা আমাকেই স্পৃহনীয় সুপাত্র ভাবিয়া আমাকেই জামাতা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এজন্য পিতৃদেবকে অনুরোধ করায় পিতৃদেব ইহা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

সেই পরম দেবতা আদেশ করিলেন—তাঁহার কথামত আমাকে চলিতে। তাঁহার আজ্ঞার উপর আর কথা কি? উপস্থিত এই ব্যাপারটি ভগ্নীপতির নিকট

গোপন রাখা হইল। আমি বুঝিলাম, কাজটি ভাল হইতেছে না। শেষে অনুতাপ করিতে হইবে, প্রতারণায় কখন শুভ ফল ফলে না। এই ব্যাপার শুনিয়া ভগ্নীপতি কি ভাবিবেন, কি বলিয়া এই বিশ্বাস ঘাতকতার কৈফিয়ৎ দিব; এ কালামুখ লইয়া কেমন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইব! আমার জীবন-তন্ত্রীতে নূতন সুর নাই বাজুক, মধুময়ী মূর্চ্ছনা নাই ফুটুক, আশা অপূর্ণ থাকে থাকুক, পরায় উজ্জ্বল আলোক চিরতরে নিভিয়া যায় যাউক,--তথাপি অন্যায় উপায়ে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন নাই, পাপের ভিত্তির উপর ধর্ম্ম প্রসাদ গড়িয়া তুলিবার আবশ্যক নাই।

ভগ্নীপতি জানিলেন তাঁহার ভ্রাতার সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ হইবে না, কন্যার পিতা আপত্তি করিয়াছেন।

বিবাহের সময় সময় ভগ্নীপতিকে জানান হইল যে, পাত্রীর পিতার একান্ত অনুরোধে আমার সহিতই উক্ত কন্যার বিবাহ হইবে। আমি অপরাধীর মত অফিসে ভগ্নীপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি উদার, স্নেহময়, আমাকে আদর করিলেন বটে, কিন্তু দেখিলাম তাঁহার মুখ ভার, অভিমানে অধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল। আমার পানে চাহিয়া কহিলেন,—"ভাই, তুমি সুখী হও! শ্বশুর মহাশয় আমাকে না জানাইয়া গোপনে এই কার্য্য কেন করিলেন? আমার ভ্রাতার বিবাহ আটকাইবে না, তোমার মত সোণারচাঁদ ছেলের সুন্দরী পাত্রীরও অভাব হইবে না! এই কার্য্য করা কি ভাল হইল?" পিতৃকৃত অন্যায়াচরণের লঘুত্ব বুঝাইয়া ভগ্নীপতির মনোদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিলাম। শেষে তাঁহার পায় ধরিয়া ক্ষমা চাহিলাম। তিনি এইটুকু স্বীকার করিলেন যে, আমার বিবাহের বরযাত্রী হইয়া কন্যাকর্ত্তার গৃহে যাইবেন না, তবে বউভাতের দিন ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইবেন।

(৪)

অনেক আশা ভরসায়, উৎসাহে আনন্দে ও বিষাদে দৈন্যে, বিবাহ করিতে গেলাম। বিবাহ একপ্রকার হইয়া গেল। যাহা দেওয়ার কথা হইয়াছিল, তাহা দেওয়া হয় নাই বলিয়া আমার পিতৃদেব ও মাতুল মহাশয় আপত্তি তুলিলেন; সে আপত্তির আর কোন ফল হইল না। ভোজনের আয়োজন চিড়া দই। বাসা সদ্য গোময় লিপ্ত শত ছিদ্র বারোয়ারী তলার মণ্ডপ। অলঙ্কার গুলি স্বর্ণের নহে। এই ব্যবহারে পিতা নির্ব্বাক নিস্পন্দ! এই বিবাহে যে প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল, প্রতারণার যেমন প্রতিফল ফলিল—তাহা পিতা ও আমি বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া, অন্তরের দুঃখ কালিমা মুখে চক্ষুতে প্রতিফলিত করিয়া নববধূসহ বাটী ফিরিলাম। পথে শুনিলাম, ঐ দিনই এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ভগ্নীপতির ভ্রাতারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কোথায় কাহার কন্যা কোন দিবসে বিবাহ—এ সকল সংবাদ দেওয়া ও আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় আমরা—ব্যবহারে এতই পর হইয়া গিয়াছি। লজ্জা ক্ষোভে দুঃখে অন্তর দগ্ধ হইয়া গেল।

বউভাত—গৃহ আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ। সকলের মুখে উৎসাহ ও আনন্দের অভিব্যক্তি। সভাক্ষেত্রে কোলাহলময়। এমন সময়ে ভগ্নীপতি আমার ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। একি! সঙ্গে অবগুণ্ঠিতা এ বধূ কে? বুঝিলাম, তাঁহার নব বিবাহিতা ভ্রাতৃবধূ। ভগ্নীপতি বলিলেন,—"রমণের বউটিকে এইস্থানে আনাও, আমি দেখিব! বউ আনা হইল, ঘোমটা উন্মোচিত হইবামাত্র ভগ্নীপতি দুই হাত পিছাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! এত সে মেয়ে নয়।" মহাগোলোযোগের সৃষ্টি হইল। সে কোলাহলের তরঙ্গোচ্ছাস অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, সারাগৃহে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। আমি বড় বিস্মিত হইলাম না; বিবাহের রাত্রেই এ প্রতারণা, এই কন্যা পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিয়া ছিলাম। পাপের প্রতিফল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলাম। পিতৃদেবও স্বকৃত কর্ম্মফল বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

আমার রুদ্ধ দুঃখ উচ্ছাসিত হইয়া উঠিল। পিতার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া আপনেরই রোপিত বিষবৃক্ষের ফল বলিয়া এতদিন যে দীর্ঘ নিশ্বাস গুলি বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া ছিলাম—আজ তাহা যেন একযোগে বাহির হইয়া পড়িল। অস্থিপঞ্জর ভেদ করিয়া যে গাঢ় যাতনা ভার আমাকে এ কয়দিন জীবন্মৃত রাখিয়া ছিল—আজ তাহা ক্রন্দন আকারে উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম,—বলিলাম, পাপের প্রতিফল! তখন ভগ্নীপতি গরল মাখা হাসি হাসিয়া, উপহাসের তীক্ষবানে আমাকে ব্যথিত করিয়া ভ্রাতৃবধূর ঘোমটা উন্মোচন করিতে আদেশ করিলেন; দেখিলাম—আমার কল্পনা রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—পারিজাতকুসুমময়ী নন্দন লক্ষ্মীর মত সহাস্যে দণ্ডায়মানা। এই মর্ম্মোভেদী বিয়োগান্ত অভিনয়ে অজ্ঞান বালিকা—সংসার অনভিজ্ঞা মুগ্ধ বালিকা আনন্দের হাসি হাসিতেছে। সে হাসি কি তীব্র, কি জ্বালাবর্ষী, কি মাদকতাময়! আমি আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই ভীষণ ঝটিকার বেগ সহ্য করিবার মত আমার শক্তি ছিল না,—আমি মূর্চ্ছিত হইয়া তাহারই পদতলে পড়িয়া গেলাম। পাপের প্রতিফল, কঠোর ঘাত প্রতিঘাতে সেই দিনটি আমার চিরস্মরণীয়।

নৈরাশ্য।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বগলাকুমার দে বি,এ,।

কেন জাগিয়ে তুলে, কাঁদিয়ে দেয়
লুকান মরম ব্যাথা—
কেন স্বপনের ছবি উঠ্‌ছে ফুটি
তুল্‌চে আশার কথা?

যদি মিশিয়ে গেছে, অসীম দূরে
ক্ষীণ আলো-ছটা টুক।
যদি মুছিয়ে নীর জগৎ চাহে
হাঁসির কপট সুখ।—

যদি ক্ষুব্ধ আমার দগ্ধ হিয়ায়
অনল রহিল বাকি—
আহা! প্রাণের তুমি, সাধের তুমি
তোমায় জ্বালা দিব কি?

—:০:—

মতিভ্রম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রসময় লাহা।

মশক-দংশনে হয়ে জ্বালাতন
ঘুম নাই সারা রাত;—
তাই গৃহান্তরে শুইল দুজনে
'ভুলো' আর ভূতনাথ।'

চক্ষু মুদি' সুখে কহে ভূতো—"আজ
ঘুমিয়া বাঁচিব, ভুলো,—
মোদের না পেয়ে, মরিবে না খেয়ে,
ডেকে ডেকে মশাগুলো।"

"ঘুমাবি কি, ভূতো চেয়ে দেখ ঘরে,
ঢুকিছে জানালা দিয়ে,—
সেই মশাগুলো খুঁজিতে মোদের
চুপি চুপি আলো নিয়ে।"

"তাই ত!"—অবাক্ দেখে ভূতনাথ,
হত ভম্ব দুই বোকা;
সে আঁধার ঘরে গোটা দশ বারো
নিরখি' জোনাকী পোকা।

—:•:—

জন্ম।

লেখক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী

কোথা হ'তে এইচি আমি
জানি নাক কোথায় হবে যেতে।
সুখ দুঃখের জগৎ মাঝে
জান্‌ছি কিন্তু রইচি বাসা পেতে॥
দেখে শুনে হয় বিশ্বাস—
এমন শক্তি আছে আমার হাতে।
চেষ্টা কর্‌লে পারি আমি
সুখটা কিম্বা দুঃখটা বাড়াতে॥
পৃথিবীটা দেখ্‌চি আছে,
সুতরাং মান্‌তে হচ্ছে এর অস্তিত্ব।
কেন আছে—সেইটা ভেবে
মাথা খারাপ কর্‌বে কে হায় নিত্য॥
জীবনটা খুব ক্ষুদ্র আমার—
আছি আমি ক্ষুদ্র স্থানটি জুড়ে।
ইচ্ছা কর্‌লে কিন্তু পারি
স্থানটি দিতে—সোনার পাতে মুড়ে
গোলের কথা হচ্ছে এই যে—
আত্মাদরটা নাই আমাদের মোটে।
থাক্‌লে পরে ওই জ্ঞানটা
খাট্‌ত সবাই একমনে এক জোটে॥
জান্‌বে আসা এই জগতে
সৃষ্টিটাকে মধুর মিষ্ট কর্‌তে।
কীট পতঙ্গ পশুর মতন
নয়কো খেয়ে আর ঘুমিয়ে মর্‌তে॥
মন্দগুলো কর্‌তে ভাল
পার্‌তাম যে ভাই সে আত্ম-বিশ্বাসে
দুখের মুখে সুখের হাসি
উঠ্‌ত ফুটে কেমন অনায়াসে॥

ভবঘুরের মতন ঘোরা
সবাই এসো ক'রে দিয়ে বন্ধ।
দুখগুলা না গাঁটে বেঁধে
বাঁধ এসো সে নির্ম্মল আনন্দ।
পরের ছিদ্র খুঁজ্‌বে না আর
ঐটা জান্‌বে ক্ষুদ্র মনের কর্ম্ম।
উচ্চ চিন্তা সঙ্গে রাখ
সেইটা তোমার হবে অঙ্গে বর্ম্ম॥
জান্‌বে তুমি—এজগতে
মহোদ্দেশ্যে তোমার অভিব্যক্তি।
সে সত্য শাশ্বতের তুমি
অংশরূপে ধর মহান্ শক্তি॥
তোমার তরে এ জগৎটা
রাখবে মনে-জগৎ তরে তুমি।
তা নইলে জন্মে মানুষ
দেখ্‌তে না ভাই এই মর্ত্ত্যভূমি॥
যে উদ্দেশ্যে এ সৃষ্টিটা
সে উদ্দেশ্যে জান্‌বে তোমার সৃষ্টি।
ক্ষুদ্র আকার বিশ্ব তুমি—
কেওকেটা নও তুমি যে জিনিসটী॥
অসীম শক্তি ধর তুমি
জান্‌বে আছে তোমার মহামূল্য॥
কার্য্য-কারণ-সাগর মাঝে
নয়কো তুমি ক্রীড়ার পুতুল তুল্য॥
গোল ক'রো না গোলের মাঝে
পড়্‌লে পরে বেজায় গুলিয়ে যাবে।
যার ভাবে ভাবময় হে তুমি—
থাক মগ্ন সদাই তারই ভাবে॥

—:○•○:—

গান।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার বিরচিত।

(দ্বাবিংশ বার্ষিক বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সভায় গীত।)

ভূপালী,—একতালা।

কেন জাগে না জাগে না প্রাণ;
হে সাগর গরীয়ান!
জাগাইতে নিত্য সত্য
তোমার জীবন-গান।
কি করুণ প্রাণে দিতে কত জ্ঞান,
জাগায়ে তুলিতে জননীর ধ্যান,
শিখাতে আদর্শে দম-দয়া-দান,
কে পারে শিখাতে তোমার সমান।
যে বঙ্গ-সাহিত্যে, যে বঙ্গ ভাষায়,
আজি মধ্যমণি উজ্জলে বিভায়
তুমি না সৃজিলে কে সৃজিত তায়
কে রাখিত বঙ্গজননীর মান।
হে দয়ালদাতা বিধাতা ভাষার,
স্মরণের দিন যাচি বার বার,
ভেঙ্গে যাক্ ভুল মোহের বিকার,
বরিষ আশীষ, জগত-কল্যাণ॥

বাহার,—একতালা।

হ'ল অবসান, আজিকার গান
সাঙ্গ স্মৃতি-সম্মিলন।
র'বে কি জাগিয়ে পরাণে মিশিয়ে
মিলনের আলাপন॥
মহান্ চরিত গীতে, যে ভাব জাগিল চিতে,
পারিল কি এনে দিতে,
ফিরে চির জাগরণ॥
যদি ফিরে জেগে থাক, আদর্শে জাগায়ে রাখ,
ফিরে যেন ভুলো নাকো.
হ'য়ে মোহে অচেতন॥
শুভদ বরদবাণী, তাহারি হৃদয় ছানি
তাহারি করুণা আনি
ক'রে বিশ্বে বরিষণ॥

গীতোক্ত ধর্ম্ম।

কর্ম্ম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আত্মতত্ত্বজ্ঞ না হইলে কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রকারে হইবার কথা নহে, যখন এই আমি, তুমি হইয়া যাইবে, আর তুমি ও আমিতে পার্থক্য বোধ রহিত হইবে, তখনই কর্ম্মার্পণে অধিকারী হইতে পারিবে। গীতা বলিতেছেন, অধ্যাত্মচিত্ত না হইলে কর্ম্মার্প হইবার উপায় নাই।

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"

শ্রীভগবান কহিতেছেন, "আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা নিক্ষেপ করিয়া কিছুমাত্র আশা বাসনা না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর।"

কথা হইতেছে, মমুক্ষুব্যক্তিদিগকে যাবতীয় কর্ম্ম অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা আমাকে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যাবতীয় কর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন, দেখিতে গেলে কর্ম্ম দুই প্রকার, প্রথম ব্যবহারিক, দ্বিতীয় বৈদিক বা শাস্ত্রীয়, স্নান ভোজন আহার বিহার বাক্যালাপ যুদ্ধ বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি ব্যবহারিক কর্ম্ম এবং যজ্ঞ দান তপস্যা জপ তপ প্রভৃতি বৈদিক বা শাস্ত্রীয় কর্ম্ম, এইসকল কর্ম্ম যাহাই কেন করনা সকলি কিন্তু অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা আমাকে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

এই কর্ম্মার্পণ ব্যাপার বড় কঠিন, গীতোক্তধর্ম্মে যত প্রকার যোগ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই কর্ম্ম যোগই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্জ্ঞেয় এবং দুঃখবোধ্য। এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এই চারিটি, অধ্যায়ে কেবলমাত্র এই কর্ম্মের কথা আছে। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক অধ্যায়েই এই অতি কঠিন সমস্যাপূর্ণ কর্ম্মের কথা কিছু না কিছু বলা হইয়াছে। এই কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইবে, এই জন্য এইকর্ম্মযোগ সম্বন্ধে এত বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে।

যাহা হউক এখানে এই অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা কর্ম্মার্পণ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা যাউক, প্রথমেই একটা উপমা লওয়া যাউক। মনেকর দ্বারস্থিত

একজন দৌবারিক একজন ভদ্রলোককে বাটী প্রবেশে বাধা দিল। বাধা দিল কেন? না সে জানে, সে তাহার নিজের কর্তৃত্বে এ কার্য্য করে নাই। সে তাহার মনিবের পূর্ব্বাজ্ঞানুসারেই এই কার্য্য করিয়াছে, অর্থাৎ মনিবের কর্তৃত্বকে নিজের উপর আরোপ করিয়া এই কার্য্য কিনা বাটী প্রবেশে বাধা দিয়াছে। দৌবারিক যেমন মুনিবের কর্তৃত্বকে (শক্তিকে) নিজের উপর আরোপ করিয়া এই কার্য্য করিল, তেমনি জীব যদি কোন কর্ম্ম করিবার সময় ভগবানের কর্তৃত্ব জানিয়া কর্ম্ম করে, তবে তাহার তো আর কোন কর্তৃত্বাভিমান বা তজ্জনিত আমিত্বও থাকে না।

মানুষ যদি বিচার করে, শ্রীভগবান যন্ত্রী, জীব যন্ত্র, শ্রীভগবানই জীবের আত্মা, তিনিই তাহার হৃদয় রাজ্যের একমাত্র রাজা তাহা হইলে তো কোন কর্ম্মেই অভিমান আসে না, কিন্তু কেন এমন হয়? মানুষের এই অহং জ্ঞান কোথা হইতে আইসে? মানুষ এই অহং অভিমানে কর্ম্ম করিয়া কখনও সুখী হইতেছে, আবার কখন দুঃখীও হইতেছে, তাই জিজ্ঞাসা করি এই সুখ দুঃখাত্মক অহং অভিমান জীবের কোথা হইতে আইসে? গীতা বলিতেছেন, মানব শ্রীভগবানের অখণ্ডিত অপরিচ্ছিন্ন অহংকে নিজের খণ্ডিত চৈতন্যে আরোপ করিতেছে বলিয়াই এই অজ্ঞানতা এই কর্তৃত্বাভিমান আসিতেছে, আসল কথা কর্ম্ম করিতেছে প্রকৃতি বা শক্তি এই শক্তি আর কেহই নহেন, ইনি ঈশ্বরের শক্তি। এক্ষণে বল দেখি, সেই অখণ্ডচৈতন্য সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারাই যদি কর্ম্ম হইল, তখন সেখানে আবার খণ্ডিতচৈতন্য তুমি কর্ত্তা হইবে কিরূপে?

আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা সম্পাদিত হইবে, আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা অবস্থিত হইবে, তাহাই অধ্যাত্ম. এক্ষণে চিত্তকে আত্মাতে অবস্থিত করিতে পারিলে তবে না অধ্যাত্মচেত হওয়া যায়?

কিন্তু কথাটি শুনিতে যত সহজ কার্য্যে তত সহজ ত নহেই পরন্তু বড়ই কঠিন, কেননা চিত্তের একদিকে যেমন আত্মা তেমনই অন্যদিকে আবার অনাত্মা বা বিষয়,চিত্ত এই আত্মা এবং অনাত্মা বা বিষয় এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন, এই আত্মা অনাত্মা মধ্যস্থ চিত্তকে আত্মার দিকে পরিচালিত করিতে পারিলে কল্যাণ এবং অনাত্মা বা বিষয়ের দিকে পরিচালিত হইলে সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণ হইয়া থাকে, নতুবা আত্মারও কোন কর্ম্ম নাই, যাহা পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বদা শান্ত তাহার আবার চলন বা স্পন্দন কোথায়? "অহং কর্ত্তা" এ অভিমানও আত্মার নাই, পুরুষের সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হয় এই জন্যই একমাত্র

প্রকৃতির গুণেই কর্ম্ম হইয়া থাকে।

বড়ই গোলযোগের কথা আসিয়া পড়িল, তাই বলিতেছিলাম গীতায় এই সুগভীর কর্ম্মতত্ত্ব বোধগম্য হওয়া বড়ই সুকঠিন যাহাহউক দেখা যাউক।

প্রশ্ন হইতেছে এই "অহং কর্ত্তা" জ্ঞান আত্মাতেও নাই, প্রকৃতিতেও নাই, তবে এই অহং অভিমান কোথা হইতে আসিতেছে?

বলিয়াছি তো আত্মা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বশক্তিমান, শক্তি যখন শক্তিমানে অবস্থিত থাকেন তখন পরম শান্ত একমেবদ্বিতীয়াম তখন পর্য্যন্ত সৃষ্টাদি ব্যাপার কিছুই নাই, তা আবার অহংএর স্থান হইবে কোথায়? তারপর যখন শক্তিমান ও শক্তির ভেদ হইয়া স্পন্দন বা চলন আরম্ভ হয়, তখন হইতেই প্রকৃতির এই গুণবৈষম্য ঘটিতে থাকে, এই যে শক্তি ও শক্তিমানের পার্থক্যের কথা বলা হইতেছে, ইহাও কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমানের সংকল্প বিকল্পের অধীন, তাঁহার সংকল্প অনুসারেই তিনি প্রকৃতির সহিত একত্রিত, তিনি যখন সংকল্প করেন, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম, আবার যখন তিনি কোন প্রকার সংকল্প না করেন, তখন তিনি গুণাতীত নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয়; এই শেষাবস্থায় তিনি মায়াতীত এবং প্রথম অবস্থায় তিনি স্বইচ্ছায় মায়াকে গ্রহণ করিলেন, যখন হইতে এই মায়ার কার্য্য হইতে থাকে, তখন হইতে "অহং কর্ত্তা" এই অভিমান স্পষ্ঠতঃ জাগিয়া উঠে, কিন্তু এই যে, অভিমান ইহা ব্রহ্মের বা প্রকৃতির নহে, কিন্তু ব্রহ্মের উপর যে প্রকৃতির বা মায়ার ছায়া ভাসে ইহা তাহার।

কথাটা আরও সহজ করিয়া বুঝিবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক, মনে কর,—একটি মাঠ চতুর্দ্দিকে ৪।৫ ক্রোশের মধ্যে কোন গ্রাম বা লোকালয় নাই, এই মাঠের মাঝখানে তৈলকাষ্ঠ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ সমুহ একত্রিত করিয়া অগ্নি সংলগ্ন করা হইল, ক্ষণকাল মধ্যেই অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, অগ্নি এই বায়ুর সহায়ে আরও ভয়ঙ্কর হইল, ক্রমে চারিদিকে অনল কণা সমুহ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, ক্রমে বায়ু যখন অত্যান্ত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল, তখন সেই অনল কণা অতি দূরবর্ত্তী গ্রাম গ্রামান্তরে গিয়া ৪।৫ খানি গ্রাম একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দিল। বহু শস্যক্ষেত্রে সেই অগ্নি লাগিয়া একটা মহা অনর্থ সংঘটিত হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই মহাঅনর্থ সংঘটনের দায়ী কে? সেই অনল কণা না তাহার দাহিকা শক্তি? অথবা প্রবল বায়ু? যদি বল অগ্নি, তদুত্তরে বলিব, দাহিকা শক্তি ভিন্ন অগ্নির কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং অগ্নির সাধ্য কি? তবে কি দাহিকা শক্তির?

তাহাই বা কি প্রকারে হইবে? কেননা অগ্নির সহিত দাহিকা শক্তি থাকিলেও সেই দাহিকা শক্তি সমন্বিত অনল কণা যদি বায়ুবেগে বিতাড়িত না হইত, তবে কি প্রকারে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইত? তবেই দেখা যাইতেছে যে অগ্নি দাহিকা শক্তি এবং বায়ু এই তিনের জন্য এই অগ্নিকাণ্ড হইলেও, একমাত্র অগ্নি ব্যতীত দাহিকাশক্তি এবং বায়ু যেমন সহকারি কারণ, অথচ এই সহকারী কারণ ব্যতীত এই অগ্নিকাণ্ড কোনও প্রকারে সংঘটিত হইতে পারিত না।

তদনুরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম, মায়া সঁচলিত সগুণ ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি বা শক্তি এই তিনের উপর কর্ম্মারোপ প্রতীয়মান হইলেও, একমাত্র প্রকৃতি বা মায়ার ভাসমান ছায়া দ্বারাই এই কর্ম্মান্ত হইয়া থাকে, ইহা গীতার উক্তি। সুতরাং বুঝা যাইতেছে অধ্যাত্ম চিত্ত হইতে পারিলে উপযুক্ত গুরুআনুগত্য গ্রহণ এবং সর্ব্বদা বিচার পরায়ণ হওয়া উচিত।

আসল কথাটা হইতেছে যে চিত্তকে জয় না করিয়া মানব কোনও রূপেই অধ্যাত্মচিত্ত হইতে পারে না, কিন্তু এই মনোজয় বড়ই দুরূহ ব্যাপার। মহাবীর রণজয়ে আপনাকে বিশ্ববিখ্যাত করিতে পারেন, একমাত্র আত্মবলে বলীয়ান হইয়া কর্শিকা দ্বীপবাসী কৃষকপুত্র একদিন বিশ্ববিজয়ী নেপলিয়ন বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি যিনি মনোজয় করিয়াছেন, তাঁহার তুল্যবীর তাঁহার তুল্য অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন পুরুষ পৃথিবীতে চির দুর্ল্লভ। তাই বলিতেছিলাম, অগ্রে মনোজয় করিতে হইবে। কিন্তু যে সৎশাস্ত্র, সৎসঙ্গ সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তা প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে মনোজয় হইয়া থাকে, তাহার অভ্যাস না করিয়া কেহ কি কখন সিদ্ধ হইতে পারিয়াছেন? মনোজয় তো দূরের কথা মনকে যদি অতি সন্তর্পণে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করিতে চাহিলাম, কিন্তু মন আমার অজ্ঞাতসারে অতর্কিত ভাবে ইহার বহু পূর্ব্বে সে তাহার বিষয় চিন্তার দিকে ছুটিয়া গিয়াছে, এত দূরে গিয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে পুনরায় ভগবানের দিকে আনয়ন করিতে আবার বহু আয়াসস্বীকার করিতে হয়। এবম্বিধ অবস্থায় অধ্যাত্মচিত্ত হওয়া কি সাধারণ কথা? বিষয় চিন্তাপরায়ণ অতি ব্যাকুল চিত্ত দ্বারা যদি কোন কর্ম্ম করা যায়, সে কার্য্য কি কখনও ঈশ্বরে অর্পণ হইতে পারে? তবে অধ্যাত্মচিত্ত হইবার উপায় কি? গীতা বলেন, আত্মসংস্থ হইয়া চিত্তকে বিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া শ্রীভগবানের কথায় তৃপ্ত করিতে থাক, পরে যখন কর্ম্ম অন্তে বলিবে "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণ মস্তু" তখনই সেই কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ হইবে, নতুবা যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, হে ভগবান! আমি প্রভাত হইতে রাত্রকালে শয়নাবধি যতগুলি কর্ম্ম করিব

সকলই তোমাতে অর্পণ করিলাম, অথবা আমার জপ তপ উপাসনা সকলি তোমাতে অর্পণ করিলাম, এই কথা মুখে বলিলেই কি সেই কর্ম্মসত্য সত্যই ঈশ্বরার্পণ হইল ? কথন নয়, কেন না সেই ব্যক্তি যদি পূর্ব্ব হইতে বিচার করিয়া ব্যবস্থা না করে যে, ঈশ্বরদূরের বস্তু নহেন। তিনি আমার হৃদয়ের রাজা, আমি তাঁহারই অধীন, তিনি অতি শান্ত ভাবে চৈতন্যরূপী হইয়া আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান আছেন। আর তাঁহারি প্রকৃতি বা মায়া চিত্তরূপে সেই চৈতন্যরূপী পরম শান্ত আত্মার উপরে নৃত্য করিতেছে। এই সমস্ত তত্ত্ব যখন বিচার করিয়া নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি হইবে, তখনই অধ্যাত্মচেত হইতে পারিবে। এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানের সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ হইবে।

ভক্তের কর্ম্মার্পণ আবার আরও সুন্দর, ভক্ত বলে, আমি কৃষ্ণদাস, কিন্তু অবিদ্যা বা মায়া আমাকে সে কথা এত দিন জানিতে না দিয়া সে নিজে প্রধান হইয়া আমাকে তাহার পথে লইয়া আসিতেছিল, কিন্তু গুরু কৃপায় এক্ষণে আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, আমি সত্য সত্যই কৃষ্ণদাস, তিনি প্রভু আমি ভৃত্য, ভক্তের এই যে, আমিটি এটি মায়া বা প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, ভক্ত নিজের আমি কে প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার আর সতন্ত্র আমিত্ব নাই, ভক্ত সেই প্রকৃতিগত বা অবিদ্যাশ্রিত আমিকে লইয়া শ্রীভগবানের নিকট উপস্থিত আছেন। কেবলমাত্র তিনি শ্রীভগবানের তৃপ্তির জন্যই সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতেছেন, ভক্ত এই কর্ম্মকে, কৃষ্ণসেবা বলিয়াই জানেন। ভক্ত জানিয়াছেন কার্য্য করিতেছেন প্রকৃতি বা মায়া, আর সেই প্রকৃতি বা মায়াই যখন আমি, তখন আবার সেখানে দ্বিতীয় আমির স্থান কোথায় ? কাজেই ভক্ত * ভগবানের ভাবে বিভোর হইয়া উচ্চস্বরে প্রাণ খুলিয়া গাহিয়া থাকেন "হরি হে ! তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি" এ অবস্থায় ভক্তের নিজের আর কোন ইচ্ছাই নাই, ইচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার ইচ্ছা, ইহাতে আর দুঃখের কি আছে ? সকলই সুখময়, কখনও বা ভক্ত শ্রীরাধার ভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন, প্রাণনাথ ! তুমি এস আর যে আমি থাকিতে পারি না, তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ আমার অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছে, এই প্রকার ভক্ত কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও বা তাহার সেই মায়াময় আমিটি কে লইয়া কত সাজাইয়া কত অলকা তিলোকা পরাইয়া, শ্রীভগবানের নিকট লইয়া যাইতে চাহে, আবার কখনও বা সেই প্রকৃতিগত আমিটি পুরুষের সঙ্গে

* ইহা গীতোক্ত জ্ঞানীভক্তের কথা বলা হইতেছে।

একেবারে মিশাইয়া দেয়, ভক্তের কিছুমাত্র আত্মজ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ শক্তি শক্তিমানে মিশাইয়া যায়, ভেদ অভেদ হইয়া থাকে, ভক্তের সেই যেকর্ম্মার্পণ ইহা বড়ই মধুর, আমরা মায়ার দাস ষড়রিপুর সেবক, কলির অতি দুঃখী জীব, আমাদের সাধ্য কি যে, ভগবদ্ভক্তের এই অতি সুন্দর কর্ম্মার্পণ হৃদয়ে ধারণা করিয়া তৎপথে পরিচালিত হইয়া এই পাপময় প্রাণকে আবার মধুময় করিয়া তুলি। অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান! তুমিই জান আমার ভবিষ্য জীবন কোন পন্থা অবলম্বন করিবে। (ক্রমশঃ)

সতী-ধর্ম্ম।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

শ্রীকৃষ্ণোক্ত পতিব্রতা ধর্ম্ম।

প্রাচীন কালের আর্য্য-মহিলারা কিরূপে পতির পরিচর্য্যা করিতেন—কিরূপে স্বামী-শুশ্রূষা করিতেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরনন্দকে বলিলেন,—"ব্রজেশ্বর! পতিব্রতা রমণীর ধর্ম্ম শ্রবণ করুন। পতিব্রতারমণী পতিতে সর্ব্বদা শ্রদ্ধান্বিতা হইয়া, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া, ভক্তিভাবে প্রত্যহ পতি-চরণামৃত পান করিবে; ব্রত, তপস্যা ও দেবপূজা ত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক পতির চরণসেবা ও পতির সন্তোষ জনক স্তব করিবে। সাধ্বী স্ত্রী শত্রুভাবে কখন পতির আজ্ঞাবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবে না; নারায়ণ অপেক্ষাও নিজ কান্তকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধ্যান করিবে। কখন অপর পুরুষের বাটী যাইবে না বা সুবেশ পুরুষ, যাত্রা, মহোৎসব, নর্ত্তক ও গায়ককে দর্শন করিবে না। অথবা অপরের ক্রীড়া (হাস্য পরিহাসাদি) দর্শন করিবে না। যাহা স্বামীর ভক্ষ্য তাহাই পতিব্রতারও ভক্ষ্য; পতিব্রতা ক্ষণ-কালের জন্যও পতির সঙ্গ ত্যাগ করিবে না। যদি স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া পত্নীকে তাড়না করেন, তবুও পতিব্রতা রমণী স্বামীর উপর কুপিতা হইবে না। পত্নী স্বামীকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে খাইতে দিবে, তৃষ্ণার্ত্ত দেখিলে জল দিয়া সন্তুষ্ট করিবে। স্বামী নিদ্রিত থাকিলে তাঁহাকে জাগরিত করিবে না, বা নিজের কোন কর্ম্মের

জন্য স্বামীকে নিযুক্ত করিবে না। পুত্রের প্রতি মাতার যতটা স্নেহ হয়, পতিব্রতানারী পতির প্রতি তাহা অপেক্ষা শতগুণ স্নেহ করিবে। কুলবধূর পতিই বন্ধু, পতিই গতি পতিই ভরণকর্ত্তা এবং পতিই দেবতা। পতিব্রতা রমণী সহাস্যবদনে ভক্তিভাবে শুভদৃষ্টিতে অমৃতময় কান্তকে দর্শন করিবে। অর্থাৎ কখন স্বামীর প্রতি বিরূপ নয়নে, ক্রুদ্ধ নয়নে বা বিরক্তির সহিত দৃষ্টি করিবে না। পতির কোন দোষ থাকিলে পতিব্রতা কখন পতিকে নিষ্ঠুর কথা বলিবে না। যদি পতির কার্য্য অসহ্য হয়, * * * তবু স্বামীর উপর নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে না। রমণীর পতি সেবাই ব্রত, পরম তপস্যা পরম ধর্ম্ম; পতিসেবাই স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা পূজা, পরম সত্য স্বরূপ, সকল প্রকার দান স্বরূপ এবং তীর্থস্থান স্বরূপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে পতিই সর্ব্বদেবময়; যত পবিত্র বস্তু আছে তাহা হইতেও স্বামী স্ত্রী লোকের পক্ষে অধিকতর পবিত্র বস্তু এবং সমস্ত পুণ্য স্বরূপ। তাহাদের পক্ষে পতিই নারায়ণ স্বরূপ। যে রমণী প্রতিদিন স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভোজন ও চরণামৃত পান করে, দেবতারাও সেই নারীকে দেখিতে ও স্পর্শকরিতে কামনা করিয়া থাকেন। যে যে গৃহে স্ত্রী-পুরুষের সমতা নাই, সেই সেই সংসারে অলক্ষ্মী বাস করে ও সেই সেই দম্পতীর জীবনও বৃথা। পতিপরায়ণা রমণীর পতি বিচ্ছেদই পরম দুঃখ ও শোক-সন্তাপের মূল। পতিবিচ্ছেদ ঘটিলে পতিপরায়ণার পক্ষে পতির জীবদ্দশাতেও বৈধব্য যন্ত্রণা অপেক্ষাও কষ্টকর হইয়া থাকে। স্বপ্নে ও জাগরণে পতিই রমণীদিগের প্রাণস্বরূপ। এবং ইহকালে ও পরকালে এক মাত্র গতি।"

পতিব্রতা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যমের উক্তি।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যমকে পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় যম বলিতেছেন,—

"হে বিপ্র! হে মহামতে! পতিব্রতা নারীর নিয়ম, তপস্যা, উপবাস, দান ও ধর্ম্ম নাই। (অর্থাৎ স্বামী সেবাই তাহাদের ঐ সকল ফল দিয়া থাকে।) হে বিপ্র! পতিব্রতা নারী যেরূপ ব্যবহার যুক্তা হইয়া থাকেন, তাহা শুনুন।— পতিব্রতা স্বামী নিদ্রা গেলে পরে নিজে নিদ্রা জান, স্বামী জাগিলেই জাগরিতা হন, স্বামীকে ভোজন করাইয়া শেষে নিজে ভোজন করেন; কাজেই তিনি যমকে জয় করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহার যম যাতনা হয় না। পতি নিশুব্ধ থাকিলে পতিব্রতা নিজে কথা কহেন না; স্বামী থাকিলে তিনি থাকেন, হে বিপ্র! কাজেই তিনি যম জয় করিয়া থাকেন। নারীগণের পক্ষে ইহা

অপেক্ষা যম যাতনা এড়াইবার সহজ উপায় আর কিছু দেখিতেছি না। পতিব্রতা রমণী (পুরুষের মধ্যে) পতিকেই দর্শন করেন, পতিতেই তাঁহার মন নিযুক্ত থাকে ও পতি আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন, হে তপোধন! আমরা এইরূপ পতিব্রতাকে ভয় করিয়া থাকি, অন্য সকলেও ভয় করে; এরূপ পরম শোভনা সাধ্বী দেবগণেরও পূজ্য। পতি যদি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা পতিব্রতা কামিনী প্রণতি পূর্ব্বক (নম্রভাবে) তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। হে বিপ্রেন্দ্র! পতিব্রতা রমণী যদি পতির নিকটে থাকিয়াও তৎকর্ত্তৃক পরিত্যাক্তা হন্ তবু তিনি পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন; কখন অন্যকে আশ্রয় করেন না। পতিব্রতা রমণী একান্ত ভক্তিতে স্বামীর অনুগতা থাকেন, কাজেই হে ব্রহ্মনন্দন! তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। এইরূপে যে রমণী পতি শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে জয় করিয়া থাকেন; আর তাঁহার নিকট আমাকেও কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিতে হয়। যে রমণী স্বামীকে ধ্যান করেন, তাঁহার অনুগতা থাকেন, তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। পতিব্রতা (পতিকথা বা পতিরূপ ব্যতীত) গীত, বাদ্য, নৃত্য ও অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু শুনেন না বা দেখেন না; সুতরাং তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। পতিব্রতা রমণী যখন স্নান করেন, কেশ সংস্কার করেন, বা অন্য কর্ম্মে নিযুক্তা থাকেন, তখনও মনে মনে অন্যের কথা চিন্তা করিবেন না। দেবতা অর্চ্চনা কালে বা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার সময়ও পতিব্রতা রমণী পতিকে চিত্ত বহির্ভূত করেন না; সুতরাং তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। হে তপোধন! যে নারী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহ মার্জ্জনা করেন, তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। যে রমণীর চক্ষু, দেহ ও স্বভাব সংযত হয়, অর্থাৎ যাঁহার চক্ষু পতি ভিন্ন অন্য পুরুষকে দেখিতে পায় না ও যাঁহার স্বভাব পতিভিন্ন অপরকে বুঝিতে পারে না,:সে সদাচারিণী রমণীকে যমালয়ে আসিতে হয় না। যে নারী পতির মুখই দেখিয়া থাকেন, (অপরের দেখেন না) পতির মনোমত কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। হে বিপ্র! পতিব্রতার এই সকল কার্য্য কলাপ ও নিয়মাদি আমি পূর্ব্বে সূর্য্যদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই গোপনীয় পতিব্রতা চরিত্র তোমাকে কহিলাম। সকল ধর্ম্মাপেক্ষা রমণীর পক্ষে এই পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি পতিব্রতাকে দেখিলেই পূজা করি।" *

* প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে এ সকল স্থলের মূল সংস্কৃত শ্লোক গুলি উদ্ধৃত হইল না। এবং উক্ত অনুবাদ গুলি "ঋষি" হইতে গৃহীত হইল

স্ত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেশ।

"এক সময়ে কয়েকটি স্ত্রীলোক রামকৃষ্ণের নিকট গমন করিলে, মহাপুরুষ কোন মহিলার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"আহা! আহা! এমন বিষ্ণুরূপিণী খুব কম দেখিয়াছি!" ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া কোন বিদুষী মহিলা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিলেন, তাহা কি করিয়া স্বীকার করি? সধবাকে আপনি লক্ষ্মী বলুন আর যাই বলুন, সব শোভা পায়, কিন্তু বিধবার আবার সুলক্ষণ কি? আপনি জানেন না, যাহাকে বলিতেছেন ইনি বিধবা।" আর একজন স্ত্রীলোক বলিলেন,—"তা ওর আর দোষ কি? সধবার মত পোষাক গহনা দেখিয়া ইনি বলিয়াছেন। বিধবা হইলে সোণার বালা লালপেড়ে ধুতি পরে, ইহা ইনি কেমন করিয়া জানিবেন?" মহাপুরুষ তখন খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন,—"আমি সব জানি; তবু বলিতেছি ইনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপিণী। তোমরা পতিকে লইয়া যেরূপ ভাবে দিন যাপন কর, এবং তাঁহার পরলোক গমনে যেরূপ পরিণাম মনে কর, বাস্তবিক পতিভাবে ভগবানের সে উদ্দেশ্য নহে। পতির সহিত কয়েক দিনের অস্থি-মাংসের সম্বন্ধ নহে। এ সম্বন্ধ চির জীবনের," বলিয়া প্রভু একটি গল্প বলিলেন:—

"কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীকে সকলেই পতিপ্রাণা বলিয়া জানিতেন। সেইজন্য রাজাও রাণীর খুব বাধ্য ছিলেন। রাজা রাণীকে কত ভাল ভাল অলঙ্কার দেন, রাণী সব সিন্দুকে রাখেন,—রুলি ভিন্ন আর কিছুই পরেন না। ইহাতে অনেকে মনে ভাবিত, তবে বুঝি রাণীর মনে সুখ নাই। কত সাধনা করিলে রাজার রাণী হওয়া যায়! ওমা এ কি প্রকার মেয়ে?—স্ত্রীলোকের যা আসল সুখ গহনা পরা—তাতে আদৌ মন নাই! এ নিশ্চয় পাগল!

রাণী রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া চরণধূলী মাথায় লইতেন; সে সময়ে দুই চক্ষু বাহিয়া জলধারা পড়িত। তারপর নিজে স্নান করিয়া রাজাকে স্নান করাইতেন। এবং রাজার অভিরুচি অনুযায়ী পোষাক তাঁহাকে পরাইতেন। রাজা রাজদরবারে যাইতেন। রাণী আপনি রাজার জন্য পাক করিতেন। অপরের সংস্পর্শিত দ্রব্য স্বামীকে আহার করিতে দিতেন না। এইটি সতী স্ত্রীর বিশেষ লক্ষণ। যে স্ত্রী সতী, সে মহারাণী হইলেও আপনি দেখিয়া আপনি রাঁধিয়া স্বামীকে আহার

করান। দাস-দাসীর হস্তে স্বামীর ভোজনাদির ভার দেওয়া সতীর ধর্ম্ম নহে। ভোজনান্তে যে পর্য্যন্ত না স্বামী নিদ্রিত হইতেন,সে পর্য্যন্ত আপনি স্বামীর পদসেবা করিতেন। কখনও কোন দাস দাসীকে স্বামীর অঙ্গসেবা করিতে দিতেন না। রাজা ঘুমাইলে নিজে গৃহকাজ করিয়া নীরবে রাজার পাতের প্রসাদ মাত্র খাইরা ত্বরায় আবার রাজার কাছে আসিয়া চরণ সেবা করিতেন। রাণী রাজা ব্যতীত আর কোন দেবতা অর্চ্চনা করিবার অবসর পাইতেন না। একদা গুরু-ঠাকুর আসিয়া রাণীর দীক্ষা সম্বন্ধে রাজার কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা রাণীর কাছে সেকথা বলিয়া পাঠাইলেন, রাণী হাসিয়া বলিলেন,—"আমি একাকিনী দুই পতির সেবা করিব কি প্রকারে? আপাততঃ যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, তাহাই সম্পূর্ণ সাধনা করিতে পারিতেছি না বলিয়াই কত অপরাধিনী হইতেছি। যাহাতে মনের সাধ পূর্ণ করিয়া পতিসেবা করিতে পারি গুরুদেব যেন আমায় সেই আশীর্ব্বাদ করেন।" রাজা রাণীকে পাগলিনী বলিয়া জানিতেন; এই উত্তরে পূর্ব্বসংস্কার বদ্ধমূল হইল।

কিছুকাল পরে রাজার মৃত্যু হইল। রাজবাটী শোক শব্দে পূর্ণ হইল। রাণী কিন্তু একটুও কাঁদিলেন না! রাণী গম্ভীরভাবে অতি শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত রাজাকে সুন্দর বেশ-ভূষাদ্বারায় শোভিত করিয়া শ্মশানে বিদায় দিলেন। রাণী স্নানাদি করিয়া হাতের রুলি গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রুলির বদলে সোণা-রূপা পরিলেন! রাণীর এই ব্যবহার দর্শনে সকলে অবাক হইল।

একদা কয়েকটি বৃদ্ধা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার এরূপ বেশ দেখিতেছি কেন? রাজা মহাশয় যতদিন জীবিত ছিলেন, আপনি সোণা পরিলেন না, আমরা আপনাকে কত জেদ করিয়াছি, তথাপি সোণা পরেন নাই! —মহারাজ কত বলিয়াছেন, তবু সোণা পরেন নাই!" এইরূপে স্ত্রীলোকেরা অনেক কথা বলিলে রাণী বলিলেন,—"বাছা! আমার প্রাণের কথা শুনিতে চাও ত বলি। বাল্যকালে শ্রীমদ্ভাগবতে শুনিয়াছিলাম, রাধিকা আয়ান ঘোষের স্ত্রী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগিনী হইয়া ছিলেন। এই কথা শুনিবা মাত্র আমার রাধিকার প্রতি বড়ই ঘৃণার উদয় হয়। পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত পর্য্যন্ত আমার ঘৃণার জিনিষ হইল। আমি রাত দিন ভাবিতাম, মানুষের কাছে যাহা পাপ, দেবতারা সে কার্য্য করেন কিপ্রকারে? পরে বাবাকে এই কথাটি বলিলাম। বাবা বলিলেন,—"রাধিকা হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ। তিনি জীব শিক্ষার আদর্শ। সংসারে যে কয়টি হৃদয়ের বিশেষ ভাব আছে, সেভাব গুলি ভগবানে ন্যস্ত করিতে

পারিলেই জীবের ভববন্ধন মোচন হয়। দাস্য-সখ্যাদি পঞ্চ ভাবের মধ্যে মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। এই মধুর ভাবে সকল ভাবের জমাট। মধুর ভাব পতি ভাবেই বিকশিত হয়। এই পতিভাব যে রমণীতে ফুটিয়াছে—সে রমণীতে বরাবর থাকিবে। সংসারের ক্ষণস্থায়ী পতিকে ধরিয়া এইভাব প্রস্ফুটিত হয়। তার পর জগৎপতিতে সেই ভাব যায়। তখন নারী-ধর্ম্ম সার্থক হয়। রাধিকা পতি-ভাব আয়ান ঘোষ হইতে যখন ভগবানে সমর্পন করিলেন, তখন পতিভাব অনন্ত বিকাশের আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইল।” পিতার মুখে এই কথা শুনিয়া আমার নূতন জ্ঞান হইল। তখন বুঝিলাম, ভগবান সংসারে স্বামী মূর্ত্তিতে আসিয়া সেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া যান। আমার সেই স্বামী সংসারে ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া যত দিন ছিলেন, আমিও ক্ষণভঙ্গুর রুলি পরিয়াছিলাম। এখন তিনি ভগবানে মিশিয়া অক্ষয়, অমর, অজয় হইয়াছেন; আমিও অক্ষয় স্বর্ণবলয় পরিয়াছি।” এই স্ত্রীলোকটিরও সেইরূপ ভাব দেখিতেছি। *

ক্রমশঃ—

সম্মার্জ্জনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র।

(৩)

বিদ্যানিধি মহাশয়ের তিরোভাবে উত্তমর্ণের সমধিক পীড়ন আরম্ভ হইয়াছে, গোবর্দ্ধন এখনও নাবালক অবস্থায়। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত দশ কর্ম্মান্বিত ছিলেন, এখানে সেখানে যাতায়াত করিয়া তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত, চন্দ্রকান্তের অবর্ত্তমানে গোবর্দ্ধন-জননী পুত্রসহ অকুল পাথারে ভাসিয়াছেন। দৈনিক-জীবিকা নির্ব্বাহ মাতা পুত্রের ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপর পাওনাদারের ঘন ঘন তাগিদ। গোবর্দ্ধন পিতার নিকট কয়েক বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিতে-ছিল। শাস্ত্রানুশাসনে সংস্কৃত ভাষা সম্যকরূপে শিখিতে হয়, সে শিক্ষায় ব্যাকরণে সম্যক বুৎপত্তি না জন্মিলে,কোন ফলই হয় না। পিতৃ বিয়োগের কয়েক মাস পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চন্দ্রকান্তের

* বাবু সত্যচরণমিত্র প্রণীত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবন ও উপদেশ।”

অকস্মাৎ মৃত্যুতে গোবর্দ্ধন আর ব্যাকরণে অগ্রসর হইতে পারিল না।

পিতা মাতার আদরের পুত্র গোবর্দ্ধন সাংসারিক ব্যাপার কিছুই জানিত না, ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল এতাবৎকাল চন্দ্রকান্তের উদ্যোগেই নির্ব্বাহিত হইয়াছে। বিদ্যানিধি-পত্নী আপনার অবস্থা সম্যক বুঝিয়াছেন, অপগণ্ড পুত্রকে লইয়া কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইবে, এ দারুণ চিন্তায় তিনি বিচলিতা হইয়াছেন, তথাচ বালকের মুখ চাহিয়া তিনি কোন কথাই গোবর্দ্ধনকে জানিতে দেন নাই, কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনী রমণী এ কথা কত দিন গোপন রাখিতে পারেন? দিনে দিনে সংসারের অভাব হইয়া আসিতেছে, পুত্রকে সে জন্য ব্যথিত করিবেন না সংকল্প করিলেও, সময়ে সে কথা পুত্রসমীপে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলেন।

মাতা পুত্রে বসিয়া সংসারের কথাবার্ত্তা হইতেছে, শৈলবালার কয়েক দিবস সংবাদ লওয়া হয় নাই, জামাতৃগৃহে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন না পাঠাইলে আর ভাল দেখাইতেছে না, কথা প্রসঙ্গে এইরূপ উভয়ে পরামর্শ চলিতেছে, এমন সময়ে মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা গোবর্দ্ধন! কতদিনে তুমি উপায়ক্ষম হইবে?"

"মা! যে অবলম্বনে আমার লেখা পড়া, তাঁহাতো শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন উপায় না করিলে চলিবে কেন? তায় এখন বাজার যেরূপ, কাজ কর্ম্ম পাওয়াই ভার।"

"আজ কাল ঠাকুর পূজা করিয়া দিন চলে না; পুটে কলা, ভিজে আলো চাল আর ঘোঙা মোণ্ডায় কি দিন কাটে? বিদায় আদায়ও তথৈবচ, তাও কালে ভদ্রে। আমার বিবেচনায়—তুমি কোম্পানীর আফিসে একটা চাকুরীর চেষ্টা কর।"

"মা! একে আমাদের সহায় সম্পত্তি কিছু নাই, তায় মুরুব্বি কে? আর আজ কাল বি, এ, এম, এ, পাশ করেই লোকে কাজের জন্য লালায়িত হচ্ছে, আর আমি মূর্খ, লেখা পড়া শিখি নাই, এ অবস্থায় কোম্পানীর চাকুরী কি করে জুটাই?"

"তবে উপায়?"

"উপায়—ভগবান। ঈশ্বর জীব দিয়াছেন, আহার দিবেন, তাঁহার এ বিশাল রাজ্যে অনাহারে মারা যায় ক'জন?"

"মারা যায় না বটে, কিন্তু কত কষ্ট!"

"কষ্টের জীবন, কষ্টেই কাটিবে, তাহাতে আর আসে যায় কি?"

"জীবনই যদি কষ্টের, তবে সুখ কোথায়? মানুষের যাহা কিছু সকলই এই পৃথিবীতে। সংসার সুখ দুঃখ লইয়া গঠিত। কতক হাসি কতক কান্না এই—সংমিশ্রণে কালপাত হয়। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, এক দিনও সুখে গেল না। হাহা ধাঁধাঁ করিয়া কর্ত্তার দিন গিয়াছে, তাঁহার অবর্ত্তমানে তোমায় আমায় সেই যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে। জানি না—ভগবান আরও কত কষ্ট দিবেন।"

"মারেন কৃষ্ণ রাখে কে, রাখেন কৃষ্ণ মারে কে? এ কথাটীর অমান্য করা যায় না। ভগবানের কৃপাদৃষ্টিভিন্ন জীব এক দণ্ড জীবন ধারণ করিতে পারে না, যখন আমরা তাঁহার কৃপায় ভিখারী, অবশ্য দিনপাত হইবে, তবে দুই চারি দিন কষ্টে কাটিতেছে বলিয়া তাঁহার উপর দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। পিতা জীবিত থাকিতে সংসারের ভার কিছুই জানিতাম না, ক্ষুধায় আহার আবশ্যক হইলেই বলিতাম, যাঁহার অবলম্বনে আমার সে দিন সুখে কাটিয়াছে, আজ সেই পার্থিব দেবতা ইহসংসারে নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিলে চলিবে কেন? পিতৃ প্রদত্ত শিক্ষায় আমায় উপার্জ্জন করিতে হইবে, দশ টাকা গৃহে আনিতে পারিলেই উদরের অন্ন ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য ভাবিতে হইবে না। এত কাল পিতৃ অন্নে পোষিত হইয়াছি, তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই দায় আমার স্কন্ধদেশে ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারই পদাম্বুজ স্মরণ করিয়া সংসার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এ সময়ে আর নিশ্চিন্ত ভাবে কালক্ষেপ করিলে চলিবে না।"

"বাবা গোবর্দ্ধন! আমিই হতভাগিনী, এ সময়ে তোমার লেখা পড়া করিবার কথা, কিন্তু কপাল দোষে তোমাকে পরের দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বনে দিন-পাত করিতে হইবে! অন্ততঃ কর্ত্তা যদি আর কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এরূপ নিরাশ্রয় হইতে হইত না।"

মাতা পুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে উত্তমর্ণের কর্ম্মচারী আসিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তাগিদ করিল। কন্যাদায়গ্রস্থ হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল, জীবদ্দশায় তিনি সে ঋণের কতক পরিশোধও করিয়াছিলেন, কিন্তু সংসারে যিনি উপায়ক্ষম, যাঁহার আশায় নির্ভর করিয়া সংসারের সকল ভার নির্ব্বাহিত হয়, এখন তিনি ইহলোকে আর নাই, এ কারণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ হইতেছে না, অধিক কি মাসে মাসে সুদের টাকা জমিয়া যাইতেছে, গোবর্দ্ধন ও তদীয় মাতা ঘোর সমস্যায় পড়িয়াছেন, সুদে আসলে মহাজনের যাহা পাওনা হইয়াছে, সত্বর ইহার একটা বন্দোবস্ত না

করিলে তাহাদিগকে অধিকতর কষ্টভোগ করিতে হইবে, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যখন উভয়েই উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পাইতেছে না, সে সময়ে কি প্রকারে ঋণ শোধের ব্যবস্থা করিতে পারেন?

দুই তিন বার তাগিদ করিতে আসিয়া মহাজনের কর্ম্মচারী যখন রিক্ত হস্তে চলিয়া গিয়াছে, অবশ্যই উত্তমর্ণ মহাশয় তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়াছেন, সত্বর ঋণশোধ করিতে না পারিলে, পদে পদে উভয়কেই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। মহাজনের মুল ধন মাতা পুত্র উভয়েই সুদ সমেত পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কোন সুযোগ উপস্থিত না হইলে কি উপায়ে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে? একে অন্নাভাব তাহাতে এই দুশ্চিন্তায় গোবর্দ্ধন ও তদীয় মাতা জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া পণ্ডিত মহাশয় কর্জ্জ লইয়াছিলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় সে ঋণ যখন পরিশোধ হয় নাই, তাঁহার বিধবা পত্নী ও নাবালক পুত্র কিরূপে এই দায় হইতে উদ্ধার পাইবেন? অনন্যোপায় হইয়া পণ্ডিত পত্নী রোদন করিতে বসিলেন, গোবর্দ্ধন আশ্বাস বাক্যে মাতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, প্রকৃত পক্ষে কোন পক্ষেই আপাততঃ সুবিধা হইল না।

(ক্রমশঃ।)

কমলা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাঙ্গা ঠান্‌দিদি।

পরদিন প্রাতঃকালে সরলা কমলাদের প্রাতঃকালীন গৃহকর্ম্ম সমস্ত করিয়া দিলেন এবং শাশুড়ী বউ উভয়কে স্নান করাইয়া আনিলেন। কমলাদের বাটীর নিকটে একটী ব্রাহ্মণ বিধবা বাস করেন। তাঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিল, কিন্তু তাহাদের একটিও জীবিত নাই। তাঁহার বর্ণ অতিশয় গৌর ছিল বলিয়া সকলে তাঁহাকে রাঙ্গা ঠান্‌দিদি বলিত। তিনি অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া কমলা ও তাঁহার শ্বশ্রূকে আহার করাইলেন। উভয়ের কেহই আহার করিতে পারিলেন না। কেবল আহার করিতে বসিলেন মাত্র। আহারান্তে রঘুপতির মাতা কমলাকে বলিলেন, "বউমা! এই অভাগিনীকে ফেলিয়া কোথায়ও যেওনা। আমার রঘুপতি গিয়াছে; এখন তুমিই আমার ব্যাটা;

তুমিই আমার মেয়ে, তুমিই আমার বউ ও মা ; তুমিই আমর সব। তুমি চলিয়া গেলে আমাকে জীয়ন্তে শিয়াল কুকুরে টানিয়া খাইবে।" এই কথা শুনিয়া কমলা বলিলেন, না মা! আমি তোমাকে ফেলিয়া কোথায়ও যাইব না। বাস্তবিকই কমলা শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন নাই।

রঘুপতি আজি চারিবৎসর চাকরী করিতে গিয়াছেন। তিনি প্রতি মাসে বাটীতে ২০৲ কুড়িটী করিয়া টাকা পাঠাইয়াছেন। পাঠক আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মনি অর্ডারের প্রথা প্রচলিত হয় নাই। টাকা পাঠাইতে হইলে, চিটি পত্র রেজিষ্টারী করিয়া পাঠাইতে হইত। রঘুপতি ও প্রথম তিন চারি মাস ১০৲ দশ টাকার করিয়া দুই খানি ব্যাঙ্ক নোট চিঠির মধ্যে রেজিষ্টারী করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। তাহার পর আর রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান নাই। কারণ কালীভৈরব তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন. রেজিষ্টারি করিতে বৃথা কয়টা পয়সা খরচ কর কেন? চিঠির ভিতরে শুধু নোট পূরিয়া পাঠাইয়া দিও। তোমার চিঠির ভিতরে কি আছে, না আছে, কে আর অত দেখিতে যাইবে? রঘুপতি প্রাণের বন্ধুর উপদেশ মত কার্য্য করিতে দ্বিধা করেন নাই। তখন কার লোক এখনকার মত এত চালাক ছিল না। রঘুপতি কালীভৈরবের চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই। কারণ কালীভৈরব তাঁহার মাতা ও স্ত্রীকে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ দিয়া সমস্ত টাকা আত্ম সাৎ করিয়া ছিলেন। রঘুপতি মাসে মাসে ২০টী করিয়া টাকা পাঠাইতেন, কালীভৈরব দিব্য আত্মসাৎ করিতেন। যখন রঘুপতি মাতা ও পত্নীকে লইয়া যাইবার কথা লিখিলেন, তখনই কালীভৈরব তাঁহাকে তাঁহার মাতা ও পত্নীর মৃত্যু সংবাদ দিয়া পত্র লিখিলেন।

রঘুপতি মাতা ও স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সংসারের প্রতি এত বীতরাগ হইলেন যে, নিজ জন্মভূমিতে আর গমন করিলেন না। গৃহ এবং গৃহ সামগ্রীর প্রতি দৃকপাত ও করিলেন না। অধিকন্তু, কালী ভৈরবকে পত্র লিখিলেন যে, "আমার গৃহের সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী তুমি তোমার বাটীতে লইয়া যাইও ও ভোগ করিও। তুমি ভোগ করিলে আমি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইব।" রঘুপতি এই পত্রের এইরূপ প্রতিউত্তর পাঠাইয়াছিলেন যে, "অমি তোমার আদেশানুযায়ী তোমার গৃহের সমস্ত দ্রব্য আমার নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়াছি। ভাই! তুমি একবার বাটীতে আসিবে। কোনমতে অন্যথা করিও না। বাটী যাইবার নামে রঘুপতির হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। নয়নদ্বয় হইতে অনর্গল বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন; আমার আবার বাটী? অরণ্যই

আমার উপযুক্ত স্থান। আমি ত অরণ্যেই আছি। হা ভগবান! তোমার মনে এই ছিল? তোমার মনে যাহা আছে তাহাই হউক এই বলিয়া তিনি কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্দ্দশার চূড়ান্ত।

এখানে কমলার দুর্দ্দশার একশেষ হইল। অন্ন বিনা অতিশয় কষ্ট হইল। কমলার মাতা কমলাকে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কমলা কিছুতেই পিত্রালয়ে গমন করিলেন না। কমলার পিতা ও ভ্রাতারা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য পুনঃপুন অনুরোধ করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন, যখনই তাহারা লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন,তখনই কমলা তাঁহাদিগকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, "আমি কেমন করিয়া যাইব? আমার শাশুড়ীকে দেখিবে কে? চক্ষুহীনা, ও পুত্রহীনা শাশুড়ীর কি দশা হইবে? সুতরাং আমি যাইতে পারিব না। ইহাতে কমলার পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া ভ্রম ক্রমে কমলার নাম গ্রহণ করিতেন না। যদিও কমলার মাতার অনুরোধে তাঁহার পিতা কখন কখন তাহাকে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতারা কদাচ তাহার পিতাকে তাহা পূরণ করিতে দিতেন না। কমলার পিতার অবস্থা ভাল। কমলার মাতা মধ্যে মধ্যে চাউল, ডাউল, কলাই ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী লোকদ্বারা কমলাকে পাঠাইয়া দিতেন। তাহাতে কি দুঃখ নিবারণ হয়? ব্রহ্মোত্তর ভূমি যাহা আছে, লোকাভাবে তাহার খাজনা পত্র আদায় হয় না। কে আদায় করিবে? রঘুপতি! একবার বাটীতে এস, দেখিয়া যাও; তোমার সোণার কমলের কি দশা হইয়াছে?

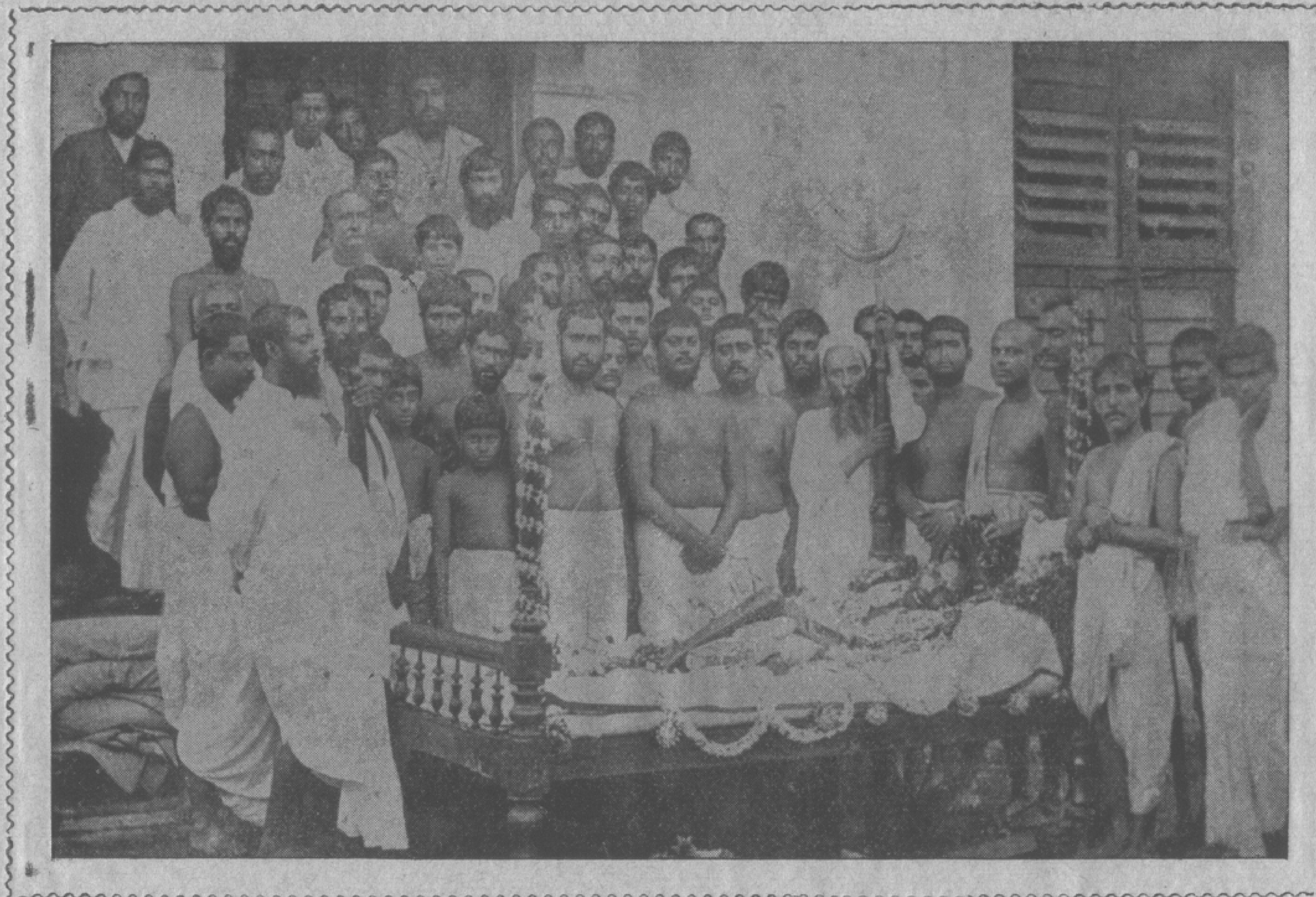
অবশেষে সংসারের এমন অবস্থা হইল যে, দিন আর চলেনা। কাজেই অন্নাভাবে কমলাকে পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। তিনি-কাহারও বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম করিয়া বেতন লইতেন না। কেহ আসিয়া বলিল, ও মা! আমাদের গৃহিনীর অসুখ হইয়াছে; আমরা খাওয়া বিনা মারা যাই; যদি মা! দয়া করিয়া এক মুঠা ফুটাইয়া দাও, তবেই ছেলে পুলে খেতে পায়। সেতো ভাত খাবি? না হাত ধোব কোথায়? কমলা বিরক্তি না করিয়া

স্বীকৃত হইতেন। তাহাদের বাটীতে যাইবার সময়ে একখানি থালা ও গুটি দুই বাটী হাতে করিয়া লইয়া যাইতেন। কারণ শাশুড়ীর জন্য ভাত আনিতে হইবে। নিরামিষ রন্ধন হইলেই অমনি অবকাশ মত অগ্রে শাশুড়ীর জন্য অন্ন ব্যঞ্জন দিয়া যাইতেন। কাহারও বাটীতে ভূরি ভোজ হইলে অনেকগুলি রাঁধুনীর প্রয়োজন হইত, কিন্তু কমলার নাম সর্ব্বাগ্রে শ্রুত হইত। কারণ কমলা অতি উৎকৃষ্ট রন্ধন করিতে পারিতেন। সকলে কমলাকে মা অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিত। যজ্ঞে রন্ধন করিলে, রাঁধুনীকে বস্ত্র দেয়, কমলা সেই বস্ত্র খানি শাশুড়ীকে পরিধান করিতে দিতেন। লোকে জিজ্ঞাসাকরিলে বলিতেন, আমার চক্ষু আছে। আমি ছেঁড়া খোঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু আমার শাশুড়ীর চক্ষু নাই, ছিন্ন বস্ত্রে ওঁর লজ্জা নিবারণ করা কঠিন। রন্ধনত করিতেনই; তাহা কিন্তু সকল দিন জুটিতনা। তজ্জন্য তিনি লোকের বাটীতে ধান ভানিয়া চাউল কাঁড়িয়া নিজের ও শাশুড়ীর অন্নের সংস্থান করিতেন। পাঠক! আপনারা বলিতে পারেন, কমলার এত কষ্ট সহ্য করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহার নিজের ভাবনা কি? তাঁহার পিত্রালয়ে অন্নের অভাব কি? তথায় গমন করিলে, তিনি ত বাটীর কর্ত্তী হইয়া সুখে দিন যাপন করিতে পারিতেন। কমলে! তোমার মত বধু কয় জনের ভাগ্যে—ঘটে? এখনকার বধু দিগকে একটী কথা কহিবার যো নাই। বধুরাই বাটীর কর্ত্রী, শাশুড়ী বাঁদীর মত সংসারে খাটিয়া মরেন। একটু ক্রটি হইলেই শাশুড়ীকে বধুর, অবশেষে পুত্রেরও মুখ ঝাম্টা খাইতে হয়।

(ক্রমশঃ।)

সমালোচনা।

ভারতবর্ষ।—সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স দ্বারা প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ছয় টাকা মাত্র। আমরা ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং পাঠান্তে আনন্দিত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অঙ্ক ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, জীবনী, সাহিত্য উপন্যাস, কবিতা ও বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে পূর্ণ। এরূপ সুবৃহৎ সচিত্র মাসিক-পত্র বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হইয়াছিল, বলিয়া আমাদের স্মরণহয় না। আমরা "ভারতবর্ষে"র দীর্ঘজীবন কামনা করি।



ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিরোভাব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রিয় সেবক রামচন্দ্র দত্ত, ভক্তবীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও গিরিন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি ভক্ত মণ্ডলী সহ ফটোগ্রাফ।

Janmabhumi Press.



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। | ১৩২০ সাল, ভাদ্র। | ৫ম সংখ্যা।

দেবীতত্ত্ব।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্য সাঙ্খ্যতীর্থ।

সংসার কূপে নিবদ্ধ মায়াবদ্ধ ক্ষুদ্র জীব আমি, কিরূপ সামর্থ্য ও কীদৃশ তুচ্ছ বাগ্ বিভব লইয়া মায়ের কথা বলিতে যাইব? অপৌরুষেয় বেদ বাণীও যাহার স্বরূপ বর্ণনে অসমর্থ হইয়া বলিতেছেন;—"যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" যাহার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরও বাক্য এবং মন নিবর্ত্তিত হয়, সেই অজ্ঞেয় অচিন্ত্য তত্ত্বে কথা কহিব আমি?

হরি-হর-বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ, যাহার পরমতত্ত্ব অবগত নহেন, আমরা অতিমাত্র জড়বুদ্ধি হইয়াও, তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিব? প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষা! কিন্তু কি করি যখন শুনিতে পাই,—

"অহ মেব স্বয়মিদং বদামি,
জুষ্টং দেবেভি রুত মানুষেভিঃ।

যং যং কাময়ে তং ত মুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং ত মৃষিং তং সুমেধাম্

ঋগ্বেদ অষ্টম অষ্টক।

সেই জগজ্জননী মহামায়া অম্ভৃণ ঋষির বাঙ্ নাম্নী কন্যায় আবির্ভূত হইয়া জীবের উদ্ধারের জন্য আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন,

"আমি স্বয়ংই বলিতেছি,দেবগণ ও মনুষ্যগণ আমার আরাধনা করিলে আমি (পরিতুষ্টা হইয়া) তন্মধ্যে যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকে উগ্র (মহেশ্বর) ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর পদ প্রদান করিয়া থাকি।

যাহার আরাধনায় সাংসারিক জীব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পদেও উন্নীত হয়, তাহার পাদপদ্ম সেবার লোভ কে সম্বরণ করিতে পারে? আমরা দেবতা নহি এবং প্রকৃত মনুষ্যও নহি, তবে বাহ্যাকারে মনুষ্যচর্ম্মে দেহটী পরিবৃত বটে; আশা আছে, ভাগ্যবশে কখনও সদগুরুর উপদেশ পাইলে, এই জগন্মাতার অপূর্ব্ব-তত্ত্ব আলোচনায়, যে দিন অজ্ঞানান্ধকার বিদূরীত হইবে; সেই একদিন প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারিব। মনুষ্য হইলেই মায়ের আরাধনায় অধিকার জন্মিবে; এইরূপ মহদ্বাসনা বুকে বাঁধিয়াই কথা কহিতেছি। আমরা নিশ্চয়ই জানি, ঈদৃশ অনধিকার চর্চ্চায় মা ক্রুদ্ধা হইবেন না,মা যে,বিলক্ষণ অবগত আছেন,—

"নখলু পশু রোষঃ সমুচিতঃ"

জ্ঞানহীন পশুর প্রতি ক্রোধ করা উচিত নহে।

সেই ব্রহ্মময়ীর লোকাতীত চরিত্র পর্য্যালোচনার জন্য এ ক্ষুদ্র হৃদয় এত ব্যাকুল হয় কেন? মহামুনি মেধস, মহামায়ার যে চরিত্র চিত্রঅঙ্কিত করিয়াছেন, বুদ্ধিরূপিণী মা আমার, সেই চরিত্র অনুশীলনে প্রবৃত্তি দিয়াছেন।

সেই অপূর্ব্ব চরিত্রের নাম দেবীমাহাত্ম্য, দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া, যিনি বিশ্ব-প্রপঞ্চ সৃজন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছেন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ক্রীড়ার উপকরণ, সেই ব্রহ্মরূপিণী জগন্মাতা মহামায়াই দেবী, আর তাঁহারই মহিমা বর্ণনার নাম দেবী মাহাত্ম্য।

দেবী মাহাত্ম্যের অপর নাম চণ্ডী; মা সংহার রূপিণী তামসী মূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রচণ্ড মহিষাসুর ও উদ্দৃপ্ত শুম্ভ নিশুম্ভের দর্প খর্ব্ব করিয়াছেন। এবং যে চরিত্রে নিদ্রারূপিণী তামসী মূর্ত্তি, মহাবিষ্ণুর সংজ্ঞা হরণ করিয়াছিলেন, এই তামস ভাব অবলম্বনই চণ্ডী নামের কারণ; সুতরাং দেবীমাহাত্ম্যে সেই চণ্ডবিক্রমা মহামায়াই চণ্ডীরূপে আবির্ভূতা।

চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত, চতুর্দ্দশ মনু ও মন্বন্তর বর্ণনাই মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। সাবর্ণিক নামক অষ্টম মনুর অধিকার বর্ণনার ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

দেবী মাহাত্ম্যের প্রথম ঘটনা এই,—

অঙ্গদেশের অধিপতি চৈত্রবংশ সম্ভব রাজা সুরথ, এক সময়ে সমস্ত পৃথিবী-তলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন, রাজধর্ম্ম পালনে কোনও ত্রুটী করিতেন না। কিন্তু ভাগ্যের বিষম বিপর্য্যয়ে, কোলাবিধ্বংসি * যবনরাজগণ, তাঁহার শত্রু হইল, তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হইল, মহারাজ সুরথ, পরাজিত হইলেন; সেই যবনগণও সুরথের প্রায় অধিকাংশ রাজ্য অধিকার করিল; অবশেষে রাজা সুরথ মাত্র নিজ দেশটীই শাসন করিতে লাগিলেন।

বিপদ্ বিপদের সহচর! এখানেও তাহার শান্তি ঘটিল না, বিশ্বাসঘাতক আমত্যগণ, তাঁহার ধনাগার ও সৈন্যাদি হস্তগত করিল; রাজা নিরুপায় হইয়া অশ্বারোহণে বনে চলিয়াগেলেন।

দুঃখে ও ক্ষোভে রাজার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, প্রবল বিজিগীষা প্রতিক্ষণে সুরথের মর্ম্মস্থল ভেদ করিতেছিল। তিনি বনমধ্যে দ্বিজবর মেধসের অপূর্ব্ব আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই পবিত্র ধর্ম্মাশ্রমে হিংস্র শ্বাপদকুলও পরিশান্ত ও হিংসাদ্বেষাদি শূন্য। মেধস মুনি, পরম সমাদরে রাজাকে আশ্রমে রাখিলেন। রাজা কিছুদিন ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্তে শান্তি আসিল না। তিনি ইতস্ততঃ ঘুরিতেছেন আর ভাবিতেছেন, হায়! রাজ রাজেশ্বর হইয়াও আমি আজ অরণ্যে! আমার পূর্ব্বপুরুষের রাজধানী আজ শত্রুহস্তে! আমার দুষ্টস্বভাব ভৃত্যগণ, কি এ রাজ্য ধর্ম্মানুশাসনে পালন করিতেছে? জানিনা আমার সেই প্রিয়তম মত্তহস্তি, শত্রুহস্তে পতিত হইয়া, কিরূপ যত্নে পালিত হইতেছে, নিয়ত পারিতোষিকাদি লাভে পরিতুষ্ট হইয়া, যাহারা সর্ব্বদা আমার অনুগত থাকিত, তাহারা এখন নিশ্চয় অন্য রাজাদের সেবায় রত হইয়াছে। বহুক্লেশে সঞ্চিত আমার সেই কোষাগার, সতত অসদ্ব্যয়িগণের হাতে পড়িয়া শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। রাজার চিত্ত তখন অনুতাপানলে বিদগ্ধ, প্রবল প্রতিহিংসা বিষে জর্জ্জরিত, এই তীব্র রজোগুণে উজ্জ্বল ক্ষত্রিয় হৃদয় কি সহসা শান্তির অধিকারী

* কোলানামক রাজধানীধ্বংস করায় ইহাদের নাম কোলাবিধ্বংসী। ইহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মত।

হইতে পারে ?

রাজা এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, এই সময়ে মহা-মহামুনির আশ্রম সমীপে একটী নির্ব্বোধ ক্লিষ্ট দুর্ম্মনায়মান লোক আসিতেছে ; দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"মহাশয় ! আপনি কে ? কি জন্যইবা এই বিজন অরণ্যে আসিয়াছেন ? আপনাকে শোকাকুলের ন্যায় দুর্ম্মনা দেখিতেছি, এই মনঃস্তাপের কারণ কি ?"

আগন্তুক ব্যক্তি রাজার প্রণয়বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিল, হয় ত ইনিও আমার সমাবস্থ, ঘোর বিপর্দকালেও সমানাবস্থ ব্যক্তি পাইলে হৃদয় খুলিয়া কথা কহিতে ইচ্ছা হয়। আগন্তুকেরও আজি তাহাই ঘটিল, তিনি নিজ দুঃখ কাহিনী শুনাইয়া রাজাকেও তাহার অংশ ভাগী করিতে লাগিলেন।

আমার নাম সমাধিবৈশ্য, ধনীকুলেই আমার জন্ম ছিল, কিন্তু আজ আমি পথের ভিখারী, আমার অসৎ স্বভাব স্ত্রী ও পুত্রগণ সমুদয় ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে, এবং আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে ; এই বিশ্বস্ত আত্মীয়বর্গ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া মহাদুঃখেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু বহুদিন গত হইতেছে, সেই স্ত্রী পুত্রাদির কুশল সংবাদ জ্ঞাত হইতেছি না। তাহারা ভাল আছে কি কোনও অমঙ্গল ঘটিয়াছে, এই ভাবনায়ই আমার হৃদয় ব্যাকুল ।"

রাজা বলিলেন, "যাহারা পিতৃ-ভক্তি পতি-ভক্তি জলাঞ্জলি দিয়া আপনাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাদের জন্যই আপনি এত ব্যাকুল ?"

বৈশ্য বলিলেন,—"মহাশয় ! ঠিক কথা, আপনি আমার মনের কথা বলিয়া-ছেন, তাহারা এইরূপ দুর্ব্যবহার করিলেও আমার মন যে, তাহাদেরপ্রতি নিষ্ঠুর হইতেছে না, এ যে, কি অদ্ভুত প্রহেলিকা ! জানিয়া জানিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না।"

এইরূপে দুইজনে অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর, মহামুনি মেধসের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "ভগবন্ ! আমি একটী নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া বলিলে এ তাপিত হৃদয় পরিশান্ত হয়।"

আমার রাজ্য শত্রুগণ কাড়িয়া লইয়াছে, আর এই বৈশ্যবরও ধন লোলুপ স্ত্রী পুত্রাদি কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছেন, তবুও আমাদের সেই রাজ্য ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি মমত্ব রহিয়াছে, আমরা জ্ঞানী হইয়াও, অজ্ঞের ন্যায় সেই সকলের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, মুনিবর ! এ কি অদ্ভুত রহস্য ?"

মেধসমুনি রাজার জ্ঞানাভিমান দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন, এবং ঈঙ্গিতে বলিলেন,—"সুরথ! তুমি যে,জ্ঞানের অভিমান করিতেছ,ইহা ত প্রকৃত জ্ঞান নহে, এইরূপ জ্ঞান পশু, পক্ষী মৃগ প্রভৃতি সকল জীবেরই আছে, সকল জন্তুরই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় গোচরে জ্ঞাত থাকে; এই সকল বিষয় আবার পৃথক্ পৃথক্ দেখ — কোনও প্রাণী দিবান্ধ (পেচকাদি) অপর প্রাণীগণ রাত্র্যন্ধ (মনুষ্যাদি) এবং কোনও কোনও প্রাণী আবার দিবারাত্রি উভয় কালেই সমদৃষ্টি সম্পন্ন (মার্জ্জারাদি) সুতরাং তাহাদের সামান্য জ্ঞান আছে। মানুষ যে, পুত্রাদির প্রতি অভিলাষযুক্ত হয়, তাহা কেবল লোভমূলক, অর্থাৎ পুত্রাদি হইতে প্রত্যুপকার পাইবে বলিয়া, কিন্তু ঐ দেখ! পক্ষিগণ নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও, দুঃখে কষ্টে দুই একটি তণ্ডুলকণা সংগ্রহ পূর্ব্বক শাবকের মুখেই অর্পণ করিতেছে, তাহাদের কোনও প্রত্যুপকারের অভিলাষ নাই। মনুষ্য ও পশ্বাদির জ্ঞানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের জ্ঞান একপ্রকার, ফলতঃ প্রত্যুপকারের অভিলাষ থাকুক আর নাই থাকুক, মহামায়ার প্রভাবে সংসার স্থিতিকারী প্রাণীগণ মমতারূপ আবর্ত্তপূর্ণ মোহগর্ত্তে,নিপতিত হইতেছে। মহারাজ! ইহাতে আর বিস্মিত হইবেন না।"

সেই মহামায়ার মায়ায়ই জগৎ সংমোহিত, সেই অঘটন ঘটন পটীয়সী, মহামায়া, জ্ঞানীজনেরও চিত্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিপতিত করেন, তিনিই জগৎ সৃজন করেন, পালন করেন এবং অন্তে আবার সংহারও করিয়া থাকেন। মনুষ্য প্রাণের সহিত কামনা করিলে তিনি জ্ঞান প্রদান করেন এবং পরিতুষ্টা হইলে মহদৈশ্বর্য্যেরও অধিকারী করিয়া থাকেন।"

মহামুনির শেষ কথাটী শুনিয়া প্রতিহিংসাক্রান্তচিত্ত সুরথ রাজার ঐশ্বর্য্য-স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইল, তার পর বৈরাগ্য পরায়ণ বৈশ্যবরেরও জ্ঞানপিপাসা প্রবল হইয়া উঠিল।

আজ মেধস মুনির আশ্রমে দুইটী সমানাবস্থ ব্যক্তি উপস্থিত; অবস্থাটা সমান হইলেও, উভয়ের লক্ষ্য কিন্তু অত্যন্ত বিভিন্ন; সুরথ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত কোনও প্রকারে শত্রু জয় করিতে পারিলেই আবার সুরথ রাজ্যেশ্বর; পুত্রকলত্রাদি পরিবেষ্টিত সুরথরাজ আবার পরমানন্দে ভাসিবেন, এ আশা সুরথের অতীত হয় নাই,সুতরাং সুরথরাজার চিত্ত রাজ্যলোভে অধীর।

আর সমাধি বৈশ্যের আর এক অবস্থা।—সমাধি বৈশ্য জীবনভরা যাহাদের জন্য, যাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, ধনরত্নাদি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রাদিই তাহার প্রতি বিমুখ; সুতরাং বৈশ্যের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? আজ

বৈশ্যের পক্ষে সংসার প্রকৃতই দুঃখময় ভীষণ অরণ্যাণী। সেই অরণ্যবাসী পত্নীপুত্ররূপ হিংস্র স্বাপদকুল, আজ বৈশ্যের জীবন সংহারে উদ্যত; সেই চির লালিত বন্ধুগণ, যাহার বিরূপ, সে যে বিষয় দোষ দর্শনে বৈরাগ্যবান্ হইবে, একথা আর কি বলিতে হয়? বৈশ্য আর সাংসারিক তুচ্ছ সুখে নিমগ্ন হইতে চাহেনা, বৈশ্য চাহে শান্তি। বৈশ্য জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানতার আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেনা। দৃষ্টানু-শ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণ-বৈশ্যবের, আজ জ্ঞানের জন্য মেধস—মুনির শরণাপন্ন। সুতরাং সুরথরাজা, ঘোর প্রবৃত্তিমার্গী, আর সমাধি পরায়ণ সমাধি বৈশ্য নিবৃত্তি পথের পথিক।

মহামুনি মেধস এইরূপ অত্যান্ত বিরুদ্ধ ভাবের ভাবুক সুরথ ও বৈশ্য বকে দেবী মাহাত্ম্য শুনাইতেছেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনি যাহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্ন হইলেন? এবং তাঁহার কর্ম্মই বা কি প্রকার?"

মেধস, রাজার অজ্ঞানতা দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন, যাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি হইতেছে, এবং যাহাতে আবার প্রলয় হইবে, সেই মহামায়ার আবার উৎপত্তি? প্রকাশ্যে বলিলেন,—"সেই জগন্ময়ী দেবী নিত্যা, তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, তাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনবশে তাঁহার যে, অভিব্যক্তি সেই অভিব্যক্তিরূপ উৎপত্তির কথা বলিতেছি।

দেবতার কার্য্য-সিদ্ধির জন্য তিনি যখন আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন অজ্ঞান মনুষ্যগণ, তাঁহাকে উৎপন্না বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, অতএব এইরূপ বহু প্রকার উৎপত্তির পবিত্র কথা শ্রবণ কর।

দেবীমাহাত্ম্যে তিনটী চরিত্রের কথা উল্লিখিত, (১) প্রথম চরিত্র (২) মধ্য চরিত্র ও (৩) উত্তর চরিত্র। প্রথম চরিত্রে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক যোগনিদ্রার স্তুতি ও মধুকৈটব বধ; মধ্যম চরিত্রে মহিষাসুর বধ ও উত্তর চরিত্রে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ বর্ণিত রহিয়াছে, মেধস মুনি অগ্রেই প্রথম চরিত্র বর্ণনা করিতেছেন।

মধুকৈটভ বধ।

প্রলয় সময় জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে; বিষ্ণু, অনন্ত শয্যায় শয়ান হইয়া যোগ-নিদ্রা উপভোগ করিতেছেন এমন সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমলোৎপন্ন মধু ও কৈটভ নামক ঘোর অসুরদ্বয়, ব্রহ্মার বিনাশে উদ্যত হইল। প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভিপদ্মে থাকিয়া একাগ্রমনে যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্থিতি সংহার

কারিণী বিশ্বেশ্বরী যোগমায়া, হরির নেত্রদ্বয় পরিত্যাগ করিলে বিষ্ণু প্রবুদ্ধ হইবেন, আর মহাবিষ্ণু প্রবুদ্ধ হইলেই, অসুরদ্বয়ের উপদ্রব হইতে রক্ষিত হইয়া, সুখে জগৎ সৃজন করিতে পারিবেন, ব্রহ্মা এই অভিপ্রায়ই আজ যোগনিদ্রার স্তবে নিরত।

ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বষট্‌কার রূপিণী, তুমি অক্ষয়া সুধা, তুমি মন্ত্রাত্মিকা রূপে ত্রিধা অবস্থান করিতেছ, তুমি স্বভাবতঃ অনুচ্চার্য্যা অর্দ্ধমাত্রা স্বরূপিণী, হে দেবী! তুমি সাবিত্রী ও একমাত্র জননী।

পরম যাজ্ঞিক ব্রহ্মা, তিনি যে, সর্ব্বব্যাপিণী যোগ নিদ্রার স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বাগ্রেই যজ্ঞীয় সাধন স্বাহা স্বধা বষট্‌কার ত্রিমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রারূপে তাঁহার স্তব করিবেন, ইহা অতিশয় স্বাভাবিক। ব্রহ্মা আদি কবি হইলেও, এই ঘোর বিপদ সময়ে বিষম আর্ত্তাবস্থায় মহামায়ার স্তবে কবিত্বের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতে পারেন কি?

ব্রহ্মা প্রথমতঃ পত্নীভাবে দেবীকে সম্বোধন করিলেন, হে দেবী! তুমি সাবিত্রী, মাধুর্য্যপূর্ণ-প্রেমভাব, সম্পৎকালেই সম্ভবে তাহাতেই নিমেষ মধ্যে ভাবান্তর করিয়া বলিলেন,—"ত্বং দেবী জননী পরা" তখন ব্রহ্মা প্রকৃত পথ ধরিলেন; ব্রহ্মা, মা মা বলিয়া আকুল হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন;—

দেবি! এজগৎ তুমিই ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, তুমিই জগতের সৃজন পালন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ, আর অন্তিমে তুমিই জগৎকে গ্রাস করিয়া থাক; তুমি সর্গকালে সৃষ্টিরূপিণী, পালনে স্থিতি রূপিণী এবং প্রলয় সংহাররূপ ধারণ কর; তুমি মহাবিদ্যা, (জ্ঞানরূপিণী) তুমি মহামায়া, (আবরণ শক্তিরূপা) তুমি মহাস্মৃতি তুমি মহামোহা ও তুমি মহা অসুরী; তখন ব্রহ্মা আকুলভাবে জগদম্বার এই রূপ স্তুতি করিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন, মা! তুমি সৃষ্টিরূপা, কিন্তু তোমার সন্তান সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, কেন মা! কেন মা অকালে অসুর হস্তে নিহত হইবে? তুমি ত স্থিতিরূপা, কিন্তু এই অসুরদ্বয় বাঁচিয়া থাকিলে, জগতের স্থিতির সম্ভাবনা কোথায়? তবে কি মা! আজ প্রকৃতই সংহাররূপিণী? সৃষ্টির পর ত সংহার, এখনও যে সৃষ্টিই হয় নাই, মা! মহাবিদ্যা! যোগনিদ্রারূপে কেন মা বিষ্ণুর বিদ্যাজ্ঞান ঢাকিয়া রাখিয়াছ? মা! তুমি মহামায়া, এই কি তোমার মায়া? আজ এই মায়াময় অসুরদ্বয় সৃজন করিয়া মায়া সূত্র বদ্ধ ব্রহ্মার প্রাণ হরণে উদ্যত? মা! মহাস্মৃতি, এখনও কি মা জগতের স্মৃতি জাগরিত হয় নাই?* তাহা হইলে কি—সৃষ্টির প্রারম্ভেই এই ঘোর অসুরদ্বয় সৃষ্টিনাশে উদ্যত হইতে

* তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়ম—ইতিশ্রুতিরত্র প্রমাণম্।

পারে? মা তুমি মহাদেবী, তোমার ঐ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিণী মহা ক্রীড়ার মর্ম্ম কে বুঝিবে মা? আমরা অজ্ঞান সন্তান, তোমার লীলার মর্ম্ম বুঝিনা বলিয়াই সূত্রবদ্ধ পুত্তলের ন্যায় তোমার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হইতেছি। তবে আজ বুঝিলাম, যথার্থই তুমি মহামোহা! এই মহামোহে ফেলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ঘুরাইতেছ, মা মহাসুরি! এই কি তোমার অসুরীশক্তি প্রকটনের উপযুক্ত সময়?"

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, এইরূপে মহামায়ার জগৎ কর্তৃত্বাদির উল্লেখে স্তব করিতেছেন, আর এ দিকে অসুরগণ, ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে; অমনি অধিকতর ব্যাকুল হইয়া, তুমি খড়্গীনী, শূলিনী, গদিনী, চক্রিনী, শাঙ্খনী, চাপিনী ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র বিভূষিতারূপে জগজ্জননীর স্তুতি করিতে লাগিলেন;—তাহাতেও কোন আশুফল না দেখিয়া, ব্রহ্মা পরিশেষে বলিলেন,—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে!
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সাত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"

যে, কোনও স্থানে সদসৎ যে, কোনও বস্তু আছে, হে সর্ব্বাত্মিকে! তাহাদের সে সকল একমাত্র তুমিই, অতএব তোমার আর কি স্তব করিব?

এইবার ব্রহ্মা সমষ্টি ভাবে ব্রহ্মময়ীর স্তব করিলেন, এইবারই মায়ের প্রকৃত-রূপের বর্ণনা হইল, এই ডাকই তাঁহার সিংহাসন টলাইল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাসিকা, হস্ত, হৃদয় ও বক্ষস্থল হইতে নির্গত হইয়া * ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন,—আজ ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বের সার্থক হইল। মধুকৈটভ! তোমরা ব্রহ্মার অপকার করিতে গিয়া কি উপকারই করিয়া ফেলিলে? আহা! যাঁহারা মায়ের সুসন্তান, তাঁহাদের বিপৎ ও সম্পৎ এবং বিষয় ও অমৃতরূপে পরিণত হয়। তাহার পর যোগনিদ্রা-বিমুক্ত বিষ্ণু জাগরিত হইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, মহামায়ার মায়ামোহে বিমোহিত মহাসুরগণ বলগর্ব্বে নারায়ণকে বলিতে লাগিল; তোমার যুদ্ধে আমরা সন্তোষলাভ করিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর; তখন ভগবান্ হরি বলিলেন, আর কি বর চাহিব, তোমরা আমার বধ্য হও; ধূর্ত্ত অসুরগন দেখিল জগৎ জলপূর্ণ তিল

* বিষ্ণুর চক্ষুরাদি স্থান হইতে নির্গত হওয়ার তাৎপর্য্য এই, সেই সর্ব্বশক্তি মহামায়া নিজ তামসী শক্তি দ্বারা বিষ্ণুর দৃক্শক্তি, বাক্শক্তি, ঘ্রাণশক্তি, গ্রহণশক্তি জ্ঞানবিকাসিনী শক্তি ও বিক্রম শক্তি এই সকল শক্তি অভিভূত করিয়াছিলেন, তাহা উঠাইয়া আনিলে পর বিষ্ণু জাগরিত হইলেন।

মাত্রও স্থল নাই, অমনি বলিয়া উঠিল, যেথামে জল নাই, তথায় আমাদিগকে হত্যাকর। তখন নারায়ণ "তথাস্তু" বলিয়া জঘনদেশে রাখিয়া তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। বলাবাহুল্য মধুকৈটভের দেহমেদ হইতে মেদিনীর পূর্ব্ব সূচনা হয়, ইহাই মহামায়ার প্রথম চরিত্র।

এইরূপে মেধসমুনি মহামায়ার প্রথম চরিত্র বর্ণনা করিলেন,—সুরথরাজা ও সমাধিবৈশ্য উভয়েই একাগ্রমনে শ্রবণ করিতেছেন;—তখন রাজা ভাবিলেন, আহা! মহামায়ার কি মাহাত্ম্য! মহামায়াই জীবের শক্তি ও অশক্তির কারণ, তিনি যখন যোগানদ্রারূপে জীবের শক্তি আচ্ছাদিত করেন, তখন জীব পূর্ণ শক্তিমান হইলেও, কর্ম্ম করণে অপটু হইয়া পড়ে। আর যখন দৃক্-শক্তি বাক্-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, বাহু-শক্তি ও হৃদয়-শক্তি বিকাশের প্রতিবন্ধকীভূতা স্বকীয় তামসী মূর্ত্তি অপসারিত করিয়া লন, তখনই শক্তিমান পুরুষের শক্তিরাশি বিকাশ প্রাপ্ত হয়; পুরুষ সকল কার্য্যেই সক্ষম হইয়া উঠে। মহামায়ার প্রথম চরিত্র চিত্রে এই ভাবেই জাজ্বল্য মান।

বিশেষতঃ দেবীর চরিত্রে ব্রহ্মার অবস্থাটা অনেকাংশে আমার অবস্থারই তুল্য; ব্রহ্মা যেমন বিষ্ণুর আশ্রয়ে থাকিয়া নিরুদ্বেগে প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই প্রধান সহায় বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রায় অবিভূত, বিষ্ণুর নাভি মণ্ডলে থাকিলেও, ব্রহ্মা তখন নিরাশ্রয়, তৎকালে আশ্রয়দাতা বিষ্ণুর কর্ণ মলোৎপন্ন শত্রুই ব্রহ্মার প্রাণনাশে উদ্যত।

নিরাশ্রয় অবস্থায় অতি মহীয়ানেরও ঈদৃশ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে; পরম নীতিপরায়ণ ব্রহ্মা, মহামায়ার আরাধনায় সাহায্য কারির শক্তি বিকাশ করিলেন, সুতরাং ব্রহ্মা অল্পকালেই বিপন্মুক্ত হইয়াছিলেন।

আর এদিকে আমিও সাহায্যদাতা মিত্র রাজগণের উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে পৃথিবী মণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলাম, কিন্তু মিত্ররাজগণ, পরে যখন ক্রমশঃ নিঃশক্তি হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন আমিও আশ্রয়হীন হইতে লাগিলাম, দিন দিন উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল, ইত্যবসরে, সাহায্যকারি নিদ্রিতপ্রায় শক্তিহীন নৃপমণ্ডলের নাভিমণ্ডলে (মধ্যদেশে) অবস্থান করিলেও, ভেদনীতি মলোৎপন্ন দুষ্টামাত্যরূপ বলবান মধুকৈটভ, আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিল; হায়! আমি ব্রাহ্মণের ন্যায় সুনীতির অনুসরণ করিতে পারি নাই অশেষ প্রযত্নে সাহায্যকারী রাজভক্ত বিশ্বস্ত মিত্ররাজগণকে শক্তিসম্পন্ন করাই তখন আমার উচিত ছিল; তাহা হইলে আর হঠাৎ ভাগ্যের ঈদৃশ বিপর্য্যয় ঘটিত না, মহারাজ সুরথ এইরূপে

দেবী চরিত্রে প্রবল রাজনীতির ছায়া দেখিতে পাইলেন।

একদিকে দেবীচরিত্র শ্রবণে সুরথরাজের মনে যেমন প্রবল রাজনীতির গভীর আলোচনা উদিত হইল, অপরদিকে সমাধি বৈশ্যের চিত্তেও, অনুরূপ চিন্তার আবির্ভাব হইল।

বৈশ্য ভাবিলেন, এই ত দেবীর প্রথম চরিত্র? যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতি সংহারের অধিশ্বরী, আজ কিনা তিনি, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা, তিনি, ব্রহ্মার স্তবে পরিতুষ্টা হইলেন, বিষ্ণুকে ছাড়িয়া দিলেন, অমনি নিদ্রা-বিমুক্ত বিষ্ণু, মধুকৈটভ বিনাশে সমর্থ হইলেন। মহামায়ার এ মায়ার অর্থ কি? এখনই যে,ত্রিকালদর্শী মহর্ষি মেধস, বলিয়াগেলেন,—"জগৎও তিনি, জীবও তিনি, দ্রষ্টাও তিনি দৃশ্যও তিনি, জ্ঞাতাও তিনি, জ্ঞেয়ও তিনি, তবে আজ এই নিত্যলীলাময়ী, এই- প্রলয়াবস্থায় ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মধুকৈটভকে সৃজন করিয়া বিষ্ণুকে নিদ্রিত মধুকৈটভকে উদ্দীপ্ত ও ব্রহ্মাকে ভীতি গ্রস্ত করিতেছেন কেন? পুনরায় তিনিই আবার জ্ঞানাবরণী শক্তি অপসারিত করিয়া, বিষ্ণুকে জাগাইলেন, এবং বিষ্ণু শক্তিরূপে মধুকৈটভের সংহার সাধন করিয়া ব্রহ্মাকে ত্রাণ করিলেন। জীবশিক্ষার্থেই ভগবতীর লীলামাহাত্ম্য! কিন্তু আমার ন্যায় মায়াবদ্ধজীব এই মায়েন্দ্র-জাল তুল্যাবিশ্বপ্রণয়ন কারিণীর লীলাচরিত্রের মর্ম্মভেদ করিবে? অসম্ভব! তবে তিনি আমার বুদ্ধিরূপিণী হইয়া, যাহা বুঝাইতেছেন; আমি তাহাই বুঝিতেছি। আমি বুঝিতেছি, এই চরিত্রে মহামায়া জীবগণকে, জগতত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। কারণ তত্ত্বজ্ঞগণ, বলিয়া থাকেন, সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থায় প্রলয় এবং বৈষম্যাবস্থায় সৃষ্টি, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ; ১ চৈতন্যের সাহার্য্যেই জড় প্রকৃতি কার্য্যোন্মুখী হইয়া থাকেন, তখনই মহত্তত্ত্বাদিরূপে প্রকৃতির পরিণাম হয়, সত্ত্ব রজ তমো গুণ কেহ কাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারে না সর্ব্বদা মিলিত ভাবই পরিণত হয়, ২ এক গুণের আধিক্য ও অপরাপর গুণের ন্যূনতা হইতেই জগৎ সৃষ্টি, এবং গুণ ত্রয়ের সাম্য ভাব হইলেই প্রলয়। ৩ সৃষ্টিকালে প্রথমতঃ তমো গুণের অভিভবের পর সত্ত্ব গুণের সাহার্য্যে রজো গুণের উদ্রেক হয়, সেই রজোগুণের উদ্রেকেই সৃষ্টি হইতে থাকে; রজোগুণ

১ সত্ত্বরজস্তমসাং শাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহানিত্যাদি
সাঙ্খ্য সূত্র প্রথম অধ্যায়।

২ অন্যান্য মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ, ।১২। সাঙ্খ্য কারিকা।

৩ সাম্য বৈষম্যাভ্যাং কার্য্যয়ম্। সাঙ্খ্যদর্শন ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্বভাবতঃ প্রবর্ত্তক হইলেও, স্থিতিকারক তমোগুণ, রজোগুণের কার্য্য করিত্বের প্রতিবন্ধক হয়; সুতরাং সর্ব্বাগ্রেই তমোগুণের অভিভূতি আবশ্যক; তমোগুণ অভিভূত অবস্থায় রজোগুণের ক্রিয়ার আশ্রয় হয়, তাহাতেই প্রলয়েরপর মহতত্ত্বাদির ধীরে ধীরে প্রকাশ হইয়া থাকে। *

শাস্ত্রানুসারে সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতৃ চেতনের নাম বিষ্ণু, রজোগুণের অধিষ্ঠাতা চেতন ব্রহ্ম এবং তমোগুণের অধিষ্ঠাতার নাম মহারুদ্র। একই চেতন এইরূপে গুণোপাধিভেদে তিন রূপে জগতের সৃষ্টাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। এইজন্যই মহর্ষি মেধস নিত্যচৈতন্য রূপিণী মহামায়াকে সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারিণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মহাপ্রলয় কালে গুণত্রয় ঠিক সমান অবস্থায় অবস্থিত হইলেও, তখন তমোগুণের প্রভাবই অধিকভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়; কারণ, তমোগুণ স্বভাবতই স্থিতি কারক, তাহার পর আবার তখন রজোগুণও সত্ত্বগুণ অধিক, বলীয়ান্ নহে, কাজেই তমোগুণের কার্য্য কারিতা প্রবল হয়। যেমন শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ এই বর্ণত্রয় ঠিক সমপরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিলে, তখন কৃষ্ণ বর্ণেরই ঔজ্জ্বল্য লক্ষিত হয়, রক্তবর্ণ কালিমাবরণে অস্ফুটাবস্থায় থাকে; আর শ্বেতবর্ণ তমোগুণে অত্যন্ত লুক্কায়িত হয়, অর্থাৎ তাহার কোনও চিহ্নই লক্ষিত হয় না। তেমনি প্রলয় কালেও, সত্ত্বগুণ মহানিদ্রায় নিদ্রিত, রজোগুণ কিঞ্চিৎ জাগরিত ও তমোগুণ, মহাপ্রভাব শালী। এই অবস্থার উপর লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিতেছেন,—"তমোত্রবেদমত্র আসীৎ" সৃষ্টি প্রথম ভাগে কেবল তমোগুণই উদ্রিক্ত ছিল। তৎপর আত্মার সন্নিধি প্রযুক্ত গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে (সত্ত্বগুণ উদ্ বোধ প্রাপ্ত হইলে) তমোগুণ অভিভূত হইয়া পড়ে, তমোগুণের প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত হইয়া রজোগুণও, স্বকার্য্যাভিমুখী হইতে থাকে; এইরূপ আত্মার সন্নিধানে সৃষ্টি কার্য্যোন্মুখ জড় প্রকৃতি বিশ্ব প্রপঞ্চ রচনা করিয়া থাকেন।

আহা! দেবি চরিত্রেও কি এই ভাবের সুব্যক্ত ছায়া লক্ষিত হইতেছেনা? দেবী চরিত্রেও ত দেখিতে পাই,যেকালে জগৎ একার্ণবিকৃত,অর্থাৎ মহাপ্রলয়াবস্থা, মহাবিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শায়িত. এখানে বিষ্ণুঅর্থে সত্ত্বগুণ * আর অনন্ত অর্থে

* তমোগুণ, সৃষ্টিপ্রবর্ত্তনে রজোগুণের সাহায্যকারিরূপে থাকিয়া মৃদু মৃদু ভাবে রজোগুণকে আটকাইয়া না রাখিলে, উচ্ছৃঙ্খল রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারেনা, এবং তমোগুণ প্রবল থাকিলে রজোগুণ একপদও অগ্রসর হইতে পারে না, সুতরাং তমোগুণ অভিভূত অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেই সৃষ্টি হয়।

* ব্যাপ্ত্যর্থ বিষ ধাতুর রূপ, বিষ্ণু সত্ত্বগুণ মোক্ষাবস্থায় ব্যাপক হয়, সত্ত্ব পুরুষয়োঃ শুদ্ধি শাম্যে কৈবল্যং পাতঞ্জলদর্শন।

পরমাত্মা * অনন্ত শয়ন অর্থাৎ প্রলয়কালে চৈতন্যাশ্রয়ে সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান। বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ সত্ত্বগুণাশ্রয়ে রজোগুণের উদ্রেক এবং কথিত তমোগুণের প্রকট ভাবেই মধুকৈটভের অভ্যুদয়। বর্ণিত ঘটনা হইতে এইরূপ অর্থের কি আভাস পাওয়া যায় না? তমোরূপী মধুকৈটভ, রজোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বিষয়ে বাধা প্রদান করিতেছে. এই নিমিত্তই কি বিষ্ণুর জাগরণে (সত্ত্বগুণের স্ফুরণে) ও মধুকৈটভের প্রশমনে (তমোগুণের অভিভাবে) ব্রহ্মার এতবা প্রস্তা? তখন জগতের সৃজন কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য, কাল রাত্রি মহারাত্রি আবরণী শক্তি; সত্ত্বগুণের আবরণ অপসারিত করিলেন, অমনি চৈতন্য সন্নিধান প্রযুক্ত বিষ্ণুর জাগরণ (সত্ত্বগুণের উদ্রেক বা গুণ ক্ষোভ) হইল সঙ্গে সঙ্গে মধুকৈটভ প্রশমিত হইয়া গেল; (তমোগুণ অভিভূত হইল) ক্রমে মধুকৈটভের দেহের উপরই সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা, মেদিনীর সূত্রপাত করিলেন। পূর্ব্ব কথিত তমোগুণের উপর দাঁড়াইয়া সত্ত্বগুণের সহায়ে, রজোগুণ নিজ প্রবৃত্তি স্বভাবে সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিল।

মহামায়া, এইরূপে জগৎ নাটকের অভিনেত্রী হইয়া জীব মণ্ডলিকে প্রকৃতপুরুষ বিবেকজনিত মহাজ্ঞান প্রদান করিতেছেন। যে, জ্ঞানলাভ করিবার জন্য, সাঙ্খ্য পক্ষাবলম্বিগণ, বহুযুগ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অভ্যাস ক্রমে, জগতের মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন; যে তত্ত্বের আলোচনা সাংখ্য জ্ঞান বা সম্যক্ জ্ঞানের পরম সহায়, দেবী চরিত্রে যে, সেই তত্ত্বই স্ফুটভাবে অভিনীত হইয়াছে। জ্ঞানী-ভক্তগণ মহামায়ার এই অপূর্ব্ব চরিত্র শ্রবণে সত্ত্ব পুরুষান্যতা খ্যাতি বা বিবেক জ্ঞান লাভ করুন।

প্রকৃতি জড়া. আত্মা চেতন কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি প্রকৃতিরই বটে, ইহার সহিত পুরুষের বা পরমাত্মার কোনও সম্বন্ধ নাই, কেবল অনাদি অজ্ঞানবশে নিত্য মুক্ত, নিত্য শুদ্ধ, পরমাত্মার সহিত প্রকৃতির (গুণত্রয়ের) ভোগ্য ভোক্তৃত্ব রূপ সম্বন্ধ থাকায়, প্রকৃতির ধৈর্য্য কর্তৃত্বাদি আত্মার উপচরিত হইয়া, আত্মা মিথ্যা আবদ্ধ হন। আর বিবেকজ্ঞান উদিত হইলেই আর সে সম্বন্ধ থাকেনা। সুতরাং স্বভাব বিমুক্ত আত্মা তখনি অভিমানিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন; সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রে এই ভাবকেই মুক্তি বলে। সুতরাং এইরূপে জগতের মূলত্ত্বের আলোচনা দ্বারা মুক্তিরূপ ফল সাধিত হয়, দেবীর এই চরিত্রে তাহারই উপদেশ।

* অনন্তের অপর নাম শেষ তাহা ও পরমত্ম বাচক, শেষ অর্থ পর, অব্যক্তং পুরুষঃপরঃ ইত্যাদি শ্রুতি।

সম্মার্জ্জনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র।

(৫)

কন্যাকে সুপাত্রে বরণ করিতে পিতামাতা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, পুত্রীর ভবিতব্যের মঙ্গল কামনায় শক্তির অতীত ব্যয়েও জনক জননী কুণ্ঠিত হন না। দেশকাল পাত্রভেদে দেশে যে রীতি প্রচলিত, তাহাতে কন্যাদায় গ্রস্থ কত শত গৃহস্থের প্রতিনিয়ত যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না, কিন্তু এরূপ সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়াও পিতামাতার অনেক সময়ে মনস্কামনা পূর্ণ হয় না, যেখানে এরূপ বিড়ম্বনা সেইখানেই কষ্ট ভোগ। বিদ্যানিধি মহাশয় কন্যাদায় গ্রস্থ হইয়া পরের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন, পাঁচ জনের নিকট ভিক্ষা লইয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার সঙ্কুলান না হওয়ায় সহধর্ম্মিনীর যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল তাহাও নষ্ট করিয়াছিলেন, অবশেষে ভদ্রাসন খানি বন্ধক দিয়া দায়োদ্ধার হইয়াছিলেন। তিনি ঋণগ্রস্থ হইয়া দারুণ অশান্তি ভোগে ইহলোক হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছিলেন। কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করিয়াও ব্রাহ্মণ কন্যার জন্য সুখী হইতে পারিলেন না, ঘর বর মনোনীত করিয়া তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, পুত্র কলত্রকে বিপন্ন করিয়া নিজে ঋণগ্রস্থ হইয়া যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কন্যা আজীবন সুখ ভোগে দিনপাত করিবে, কিন্তু ভগবান যাহার অদৃষ্টে যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষ শত চেষ্টা করিলেও বিধির সে বিধি খণ্ডন হইবার নহে! বড় লোকের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, জামাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারী, সময়ে দশ টাকা উপার্জ্জন করিবে, এই বিশ্বাস বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্পূর্ণ ছিল, এ কারণ সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়া পুত্রীর ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় তিনি এই সম্বন্ধ সূত্রে মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কুটুম্বের আচরণে তাঁহাকে সপরিবারে সাতিশয় মনক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছিল

ভাগ্যলক্ষ্মী কখন কাহার প্রতি কি ভাবে দৃষ্টিপাত করেন, মানুষ তাহার পূর্ব্বক্ষণেও বুঝিতে পারে না অথচ আত্মম্ভরীতায় নির্ভর করিয়া একে অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্ন লোকের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছল্য ভাবে দেখিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া দশের মধ্যে একজন বলিয়া মান্য হইতে সক্ষম, তাঁহার মদমাৎসর্য্য অনেক স্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু যাহাকে বাল্যাবধি সাংসারিক কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই, সুখের দোলায় আজীবন কালপাত হইয়াছে, দীন দরিদ্রের প্রতি সদয়ভাব

দেখাইতে অনেক সময়ে তাহাকে কুণ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, বড় মানুষের পুত্র কন্যা অপেক্ষাকৃত দীন নরনারীকে বেতনভোগী দাসদাসী অপেক্ষা ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া থাকে। যে সংসারে এই বীভৎস ভাব দৃশ্যমান, সে সংসার যতই কেন উন্নতি সোপানে আরূঢ় হউক না সময়ে তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য। সাধারণতঃ বিলাসভোগে অনুরক্ত হইয়া ধনশালীর পুত্র কন্যা সংসারের ভাল মন্দের প্রতি আস্থা প্রদান না করায়, সকল বিষয়ে পর মুখাপেক্ষীভাবে থাকায়, সময়ে পৈত্রিক ধনসম্পত্তি ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকে। বিষয় বুদ্ধি না থাকিলে বিষয় রক্ষা হয় না, চিরদিন কখন কাহারও সমান যায় না, ক্ষণভঙ্গুর জীবন লইয়া কেহ কোন বিষয়ে নির্ভর করিতে পারে না, বিদ্যানিধি জামাতা শিবরামের পিতা হরলাল গণ্য মান্য, সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিও লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের কঠোর হস্তে ধনী দরিদ্র সকলেই সমভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক সময়ে দশ টাকা উপায় করিয়াছিলেন, জন সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তিও হইয়াছিল, পুত্র শিবরাম সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারীও হইয়াছিলেন, চন্দ্রকান্ত এই সময়েই শৈলবালাকে শিবরামের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

হরলাল বাবুর অর্থাকাঙ্ক্ষা সাতিশয় বলবতী ছিল, যে কোন উপায়ে দশ টাকা সংস্থান করিতে পারিলেই, তিনি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। যাহারা অর্থাগম কারণ একান্ত ব্যস্ত, অহোরাত্র সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, ঘটনাক্রমে অনেক সময়ে তাহাদিগকে এক কালে নিঃস্ব হইয়া পড়িতে হয়, টাকার খেলায় কখন কাহার কোন দিকে মতি গতি ফিরে, সহজে তাহার নিরাকরণ হয় না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লোক সমাজে পরিচিত হইলেও, মান সম্ভ্রম যথেষ্ট সত্ত্বেও তিনি অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এ কারণ তিনি প্রেমারা পাশা প্রভৃতি জুয়া ও দ্যূত ক্রীড়ায় অনুরক্ত থাকিতেন, এক সময়ে এই ভাবে কিঞ্চিৎ উপায় করিয়া মূলধনের বৃদ্ধি লালসায় হরলাল তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং গ্রহ বৈগুণ্যে রিক্তহস্তে তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগত হইতে হইয়াছিল, অবস্থার সেই অধঃপতন হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর উন্নতি করিতে পারিলেন না। উত্তরোত্তর তাঁহাকে অধঃপতিত দশায় পড়িতে হইয়াছিল, অধিক কি সেই জুয়া খেলায় সময়ে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, নষ্ট অর্থ পুনরায় গৃহে আনিবেন, এই বিবেচনায় তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না, লোকের যে সময়ে

অধঃপতন হইতে থাকে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন অনুষ্ঠিত বিষয়ে নিষেধ করিলেও কোন প্রতিকার হয় না। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই হরলাল বিষয় সম্পত্তি ঘর বাড়ী প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। আপনার নিজস্ব বলিয়া পরিচয় দিবার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আর কিছুই ছিল না। উপায়ক্ষম পুরুষ দুর্ব্বিপাক প্রযুক্ত অকস্মাৎ কোন গোলযোগে পতিত হইলে, তাহার উন্নতির পথে যে কণ্টক পতিত হয়, সহজে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। অদৃষ্টচক্রের ফেরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, এক সময়ে যাঁহার বাটীতে দশ জন অন্ন পাইত এক্ষণে তিনিই অন্নের কাঙ্গাল হইয়াছেন, অতি কষ্টে দিনপাত হইতেছে। এক সময়ে উন্নতিলাভে দশজনকে প্রতিপালন করিয়া দৈন্যাবস্থা প্রযুক্ত হইলে জীবন্মৃতাবস্থায় কালপাত করিতে হয়। সংসারে সকল দিকে সচ্ছলভাব দেখিলে, চিত্ত প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে, সেই মনের স্ফূর্ত্তিতে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ হউক না কেন, সফলতা অনিবার্য্য, এই জন্যই সময়ে সময়ে এইরূপ আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠানের আবশ্যক, কিন্তু এবম্বিধ অবৈধ আনন্দে আসক্ত হইয়া সময়ে বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে, যেহেতু হরলাল বাবু পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হইয়া স্বোপার্জ্জনে সমধিক উন্নতি-লাভ করিয়াছিলেন, সচ্ছলাবস্থায় সাধারণতঃ বিলাসের প্রতি অনুরাগ জন্মে, যাহার যেরূপ ভাব গতি, তাহার সেইরূপই হইয়া থাকে, হরলাল বাবু দ্যুত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াও এক সময়ে সচ্ছলভাবে কাটাইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই দ্যুত ক্রীড়ার প্রকোপে তিনি নিঃস্ব নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন, কি উপায়ে দিনপাত হইবে তাহার নিরাকরণ হইতেছে না, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত শরীরে তাদৃশ সমর্থ না থাকায় পূর্ব্বের মত পরিশ্রম করিতে পারিতেছেন না, তাহার উপর এতাবৎকাল যে স্থানে কর্ম্ম করিয়া তাহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল, সেখানে তাহার গতিবিধি বন্ধ হইয়াছে, হরলাল বাবুকে যে জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, ঘটনা-ক্রমে তাঁহার প্রভুগণ সে ব্যবসা উঠাইয়া দেওয়ায়, তাঁহাকে আর প্রয়োজন না থাকায়, তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। লোকের একটি বিপদ ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে ধারাবাহিক বিপাকের সংঘটন হইয়া থাকে, হরলাল বাবুর অদৃষ্টেও তাহাই দাঁড়াইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি কর্ম্মচ্যুত, দ্বিতীয়তঃ দ্যুত ক্রীড়ায় যথাসর্ব্বস্ব হৃত, তৃতীয়তঃ বয়াধিক্য প্রযুক্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে-বঞ্চিত, চতুর্থতঃ দাম্ভিকতা বশতঃ লোকের সহানুভূতিলাভে অক্ষম, এই কারণে সকলে হরলাল বাবু ভবিষ্যতের বিষয় স্মরণ করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন।

শিবরাম লেখাপড়া শিখিয়াছেন, অবশ্য শিবরাম দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসারের সহায়তা করিবেন, তাহাতে হরলালের কষ্টের লাঘব হইবে, কিন্তু এতাবৎকাল পুত্র পিতার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে, এখনও শিবরাম স্বোপার্জ্জনে সংসারের কোন উপকার করিতে পারে নাই,যদিও বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে ব্যবহারজীবিকায় তাঁহার দিনপাত হইবার কথা, কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহার ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিলাভ হইতেছে, ততক্ষণ তাঁহার স্কন্ধে ব্যয়ের কোন ভার অর্পিত হইতে পারে না। তিনি এক্ষণে আলিপুরের আদালতে প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া থাকেন, বাটী হইতে ট্রাম ভাড়া লইয়া তাঁহাকে সে কার্য্য করিতে হইতেছে, সম্প্রতি সন্ধ্যার পর প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী একটী ছাত্রকে পড়াইয়া যৎসামান্য উপার্জ্জনের সম্ভাবনা হইয়াছে, কিন্তু সে-টাকা কয়েকটী বাজে খরচেই ব্যয় হইবে, প্রকৃত সংসারের পক্ষে তাহাতে কোন উপকার দর্শিবে না, বার্দ্ধক্য অবস্থায় পিতা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এতাবৎকাল যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছেন, অবস্থার বৈষম্যে সে ভাবের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, এ কারণ একে একে অন্তঃপুরবাসিনীগণের অলঙ্কার পত্রগুলি সকলই নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। হরলাল বাবু বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন, কিন্তু যতক্ষণ না অর্থ হস্তগত হইতেছে, ততক্ষণ কোন উপায়ই দেখিতেছেন না। উপযুক্ত পুত্র পিতার অবস্থা সম্যক বুঝিয়াছেন, কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কোন অংশে তাঁহার সাহায্য করিতে পারিতেছেন না বলিয়া মনক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

সংসার লইয়া পিতাপুত্র উভয়েই বিচলিত হইয়াছেন। হরলাল বাবু সংসারের ঘোর তরঙ্গে বহুকাল আলোড়িত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। পুত্র অল্পদিন মাত্র সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহার ঘাত প্রতিঘাত এখনও সম্যক উপলব্ধ করিতে পারেন নাই, তথাচ আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি সংসারে ঝাঁপ দিয়াছেন।

(৬)

ভাঙ্গা গড়া লইয়া সংসার, একদিকে উন্নতির পতন, অন্য পক্ষে পতিতের উদ্ধার, এই দ্বিবিধ ভাবে সংসার চালিত হইয়া থাকে। বিদ্যানিধি পুত্র গোবর্দ্ধন যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, বিদ্যার পরিচয়ে পরের নিকট চাকুরী করিয়া যে সংসারের সকল অভাব পূরণ করিতে পারিবেন, সে আশা তাঁহার পক্ষে দুরাশা মাত্র। তবে নিজ জননী, উদরের অন্ন ও পরিধেয় বস্ত্র সরবরাহ

করিতে পারিলেই গোবর্দ্ধন আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন। পিতার অবর্ত্তমানে তাঁহাকে সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু যতক্ষণ না উপার্জ্জন হইতেছেন, ব্রাহ্মণ যুবক মনের আশা মনেই সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, নিত্য নৈমিত্তিক অভাব পূরণ জন্য তাঁহাকে এখানে সেখানে অনেক স্থানে সন্ধান করিতে হইয়াছিল, কিন্তু কোথাও তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই, পুনঃপুনঃ ইতাদৃত হইয়া স্বীয় অকৃতীর কারণ গোবর্দ্ধনের জীবনে ধিক্কার জন্মিয়াছিল, কিন্তু পার্থিব দেবী গর্ভধারণীর অভাবের কথা প্রতিমূহূর্ত্তে স্মরণ করিয়া গোবর্দ্ধন কোন প্রকারেই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, যে কোন উপায়ে দশ টাকা গৃহে আনিতে না পারিলে, অভুক্ত অবস্থায় জননী সহ থাকিতে হইবে, এই দারুণ দুশ্চিন্তায় যুবকের সাতিশয় চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। জননীর ভরণপোষণ জীবনের সার ব্রত স্থির জানিয়া, তিনি অবশেষে এক সদাশয় মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান স্বল্পদিনে কার্য্য পারওয়ে সেই ব্যবসায়ীর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। উত্তরোত্তর যত দিন যাইতে লাগিল, গোবর্দ্ধন প্রভুর স্বস্ত ও অনুরাগ ভাজন হইয়া উঠিলেন, যৎসামান্য বেতনে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া স্বল্পদিনের মধ্যেই গোবর্দ্ধন কর্ম্মস্থানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীবৃদ্ধিও হইতে থাকিল। লেখা পড়ায় তাদৃশ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, মহাজনের বিষয় বুদ্ধি যথেষ্ট; এ কারণ গোবর্দ্ধন প্রভু কয়েক বৎসর মাত্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট উপায় করিয়াছিলেন, এক্ষণে গোবর্দ্ধনের সহায়তায় তাঁহার ব্যবসায় দিন দিন সমধিক উন্নতি হওয়ায় তিনি গোবর্দ্ধনের প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশে উদ্বৃত্ত টাকার এক চতুর্থাংশ গোবর্দ্ধনকে দিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। সংসার সম্বন্ধে গোবর্দ্ধনের আর কোন প্রকার অভাব থাকিল না, অধিকন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের জীবদ্দশায় যেভাবে সংসার চালিত হইয়া আসিতেছিল, তদপেক্ষা সমধিক সচ্ছল অবস্থায় দিন কাটিতে লাগিল।

শৈলবালার শ্বশুরালয়ের দুরবস্থার সংবাদ মাতঙ্গিনী ও গোবর্দ্ধন উভয়েই অবগত হইয়াছিলেন। মায়ের প্রাণ কন্যার জন্য আকুল হইয়াছিল, ইতঃপূর্ব্বেই মাতঙ্গিনী কন্যাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার জন্য বৈবাহিক হরলাল বাবুকে অনুরোধ করিয়াতত্ত্ব পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু বৈবাহিকের নিকট তাঁহার সে আবেদন উপেক্ষিত হইয়াছিল, তথাচ কন্যার জন্য মাতার মন স্থির হয় নাই, যতক্ষণ না শৈলবালা পিত্রালয়ে আসিতেছে, মাতঙ্গিনী কিছুতেই নিশ্চিন্ত নহেন; মাতৃগত প্রাণ গোবর্দ্ধন

পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইয়াও শৈলবালাকে পাঠাইবার জন্য শিবরামের পিতৃ-সমীপে কত অনুরোধ উপরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আবেদনে হরলাল বাবু আদৌ কর্ণপাত করেন নাই।

কর্ত্তার অবর্ত্তমানে অপগণ্ড বালক গোবর্দ্ধনকে লইয়া মাতঙ্গিনী সংসার চিন্তায় চৈতন্যহারা হইয়াছিলেন। শৈলবালার শ্বশুরালয়ের সে সময়ে এরূপ হতশ্রী হয় নাই, কন্যার অশন বসনে কোন কষ্ট হইতেছেনা জানিয়া বিদ্যানিধি পত্নী নিশ্চিন্ত মনে কাটাইতে ছিলেন, কিন্তু যে দিন কন্যার শ্বশুরালয়ের হতশ্রীর সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, সেই সময় হইতে মাতা আর সুস্থির চিত্তে এক মুহূর্ত্ত কাটাইতে পারেন নাই, অহোরাত্র কন্যার সংবাদ জন্য তিনি বিচলিতা হইয়াছিলেন। মাতার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পুত্রও ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন, কিন্তু হরলাল বাবু যতক্ষণ না তাঁহার পুত্রবধূকে স্বেচ্ছায় পিত্রালয়ে যাইতে অনুমতি প্রদান করিতেছেন, ততক্ষণ শৈলবালা কিরূপে শ্বশুর গৃহ হইতে পিত্রালয়ে আসিতে পারেন?

ঈশ্বরের অনুগ্রহে গোবর্দ্ধন এক্ষণে দশ টাকা উপায় করিতেছেন, কর্ম্মস্থানে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছে, উত্তমর্ণের সুদে আসলে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া তিনি পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, একমাত্র সহোদরার জন্য তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে, মাতা শৈলবালাকে লইয়া আসিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা, জননীর চিত্ত চাঞ্চল্য নিবারণ অভিপ্রায়ে গোবর্দ্ধন যথাক্রমে কয়েক দিবস ভগ্নীপতির বাটীতে যাইয়াছিলেন, ভগ্নীকে পাঠাইবার জন্য তাহার শ্বশুরকেও বিস্তর অনুনয়বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন মতে হরলাল বাবু বধূমাতাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে স্বীকৃত হন নাই।

হিন্দুর গৃহে কন্যা পতিগৃহে বাস করিবে, আজীবন স্বামীর সহচরীভাবে কালপাত করিবে, পিতা মাতা বা তদীয় গুরুজন মাত্রের এইরূপই কামনা, কিন্তু এককালে কন্যা বহুদিন পিত্রালয়ে না আসিলে মায়ের প্রাণ ব্যথিত হইতে থাকে, যতক্ষণ না মাতা কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন, তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় মানসিক অবস্থা সম্যক জানিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ কিছুতেই নিশ্চিন্তা নহেন। তাহাতে শৈলবালার শ্বশুর মহাশয় বধূমাতাকে পিতৃগৃহে পাঠাইতে কিজন্য স্বীকৃতা নহেন? এই সাতপাঁচ ভাবিয়া মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী পাগলিনীপ্রায় হইয়াছেন, এ অবস্থায় গোবর্দ্ধন মাতাকে সান্ত্বনা করিতে স্বয়ং ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন, কিন্তু শৈলবালার শশুর মহাশয় বধূমাতাকে পাঠাইতে সম্মত হইলেই কোন পক্ষে

আর গোলযোগ হয় না; কিন্তু অবস্থার তারতম্যে তাঁহার মতি গতিরও ভাবান্তর দাঁড়াইয়াছে।

শৈলবালাকে লইয়া আসা সম্বন্ধে মাতা পুত্র উভয়েই নীরাশ হইয়াছেন, একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া শৈলবালার মঙ্গল কামনা করিতেছেন। তথাচ রক্তমাংসজড়িতদেহী কুটুম্বের এরূপ অশ্বব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন, এ দারুণ আক্ষেপ উভয়েই মনে মনে সম্বরণ করিয়াছেন. তাহাতে দুইজনেরই কষ্ট হইয়াছে কিন্তু সে কথার আন্দোলনে মন সমধিক ব্যথিত হয়, বিবেচনায় কথঞ্চিৎ শৈলবালার সম্বন্ধে আন্দোলনে নীরস্ত হইয়াছেন।

(৭)

যে শৈলবালার কারণ মাতঙ্গিনী ও গোবর্দ্ধন অহোরাত্র অশান্ত হৃদয়ে কালপাত করিয়াছিলেন, যাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া আসিবার জন্য কত শত বার কুটুম্ব দ্বারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে যুবতী আর জীবিতা নাই, সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রনা হইতে সে ব্রাহ্মণতনয়া চিরদিনের মত অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

দরিদ্র দুহিতা হইলেও বিদ্যানিধি মহাশয় ঘর বর দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, বরপক্ষীয় প্রাপ্য অবস্থার অপেক্ষা অধিক হইলেও ব্রাহ্মণ বহু কষ্টে সে দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান অদৃষ্টে সুখ না দিলে, সুখের কিরূপে বিধান হইতে পারে? শৈলবালার শ্বশুর হরলাল বাবু এক সময়ে দশ টাকা সংস্থান করিয়াছিলেন, তথাচ তাঁহার ধনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায়, তিনি প্রয়োজন মত কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকি য়া মাসে মাসে যাহা উপায় করিতেন, তাহাতেই তাঁহার সংসারের দৈ নন্দিন খরচ পত্র চলিয়া যাইত। হরলাল বাবুর সংসারজ্ঞানও যথেষ্ট ছিল, লোক লৌকিকতা আহার ব্যবহার সকলদিকে লক্ষ্য রাখিয়া হরলাল বাবু এতাবৎ কাল পোষ্য প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। সকল দিক বজায় রাখিয়া যে ব্যক্তি গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ নহে, তাহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়া থাকে. কিন্তু সংসার সম্বন্ধে সম্যক দৃষ্টি সত্ত্বেও হরলাল বাবু দ্যুতক্রীড়ায় এক কালে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক সময়ে সুখ সচ্ছন্দে দিনপাত করিয়া দরিদ্র অবস্থায় পরিণত হইলে. সংসারের অভাব জনিত যে কষ্ট হয়, তাহাতে সমধিক ব্যথা লাগে। হরলাল বাবু উপস্থিত অবস্থায় এক কালে ম্রিয়মাণ ও মনক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। পুত্র শিবরামের এখনও প্রতিপত্তি হয় নাই।

শৈলবালা ভ্রাতা ও জননীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন

ভগ্নীকে লইয়া আসিবার জন্ত কয়েকবার ভগ্নীপতির বাটীতে উপস্থিত হওয়ায় পরস্পর দেখাসাক্ষাৎও হইয়াছিল, কিন্তু দাম্ভিকতা প্রযুক্ত হরলাল বাবু বধূমাতাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে সম্মত না হওয়ায়, মাতঙ্গিনীর সহিত শৈলবালার আর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। কন্যা মাতার জন্য কত কাঁদিয়াছিলেন, কত অনুতাপ করিয়াছিলেন, মায়ের প্রাণও দুহিতার জন্য বিশেষ বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু নিয়তির প্রকোপে সে মাতা পুত্রীর ইহলোকে আর সাক্ষাৎ ঘটিল না। শৈলবালা বহুদিনাবধি পিত্রালয়ে আইসে নাই, পিতৃ শ্রাদ্ধান্তে তিনি যে শ্বশুরালয়ে যাইয়াছিলেন, ইহজন্মে আর তাঁহাকে পিত্রালয়ে আসিতে হইল না!

কয়েক মাস যাবৎ শৈলবালা মনক্ষুণ্ন অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন, শ্বশুরের অবস্থার হীনতা প্রযুক্ত সংসারেরও বন্ধন কতক পরিমাণে শিথিলও হইয়াছিল, তাহাতে যুবতীর গ্রাসাচ্ছাদনের কোন কষ্ট না হইলেও বহুদিন পতিবাসে অবস্থিতি করায় মাতা ও ভ্রাতার সংবাদ পাইলেও, তাঁহাদের জন্য তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছিল, সে কথা শ্বশুরালয়ে কাহারও নিকট কিছুই ব্যক্ত করেন নাই, মনের আক্ষেপ মনেই সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শৈলবালার মনস্তাপের সংবাদ ভগবানের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকে অবিলম্বে এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, যুবতীরও চিন্তানল চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

কোন প্রকার অসুখ বিসুখ হইলে চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিয়া রোগের প্রতীকার হইতে পারে, কিন্তু শৈলবালাকে অসুখের জন্ত কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। আহারান্তে অকস্মাৎ যুবতীর বক্ষ কেমন চাপিয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। অসুখের সংবাদ পাইবামাত্র হরলাল বাবু চিকিৎসক আনাইতে পাঠাইয়াছিলেন, ডাক্তারও যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে রুগ্নাকে সজীব অবস্থায় দেখিতে হয় নাই, অবশেষে হৃদ্‌রোগে শৈলবালার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, চিকিৎসক কর্ত্তৃক ইহা অবধারিত হইয়াছিল।

মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে, একটা না একটা গোলযোগে জড়িত হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য শেষ হইয়া গেল।

শৈলবালার অকাল মৃত্যুতে হরলালের গৃহে শোকোচ্ছ্বাস বাহিত হইল, অন্তঃপুরস্থ রমণীবর্গ হা হুতাশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, কিন্তু সে অনু-

তাপ কতক্ষণের জন্য? যে গেল সেই গেল, সময়ের অন্তরালে তাহার আর চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। কয়েক দণ্ড অতিবাহিত হইতে না হইতে শৈলবালার দেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য স্থানান্তরিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে রোদনের রোল হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল।

অশুভ সংবাদ কখন অপ্রকাশ থাকে না, যে মুহূর্ত্তে কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, পরক্ষণে তাহা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া যায়। শৈলবালার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সম্ভবতঃ পূর্ব্বক্ষণেই গোবর্দ্ধন শৈলবালার নিধন সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন, একথা তাঁহার মাতারও অবিদিত থাকিল না। পুত্রীর মৃত্যু সংবাদে মাতঙ্গিনী উচ্চৈ স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন, গোবর্দ্ধন মাতাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু যে আবেগে জননী রোদন করিতেছিলেন বিশেষ সাধ্য সাধনায় পুত্র আপাততঃ কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারিলেন না।

শৈলবালার বাল্যাবস্থা হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্তযাবতীয় বৃত্তান্ত আক্ষেপ সহ মাতঙ্গিনী উল্লেখ করিতে লাগিলেন, দর দর ধারে বৃদ্ধার নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। মাতার অবস্থা দেখিয়া পুত্রও মাতৃশোকে সহানুভূতি দেখাইলেন, তাঁহাকেও অশ্রুধারায় বিগলিত হইতে হইল। যেক্ষণে শৈলবালার মৃত্যু সংবাদ তদীয় পিত্রালয়ে পৌছিয়াছিল, মাতা ও ভ্রাতা এরূপ শোকবিহ্বল হইয়াছিলেন যে, যথাক্রমে দিবারাত্রি কাটিয়া গেল কিছুতেই তাহাদের সান্ত্বনা হইল না।

গোবর্দ্ধন মনের আক্ষেপে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, শিবরামের সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ আজ হইতে শেষ হইয়া গেল। এতাবৎকাল ভগ্নীর কারণ সকল বিষয়ে তাহাদের নিকট জড় সড় ভাবে কাটাইয়াছি, তাহারা একটা অন্যায় বলিলেও কোনদ্বিরুক্তি করি নাই; অধিক কি, ধর্ত্তব্য বলিয়া ভাবি নাই, তাহাদের অপমানসূচক কথা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সে সম্বন্ধ আত্মীয়তা এককালে ঘুচিয়া গেল। এক্ষণে আর তাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? যে অবলম্বনে শিবরাম আপনার হইয়াছিল, যখন চির দিনের মত সে সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, আমাদের শৈল আর ইহজগতে নাই, তখন শিবরাম বা তদীয় পিতা হরলালকে আর ভয় কি? এখন সেই অকালকুষ্মাণ্ড ভগ্নীপতি ও তাহার পাষণ্ড পিতা হরলালের পক্ষে সম্মার্জ্জনীই সার ব্যবস্থা! ! !

শূলরোগ (colia.)

লেখক, - শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায়। (সেনগুপ্ত)

আজ কাল আহারাদির পরিপাকের অভাবে অধিকাংশ লোকের এই রোগ হইতে দেখা যাইতেছে। সাধারণতঃ যকৃতদোষ হইতেই এই রোগের উদ্ভব। কখন কখন পাথুরী শর্করাদি হইতেও ঐ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহার উৎপত্তির কারণাদি নিম্নে বিষদ ভাবে লিখিত হইতেছে।

যে রোগ উদরে, কুক্ষিদেশে, ত্রিকস্থানে, তলপেটে, (বস্তিতে) নাভিতে ও হৃদয়ে টানিয়া ধরামত বা ছুঁচ ফোটা মত বেদনা ধরে তাহাকেই শূলরোগ বলা যায়।

অত্যন্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ধাতুক্ষয়, রাত্রিজাগরণ, গুরুপাকদ্রব্য ভোজন শুষ্ক শাক মাংসাদি ভোজন, মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে, হৃদয় পার্শ্ব ত্রিকস্থান ও বস্তি দেশে যে দারুণ বেদনা ধরে, তাহাই বাতজ শূল। এই বেদনা থাকিয়া থাকিয়া ধরে ইহাতে মলমূত্র-অধোবায়ু রোধ হইয়া থাকে। প্রায় ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া গেলে সন্ধ্যাকালে ও বর্ষাকালে এই বাতজ শূলব্যথা ধরে বা প্রবল হয়। তৈলমর্দ্দন ও তাপ দিলে এ বেদনা নিবৃত্তি হয়।

ঝাল ও টক্ দ্রব্য অধিক আহার করিলে অতিরিক্ত ধাতুপাত ও সুরাপান প্রভৃতি পিত্তবর্দ্ধক কারণে যে শূলবেদনা নাভিতে উৎপন্ন হয়, তাহাই পিত্ত শূল। এই বেদনার সহিত রোগীর তৃষ্ণা, গাত্রদাহ ও কখন কখন মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময়, অৰ্দ্ধরাত্রে ও শরৎ ঋতুতে এই ব্যথা ধরে ও প্রবল হয়। শীতল দ্রব্য প্রয়োগে, শীতল জলের ধারা ও শীতল পাণীয় সেবনে এই ব্যথা নিবৃত্তি হয়।

মৎস্য ও হংসাদি জলচর ও উভচর জীবের মাংস প্রচুর পরিমাণে ভোজন, খেচরান্ন পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে পেটে যে অসহ্য কর্ত্তনবৎ বেদনা ধরে তাহাই শ্লেষ্মজ শূল। ভোজন করিবামাত্র বা ভোজনের অল্পক্ষণ পরে অথবা শীত ও বসন্তকালে এ বেদনা ধরে বা প্রবল হয়। বিবমিষা (গা বমি বমি) মুখে জল উঠা, অরুচি, আমাশা, আমাশায় ও উদরে স্তব্ধভাব, পেট ও মস্তক ভার এ রোগের আনুসঙ্গিক উপদ্রব।

উক্ত ত্রিবিধ শূলের লক্ষণ একত্রে প্রকাশ পাইলে কালাকাল বিচার না করিয়া যথা তথা বেদনা ধরিলে ও উদর নাড়ী কুক্ষি পাঁজরে হৃদয় প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভূত হইলে সে শূল ত্রিদোষজ।

বাতজ ও পিত্তজ শূলে পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ শূলের মিশ্রিত লক্ষণ সহ অত্যন্ত

গাত্রদাহ ও জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে উহা বা॰ পিত্তজ শূল।

কুক্ষি, হৃদয়, নাভী এই তিনের মধ্যবর্ত্তীস্থানে বেদনা ধরা ও তৎসহ পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ শূলের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে উহা পিত্তশ্লেষ্মজ শূল।

পেটফাঁপা, বিবমিষা (গা বমি বমি) সহ শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহা আমজ শূল।

বহুদিনের শূলেযক্ষারোগ বদ্ধমূল হইয়া যখন প্রতিদিনই খাদ্য বা অন্নাদি পরিপাক হইবার সময় ব্যথা ধরে তখনি উহা পরিণাম শূল।

পুরাতন শূলরোগের যে অবস্থাই পথ্যাপথ্য, ভোজন অভোজন, জীর্ণাজীর্ণ কালাকাল প্রভৃতি কারণ অপেক্ষা না করিয়াই যখন তখন ব্যথা ধরিলে তাহাকে অন্নদ্রবশূল বলে। সর্ব্বতোভাবে নিয়ম পালন করিয়া থাকিলেও এ বেদনা ধরিতে দেখা গিয়াছে। কখন খালিপেটে কখন ভরাপেটে ব্যথা ধরে। দুই এক ঝলক পিত্ত বমন হইয়া গেলে বেদনার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। অল্প অল্প বেদনা প্রায় নিয়তই ধরিয়া থাকে।—

সকল প্রকার শূলের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ—

এক দোষজ শূল সহজেই আরোগ্য হয়। দুই দোষোৎপন্ন শূল বিশেষ চিকিসায় কষ্টে আরোগ্য হয়, অথবা স্থগিত থাকে। ত্রিদোষজ শূল অসাধ্য। পরিণামশূল ও অন্নদ্রব শূল বড়ই কষ্টসাধ্য বহুদিনের চিকিৎসায় আরোগ্য হয়।

সকল প্রকার শূলরোগে শঙ্খভস্ম বিশেষ উপকারী, বেদনা নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ৷৷॰ ঘণ্টা ১ঘণ্টা অন্তর ⁄॰ এক আনা মাত্রায় শঙ্খভস্ম লেবুর রসের সহিত গুলিয়া সেবন করাইলে বেদনার শান্তি হয়।

পরিষ্কৃত সোরা ⁄॰ আনা মাত্রায় জলে গুলিয়া নিত্য ২।১ বার সেবনে যকৃত ও বস্তির বিশোধিত হইয়া বেদনার উপশম করে।

হিং শূলব্যথার একটী মহৌষধ। নিত্য দুইবেলা আহারের পর ঘৃতেভাজা হিং একরতি পরিমাণে ও বিট লবণ ⁄॰ আনা মাত্রায় একত্রে জলসহ সেবনে বেদনার শান্তি হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে।

কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে যষ্টিমধু চূর্ণ, হরিতকী চূর্ণ, শুঠ চূর্ণ, শোধিত গন্ধক চূর্ণ মৌরী চূর্ণ ও চিনি সমভাবে মিশ্রিত করিয়া ঐ চূর্ণ ৵॰ আনা হইতে ।॰ আনা সেবনে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া রোগের উপকার করে।

বায়ুশূলে—জোয়ান হিং সৈন্ধব যবক্ষার ও হরিতকী চূর্ণ মিলিত ৵॰ হইতে ।॰ আনা ঘোল বা কাঁজীর (আমানী) সহিত সেবনে উপকার দর্শে।

শুঁঠ ১ তোলা এরণ্ডমূল ১ তোলা ৵৷৹ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵৹ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ ৵৹ ছটাক মাত্রায় অল্প লবণ ও এক রতি হিং মিশ্রিত করিয়া সেব্য

শ্লৈষ্মিক শূলে—নিমছাল এরণ্ডকমূল চিতামুল ও শুঁঠ প্রত্যেক ॥৹ আট আনা উক্ত রূপে পাঁচন প্রস্তুত করিয়া তৎসহ সৈন্ধব লবণ ৵৹ আনা ও হিং এক রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে বিশেষ ফল দর্শে।

শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক।৵৹ আনা পাকার্থ জল ৵৷৹ সের সিদ্ধ করিয়া পূর্ব্ববৎ মাত্রায় শীতল হইলে মধু ॥৹ তোলা গুড় ॥৹ তোলা দিয়া দিনে ২ বার সেব্য। কিছু দিন এই পাঁচন সেবনে বহু দিনের শূল আরোগ্য হয়।

পথ্য। দুগ্ধ, সাগু, বার্লী, খইয়ের মণ্ড,যবের রুটী, অল্পতরকারী, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, নারিকেল অল্পমাত্রায়, মিষ্টদ্রব্য, পাকা ফল, পেঁপে প্রভৃতি (আম্র কাঁঠাল গুরুপাক দ্রব্য নহে) লঘু পথ্য।

অপথ্য। গুরুপাক দ্রব্য ঘৃত, পাকামাছ, মাংস, ডিম্ব, গম ও সকল প্রকার ডাল, গরম মসলা, লঙ্কা, শাক-পাতাড় রৌদ্রতাপ রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

—::·::—

৺কাশীধামে রামাষ্টমী উপলক্ষে—জনৈক হতভাগ্য।

বাসন্তী অষ্টমী নিশি ক্ষীণ চন্দ্রালোকে—
শোভিছে অদূরে হিরণ্ময়ী বারাণসী—
ত্রিদিব-সুষমা; অঙ্কিত পাষাণ বক্ষে
(তব) যুগান্তের পূর্ণকীর্ত্তিগাথা; অর্দ্ধশশী—
বেড়ি কোটিদেশে শোভে অসৌশি-বরুণা—
রজত-মেখলা; বাজে ঘণ্টা, কম্বুরবে
উদ্বোধিত দশদিশি; পোড়ে ধুপ-ধুনা
বহেগন্ধ মন্দানীল ওঁকার প্রণবে
মুখরিত জাহ্নবীর পূণ্য তটভূমি!
(কোথা) কে আছরে অন্নক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত্ত মানব
পাপী তাপী বিশ্বমাঝে? দগ্ধ! চাহ তুমি
লভিবারে চিরশান্তি—নির্ব্বাণ-বিভব,
মুছিবারে অশ্রুবারি? হের অন্নপূর্ণ।
জগত-জননী বিতরেণ জগ জনে
স্নেহ-সুধা-অনন্ত অক্ষয়; লহ কণা
(ভিক্ষা) হৃদপাত্রে-পূর্ণশান্তি জীবনে মরণে!

গীতোক্ত ধর্ম্ম।

কর্ম্ম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নৈষ্কর্ম্মই যে গীতোক্ত-কর্ম্মবাদ একথা বুঝান হইল, এই কর্ম্মবাদ বারংবার বুঝাইলেও গীতা এই দুজ্ঞের্য় কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"গহণাকর্ম্মণোগতি" কর্ম্মের গতি এতই জটিল এবং সমস্যাপূর্ণ যে, এই কর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশ করা জ্ঞানীর পক্ষেও সুদূর—পরাহত। তাই বলা হইয়াছে,—

"বুদ্ধিযুক্তোজহাতিইউভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্॥"

ইহাও কিন্তু পূর্ব্বকথিত বিহিত কর্ম্মের ইঙ্গিত ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেননা, যতদিন পর্য্যন্ত মনোবৃত্তি নিরোধ না হইতেছে, ততদিনই না কর্ম্মের প্রয়োজন? আবার শাস্ত্র বলিতেছেন, এই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইলেও প্রথমে কর্ম্মের প্রয়োজন। তথাপি এই কর্ম্মযোগ অতি জটীল ও সমস্যাপূর্ণ বলিয়া গীতা কর্ম্ম করিবার কৌশল শিক্ষা দিতেছেন। গীতা বলিতেছেন, রে অবোধ দুঃখী জীব! এই সুগভীর কর্ম্মতত্ত্ব বড়ই দুর্ব্বোধ্য, অথচ এই কর্ম্ম ব্যতীতও এই দুঃখময় সংসারের যাওয়া আসার নিবৃত্তি হইবে না। অতএব যদি এই শোকদুঃখময় জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে শান্তিলাভ করিতে চাও, যদি জন্মান্তরের হা হুতাশের তীব্র তাড়না এবং এই জরা-মৃত্যু-ব্যাধি সঙ্কুল দুস্তর সংসার সাগর পার হইতে চাও, তবে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে প্রথমে এই কর্ম্মের কৌশল শিক্ষা কর, ইহাই ঈশ্বর সমীপে গমন করিবার প্রথম সোপান।

কর্ম্ম কৌশল সম্বন্ধে গীতার অভিমত এই,—"শ্রীভগবানে যাহাতে প্রীতি হয় এবং মনের একাগ্রতা লাভ হয়, তাহার জন্য প্রথমে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কর, কিন্তু এই স্বধর্ম্মানুষ্ঠান এমন কৌশলে সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহাতে চিত্ত বেশ শান্তভাব ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের চিন্তা করিতে পারে। প্রথমেই ভাবনা কর, সেই রমণীয় দর্শন শ্রীভগবাননিত্য সর্ব্বশক্তিমান এবং আনন্দ স্বরূপ, তিনি আমাতে এবং সর্ব্বপ্রাণীতে সমভাবে বিরাজমান, এই চিন্তার সময় চিত্তের সর্ব্বপ্রকার লয় বিক্ষেপ যদি সংসারের কোলাহলে বিঘ্ন ঘটে, তবে ইহার জন্য উপযুক্ত নির্জ্জন স্থান ঠিক করিয়া লইতে হইবে। ক্রমে এই অভ্যাসে তীব্র বৈরাগ্য আসিবে, তখন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ব্যতীত এ জগতে আর কিছুই ভাল লাগিবে না।"

ইহাই হইল কর্ম্মের প্রথম অবস্থা বা কৌশল।

সংসারি লোকের পক্ষে এই কর্ম্ম কৌশলও সহজে ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু তথাপি একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাঁহারা স্বচ্ছন্দে গীতার এই ইঙ্গিত অনুশারে কার্য্য করিতে পারেন, সংসারি লোকের মধ্যে দেখা যায়, কেহ নাম জপ কেহ সন্ধ্যা-গায়ত্রী কেহবা আবার শ্রীভগবানের সহস্র নামাদি পাঠ করিয়া থাকেন; ইহাও কি কর্ম্মের কৌশল নহে? তবে ঐ সকল নামজপ, সন্ধ্যা-বন্দনাদি বা সহস্র নাম পাঠ প্রভৃতি কার্য্যে রত হইবার পূর্ব্বে একবার কাতর প্রার্থনায় শ্রীভগবানকে প্রাণখুলিয়া ডাকিয়া বলিতে হয় যে, হে প্রভু! হে সর্ব্ব-শক্তিমান! আমাকে তোমার শক্তি দাও, আমি যেন শাস্ত্রমুখে তোমার অনুমতি জানিয়া তদনুশারে কার্য্য করিতে পারি, এই যে সন্ধ্যাগায়ত্রী বা সহস্র নামাদি পাঠ করিতে উপবেশন করিয়াছি, ইহাও প্রভু তোমারি অনুমতি জানিয়া, আরও বলিতে হইবে হে সর্ব্বজ্ঞ! এই কার্য্য ভাল হয়, কি মন্দ হয়, তাহা আমি জানি না, আমি কেবল এইমাত্র জানি যে, শাস্ত্র কথিত এই সকল কার্য্য তোমারই অনুমতি। তোমার অনুমতিই শাস্ত্রবাক্য, এইরূপ চিন্তা করিয়া এইরূপে শ্রীভগবানের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে দেখিতে পাইবে, ক্রমে ক্রমে শ্রীভগবানে প্রীতি আসিবে। ইহাও গীতোক্ত কর্ম্মকৌশল।

আসল কথা হইতেছে, আমার কার্য্য বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না। সকলি তাঁহার অনুমতিএবং তাঁহারি কার্য্য হইবে। কামনা থাকিলেই না-অহং অভিমান? এবং অহং অভিমান থাকিতেই না কামনা? এই জন্য এই কর্ম্ম-তত্ত্বে প্রথমে অহংকর্ত্তা এই জ্ঞানের পরিহার করিয়া শেষে কামনার ধ্বংস করিতে বলা হইয়াছে, কেননা কামনা পরিত্যাগই নৈষ্কর্ম্ম্যের একমাত্র হেতু। এই কামনা কিন্তু বড়ই দুর্দ্দমণীয়; তাই কর্ম্মযোগ অর্থাৎ গীতার ৩য় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এই কামনার কথাই বলা হইয়াছে।

"এবং বুদ্ধে পরাং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মনমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥"

"হে মহাবাহো! এই পূর্ণ আত্মাকে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া আপন সংস্কৃত মনের দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া এই অতি ভয়ঙ্কর দুর্দ্ধর্ষ কামরূপ শত্রুকে বিনাশ কর।"

গতবারে বলিয়াছি, মহাবীর যিনি তিনি রণজয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারেন। কিন্তু আপন মনকে যিনি জয় করিয়াছেন, তাঁহার তুল্যবীর পৃথিবীতে আর

কেহই নাই, এই অতি দুর্দ্দমনীয় কামশত্রুকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরাজয় করিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রেয়লাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এই যে. জ্ঞান যাহা দ্বারা জীবকে প্রকৃতির পথে লইয়া যাইবে, এই দুদ্ধর্ষ কামনার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, বলিয়া জীব সেই আত্মজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয় বাসনায় অভিভূত হইয়া থাকে। অথবা নৈষ্কর্ম্ম্যই প্রকৃত জ্ঞান, এই জ্ঞান অর্থাৎ এই নিস্কাম অবস্থাই জীবের সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ পরম শান্ত ভাব।

যাহারা এই দুরাসদ কামনার অধীন হইয়া নিস্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে না পারিল, তাহাদিগকে গীতোক্ত ইন্দ্রিয়ারাম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? ইন্দ্রিয় সুখের জন্য ভোগের জন্য এবং কেবলমাত্র লালসা তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করে, সে বড়ই দুর্ভাগ্য, ইহকালে এবং পরকালে সেই ইন্দ্রিয়ারাম ব্যক্তির জীবন কেবল দুঃখই ভোগ করে।

বলবান কামনা সর্ব্বদাই বিষয়াভিমুখী, বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন,—

"ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্ণাবমিবাম্ভসি॥"

"বিষয়ানুরক্ত ইন্দ্রিয়গণকে যেমন অনুধাবন করে, সেই মত জলমধ্যে বায়ুচালিত নৌকার ন্যায় সেই ব্যক্তির বুদ্ধিকে বিনাশ করিয়া থাকে।

সর্ব্ব প্রকার কামনার ধ্বংস না হইলে নৈষ্কর্ম্ম্য হওয়া হয় না, এই পৃথিবীতে একমাত্র আত্মারাম শ্রীভগবান ব্যতীত আমার বলিয়া যখন আর কেহই নাই, তখন কিসের জন্য এবং কাহার জন্য কামনা করিব ? আরও যখন আমার আপনার বলিবার কিছুই নাই, তখন অপরের জন্য আবার কি কামনা হইতে পারে ? তাই আবার বলি যদি নিস্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতিলাভ করিতে চাও. যদি এই হা হুতাশ পূর্ণ অতি দুঃখময় সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে আশা কর, তবে এই দুদ্ধর্ষ কামরূপ শত্রুকে অগ্রে জয় কর, যিনি কামকে পরিত্যাগ করিয়া বাসনায় জলাঞ্জলী দিয়াছেন, সেই নিস্কাম কর্ম্মীকে গীতা বলিতেছেন,—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থমনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥"

"যখন কোন সাধক যাবতীয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আপন স্বরূপে আপনি পরিতুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।"

এই অবস্থার পরেই সাধক সর্ব্বদাই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েন।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত স্পৃহঃ।
বীত রাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

"দুঃখে যাঁহার মন উদ্বেগশূন্য, সুখে যিনি তৃষ্ণাশূন্য, যাঁহার মন হইতে আসক্তি ভয় এবং ক্রোধ দূর হইয়াছে, এইরূপ আত্মমনন-শীল ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ইত্যাদি।

যে মহাপুরুষ ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিয়াছেন, এ ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইলেও তাঁহার সেদিকে লক্ষ্য হয় না, তাই মহামুনি অষ্টাবক্র, মুক্তিকামী রাজর্ষি জনকের প্রশ্নে এক মাত্র উত্তরে বলিয়াছিলেন,

"মুক্তি মিচ্ছসি চেত্তাত
বিষয়ান্ বিষবত্তজঃ।"

হে মহারাজ! মুক্তির জন্য কিছুই করিতে হইবে না, যদি মুক্তি চাও, তবে এই বিষয়কে বিষের ন্যায় পরিত্যাগ কর। বিষয় শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ যথা (বি+ষি=বন্ধন করা+অচ) ইহার অর্থ জ্ঞেয় বস্তু অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু। এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার অবলম্বন করিয়াই জন্ম জন্মান্তরীন এবং ইহজীবনের কর্ম্ম আসিয়া জীবকে আবদ্ধ অর্থাৎ বন্ধন করে, বন্ধনের বিপরীত শব্দ মুক্ত, তাই জ্ঞানগুরু মহর্ষি অষ্টাবক্র বিষয় শব্দের দ্বারা ইঙ্গিৎ করিয়া একটী মাত্র কথায় বলিলেন, "হে মহারাজ! যদি মুক্ত হইতে চাও, তবে বন্ধন (কর্ম্ম বন্ধন) মোচন হইবার উপায় দেখ।" (ক্রমশঃ।)

সতী-ধর্ম্ম।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

স্ত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উপদেশ।

"একদা বুদ্ধদেব নিমন্ত্রিত হইয়া অনাথ পিণ্ডদ শ্রেষ্ঠীর ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য উপযুক্ত আসনাদি প্রস্তুত ছিল। উপস্থিত হইয়া ভগবান্ আসন গ্রহণ করিলে শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন শ্রেষ্ঠীর অন্তঃপুরে বড় গোলমাল

করিলেন, "শ্রেষ্ঠী, ঘরে এত গোলমাল ও উচ্চশব্দ কেন? বোধ হইতেছে, যেন কৈবর্ত্তেরা মাছ ভাগ করিতেছে।" শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "হাঁ ভগবান, বড় গোলমাল হইতেছে। আমার পুত্র-বধূ সুজাতা ধনাঢ্য লোকের দুহিতা। সে শ্বশুর শাশুড়ীকে মান্য করে না, স্বামীকে গ্রাহ্য করে না, এমন কি ভগবানকেও সৎকার করে না, মানে না, পূজা করে না বা ভক্তি করে না। তাহার আচরণে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া অন্তঃপুর বাসীরা গোলমাল করিতেছে।" অসৎ প্রকৃতির লোক স্বভাবতঃই দুর্ব্বুদ্ধি। অনাথ পিণ্ডদকে ভগবানের নিকট যাইতে দেখিয়া সুজাতা মনে করিল, আমার শ্বশুর বুঝি আমার নিন্দা গাইতে যাইতেছেন। এই ভাবিয়া সে আড়ালে দাঁড়াইয়া বুদ্ধের সহিত তাহার শ্বশুরের কথোপকথন শুনিতেছিল। ভগবান জানিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন, "সুজাতা এখানে এস।" "হাঁ প্রভু এই যাচ্ছি" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া সে ভগবানকে অভিবাদনান্তর একান্তে গিয়া উপবেশন করিলে, ভগবান বলিলেন, সুজাতা, পুরুষের সাত প্রকার ভার্য্যা। যথাঃ—(১) বধকা সমা। (বধকারিণী) (২) চোরি সমা। (৩) আর্য্যা সমা। (৪) মাতৃ সমা। (৫) ভগিনী সমা। (৬) সখী সমা। (৭) দাসী সমা। তুমি এই সাত প্রকারের কোন প্রকার ভার্য্যা?"

"প্রভু আমি আপনার সংক্ষিপ্ত উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সরল ও বিশদ ভাবে বলুন। আমি বুঝিয়া উত্তর করিব।"

"তবে মনোযোগ দিয়া শুন, বলিতেছি।"

"হাঁ প্রভু শুনিতেছি, বলুন।"

ভগবান বলিলেনঃ—

(১) বধকা সমা।

"পদুঠ্‌ঠচিত্তা অহিতানু কম্পিনী ;
অঞ্‌ঞেসু রত্তা অতিমঞ্‌ঞতে পতিং,
ধনেন কীতস্‌স বধায় উসসুকা ;
যা এব রূপা পুরিসস্‌স ভরিয়া
বধকা চ ভরিয়াতিচ সা পবুচ্চতি।"

যে স্ত্রী সতত কোপন স্বভাবা, স্বামীর অহিত কামিনী, যে অন্যে আসক্তা হইয়া নিজ পতিকে অবমাননা করে, ধনের দ্বারা ক্রীত হইয়াও যে ক্রয় কারীকে বধ করিবার জন্য উৎসুকা হয়, পুরুষের সেই স্ত্রী বধকা ভার্য্যা নামে কথিতা হয়।

(২) চোরী সমা।

"য়া ইথিয়া বন্মতি সামিকো ধনং
সিপ্পং বণিজ্জ জঞ্চ কসিং অধিঠ্ঠহং,
অপ্পং পিতস্ সা অপহাতুং ইচ্ছতি ;
যা এবরূপা পুরিসস্ স ভরিয়া
চোরি চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।"

শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষি কর্ম্মাদি দ্বারা স্বামী যে ধন লাভ করে, তাহা হইতে অল্প হইলেও চুরি করিতে যে, স্ত্রী ইচ্ছা করে এবং সুযোগ পাইলে চুরি করে, এমন কি উনেনের উপর চড়ান ডাল, চাউল হইতেও কিছু কিছু চুরি-করিয়া লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে সে স্ত্রীকে চোরী সমা বলে।

(৩) আর্য্যাসমা।

অকম্মকামা অলসা মহগ্ ঘসা
করুসা চ চণ্ডী দুরুত্তবাদিনী
উঠ্ঠায়কানং অভিভুয্য বত্ততি :
যা এবরূপা পুরিসম্ স ভরিয়া
আর্য্যা চ ভরিয়াতি চ সা প বুচ্চতি।

যে স্ত্রী কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করে না, অলস স্বভাবা অথচ ভাল খাওয়া পরা না হইলে যার চলে না, যাহার ব্যবহার কর্কশ, প্রকৃতি চণ্ডা, যে অপ্রিয় ও কর্কশ বাক্য ব্যবহার করে ও স্বামীর উপর প্রভুত্ব দেখায় সে স্ত্রী পুরুষের আর্য্যা সমা ভার্য্যা বলিয়া কথিত হয়।

(৪) মাতা সমা।

"যা সর্ব্বদা হোতি হিতানুকম্পিনী
মাতাব পুত্তং অনুরক্খতে পতিং
ততোধনং সম্ভতং অস্সরক্ খতিং
যা এবরূপা পুরিস্ স ভরিয়া
মাতা চ ভরিয়াত চ সা প বুচ্চতি।

যেস্ত্রী সর্ব্বদা পতির হিতাভিলাষিণী, মাতা যেমন প্রাণপণে পুত্রকে রক্ষা করে, সেইরূপ যে স্ত্রী নিজ পতির রক্ষা কল্পে সতত সচেষ্ট থাকে, পতির উপার্জ্জিত ধন যে যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া থাকে, সে স্ত্রী মাতৃ সমা ভার্য্যা নামে কীর্ত্তিতা।

(৫) ভগিনী সমা।

"যথাপি জেঠ্ঠা ভগিনী কানিঠ্ঠকা
স গারবা হোতি সকম্হি সামীকে
হিরীমানা ভত্তু বসানু বত্তিনী
যা এবরূপা পুরিসস্ ভরিয়া
ভগিনী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।"

যে স্ত্রী ভগিনীর ন্যায় স্বামীর প্রতি স্নেহপরায়ণা বা ভক্তিমতী, আর যে সলজ্জ ভাবে স্বামীর বশবর্ত্তিনী সে স্ত্রী ভগিনী সমা ভার্য্যা বলিয়া কথিতা।

(৬) সখী সমা।

"যা চিধ দিস্বান পতিং পমোদতি,
সখী সখারং বচিরস্সং আগতং,
কোলির্য্যকা সীলবতী পতিব্রতা,
যা এবরূপা পুরিসস্ স ভরিয়া
সখী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।

বহুদিন পরে আগত সখাকে দেখিয়া সখী যেমন আনন্দ অনুভব করে, সেরূপ যে স্ত্রী পতিকে দেখিয়া প্রমোদিতা হয়, আর যে কুল-গৌরব রক্ষা কারিণী, শীলবতী ও পতিব্রতা সে স্ত্রী সখী সমা ভার্য্যা নামে অভিহিতা।

(৭) দাসী সমা।

অকুদ্ধসন্তা বধদণ্ড তজ্জিতা,
অদুঠ্ঠচিত্তা পতিনো তিতক্খতি,
অক্কোধনা ভত্তু বসানুবত্তিনী
যা এব রূপা পুরসিস্ স ভরিয়া
দাসী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চ।

স্বামী বধ করিতে উদ্যত হইলেও যে স্ত্রী প্রসন্ন চিত্তে ভক্তির সহিত স্বামীর ব্যবহার সহ্য করে, স্বামীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধ প্রকাশ করে না, যে স্বভাবতঃ ক্রোধহীনা ও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী সে স্ত্রী দাসী সমা বলিয়া কীর্ত্তিতা।

যা চিধ ভরিয়া বধকাতি বুচ্চতি
চোরী চ আর্য্যাতি চ সা পবুচ্চতি
দুস্সিলরূপা ফরুসা অনাদরা
কায়স্স ভেদা নিরয়ং বজন্তিতা।

বধকা, চোরী ও আর্য্যা সমা স্ত্রী দুঃশীলা, কর্কশস্বভাবা ও স্নেহ-দয়া হীনা। মৃত্যুর পর তাহারা নরকে গমন করিয়া থাকে।

যা চিধ মাতা ভগিনী সখীতি চ
দাসী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি
সীলে ঠিতত্তা চিররত্ত সংবুতা
কায়স্স ভেদা সুগতিং বজন্তি তাতি।

আর মাতা, ভগিনী, সখী ও দাসী সমা স্ত্রী শীলবতী, চির সুরতা ও সংযতা বলিয়া মৃত্যুর পর তাহারা স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে।

হে সুজাতা! পুরুষের এই সাত প্রকার ভার্য্যা। তুমি ইহাদের কোন্ শ্রেণীর?"

"হে প্রভু! আজ হইতে আমাকে দাসী সমা বলিয়া গ্রহণ করুন।"

সুজাতা সেই হইতে শ্বশুর শ্যাশুড়ীর প্রতি ভক্তিমতী ও তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইল। স্বামীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রেম পরায়ণা ও ছায়ার ন্যায় স্বামীর একান্ত বশবর্ত্তিনী এবং দাসদাসীর প্রতি বাৎসল্য পরায়ণা হইয়া পরিবারের সকলকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। এমন কি প্রতিবেশীরাও সুজাতার অমায়িক ব্যবহার ও কোমল স্বভাব দর্শনে মুগ্ধ হইতে লাগিল।*

উপসংহারে—প্রাণকথা।

স্বামী স্ত্রীর চির-ভক্তিভাজন মূর্ত্তিমান দেবতা; একমাত্র পতিকে অর্চ্চনা করিলেই সর্ব্বদেবতার পূজা করা হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পতিরূপে বিরাজিত। যে গৃহে পুণ্যশীলা পতিব্রতা রমণী বিরাজিমান, ভগবান শ্রীহরি তথায় নিত্য অবস্থান করেন। অতএব পতিই অবলার একমাত্র প্রাণারাধ্য ধন —পূজা-ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ। যথা,—

"যয়া প্রিয়ঃ পূজিতশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ পূজিত স্তয়া;
পতিব্রতা ব্রতাথঞ্চ পতিরূপী শ্রীহরিঃ স্বয়ং॥"

অর্থাৎ,—শ্রীহরি স্বয়ং পতিরূপে বিরাজিত; মহিলাগণ স্বামী-পদপূজা করিলেই ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্ম পূজার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"পুণ্যব্রতো গৃহী যত্র, গৃহিণী চ পতিব্রতা।
পিতৃ ভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥
আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জ্জবম্।
সত্যং শৌচং ক্ষমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥

* শ্রীপূর্ণানন্দ স্বামী।

অর্থাৎ,—যে গৃহে পুণ্যশীলা, পতি-ব্রতা গৃহিণী, পিতৃভক্ত সন্তান, সতীত্ব আতিথ্য, দয়া, গুরু-ভক্তি, সত্য, শৌচ, সরলতা ও ক্ষমা প্রভৃতি বিরাজমান, ভগবান শ্রীহরি সর্ব্বদা তথায় বিহার করেন।

রমণী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সনাতন আর্য্যশাস্ত্রে এরূপ ভূরি ভূরি অমূল্য উপদেশ রত্ন সন্নিবেশিত আছে। পূর্ব্বোলিখিত পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম সকল পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টই অনুমিত হয় যে, রমণীদিগের পক্ষে—পুরুষোচিত গুণ-গ্রামে ভূষিতা হইবার চেষ্টা পাওয়া,—অর্থাৎ চাকরি করা, বক্তৃতা দেওয়া, স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করা এবং সভা-সমিতিতে যোগদান করা অতীব অন্যায়। ইহাতে শুধু যে অধর্ম্ম হয় এমত নহে; গর্ভধারণ, সন্তান পালন এবং গৃহ-কর্ম্ম সম্বন্ধেও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। কিন্তু হায়! আমরা একবার ভ্রমেও সেই অখিল সম্পন্ন মহা-প্রাজ্ঞ প্রাচীন আর্য্য-ঋষিদের স্বর্গীয় উপদেশাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি না। হা ভগবান্! কবে আমাদের মতি-গতি ফিরিবে? কবে আমরা স্ব স্ব ভগিনী সুতা ও দয়িতা প্রভৃতিকে দেশীয় প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিতা ও প্রাচীন দীক্ষায় দীক্ষিতা করিতে যত্ন পাইব? ভগবান্! সে দিন কি হইবে না? আর কি ভারতে সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর আবির্ভাব হইবে না?

সম্পূর্ণ।

গিরিশচন্দ্রের উপস্থিত রচনা-শক্তি।

(শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সংগৃহীত।)

যৌবনকালে একদিন মহাকবি গিরিশচন্দ্র আফিস যাইবার জন্য বাহির হইয়াছেন, পথিমধ্যে তাঁহার এক সুপরিচিত বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "বেহাইবাড়ী কিছু লিচু-তত্ত্ব পাঠাইতেছি, তোমায় একটি কবিতা বাঁধিয়া দিতে হইবে।" গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত কবিতাটি বাঁধিয়া দিলেন :—

সুগোল কণ্টকময় পাতা কুচু কুচু।
সবিনয় নিবেদন পাঠাতেছি কিছু॥
দেখিলেই বুঝিবেন রসভরা পেটে।
মধ্যেতে বিরাজ করে আঁটি বেঁটে বেঁটে॥
সুরস রসেতে যদি রসে তব মন।
তা'হলেই জানিবেন সিদ্ধ আকিঞ্চন॥

—:—

কমলা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

একদিন কাজ কর্ম্ম সারিয়া কমলা বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সরলা আসিয়া আহ্বান করিল সই! কাপড় কাচিবেনা?

কমলা। হাঁ; কাচিব, আমি তোমার জন্য বসিয়া আছি।

সরলা। তবে চল, সকাল সকাল সারিয়া আসি। কমলা শুনিয়া উঠিলেন, গামোছা খানি ভিজাইয়া শাশুড়ীর গা, হাত, পা ও মুখ মুছাইয়া দিয়া এক খানি কাচা কাপড় আনিয়া তাঁহার হাতে দিলেন, কমলার শাশুড়ী কাচা কাপড় খানি পরিয়া, ছাড়া কাপড় খানি কমলার হস্তে দিলেন। কমলা কাপড়খানি ও একটী পিত্তলের কলসী লইয়া পুষ্করিণীতে চলিয়া গেলেন।

পুষ্করিণী হইতে কাপড় কাচিয়া আসিয়া গৃহে সন্ধ্যা দিলেন। পরে কিছুক্ষণ কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিয়া শাশুড়ীকে শুনাইয়া, শাশুড়ীর ক্রোড়ে শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়, এমন সময়ে কমলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। রঘুপতি একটা ব্যাগ, একটা ছাতি ও এক গাছা ছড়ি হাতে করিয়া বাটীতে আগমন করিলেন। কমলা তখন পুষ্পাদি লইয়া শাশুড়ীর পূজার আয়োজন করিতেছেন। রঘুপতিকে দেখিয়া অভিমানে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রঘুপতি বলিলেন, "কমলা! আমি কত দিনের পর বাটীতে আসিলাম, তুমি আমাকে বসিবার আসন দিলে না, পা ধুইবার জল দিলে না, কেবলই কাঁদিতে লাগিলে? তবে তুমি কাঁদ আমি চলিলাম," এই বলিয়া যেমনই রঘুপতি চলিয়া যাইবেন, কমলা "না না যেওনা, যেওনা, তোমার পায়ে পড়ি বলিয়া যেমনই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কমলা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেই লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার ক্রন্দনে শাশুড়ীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কমলার গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ও বৌ মা! ও বৌ মা! কাঁদিতেছ কেন? কমলা কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। কোনও উত্তর দিলেন না। শাশুড়ী বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়া যখন ক্রন্দন ব্যতীত কোনও উত্তর পাইলেন না, তখন ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "যদি উত্তর না দাও, তবে আমি মাথা খুঁড়িয়া মরিব।

শাশুড়ীকে রাগান্বিতা দেখিয়া কমলা কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া বলিলেন, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।

শাশুড়ী। কি স্বপ্ন ?

কমলা। আমি তাঁকে স্বপ্ন দেখিয়াছি।

শাশুড়ী। তাঁকে, কাকে ?

কমলা। তোমার ছেলেকে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া শাশুড়ীও কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল। ইহাঁরা শাশুড়ী বউয়ে কেহই শয্যা হইতে উঠিলেন না। কমলা বলিলেন, "মা! আমার বিশ্বাস তিনি বাঁচিয়া আছেন। আমি একবার তাঁর অন্বেষণে যাইব।

শাশুড়ী। ওমা! তুই কুলবধু, কোথায় যাবি মা ? তোর এই সোমত্ত বয়েস। পথে কত বিপদ আপদ আছে।

কমলা। কি বিপদ মা ? ভগবান আছেন, তাঁহার নাম করিয়া গমন করিব বিপদ আপদ কোথায় চলিয়া যাইবে।

শাশুড়ী। না মা! তোমার যাওয়া হইবে না। কত লোকেকত কথা বলিবে। সে সব কথা শুনিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। আমার নির্ম্মল কুলে কলঙ্কের কথা শুনিলে আমি আত্মহত্যা করিব।

কমলা। না, মা! তোমার কিছুই করিতে হইবে না। আমি যদি সতী হই, আর যদি তোমার ছেলের পায়ে মতি থাকে, তাহা হইলে আমার কিছুই হইবে‌না। আমি যাইবই যাইব। আমার কাছে তাঁর তিনখানি চিঠি আছে ; সেই চিঠিতে তাঁর ঠিকানা লেখা আছে। আমি সেই ঠিকানায় যাইব। আমার দিনপনের বিলম্ব হইবে ; যদি দেখা পাই, তবে তোমার ছেলেকে লইয়া বাড়ীতে আসিব। না হয়, সেখান থেকে আসিয়া তোমাকে লইয়া কাশীবাস করিব। এ গ্রামে আর থাকিব না।

শাশুড়ী। কেন ? গ্রামের দোষ কি ?

কমলা। এক জনের দোষে গ্রামের উপর ঘৃণা হইয়া গিয়াছে।

শাশুড়ী। কি বল্লি মা! কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না।

কমলা। সরলাকে জিজ্ঞাসা করিও সে বলিবে ; আমি ও পাপ কথা বলিতে পারিব না, সে বলিবে।

এই বলিয়া কমলা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং গৃহ কার্য্যে নিযুক্তা

হইলেন। শাশুড়ীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন; দাওয়ার এক পার্শ্বে একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। কমলার গৃহ কার্য্য সারা হইল। সরলাও গৃহ কার্য্য শেষ করিয়া কমলাদের বাটীতে আগমন করিয়া ডাকিল,সই!

সরলার স্বর শুনিতে পাইয়া কমলার শাশুড়ী বলিলেন, ও সরলা! একবার আমার কাছে আয় ত মা!

তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

"কি কথা বামুন মা!" বলিয়া সরলা তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিল। তখন কমলার শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌমা এখানে থাকিতে চায় না, কাশীবাস করিতে চায়; কেন বলিতে পারিস?

সরলা। কেন পারিব না; আজি দিন পনের হইল, যখন আমরা নাইতে যাই ও বৈকালে কাপড় কাচিতে যাই, কালীভৈরব দাদা পথে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ঠাট্টা ও তামাসা করেন; আমরা কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে ভুলেও তাকাইনা ও তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিনা। সইত এক হাত ঘোমটা দিয়া থাকে। সে কথা যাউক, গত কল্য বৈকালে যখন আমরা কাপড় কাচিয়া বাড়ী আসি, কালীভৈরব দাদা দুই টা বড় বড় গোলাপ ফুল লইয়া পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমাকে বলিলেন, সরলা! নে, খোঁপায় দিস। আমি বলিলাম, বউ দিদিকে দিও, বেশ মানাবে। কিন্তু তিনি বলিলেন, তোমার সইয়ের মাথায় চমৎকার মানায়। তোমার সইয়ের যৌবনটা বৃথায় গেল। তখন আমার বড় রাগ হইল ও বলিলাম, তোমার যত বড় মুখ তত বড় কথা। সই বিধবা মানুষ ওর ফুলে দরকার কি? আমি এই কথা বউ দিদিকে বলিয়া দিব। বেশী বাড়া বাড়ি কর ত বাবাকে বলিয়া দিব।

কমলার শাশুড়ী। য়্যাঁ এত বড় আস্পর্দ্ধা! তোর কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। তার পর আঁট কুড়ির ব্যাটা কি বলিল?

সরলা। য়্যাঁ! এমন কি বলিলাম, এমন কি বলিলাম, বলিতে বলিতে গোঁজ গোঁজ করিয়া চলিয়া গেল।

এই কথা কমলার শাশুড়ী শুনিয়া, ও বাবা! রঘুপতি। একবার বাড়ী আয়রে, তো বিনে কি দশা হয়েছে, একবার দেখে যারে। আঁটকুড়ীর ব্যাটা কালীভৈরব। তুই যে রঘুপতির প্রাণের বন্ধু। রঘুপতি! তোর প্রাণের বন্ধুর ব্যবহার দেখে যাবে। হে ধর্ম্ম! তুমি কি নাই? হে ইন্দ্রদেব। তোমার বজ্র কি নাই? তাহা আঁটকুড়ীর ব্যাটা কালীভৈরবের মাথায় পড়েনা? যম

তুমি দুষ্ট লোকের কাছে ঘেঁসিতে পার না। আমার রঘুপতি ধীর, শান্ত, তাই তাহাকে লইলে? ইত্যাদি বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সরলা বলিল, "ও বামুন মা। চুপ কর, চুপ কর, এই দেখ, সই কাঁদিতেছে"। এই কথা শুনিয়া, কমলার শাশুড়ী "আমার বুকটা জ্বলে গেল, আমার বুকটা জ্বলে গেল" বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন কমলা বলিলেন, "মা! চুপ কর, মা! চুপ কর, আর কাঁদিলে কি হইবে? আমাদের ভগবান আছেন। তিনিই দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তিনি ভিন্ন আর আমাদের কেহই নাই। ভগবানই ইহার বিচার করিবেন"। এই বলিতে বলিতে শাশুড়ীর নিকটে আসিয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চলে তাঁহার চক্ষু মার্জ্জন করিয়া দিলেন। কমলার শাশুড়ী "আহা, বাপরে। এও কি কখন সহ্য হয়?" বলিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

শাশুড়ী চুপ করিলেন, দেখিয়া কমলা সরলাকে বলিলেন, "সই! আমার বোধ হয়, তিনি জীবিত আছেন। আমি একবার তাঁর অন্বেষণে তাঁর কর্ম্মস্থানে যাইব। আমার অবর্ত্তমানে তুমি এই কয় দিন আমার মায়ের তত্ত্বাবধান করিও। রাত্রে মায়ের কাছে শয়ন করিও। (কমলা শাশুড়ীকে মা বলিতেন।)

সরলা। সত্য সত্য যাইবে নাকি?

কমলা। হাঁ। কয় দিন ধরিয়া আমার মনের মধ্যে কেমন করিতেছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তিনি জীবিত আছেন। কয় দিন ধরিয়া আমার বামঙ্গ কেবলই নাচিতেছে। কেন বলিতে পারি না।

সরলা। একাকী যাইবে?

কমলা। দোসর আবার কোথায় পাইব?

সরলা। দাদাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও না?

কমলা। না, মন্দ লোকে কত কথা বলিবে।

সরলা। তোমার দাদাকে কেন সংবাদ দাও না?

কমলা। "দাদা আসিবেন না; দেখিতেছ না, আমি মাকে ফেলিয়া বাপের বাড়ী যাই নাই, বলিয়া তিনি আমার কোন সংবাদ লয়েন না।"

সরলা। "বামুন মার খাওয়া দাওয়া কোথায় হইবে?"

কমলা। "আমি রাঙা ঠান্‌দিদিকে ৩৲ তিনটী টাকা দিয়া যাইব; তিনি এই কয় দিন মাকে ভাত দিবেন।"

সরলা। "যাহা ভাল বুঝ ভাই। তাহাই কর, আমার কিন্তু ভাল বোধ

হইতেছেনা।"

কমলা। "কোন চিন্তা নাই সই!" বলিয়া সরলার হাত খানি ধরিয়া বলিলেন, "দেখিও সই! মায়ের যেন কোন কষ্ট না হয়?"

সরলা বলিল, "সে জন্ত কোন চিন্তা নাই, তোমার জন্ত বড়ই ভাবনা হইবে।" কমলা বলিলেন, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে যাইব। কমলার শাশুড়ী বলিলেন, সরলা শুন্‌লি? বৌমার কাণ্ড শুন্‌লি?

তখন কমলা বলিলেন, চল সই! স্নান করিয়া আসি, বলিয়া গৃহ মধ্যে গমন করিয়া, একটা বাটীতে করিয়া তৈল আনয়ন করিলেন। এবং শাশুড়ীকে মাখাইয়া দিয়া নিজে মাখিলেন। তাহার পর সরলাকে বলিলেন, কই সই! তৈল মাখিলে না? এই যে মাখি বলিয়া সরলাও নিজ দেহে তৈল মাখিল।

তৈল মাখা হইলে, সরলা তাঁহাদের বাটী হইতে একটী পিত্তলের কলসী আনিয়া কমলাও একটী পিত্তলের কলসী লইয়া শাশুড়ীর হস্ত ধারণ করতঃ স্নান করিতে গমন করিলেন। স্নান কার্য্য শেষ করিয়া তিন জনে বাটীতে আগমন করিলেন। ক্রমশ

সমালোচনা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

ভবরামের উইল।—শ্রীযুক্তরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—এচ, পি, ব্যানার্জ্জী কর্তৃক প্রকাশিত, গিরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস দ্বারা মুদ্রিত, মূল্য একটাকা চারি আনা। পুস্তক খানি ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। উপযুক্তই হইয়াছে—কৌস্তভ ভগবান বই আর কার কণ্ঠে শোভা পায়?

আজি কালিকার দিনে গাউন পরা, বনেট মাথায় প্রেয়সীর প্রণয় সম্ভাষণ না থাকিলে উপন্যাস জমিয়া উঠে না, প্রেমের হলাহলি—ঢলাঢলি না থাকিলে বঙ্গীয় পাঠকের তাহা পড়িতে মন চায় না, প্রেম ভাল, প্রেমেই সংসার চলিতেছে, প্রেম ব্যতিরেকে সংসার অন্ধকারময় শিথিল শৃঙ্খল ও অশান্তির স্থান হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার বিশেষত্ব আছে, আলোচ্য গ্রন্থের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে গল্পাংশের আড়ম্বর মাত্র নাই। ভবরাম এই উপন্যাসের

নায়ক, তাঁহার পত্নী সাগরবালা নায়িকা, করুণাসিন্ধু ভ্রাতা এবং ঝামেরিয়া নাম্নি চিরকুমারী, এই কয়েকটী ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। ভবরাম মহাতেজস্বী চরিত্রবান পুরুষ তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রাণতার জাজ্জ্বল্যমান ছবি প্রত্যক্ষ করা যায়। গ্রন্থকার আপনার চিত্র আপনি যেরূপ আঁকিয়াছেন, সিদ্ধহস্ত চিত্রকরও সেরূপে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইবে না, আমরা এ চিত্র দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। সাগরবালা অন্তঃপুরচারিণী তাহাকে আমরা দেখি নাই— তাঁহার চিত্র দেখিয়া মনে হয়, উদোমদো পতিপ্রাণা হিন্দু গৃহিণী স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামীই সংসারের সার, মহাকবি কবিকঙ্কণ ব্যাধবধু ফুল্লরার মুখে বলিয়াছেন,—

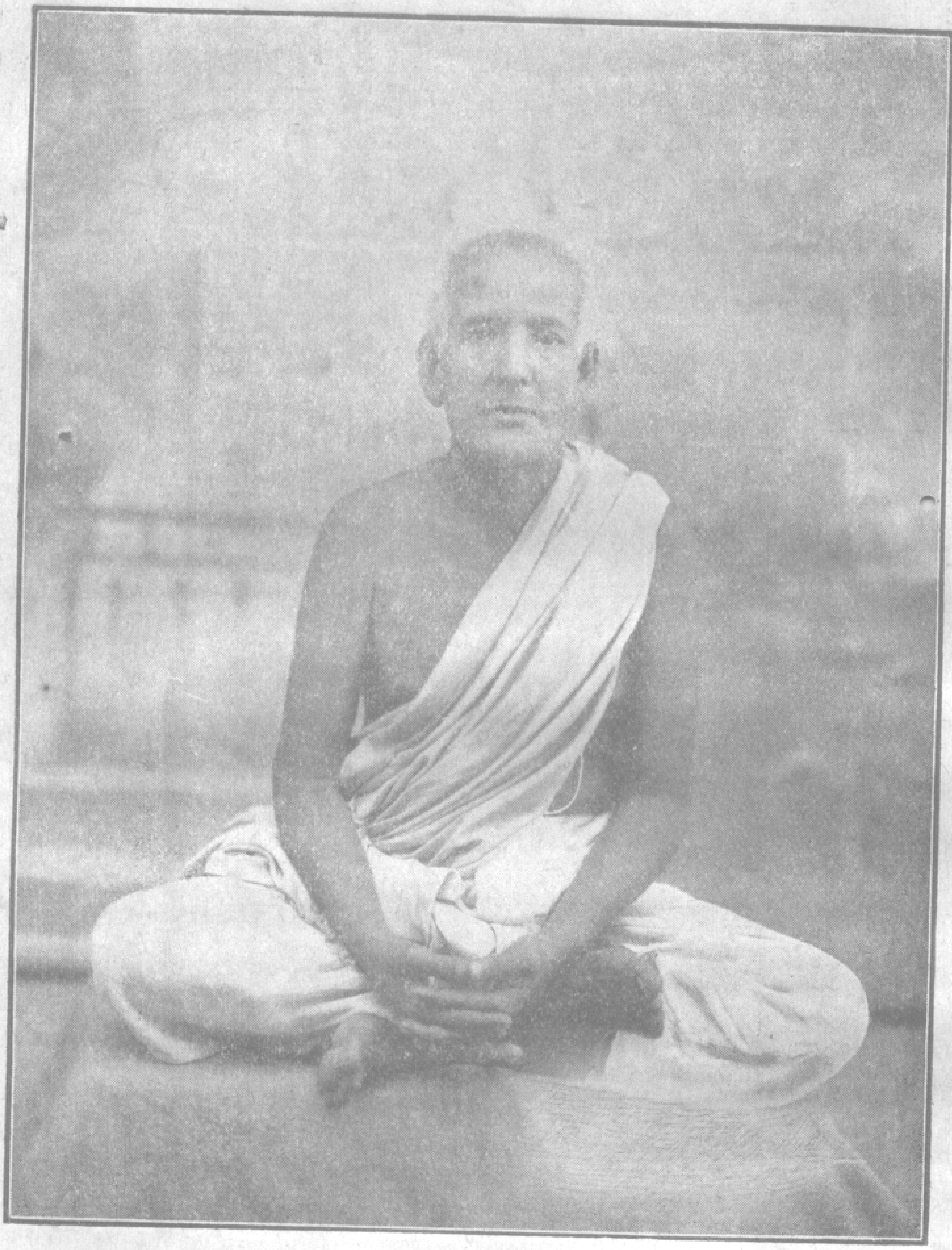
"স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী সে বিধাতা বনিতার।
স্বামীই পরম ধন, স্বামী বিনা অন্যজন,
কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা॥
সন্তোষে বসয়ে খাটে, অপরা বিনাক ফাটে,
দণ্ডে রাজা বনিতার পতি।
শুনগো শুনগো সই, হিত-উপদেশ কই,
ইতিহাসে কর অবগতি॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সং।

সাগরবালা স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিতেন, তাঁহার পাদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করতেন না। এখনকার অনেক রমণীই হয় ত একথা শুনিয়া হাসিবেন, স্বামীর দুই হাত দুই পা তাঁহারও দুই হাত দুই পা—স্বামীর ক্ষুধা-তৃষ্ণার অধীন—তিনিও কোনমতে তাহার কম নহেন— তবে আর তিনি কিসের দেবতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার কি মহিমা! পত্নী পতির সর্ব্বেশ্বরী—অনুগ্রহ করিয়া একমুঠা দিলে তবে পতির ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, নতুবা উপবাসী থাকিলেও কাতর নহে, পুরুষ পত্নীগত প্রাণ। পুরুষ সমস্ত মুখে রক্ত তুলিয়া যাহা কিছু পাইবেন, পত্নীর হস্তে দিবেন, পত্নীর আজ্ঞাধীন হইয়া চলিবেন ইচ্ছাকরিলে ধন অর্থ সব কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দিলেও কিছু বলিবার নাই—এ সমাজ উন্নত হইবে না ত হইবে কোন সমাজ। হিন্দুরমণী এখন সতী সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়াদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকার আজি কালিকার দুর্দ্দিন দুঃসময়ে সাগর বালার চরিত্র বিক্রমে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; স্বামীর কারবারের উন্নতির জন্য আপনার সখের নেক্‌লেস ছড়াটী অকাতরে

খুলিয়া দেবরের হাতে দিলেন—এখনকার সাধারণ স্ত্রীদিগকে বলিলেই—রেখে দাও তোমার ব্যবসা বাণিজ্য যদি ফিরেই দিতে হবে, তবে দাও না কেন ? সাগরবালা আদর্শ হিন্দুরমণী, অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে না পারিলে তাঁহার মত নারী হওয়া যায় না। স্বামী ভবরাম তাঁহাকে আপন ভ্রমণ কাহিনী শুনাইয়াছেন, তাহাতে আপনার মনস্বিতারন্যায়নিষ্ঠা এবং ধর্ম্ম প্রাণতার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সকলেরই অনুকরণীয়, যখন তাঁহার সহিত পাগলের সাক্ষাৎকার হইল, তখন তিনি তাহার প্রতি অনুরক্তা হইয়া যে, ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই—লোকটী কি সত্যই পাগল ! তবে ইহার সহিত আলাপ করিব—একটী গান শুনিব ইহার অঙ্গের ছাই ভস্ম ও অঙ্গের ধূলাগুলি মুছাইয়া দিব। জগতে পাগল নয় কে ? কেহ অর্থের জন্য পাগল, কেহ স্বার্থের জন্য পাগল—কেহ সন্তান সন্ততি লইয়া পাগল—কেহ বা ঋণের জন্য পাগল, কেহ বা ঋণ প্রাদান করিবার জন্য পাগল। সংসারটা পাগলেরই হাট বাজার। যিনি পেটের জন্য ধড়া চূড়া পরিয়া ওকালতী করিতেছেন তিনিও যেরূপ পাগল—পেটের জ্বালায় ক্ষুধার যন্ত্রনায় চীৎকার করিতেছে, সেও সেইরূপ পাগল নাম কিনিবার জন্য উন্নতি উন্নতি করিয়া যিনি গগন বিদীর্ণ করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, তিনিও তদ্রূপ পাগল। দার্শনিক পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক শিল্পী কবি গ্রন্থকার ভাবুক পর্য্যটক সকলেই আপনার ভাবে আপনি বিভোর সকলেই আপনার ধ্যানেই আপনিই মগ্ন বাহ্যজ্ঞান রহিত। বড় হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট পর্য্যন্ত যখন একই প্রকার ঘুরিতেছে তখন জগতে পাগল নয় কে ? ইত্যাদি। সমস্তটা খুলিয়া দেখাইবার ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাব। পাগল পরিণামে তাঁহার অভিষ্টদেব হইয়াছেন। গুরুভক্তি আপনা হইতেই এইরূপই জন্মিয়া থাকে। কাহাকেও শিখাই'ত হয় না ইহা পূর্ব্ব জন্মার্জিত, সময়ে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।

গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের সার মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাতে বিলক্ষণ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। ভবরামের উদ্যোগ অনুষ্ঠান প্রশংসার যোগ্য, তিনি যেরূপে ব্রাহ্মণ-সন্তানের শিক্ষা দীক্ষার ১১টী প্রস্তাব করিয়াছেন, একালে সেই অনুষ্ঠান গুলি সিদ্ধ করিতে পারিলে আবার ভারতে ব্রহ্মতেজের বিমল জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায়, আবার ব্রাহ্মণ প্রধান্য ভারতভূমির সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, আবার হিন্দুধর্ম্মে যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বুঝিবার সুযোগ পাইতে পারি। রামপদ বাবুর উত্তম উৎসাহ প্রশংসার যোগ্য এজন্য আমরা সর্ব্বান্তকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।



ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত—

সেবক স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

জন্ম ১২৫০ সাল, মৃত্যু ১৩১৮ সাল।

জন্মভূমি প্রেস,—কলিকাতা।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। } ১৩২০ সাল, আশ্বিন। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শারদোৎসব।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এস, মা এস! এস আনন্দময়ী আনন্দদায়িনী ভক্তের নিরানন্দ গৃহে এস। এস দীনতারিণী, দীন হীনের গৃহে এস। এস ভক্তের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, ভক্তের জননী,এস মূর্ত্তিময়ী শান্তি,এস সন্তানপালিকে ভক্তের কাতোরোক্তি স্মরণ করিয়া এস। ভক্তের প্রাণ, ভক্তের মান,ভক্তের হৃদয়,ভক্তের শান্তি ভক্তের আশা ভক্তির একাগ্রতাভাব চলিয়াগিয়াছে,ভক্তগণ কেমনকরিয়া তোমার আবাহণ গীত গাহিবে? তবে যদি দয়া কর, যদি বারেকের তরে, এই কলুষকলঙ্কিত ভক্ত হৃদয়ে আবির্ভাব হও, যদি বারেকের তরে, তোমার স্নেহের সন্তান, গাঢ়সুপ্ত ভক্তের অচৈতন্য দেহে তোমার মৃতসঞ্জিবনী পদ্মাঙ্গুলী বুলাইয়া দেও, যদি বস্ত্রহীন বঙ্গবাসীকে নূতন সাজ পরাইয়া দেও, যদি তোমার সুপ্ত সন্তানের মুখে তোমার পুণ্য পীযুষ ঢালিয়া দাও,তবে দেখিবে মা ভক্তগণ জাগিবে,হৃদয়-মন্দিরে তোমার

পূজা করিতে শিখিবে, তোমার আবাহন গীত গাহিবে, সেই গীতে জগৎ মুখরিত হইবে; জগৎবাসী জানিবে, ভক্তগণ মাতৃপ্রেমে বঞ্চিত নহে, ভক্তের হৃদয়ে মাতৃভক্তি আছে, ভক্তের ধমনীতে মাতৃরক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

আজ এত আনন্দ কেন! ভক্তের চিরান্ধকার হৃদয়াকাশে, আজ শশধরের আবির্ভাব কেন হইল? এ বিষাদময় হৃদয়ে আজ, আনন্দের হাট কে বসাইল! আজ মরুভূমিতে জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা কে করাইল? বুঝি মা আসিতেছেন।

সত্যাই কি মা আসিবেন? সত্যাই কি, সন্তানের প্রতি সন্তানপালিকা মা। মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন? সত্যাই কি, ভক্তহৃদয়ে প্রকৃত ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে?

শরৎ আসিয়াছে। নিদাঘ চলিয়াগিয়াছে। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ মন্দীভূত হইয়াছে। শরতের নীল নভোমণ্ডলে শারদীয় নীলমণি প্রাণভরিয়া হাসিতেছে। সেই সুধামাখা হাসির অনুকরণ করিয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত জগৎ হাসিয়া আকুল হইতেছে। অনন্ত নীলিমার মধ্য হইতে তারাগুলি উঠিতেছে, জ্বলিতেছে ও নিভিতেছে। গাছের পাতার মধ্যদিয়া শরতের মৃদুমন্দ অনিল ঝর্ ঝর্ শব্দে বহিয়া যাইতেছে। উন্মুক্ত প্রান্তরের কচি কচি সবুজ দূর্ব্বাদলের উপর নীহার-বিন্দু মুক্তাফলের হীনতা প্রকাশ করিতেছে। সব এক সুরে বাঁধা। এই শরৎকালে আশ্বিনমাসে শুক্রবাসরে ষষ্ঠী তিথিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কৈলাসবাসিনীর পূজা করিয়া ছিলেন,মায়ের অকাল বোধন করিয়াছিলেন। মা ভক্তহৃদয়ে অবির্ভাব হন। সেই অবধি এই শারদোৎসব। কত যুগযুগান্তর অতীত হইল, পূজা নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে। সেই সব; সেই ফুল, সেই চন্দন সেই চমৎকারিণী প্রতিমা; তখন যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। সেই মন্ত্রে এখনও মা অর্চ্চিতা। উপকরণ অনুষ্ঠান সকলি আছে কিন্তু হৃদয়ে সে অপার্থিব আনন্দ কোথায়? প্রতি বৎসরই বোধন হইতেছে কই মা ত জাগিতেছেন না! মা জাগিবেন কেন? আমাদের সকলি আছে কিন্তু হায় ভক্তি কোথায়? মা ভক্তি চান। মা সজ্জিত নৈবেদ্যের ও বিবিধ উপকরণের অভিলাষিণী নহেন। মা ভক্তি চান। আমাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, আমাদের কাতর অশ্রু মায়ের প্রার্থিত। মা আর কিছুই চান না। যদি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে আমরা মাকে ডাকি, যদি মার জন্য কাতরভাবে অশ্রুপাত করি, যদি বালকের মত মায়ের জন্য ব্যাগ্র হই তবে মা আসিবেন।

মা আসিয়াছেন। রূপে দশদিক আলো করিয়া, মা আসিয়াছেন। সিংহ সমারূঢ়া, দশভুজা, দশ প্রহরণ ধারিণী মা আসিয়াছেন। মা আসিয়াছেন, সঙ্গে কার্ত্তিকেয়, মূর্ত্তিমান পরাক্রম, সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধিপ্রদ গণেশ, পার্শ্বে বিদ্যারূপিণী সরস্বতী ও সর্ব্বজনবাঞ্ছিতা কাঞ্চনময়ী লক্ষ্মী।

আজ ভক্তগণ আত্মপর ভুলিয়া আনন্দ করিতেছে। জাতিগত পার্থক্য, পার্থিব বিভিন্নতা,অর্থের গৌরব সকলে জলাঞ্জলি দিয়া ধনী নির্ধনের সহিত, বৃদ্ধ অপ্রাপ্ত বয়স্কের সহিত যোগী ভোগীর সহিত পরস্পর মিলিত হইয়া এই স্বর্গীয় উৎসবে যোগদান করিয়াছে। মর্ত্তে স্বর্গের অধিষ্ঠান হইয়াছে। ভক্তি আসিয়া স্বার্থপরতার স্থান অধিকার করিয়াছে।

অন্তরে চণ্ডীমণ্ডপে মৃন্ময়ী, অন্তরে স্বর্ণময়ী ভক্তের অধিষ্ঠাতৃ দেবী দণ্ডায়মানা। মুখে হাসি ধরে না। ললাট নেত্রের তীক্ষ্ণ বহ্নি প্রকৃত ভক্তের তমসা-ময় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয় পুরী আলোকিত করিয়াছে। অজ্ঞান চলিয়া গিয়াছে, জ্ঞান আসিয়াছে। মায়ের আগমনে সুপ্ত ভক্ত জাগিয়াছে। ভক্তগণ আজ তাহার হৃদয় উদ্যান হইতে অশ্রুপুষ্প চয়ণ করিয়া ভক্তিচন্দন সহকারে জননীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ঘুমের ঘোর যায় নাই বলিয়া পদে পদে পথবিভ্রম ঘটিতেছে; কিন্তু মায়ের হাসিমুখ লক্ষ্য করিয়া যাইতেছে বলিয়া বাধা বিঘ্ন সরিয়া যাইতেছে। মায়ার অরণ্য সরিয়া গিয়া, বিপদের পর্ব্বত বিভক্ত হইয়া, হিংসা বিবাদ শত্রুতায় নদ নদী শুষ্ক হইয়া নবীন কর্ম্ম পথ করিয়া দিতেছে।

ভক্তগণ জাগিয়াছে, পুনরায় সুপ্ত হইবার জন্য নহে, আর সুপ্ত হইবে না বলিয়াই জাগিয়াছে। ভক্তগণ আজ মাকে চিনিয়াছে, মাকে পাইয়াছে, মাকে পূজা করিতে শিখিয়াছে।

সপ্তমী কাটিয়া গিয়াছে। অষ্টমী আসিল। মায়ের মহাস্নান সম্পন্ন হইল। মায়ের করুণ বদন দ্বিগুণ করুণ ভাব ধারণ করিল! মায়ের আবার মহাস্নানের প্রয়োজন কি? অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু মা, এ স্নানে কি তোমার পরিতৃপ্তি হইল? যে উপকরণে তোমার স্নান সম্পন্ন হইল সেত তোমার স্নানের প্রকৃত উপকরণ নহে, মা। যেদিন ভক্তগণ তপ্ত আঁখিজল সহযোগে তোমাকে স্নান করাইবে সেই দিন সেই স্নানে তুমি তৃপ্তি লাভ করিবে।

অষ্টমী যাইতে আর একদণ্ড। সন্ধিপূজা আরব্ধ হইল। অষ্টমীর শেষ একদণ্ড। নবমীর প্রথম একদণ্ড মহাসন্ধিক্ষণ। এই শুভক্ষণে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র

পার্ব্বতীকে নীল শতদলে পূজা করিয়া ছিলেন। মাও প্রসন্না হইয়াছিলেন। সেই সন্ধিপূজা এখনও প্রচলিত কিন্তু মা প্রসন্না হন না কেন? ভক্তের সাত্ত্বিক আয়োজন অনুষ্ঠানে নাই,বঙ্গবাসীর হৃদয়ে ভক্তি নাই। মা প্রসন্না হইবেন কেন?

নবমী কাটিয়া গেল; দশমী আসিল। শাস্ত্রের বিজয়া কৃত্য সম্পন্ন হইয়া গেল। যদি মা আসিলেন তবে এত শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন কেন? বোধ হয় ভক্ত ভক্তির একাগ্রতা দেখাইতে পারে নাই বলিয়াই আজ মা চলিলেন।

অপরাহ্নে রাজপথে বিপুল জনতা ভেদ করিয়া যায় কাহার সাধ্য! ঐ এক খানি ক্রমে আর এক খানি পরে আরও এক খানি শারদীয়া মৃন্ময়ী অন্তরে হিরন্ময়ী শারদীয়া প্রতিমা নদীতীরে নীতা হইয়া চোখের নিমিষে নদীর স্বচ্ছ নীল বারি রাশীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আনন্দ কোলাহল চোখের নিমিষে কোথায় মিশাইয়া গেল।

মা চলিয়া গেলেন। ভক্তগণকে মাতৃহীন করিয়া মা চলিয়া গেলেন। মাতৃহীন হইয়া ভক্তগণ যখন স্ব স্ব ক্রটী সম্যক বুঝিতে পারিল তখন,মাতৃহীন হইয়া তাহারা ভেদাভেদ ভুলিল। পরস্পর স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ হইল। সকলে আত্মপর ভুলিল।

দুর্গাষ্টক।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

(১)

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে।
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে॥
নমস্তে জগদ্বিন্দ্য পদার বিন্দে।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

জগৎব্যাপিকে শিবে সদয়া শরণ্যে।
বিশ্বরূপা বিশ্বমাতা বিশ্বের বরণ্যে॥
জগৎ বন্দিতাপদ প্রণাম তোমায়।
জগত্তারিণি দুর্গে তারো মা আমায়॥

* দুর্গাষ্টকের বঙ্গানুবাদ অনেকই বাহির হইয়াছে, কিন্তু এরূপ চারি-চরণে অনুবাদ অন্যত্র দেখি নাই, এজন্য ইহা প্রকাশ করিলাম। জং সং।

(২)

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে।
নমস্তে মহা যোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দ নন্দ স্বরূপে।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

মা মহাযোগিনি তুমি হও জ্ঞানরূপা।
সদানন্দানন্দরূপা কর মোরে কৃপা॥
জগতের চিন্তনীয়া প্রণাম তোমায়।
জগত্তারিণি দুর্গে তারো মা আমায়॥

(৩)

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য।
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ॥
ত্বমেকা গতির্দ্দেবী নিস্তার দাত্রি।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অনাথ দরিদ্র জরা তৃষ্ণাতুর জন।
ভয়ার্ত্ত সাবদ্ধ জীব যে লয় শরণ॥
তাঁহাকে কর মা কৃপা প্রণাম তোমায়।
জগত্তারিণি দুর্গে তারো মা আমায়॥

(৪)

অরণ্যে রণে দাষণে শত্রু মধ্যে।
অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজ গেহে॥
ত্বমেকা গতি দে'বি নিস্তার হেতু।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অরণ্যে দারুণ রণে শত্রু মধ্যে আর।
অনল সাগর মাঠ রাজার আগার॥
সর্ব্বত্র তুমিই গতি প্রণাম তোমায়।
জগত্তারিণি দুর্গে তারো মা আমায়॥

(৫)

অপার মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে।
বিপৎসাগরে মার্জ্জতাং দেহ ভাজাং॥
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তার নৌকা।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

বিপদ সাগর মহা দুস্তর অঘোরে।
ডুবি তায় যেবা ডাকে হইয়া কাতর॥
হইয়া নিস্তার নৌকা উদ্ধারো তাহায়।
জগত্তারিণি দুর্গে তারো মা আমায়॥

(৬)

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ড দোর্দ্দণ্ড লীলা।
লসৎ খণ্ডিতাখণ্ডলাশেষ ভীতে॥
ত্বমেকা গতির্বিঘ্ন সন্দেহ হন্ত্রি।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

চণ্ডের দুর্দ্দল লীলা খণ্ডিয়া বাসবে।
উভয় করিলে মাগো আপন প্রভাবে॥
তুমি গতি বাধাবিঘ্ন সন্দেহ হারিণি।
তারো মা আমায় দুর্গে দুর্গতি হারিণি॥

(৭)

ত্বমেকা জিতা রাধিতা:সত্য বাদিন্য।
মেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধ নিষ্ঠা॥
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

তুমি সত্যবাদিনি অর্চ্চিতা আরাধিতা।
অমেয়া অজিতা ক্রুদ্ধা ক্রোধাশ্রয় ভূতা॥
সুষুম্না পিঙ্গলা ঈড়া প্রণাম তোমায়।
জগত্তারিণি দুর্গে তারো মা আমায়॥

(৮)

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীম নাদে।
সরস্বত্যবন্ধত্যমোঘ স্বরূপে ॥
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥

তুমি শিবা ভীমরূপা কালরাত্রি রূপা।
সরস্বতী অরুন্ধতী অমোঘ স্বরূপা ॥
কোটী সতী বিভূতি মা প্রণাম তোমায়।
জগত্তারিণি দুর্গে তারো মা আমায় ॥

শারদীয়া মা জগদম্বা কি আনন্দদায়িনী?

লেখিকা,—শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ঘোষ।

জগজ্জননী মা আমার আনন্দময়ী কি নিরানন্দময়ী তাহা আমরা মায়ের অবোধ-ছেলে বুঝিতে অক্ষম। তবে এই মাত্র বুঝিতে পারি, মায়ের যথার্থ নাম কর্ম্মফল প্রদায়িনী বা মহামায়ারূপিনী, তাহা ভিন্ন অন্য নাম সকল নামে মাত্র, কাজে নয়। মাগো জগদম্বা! পাষাণের কন্যা হইয়া দয়াময়ী নাম এ যে আকাশ কুসুমের মত আশ্চর্য্যকথা মা, মা! বাপের ধারা যদি কন্যা পুত্রের না হইবে, তাহা হইলে সে কন্যা পুত্রের যে বাপের ঠিক নাই মা! তবে আমাদের পিতা সদানন্দময় অশুতোষের যদি কন্যা বলিয়া স্বীকার কর, তবেই জানিব তোমার নাম দয়ামহী মাগো! তুমি যে জগৎ জননী কে তোমার পিতা আর কে তোমার মাতা, জগৎ প্রসবিনী জগৎ পালিনী মহাশক্তি রূপিনী, তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার করি। মা! সম্বৎসরের মনের ব্যাথা ও হৃদয়ে গাঁথা আছে, তাহা আজ তোমার চরণে নিবেদন করিব, মা তোমার আগমনে জগতে আনন্দের ধ্বনি শুনিতে পাই, তাই আমার চিরদিনের সন্দেহ একটী তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। মা আজ তোমাকে বলিতেই হইবে জগৎ জননী হয়ে তো নীরব থাকা তোমার সাজিবে না মা, মাগো! আমরা মাতৃহারা সন্তান সকল, তাই তোমায় মা বলে অপার তৃপ্তি লাভ করি। কিন্তু মা আমাদের নির্ব্বাক ছিলেন না, মা যদি মাতৃরূপ ধরে জগৎ জননী নাম ধরে জগতে তিনটী দিনের জন্য এসেছো তবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, মাটীর মূর্ত্তি দেখেতো ভুলিবনা মা, তোমার ডাকের সাজান তোমার নির্ব্বাক রূপ দেখিয়া কি মাতৃস্নেহে

বঞ্চিত সন্তানের মনে শান্তি হয়? মা! আজ ঐ মুখর মূর্ত্তি হইতে সাধনা বাক্যবলে মাতৃস্নেহ মাখা কথায় পিপাসিত প্রাণ জুড়াও, মাতৃহীন শোকদগ্ধ ছেলেদিগকে কোলে নিয়ে আদর কর—শান্তি মাখা কোলে তুলে লয়ে সান্ত্বনা কর, কাতর প্রার্থনা যদি না শুনিয়া কেবল মাত্র আনন্দময়ী নাম লইয়া নির্ব্বাক বধিরের ন্যায় থাক, তবে জানিব তুমি কখনই আনন্দময়ী নও। কাণাছেলের পদ্মলোচন নামের মত, তোমারও ঐ নাম কেবল নামে মাত্র কাজে নয়। জগৎ প্রসবিনী হইয়া মীনের মাতার ন্যায় স্নেহ শূন্যা হলে তাপিত সন্তানের হৃদয় জ্বালা কে জুড়াইবে মা? যদি বল জীবের কর্ম্মফলে সুখদুঃখ ভোগ করে, মা যদি তাই হবে তোমায় আনন্দময়ী বলিয়া বলে কেন তোমার আগমনে লোকে এত আনন্দ কোলাহল করে কেন?

"তারা তোমার ভরসা বল কে করে।
যদি আপনার কর্ম্মফল ফলিবে আমারে॥

মা অদৃষ্টখণ্ডিনী মহাশক্তি; তোমার অসাধ্য তো কিছুই নাই মা, তোমার কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিলয় হয়, তোমার ইচ্ছায় কত অসাধ্য সাধন হয়। মা স্নেহময়ী জননী হয়ে এত অবিচার কেন মা,পিতা মাতার কোল হইতে পুত্র কন্যা কাড়িয়া লও, এক মাত্র পুত্র যার নয়নের মণি তাহাকে পুত্রধনে বঞ্চিত করিয়া অন্ধকারে দাও, মা সতীকুলরাণী; পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী রূপে জগৎকে পতি ভক্তি শিখাইয়া আবার পতিহারা করে জীবন্মৃতা অবস্থায় রাখ। মা! যে শিশু মা-বই জানে না, মাতৃস্তন্য ভিন্ন যার অন্য আহার নাই, মাতৃকোল ভিন্ন যার অন্য শয্যা নাই, মাতৃমুখ মণ্ডল ভিন্ন যার আর অন্য সুখময় দৃশ্য কিছুই নাই কোন প্রাণে তাকে মাতৃধনে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করে দাও? মা তোমার শুভ আগমনে যে, শিশুগণ আনন্দে নৃত্য করিত,পুলকে পূর্ণিত হয়ে মধুর হাসির তরঙ্গ তুলিত, আজ তাহাদের স্নেহময়ী মাকে হারাইয়া সেই বাজনার শব্দে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া সেই হাসির সেই আনন্দের পরিবর্ত্তে আজ হাহাকার ক্রন্দনের শব্দে জগৎ পূর্ণ হইতেছে। জননী! তোমার মাতৃ স্নেহভরা কোমল হৃদয়ে কি সে ক্রন্দন ধ্বনি আঘাৎ করিতেছে না?

তোমার কর্ণ কি একেবারে বধির হয়েছে? ত্রিনয়নী হয়ে কি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না। মা! সেই জন্যই আবার বলি তুমি আনন্দদায়িনী কিসে; এমর্ম্মান্তিক দুঃখ ঘুচাইতে একমাত্র তুমি ভিন্ন কেহ নাই, তোমার কৃপায় জীবে চির অক্ষয় শান্তি লাভ করিয়া থাকে। আর মাতৃহীন শিশু ভুলান কি তোমার

এত বড় ভার, তাতো নয় মা তুমি তাদের মনে শান্তি দাও কৃপাকর। তা যদি না কর তবে কেন দুঃখশোকের সমুদ্রে ভাসাইয়া জগৎ জননী নাম ধরিয়াছ? পুত্র কন্যার আব্দার মায়ের কাছে পূর্ণ হয়, তাই আজ তোমার চরণ দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছি তোমার কৃপা ভিন্ন ছাড়িব না, তোমার ঢাকঢোলের বাদ্য শুনিয়া ভুলিব না, তোমার ঢাকের শব্দে ও মুখর মুর্ত্তি দেখিয়া তোমার কপটতায় ভুলিব না। একটী মা কথা যেমন অমৃতের খনি, একটী মাতৃস্নেহ বাক্য তেমনি সুধামাখা, মায়ের মুখে সান্ত্বনা বাক্য শুনিলে তবে এ শোকতাপ দুঃখ দগ্ধ হৃদয় শীতল হবে, নচেৎ কিছুতেই শান্তিলাভ করিবার উপায় নাই। মা শিবসোহাগিনী! সাধ্বী পতি ব্রতায় সম্মান একমাত্র তুমিই রক্ষা করিয়া থাক, মন্দভাগ্যখণ্ডিনী মা তোমার কৃপাবলে অসাধ্য সাধন হয়, তোমার ব্রত প্রভাবে সাবিত্রী মৃত পতির জীবন লাভ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। মা তুমি জগদ্ধাত্রী রূপিনী হয়ে জগতের মঙ্গল বিধান করিয়া থাক।

তোমার চরণ পূজাকরিয়া নর নারী সকল দুঃখ এড়াইয়া অপার শান্তি লাভ করে, মা যদি দয়া করে এসেছ, যদি আনন্দময়ী জগজ্জননী নাম ধরিয়াছ, তবে আজ শোক তাপ জর্জ্জরীত তনয় তনয়ার কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর, নিজ হাতে শোকঅশ্রু মুছাও অন্তর্যামিনী মনোবাসনা পূর্ণকর।

"কেন মা কাঁদাও শ্যামা যদি না মুছাবে আঁখি।
কাঁদিয়ে মরিলে কি মা তুমি তাহে হবে সুখী॥
কে মুছাবে আঁখি ধারা, তুমি না মুছালে তারা,
ভাই বন্ধু সুত দারা (ও মা) তারা কেবল সুখের সুখী॥"

গীতোক্ত ধর্ম্ম।

লেখক,—শ্রীনিতাইচাঁদ শীল।

কর্ম্ম।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

গীতার প্রথম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সাংখ্য জ্ঞান ধ্যান ভক্তি প্রভৃতি যোগসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইলেও, সকল অধ্যায়েই এই কর্ম্মের কথা কিছু না কিছু বলা হইয়াছে। কর্ম্মোপদেশই গীতার সারমর্ম্ম, এই নিমিত্ত এই কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে আকাঙ্ক্ষা করি, প্রারম্ভেই বলিয়া রাখিয়াছি, যথানিয়মে গীতার শ্লোক অনুবাদ বা তাহার তাৎপর্য্য দেখান আমাদের উদ্দেশ্য

নহে; কেন না "গীতা-সমুদ্রে যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র নদীরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে।" ইহা যখন সর্ব্ববাদী সম্মত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তখন এই গীতোক্ত কর্ম্ম বিস্তারিত বুঝিতে চেষ্টা করা বাতুলের কার্য্য বলিয়া মনে করি, তাই কেবলমাত্র প্রাগুক্ত বাক্যের যথার্থ্য দেখাইয়া, গীতাই জগতের একমাত্র সর্ব্বভৌম ধর্ম্মপুস্তক কিনা, ইহাই সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য এই প্রয়াস।

হাঁ বলিতেছিলাম,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই পরিত্যাগ কিন্তু বিষের মত হওয়া চাই, বিষ যেমন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য হইয়াও আবার কার্য্যবিশেষে তাহার আবশ্যক হয়, ঠিক সেইরূপভাবে পরিত্যাগ চাই। মনে করুন যে, সর্প-বিষ মহাবল-পরাক্রান্ত মত্তহস্তিকেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যম সদনে প্রেরণ করে, সেই সদ্য প্রাণঘাতি সর্প-বিষ আবার সূচিকাভরণ (ঔষধ) রূপে দুশ্চিকিৎস্য বাতশ্লেষ্মা-বিকারে মানবের প্রাণদায়ক।

যাঁহারা এই জটীল কর্ম্মতত্ব সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেইসকল কর্ম্মযোগী প্রথমতঃ লৌকিক কর্ম্ম করিয়া গীতোক্ত কর্ম্মতত্ব অনুভব করেন, ক্রমে ফলা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করেন। এই যে,ভগবৎ প্রীতার্থ কর্ম্ম,ইহাও তাঁহারা স্বকর্ম্ম বলিয়া জানেন না। প্রত্যেক, কর্ম্মেই তাঁহাদের ধারণা থাকে যে, এই কর্ম্ম আমার নয়, ইহা শ্রীভগানেরই অনুমতি অনুসারে তাঁহার কর্ম্ম তাঁহাকে করিয়া দিতেছি, ইহাতে লাভালাভ বা জয় পরাজয় কিছুই আমার নহে। তিনি যন্ত্রী আমি কেবল যন্ত্র মাত্র, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থেই যখন তাঁহার সত্বা বিদ্যমান রহিয়াছে, সর্ব্ব-জীবের ভিতরেই যখন তিনি বাস করিতেছেন, তখন কোন কর্ম্মে রাগ দ্বেষ ইষ্টানিষ্টই বা কিসের জন্য হইতে পারে? আমি আমার কর্ম্ম করি না, সেই আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানই আমার কর্ম্মের কর্ত্তা এবং ভোক্তা, তাঁহারই জন্য আমি কর্ম্ম করি।

সর্ব্বজীবে তাঁহার সত্বা উপলব্ধি এবং তিনিই সকলের হৃদয়ের রাজা সর্ব্বদা এই ধারণাভ্যাসী হইলেই অহং অভিমান দূর হইবে, এবং অহং অভিমান দূর হইলেই গীতোক্ত-কর্ম্মযোগী হওয়া যায়। এই আত্মাভিমান আছে ব'লেই না রাগ দ্বেষ মান অপমান? শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্ম করি, আমার কোন কর্ম্ম নাই, এই ধারণায় যদি অহং অভিমানই দূর হইল, তবে রাগ দ্বেষই বা কাহার উপর হইবে? এই কর্ত্তৃত্যাভিমান গেলেই সমত্ব বুদ্ধি হইবে, তখন কেবল ঈশ্বর প্রীতিই একমাত্র লক্ষ্য হইবে, তার পর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা প্রকৃত

জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্মযোগী মুক্ত হইবেন। এই জন্যই মহামুনি "বিষয়ান্ বিষবত্তজঃ" বলিয়া রাজর্ষিকে উপদেশ করিলেন।

অতএব কর্ম্মজনিত ফলাকাঙ্ক্ষাই বন্ধনের হেতু। এই ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের দিকে তাহার দিকে লক্ষ্য থাকে না, লক্ষ্য থাকে কেবল ভগবানের দিকে, এইজন্য এই গীতোক্ত কর্ম্মযোগের প্রথমাবস্থায় বিহিত কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম ত্যাগে অভ্যাস, পরে নিস্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, * চিত্তশুদ্ধি হইলেই পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের মধ্যে শ্রীভগবান জানিয়া তাহাদিগকে আত্মরূপে দর্শন। এইপ্রকারে সঙ্কীর্ণ আমিত্বের নাশ হইয়া বিরাট আমিত্বের বিকাশ বা লয়। এই আমিত্বের লয় হইলে আর কোন প্রকার কর্ম্ম সংস্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখন কোন কর্ম্ম করিলেও সে কর্ম্ম তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না, সুতরাং মুক্ত। তবেই হইল যে, বিষ যেমন সর্ব্বথা পরিত্যজ্য হইয়া সময় ও কার্য্যবিশেষে আবশ্যক হইলেও সেই আবশ্যককে প্রকৃত প্রস্তাবে বিষকে গ্রহণ করা বলা যায় না, সেইরূপ আমিত্বের ধ্বংস হইলে যখন কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর হইয়া যায়, তখন কর্ম্ম করিলেও আর সেই কর্ম্মে সেই বিষয়াভিমান শূন্য পুরুষকে বন্ধন করিতে পারে না।

অতএব "কর্ম্মাহি বন্ধকারণং প্রসিদ্ধং" এই কর্ম্মে বন্দী হইবার একমাত্র কারণই যে দুরাসদ কাম ইহা একাধিকবার বলা হইয়াছে, তথাপি আবার বলি, কামনা শূন্য অর্থাৎ বাসনা বর্জ্জিত কর্ম্ম হইতে পারে না। কর্ম্ম করিতে গেলেই কোন না কোন কামনা থাকিবেই, কামনা শূন্য, আকাঙ্ক্ষা শূন্য, কোন কার্য্য কি মানুষ করিতে চায়? লৌকিক কর্ম্মই কর আর যাহাই কর, বাসনাশূন্য কোন কার্য্য করিতে গেলে ঐ কর্ম্মে উৎসাহই হইবে না, তাই গীতা প্রথমেই বলিয়াছেন এই কর্ম্ম-তত্ত্বটী আগে বেশ করিয়া বুঝিয়া লও, ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া বাসনা বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে. কর্ম্ম-তত্ত্বটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে কেহই ইহা পারিবে না, এইজন্য কর্ম্মের কৌশল শিক্ষা দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে ঈশ্বর-প্রীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম অভ্যাস করিলেই ক্রমে ক্রমে কর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে, শ্রীভগবানের দিকে টান থাকিলে ভগবানকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলে সেই ভালবাসায় প্রাণ ভরিয়া যাইবে, এই অপার্থিব ভগবৎ প্রীতিতে ক্রমে কর্ম্মের অবস্থা কমিয়া যাইবে, পরে কর্ম্ম-জনিত ফলাকাঙ্ক্ষাও আর

* কর্ম্মসন্ন্যাসী ধ্যানযোগে ইহার পর চিত্ত নিরোধ করেন। একথা ধ্যান যোগে বিস্তারিত বলিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

থাকিবে না। যে কর্ম্মে সুখ বা দুঃখ দান করে, সেই কর্ম্মেই না জীবের বন্ধন হয়? কর্ম্মযোগী ভগবানে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ করিয়া সদানন্দে কালযাপন করেন। তাহার হৃদয়ে নিরানন্দ প্রবেশ করিতে পারে না। যিনি সর্ব্বাবস্থায় আনন্দময়, তাহার মনে কি কখন রাগ. দ্বেষ, মান অভিমান স্থান পায়? এইটি জানিলেই হইল যে, মন শ্রীভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেই কর্ম্মে বন্ধন করিতে পারিবে, বিষয়াসক্তি না থাকিলে রাগ, দ্বেষও মনে স্থান পাইবে না, সুতরাং কর্ম্মই বা কেন বন্দী করিতে পারিবে?

এই কর্ম্মতত্ত্বের উপসংহারে আবার বলি অহং অভিমান ত্যাগ করিবার জন্য শ্রীভগবানকে সর্ব্বদা স্মরণ কর, তুমি কেহই নও, তোমার কোন কার্য্য নাই,তিনি তোমার হৃদয়ের রাজা ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে অনুভব করিতে অভ্যাস কর, তিনিই একমাত্র সর্ব্বব্যাপী এবং আমার মধ্যে থাকিয়া সর্ব্ববিষয় পরিদর্শন করিতেছেন. তাঁহার সন্তোষের জন্য কেবল আমার কার্য্য করা, এই ধারণা এই অনুভব অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে অহং অভিমান ত্যাগ হইয়া যাইবে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারিবে, স্থিত প্রজ্ঞ হইতে পারিলে যাবতীয় কামনা বা আশা বাসনা তুলার ন্যায় উড়িয়া যাইবে,তখন কোন বিষয়েই আর তোমার আস্থা থাকিবে না, এমন কার্য্যই, নাই যাহা অভ্যাসে হইতে পারে না।

"অসংশয়ং মহাবাহো। মনো দুর্ণিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥ *

তবেই হইল, কর্ম্মত্যাগ হইলেই সমত্ববুদ্ধি লাভ হেতু স্থিত প্রজ্ঞ, ইহার পরেই সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর জ্ঞানে সমদৃষ্টি, ইহার পরেই লয়। সুতরাং মুক্ত। তাই একমাত্র উপদেশ

"বিষয়ান্ বিষবত্তজঃ"

* ধ্যানযোগ বুঝাইবার সময় এই অভ্যাসের বিষয় বিশেষরূপে বিস্তার করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে।

ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ বিশ্বাষ।

সন ১২৫০ সালের পৌষ মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গত প্রাণ প্রেমিকভক্ত, ইটালী রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার যশোহর জেলার অন্তর্গত চেঙ্গুটীয়া রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী জগন্নাথপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺ প্রসন্ননাথ মজুমদার ও মাতা ৺ বামাসুন্দরী দেবী। প্রসিদ্ধ "মহিলা" কাব্য প্রণেতা ঋষিকবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ইহাঁর জ্যেষ্ট ভ্রাতা। দেবেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ট হইবার প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতা ৺ প্রসন্ননাথ মজুমদার মহাশয় লোকান্তরিত হন। পিতৃহীন শিশু মাতা ও ভ্রাতার পরম আদরের ধন ছিলেন। এই গৌরবর্ণ চারুদর্শন শিশুকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বড় ভালবাসিতেন। মাতা ৺ বামাসুন্দরী দেবির স্নেহাতিশর্য্যে ও আত্মীয় বর্গের সমধিক আদরে পরিপুষ্ট দেবেন্দ্রনাথ বাল্যাবস্থায় লেখাপড়ায় অমনোযোগী হইয়া, খেলা করিয়া আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইতেন।

দেবেন্দ্রনাথের প্রায় দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, তাঁহার অগ্রজ তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদানার্থ কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার বাসাবাটীতে আনয়ন করেন এবং একটী উত্তম বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দেন। দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াও লেখাপড়ায় মনোযোগ না দিয়া পাড়ার বালকদিগের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে বয়ঃ বৃদ্ধি সহকারে পাঠাভ্যাস হইতে বিরত হইয়া তাহাদিগের সহিত মিশিতে লাগিলেন; তাহাতে কোন আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথের নিকট অভিযোগ করিলে সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "দেবী যতই খারাপ হউক না কেন, একদিন না এক দিন সে ভাল হইবে, কারণ দেবী ভ্রমেও কখনও মিথ্যা কথা বলে না" সুরেন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যৎবাণী যে ফলবতী হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। অসাধারণ সত্যানুরাগ ও অকৃত্রিম ভালবাসা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের বিশেষত্ব ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অগ্রজের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ট সহোদরের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। অন্যান্য দোষ গুণের ন্যায় বিদ্যানুরাগও কতকটা সংক্রামক। কাব্য-চর্চ্চানিরত সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে থাকিয়া, দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে বিদ্যানুরাগী হইয়া উঠেন এবং সঙ্গীত ও সেতার শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। স্বনামধন্য নাট্যগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয় পরে সৌহার্দ্দে পরিণত হইয়াছিল। গিরিশবাবু কাব্যালোচনার জন্য ঋষিকবি সুরেন্দ্রনাথের নিকট প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন।

কবি ভ্রাতার সংস্পর্শে দেবেন্দ্রনাথের কবিত্ব শক্তির যে বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার রচিত গীতগুলি (যাহা এক্ষণে "দেবগীতি" নাম ধারণ করিয়া পুস্তিকাকারে সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়াছে।) হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সুরেন্দ্রনাথ যোগ সাধন করিতেন। কালে তিনি একজন উচ্চাবস্থার যোগী পুরুষদের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথও যোগাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন এবং একাদিক্রমে একাদশ বৎসর যোগ সাধনা করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী যোগানুশীলনের ফলে দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত-সংযম ও একাগ্রতা জন্মিয়াছিল। যোগারূঢ় অবস্থায় তিনি অদ্ভুত অশ্রুত পূর্ব্ব শব্দ শুনিতেন এবং অপরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন। তরুণ বয়স হইতেই দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মলিপ্সা বলবতী ছিল, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভগবদারাধনায় জীবন নিয়োজিত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু স্নেহময়ী জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহার এই সংকল্পে বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল। সেইজন্য তিনি ২৫ বৎসর বয়সে দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবাহিত জীবনেও দেবেন্দ্রনাথের সাধনাদি ক্রিয়ার ও ভগবৎচর্চ্চার ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি নির্লিপ্তগৃহী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বিবাহের অল্প দিন পরেই সুরেন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন।

যোগারূঢ় অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শ্রবণ করিয়াও এবং অপরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াও মন যখন উক্ত অবস্থা হইতে নিম্নে নামিয়া আসিত, তখন তাঁহার মন সাধারণ মানবের ন্যায় হইত। ইহাতে তাঁহার মনে দারুণ সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং "ভগবান আছেন কি না, যদি থাকেন তাঁর দর্শন পাইনা কেন?" ইত্যাদি চিন্তায় তাঁহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? তাহা সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই সদুত্তর দিয়া তাঁহার চিন্তা দূর করিতে পারিলেন না। ঐ সময় তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাইলেই আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন, সাধু সন্ন্যাসীর কথা শুনিলেই দেখিবার জন্য ছুটিতেন, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সমাজে যাইতেন, কিন্তু কোথাও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। ভগবান লাভের প্রশস্ত পন্থা নিরূপনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। একদিন দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যাকুলিতচিত্তে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার মাতুল হরিশ্চন্দ্রমুস্তফি মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হন, তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া প্রস্থান করিবার জন্য ইতঃস্তত করিতেছিলেন, এমন সময়ে "সাধু অঘোরনাথের জীবনী" তাঁহার

দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অমনি তিনি সাগ্রহে পুস্তকখানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক সাধু অঘোরনাথ কিরূপে পশ্চিম প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছিলেন; এবং কিরূপে ভগবানের নাম গুণ গান দ্বারা তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়, তাহা পাঠ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন "কে বলে ভগবান নাই, না হলে এই ভীষণ দস্যু হস্ত হইতে অঘোরনাথকে বাঁচাইল কে!" দেবেন্দ্রনাথ পুস্তকখানি রাখিয়া উন্মত্তের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া, আপনার পাথুরিয়া ঘাটাস্থ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ত্রিতলস্থ, একটী ছোট নির্জ্জন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। তিনদিন অনাহার অনিদ্রায় ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে-চতুর্থ দিবস প্রাতে অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভগবানের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলেন, তখন মুখ হইতে আপনা আপনি "এই যে ভগবান" এইকথ বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ধ্বনি উঠিল, "গুরু চাই।" এখন কোথায় সদগুরু পাইবেন, ব্যাকুলিতচিত্তে তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে, লোকমুখে কালনার প্রসিদ্ধ সিদ্ধভগবানদাস বাবাজীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে গুরু করিবার জন্য আহিরীটোলার ষ্টিমার ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া শুনিলেন যে, ষ্টিমার ছাড়িয়া গিয়াছে, সেইদিন আর অন্য ষ্টিমার। যাইবেনা।

দেবেন্দ্রনাথ বড়ই হতাশ হইয়া বাসায় ফিরিবার পথে পাথুরিয়াঘাটায় নগেন্দ্র-ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে যাইয়া বসিলেন, এবং তথায় কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া অন্যমনস্ক ভাবে একখানি পুস্তকের পাতা খুলিলেন। যে পাতা খুলিলেন, দেখিলেন, তাহার নিজ হাতে লেখা রহিয়াছে "দক্ষিণেশ্বরবাসী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরও এই মত।" পরমহংসদেবের নাম দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, "এঁরতো খুব উচ্চাবস্থা, শুনেছি ঈশ্বরলাভ না হলে "পরমহংস" অবস্থা হয়না। এই মহাপুরুষ কি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করিবেন না? দেবেন্দ্র নাথ তৎক্ষণাৎ পুস্তকখানি রাখিয়া নিজের বাসাভিমুখে চলিলেন। পরমহংসদেবকে দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, যে পুস্তকে পরমহংসদেবের নাম দেখিলেন সেই পুস্তকের নাম পর্য্যন্ত দেখিবার তাঁহার দেরী সহিলনা; বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একজন লোককে দক্ষিণেশ্বর যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিয়া তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবকে দেখিবার জন্য বাসা হইতে বহির্গত হইলেন। দ্বারদেশে পূর্ণকুম্ভ দর্শন করিয়া যাত্রা শুভ হইবে জানিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে আহিরীটোলার নৌকার

ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, দক্ষিণেশ্বর যাইবার একখানি নৌকা একটী মাত্র লোকের অপেক্ষায় রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ উঠিবা মাত্র মাঝি নৌকা খুলিয়া দিল। রাসমণির ঘাটে পৌঁছাইয়া লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের ঘরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, ঠাকুর মৃদুহাস্যে বলিলেন, "ঐদিক দিয়ে ঘুরে এস"। দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে জুতা রাখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ভক্তি সহকারে ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দেবেন্দ্রনাথকে আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করাতে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি"। "আর আমাকে কি দেখিবে বাপু এই দেখ না পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে গেছে, তুমি হাত দিয়ে দেখনা" এই বলিয়া ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিলেন। যাঁহারা ঠাকুরের অন্তরঙ্গভক্ত, তাঁহাদিগকে কোনরূপ ছল করিয়া অগ্রে স্পর্শ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতটী টিপিয়া দেখিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করে ভেঙ্গে গেছে?" ঠাকুর কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন,"একটী অবস্থা হয়,সেই সময়ে ভেঙ্গে গেছে। হ্যাঁগা ভাল হবে ত?" দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, "সাধু মানুষ, এঁদের আপনাআপনিই ভাল হয়ে যাবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভাল হবে বৈকি, ভাল হয়ে যাবে।" এইকথা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব আহ্লাদে আটখানা হইয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ ইনি কল্‌কাতা থেকে এসেছেন, ইনি বোলছে হাত ভাল হয়ে যাবে"। এই কথা বলিয়া হরিশকে ডাকিয়া বলিলেন, "এঁকে কিছু জল খাবার এনে দে।" হরিশ একটী সন্দেশ ও একঘটী জল আনিয়া দিলেন, দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া জলযোগ করিয়া, পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন,অধিকাংশ কথা ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে। কথায় কথায় অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, পরমহংস দেব, দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "দেখ অনেক বেলা হয়ে গেছে, এইখানেপ্রসাদ খাও। এ ঠাকুরবাড়ী এখানে প্রসাদ খাবার কিছু আপত্তি নেই, এখানে অনেক ভাল ভাল ব্রাহ্মণে খায়।" এই বলিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন,"যে, ওরে এঁকে বিষ্ণু ঘরের প্রসাদ দিস।" দেবেন্দ্রনাথ বালক স্বভাব ঠাকুরের আড়ম্বর হীন সরল মধুরবাক্য শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলেন,তাহার উপর "বিষ্ণু ঘরের" প্রসাদ দিতে বলাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুনঃ পুনঃ ভাবিতে লাগিলেন,"আমি যে নিরামিষ আহার করি,ইনি তাহা কিরূপে জানিলেন? ইনি কি অন্তরের কথাও জানিতে পারেন?"

দেবেন্দ্রনাথ সে দিন আর স্নান করিলেন না, শ্রীযুক্ত রামলাল দাদার সহিত আহার করিতে গেলেন, এবং আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁহার জ্বরভাব হইতে লাগিল। ঐ অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কি গো তোমার কি কোন অসুখ বোধ হ'চ্ছে?" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ একটু জ্বর বোধ কচ্ছি।" "অ্যাঁ তোমার জ্বর হয় নাকি?" এই বলিয়া ঠাকুর অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন, একজন ভক্তের সহিত তাঁহাকে নৌকা করিয়া বাটী পাঠাইয়া দিলেন। নৌকারোহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ পাঁজরায় বিষম বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন, এবং জ্বরও অধিক পরিমাণে আসিল।

দেবেন্দ্রনাথ নৌকা হইতে নামিয়া ভক্তটীর অনিচ্ছা সত্বে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বেহুঁস অবস্থায় এক আত্মীয়ের বাড়ী আসিয়া, তাঁহাদিগকে পাল্কী আনিতে বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। বাসায় আসিয়া ৪০ দিনের পরে তাঁহার জ্বর ত্যাগ হয়। জ্বরের সময় কেবলই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা কহিতেন,এবং দেখিতেন,সেই বালক স্বভাব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার শিয়রে বসিয়া রহিয়াছেন। জ্বর হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পর দেবেন্দ্রনাথ অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। বাটীতে থাকিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন,"তাইতো গুরুর কি করা যায়।"

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর,একদিন"বঙ্গবাসী"কাগজে দেখিলেন, "অদ্য অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইবেন।" ইহা পাঠ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ যেন আবিষ্ট হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ কি এক টানে বাগবাজারের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। বলরাম বাবুর বাটীতে গিয়া দেখিলেন, ঠাকুর ভক্তদিগের সহিত কীর্ত্তনানন্দে অপূর্ব্ব নৃত্য করিতেছেন। সেই মনোমুগ্ধকারী অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত গলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, এই সুযোগে সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথও এই অবসরে একবার প্রণাম করিয়া লওয়া যাউক,মনে করিয়া যেমন ঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন, অমনি ভক্তবৎসল ঠাকুর স্নেহের সহিত দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন,"কি হে,ওখানে আর যাওনি কেন, তোমার কথা কেবল ভাবি, এইবার থেকে যেও।" দেবেন্দ্রনাথ সেটান প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, এবং সেই অবধি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দেবেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা চোকে চোকে. ইসারায় ইসারায় এবং অধিকাংশ সময় নিভৃতে হইত। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া আছেন,এমন সময় ঠাকুর বলিলেন,"তোমাদের বেশ ভাব হয়তো দেখি। এই কথার দু-একদিন পরে দেবেন্দ্রনাথের ভাব হইতে আরম্ভ হয়। ভগবৎ গুণকীর্ত্তন শুনিলেই তাঁহার ঘন ঘন ভাব হইত। তজ্জন্য স্বামী বিবেকানন্দ দেবেন্দ্রনাথকে ভাব চাপিতে ও মৎস্য মাংস ভোজন করিতে বলেন। দেবেন্দ্রনাথ বরাবর নিরামিষ খাইতেন, স্বামিজীর কথা শুনিয়া ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে মৎস্য খাইতে অনুমতি দেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে খুব অল্প পরিমাণে মৎস্য খাইতেন, কিন্তু মাংস খাইতে পারিতেন না।

দেবেন্দ্রনাথ সখী ভাবে সাধনা করিতেন বলিয়া স্বামিজী প্রমুখ ঠাকুরের ভক্তগণ তাঁহাকে 'সখী' বলিয়া ডাকিতেন। স্বামিজী দেবেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং ভাবোন্মত্তাবস্থায় তাঁহার মধুর নৃত্য স্বামিজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। স্বামিজী বলিতেন, "অনেক বাইনাচ দেখিয়াছি, কিন্তু দেবেনবাবুর নৃত্যের ন্যায় এরূপ মধুর মনোমুগ্ধকারী নৃত্য কোথায়ও দেখি নাই।" দেবেন্দ্রনাথের নৃত্য দেখিবার নিমিত্ত স্বামিজী,—"আমি মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে"—এই গানটী প্রায় দেবেন্দ্রনাথের নিকট গাইতেন। জানি না স্বামিজীর গানে কি মোহিনী শক্তি ছিল! এই গানটী শ্রবণ করিলেই দেবেন্দ্রনাথ আত্মহারা হইয়া ভাবোন্মত্তাবস্থায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া নৃত্য করিতেন। সেই সময় তাঁহার মধুর নৃত্য ও আনন্দাশ্রুসিক্ত প্রেমোৎফুল্ল বদন দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ বলেন, "বলরামবাবুর বাটীতে দাদার সখীভাবে দুইঘণ্টাকাল ধরিয়া যে মধুর নৃত্য দেখিয়াছি, তাহার তুলনা নাই।"

দেবেন্দ্রনাথের সংসার ভাল লাগিত না; সংসার অন্ধকূপ তুল্য বোধ হইত। এজন্য তিনি সন্ন্যাসী হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিবার মানসে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া, ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি ভিক্ষা করেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস বচনে আশ্বস্ত করিয়া সংসারে থাকিতে বলেন। রামকৃষ্ণগতপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংসারেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে অন্য কোন সাধনা করিতে না বলিয়া কেবল হরিনাম করিতে বলিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও

শ্রীগুরুর বাক্য বিশ্বাস করিয়া একাগ্রচিত্তে এরূপ নাম করিতেন যে, নাম করিতে করিতে তাঁহার শরীরে অশ্রুপুলক স্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইত এবং তাঁহার সবিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

প্রায় ছয়মাস কাল দেবেন্দ্রনাথ এক প্রকার উন্মাদাবস্থায় ছিলেন, কোথা দিয়া যে দিনরাত্র যাইত,তাহা তাঁহার হুঁস থাকিত না। এ সময় আত্মীয় স্বজনকে তাঁহার কালসর্প বলিয়া বোধ হইত; তাঁহাদিগের সহিত কথা বার্ত্তা দূরের কথা তাঁহাদিগকে দেখিলেই দারুণ কষ্ট হইত। কেবল পরমহংসদেবের কোন ভক্তকে দর্শন করিলে আনন্দে বিভোর হইতেন এবং পাছে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, এই আশঙ্কায় তাঁহার কাপড় ধরিয়া বসিয়া থাকিতেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের এই অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বলেন, "মা ও ছাপোষা মানুষ ওর মুখ চেয়ে অনেকগুলি লোক থাকে, একবারে অত দিওনা মা! পরে দেবেন্দ্রনাথের বক্ষঃস্থলে হাত বুলাইয়া দেন। দেবেন্দ্রনাথও তদবধি শান্তভাবে শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া সংসার করিতে থাকেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকে ফেলিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অভাবে বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলে, এবং নিজেকে বড়ই অসহায় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরহে অত্যন্ত অধীর হইয়া দেহত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। স্বামিজী এ বিষয় অবগত হইয়া, দেবেন্দ্রনাথকে নিরস্ত করেন এবং তাঁহাকে চোকে চোকে রাখিয়াছিলেন।

অগ্রজের দেহত্যাগের পর, সংসারের সমস্ত ভার দেবেন্দ্রনাথের উপর পতিত হয়। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুরবংশের ষ্টেটে কার্য্য করিতেন এবং সামান্য বেতন পাইতেন; তদ্দ্বারা কায়ক্লেশে একরকমে সংসার চালাইতেন। তাঁহার অবস্থা হীন হইলেও পরদুঃখমোচনে বরাবর মুক্ত হস্ত ছিলেন। অপরের কষ্ট দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিতেন এবং তাহার প্রতিকার করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। ১৩০৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ইটালিস্থ জমীদার স্বর্গীয় ৺ দেবনারায়ণ দেব মহাশয়ের ষ্টেটে কর্ম্ম স্বীকার করিয়া, সপরিবারে ইটালীতে আসিয়া বাস করেন। এইস্থানে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বিশেষ বিকাশ হয় এবং এইস্থানে তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এইস্থানে অবস্থানকালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। দেবেন্দ্রনাথের পত্নীও পরম ধার্ম্মিকা এবং সরল ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

তাঁহাকে দেখিয়া "অতি সরল" বলিয়া বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম ইটালীতে আসিয়া ঠাকুরের কথা লোকদিগকে বলিতেন না, পাছে ঠাকুরের নামে কেহ কিছু বলে। আপনাকে গোপন রাখিয়া প্রকাশ্যে সংসারীর ন্যায় কর্ম্ম করিতেন।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ ৺দেবনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে দপ্তর খানায় বসিয়া আপনার কার্য্য করিতেছিলেন, এমন সময় দেবনারায়ণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পৌত্র সুরেন্দ্র বাবু (ইনি দেবেন্দ্রনাথকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং সময় সময় তাঁহার নিকট হইতে শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়া লইতেন।) আসিয়া বলিলেন, "মশাই, একটী সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি শ্যামাবিষয়ের অতি সুন্দর সুন্দর গান গাহিতেছেন। তাঁ'র কণ্ঠ অতি মধুর, আপনাকে শোনাবার জন্য ডাক্‌তে এলুম।" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি এইখান থেকেই শুনিব, বৈঠকখানায় যাইতে আমার তত ইচ্ছা নাই।" সুরেন্দ্রবাবু একটু দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "মশাই আমার বড় ভাল লাগ্‌ল বোলে, তাই এত আগ্রহের সহিত আপনাকে ডাক্‌তে এলুম, আপনি যদি না যান তাহলে আমার বড় কষ্ট হ'বে।"

সুরেন্দ্র বাবু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে, দেবেন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রবাবুর সহিত উপরের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। ঐ বৈঠকখানার এক ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের নিকট যাতায়াত করিতেন, ও ভগবৎ বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তিনিও গান শুনিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিত ও ঠাকুরের ভক্ত। ঐ ভক্তটী দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং যত্নপূর্ব্বক আপনার পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। সন্ন্যাসী গাহিতে লাগিলেন,—

"উঠ মা করুণাময়ী খোল মা কুটীর দ্বার।
আঁধারে হে'রিতে নারি মা, হৃদি কাঁপে অনিবার॥"

প্রথম দু'কলি গান হ'তেই দেবেন্দ্রনাথ ভক্তটীকে বলিতে লাগিলেন, "বেশ গান না?" ভক্তটী কেবল 'হাঁ' দিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী গাহিতে লাগিলেনঃ—

"তার'স্বরে তারা তোমায়, ডাঁকি আমি বারে বার,
কত মা মা ব'লে ডেকে ডেকে, হ'ল অস্থি চর্ম্ম সার।
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ শুয়ে অন্তঃপুরে,
কত মা মা বোলে ডাকি তোমায় তবু নিদ্রা ভাঙ্গে নাকো তোমার।"

"সন্তানে রাখি বাহিরে" শুনিয়াই দেবেন্দ্রনাথ "আহা! আহা!" করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বশরীর লোমঞ্চ হইল। ভাব চাপিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ভক্ত টীর

উরং চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "বেশ গান না. বেশ গান না!" ভক্তটীও পূর্ব্বকারের ন্যায় কেবল 'হাঁ হাঁ' বলিতে লাগিলেন। গানখানি তখন খুব জমেছে সকলেই সন্ন্যাসীকে বাহবা দিচ্ছিলেন। সন্ন্যাসী গাহিতে লাগিলেন,—

"খেলায় মত্ত ছিলাম বলে, বুঝি মুখ মা বাঁকাইলে,
চাহ মা কৃপা নয়নে খেলিতে যাব না আর।।"

দেবেন্দ্রনাথ আর ভাব চাপিতে পারিলেন না, ওঁ কালী বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। পার্শ্বে ভক্তটি ছিলেন,তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেবেন্দ্রনাথকে ধরিয়া ফেলিলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই অবস্থা দেখিয়া সকলে ভীত এবং বিস্মিত হইলেন। অনেকে মনে করিলেন, দেবেন্দ্রনাথের হঠাৎ সর্দ্দি-গর্ম্মি হইয়াছে এবং যাহাতে সুস্থ হন সেই অনুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রবাবু ঐ সময় বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। ভাগ্য ক্রমে উপেন্দ্রবাবু (ইনি স্বামী বিবেকানন্দের আশ্রিত) ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নাই, ভগবানের নাম করিলে ইনি প্রকৃতিস্থ হইবেন। ইহাকে ভাব সমাধি বলে, ভগবানের সহিত জীবের মিলন হইলে এইরূপ অবস্থা হয়।" দেবেন্দ্রনাথের কর্ণের নিকট ওঁকালী ওঁকালী বলিতে বলিতে ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলে যখন শুনিলেন,ভগবানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলে এইরূপ অবস্থা হয়, অনেকে তখন দেবেন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে প্রকাশ্যরূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে অনেকে দেবেন্দ্রনাথকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের নাম প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই দিন ইটালীর অনেক লোক জানিতে পারিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের শিষ্য।

সে দিন ইটালীতে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মহা সমালোচনা হইতে লাগিল। কতিপয় ব্যক্তি বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ তিনি আবার অবতার! তার শিষ্য আবার মহাপুরুষ! কালে কত আরও শুনতে হবে।" আমাদের শাস্ত্রে ত দশ অবতারের কথা আছে, তবে রামকৃষ্ণ আবার ঝাঁ করে কোথা থেকে অবতার হ'ল?" তাঁহারা সে দিন থেকে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেন। এমন কি দেবেন্দ্রনাথ রাস্তায় বহির্গত হইলে, অনেকে তাঁহাকে পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া উপহাস করিবার জন্য 'প্যাঁক প্যাঁক" (হংস ধ্বংনি) শব্দ করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগত

প্রাণ দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তাহাদিগেরই কল্যাণ কামনা করিতেন। কিসে লোকের কল্যাণ হইবে, কি করিয়া লোক ভগবৎপথে অগ্রসর হইতে পারিবে, এই চিন্তা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ যেখানে দশজন বসিয়া গল্প ক্রীড়া করিত, সেইখানে যাইতেন এবং তাহাদিগের সহিত কখনও বা গল্প ক্রীড়ায় যোগ দিতেন, কখনও বা বসিয়া থাকিতেন। সুযোগ উপস্থিত হইলে মধ্যে মধ্যে ভগবৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ যেমন প্রিয়দর্শন ছিলেন, তেমনি মধুরভাষী ছিলেন। তাঁহার মুখে মধুর ভগবৎকথা এবং বালক স্বভাব ঠাকুরের লীলার কথা শুনিয়া, অনেকে আকৃষ্ট হইয়া গল্প ক্রীড়া হইতে বিরত হইয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার কথা শুনিতেন। ক্রমে ক্রমে ইটালীতে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী অবতারের জমাট ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের নাম দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রচার হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

আনন্দময়ী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন।

এ সংসার-বিপিনে জন-মানব শূন্য নিবিড় কাননে কত সুরভি কুসুম ফুটিয়া অকালে শুকাইয়া যায়, কে তাহার সংবাদ পায়? স্বর্গীয় পারিজাত কুসুমের অনুপম সৌন্দর্য্য-সৌরভ বার্ত্তা ত্রিজগৎ প্রসিদ্ধ; কেন না, সে দেবরাজের সাধের উদ্যান রক্ষিত নন্দন-কুসুম। বড় লোকের বড় ঘরের কথা সর্ব্বজন বিখ্যাত; দরিদ্র ভিখারীর করুণ গাঁথা কেহ জানে না, বলিতে গেলেও কেহ কাণ পাতিয়া বড় একটা শুনিতে চাহে না। এ প্রসঙ্গে আমরা সেইরূপ একটী বনজকুসুমের নির্ম্মল সৌরভের পবিত্র কথা—ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম নিবাসিনী একটি নীচ বংশজ দরিদ্র রমণীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের পবিত্র মধুর অপূর্ব্ব গাঁথা লইয়া উপস্থিত হইতেছি; জানিনা, সুরুচি মার্জ্জিত আধুনিক সমাজে বন্য-কুসুম জ্ঞানে ইহা অনাদৃত হইবে কি না।

আনন্দময়ী রূপসী বা বিদুষী নহেন। অথবা কোনও ধনশালী প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ঘরে—বহু জনমান্য কুলীন কি উচ্চজাতীয় সমাজিকের গৃহেও তাঁহার জন্ম হয় নাই। তিনি নিম্ন সম্প্রদায় ভুক্ত নিয়ত অভাব গ্রস্ত দরিদ্র হিন্দু পিতা-মাতার দুহিতা এবং অশিক্ষিত নিরক্ষর কাঙ্গালের বনিতা। আনন্দময়ী অমার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন জনক গৃহে "আনন্দময়ী" নামে অবিহিত হইতেন।

আমরা তাঁহার সেই পৈত্রিক নামটিকে সুরুচির সুরভি সাবানে মাজ্জিত করিয়া "আনন্দময়ী" করিয়া লইলাম। এমন দরিদ্র-দুহিতা—অশিক্ষিত কাঙ্গালের অশিক্ষিতা বণিতা বলিয়া, সুসভ্য সম্রান্ত শিক্ষিত সমাজ আনন্দময়ীর নাম শ্রবণে নাসা কুঞ্চিত না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

বিক্রমপুরের কোনও ক্ষুদ্র পল্লীতে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে আনন্দময়ী জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগৃহে আনন্দময়ী অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া জননীর গৃহ-কর্ম্মের সহায়তা করিতেন, এবং নিয়তই স্নেহময়ী জননীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহারই অনুকরণে ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া পবিত্র তুলসী-তলে ফুল-জল ও ধূপ-দীপ প্রদান করিয়া প্রাণে বিপুল প্রীতি লাভ করিতেন। আনন্দময়ী আশৈশব ভক্তিমতী, বিশ্বাসবতী ও আবেগ-আনন্দময়ী; সরলা বনবালার ন্যায় আজীবন তিনি ভোগ-বিলাসস্পৃহা বিবর্জ্জিত ছিলেন। অবশ্য শৈশব শিক্ষাই তাঁহার এ নিবৃত্তি মূলক সুশিক্ষার নিদান। একদিন বালিকা মাতার মুখে শুনিলেন,—"তুলসী দেবতা, হরি নারায়ণ,—জল নারায়ণ,—স্বামী নারায়ণ।" সরলা বালিকা অর্থ বুঝুক আর নাই বুঝুক, তোতাপাখীর ন্যায় কথা গুলি শিখিয়া রাখিল। মাতৃদত্ত শিক্ষায় তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল, স্বামী দেবতা;—স্বামীই নারায়ণ।

বিক্রমপুর হাসাইলের অদূরবর্ত্তী শোল পরাণ নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে এক দরিদ্রের গৃহে তাঁহার বিবাহ হইল। বালিকা আনন্দময়ী দশবৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ছাড়িয়া স্বামীগৃহে উপনীত হইলেন। স্নেহময়ী অশিক্ষিতা জননী যাত্রাকালে কন্যাকে বলিয়া দিলেন,—"স্মরণ রাখিও মা স্বামী নারায়ণ; স্বামীর সেবা পরিচর্য্যা—স্বামীর প্রতি প্রীতি-ভক্তি প্রদর্শন তাহারই পূজা করা হয়, শ্রীহরির কৃপা পাইতে হইলে পতিভক্তি প্রদর্শন করিতে কাতর হইও না, সুখে দুঃখে সর্ব্বদা কায় মনোবাক্যে স্বামীর সেবা-পরিচর্য্যা করিও।"

দরিদ্র-গৃহিনী দুঃখিনী জননীর আর কি আছে, কি দিবে? তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষানুযায়ী যাহা সার ধন, শ্রেষ্ঠ রত্ন—জননী বালিকা কন্যাকে তাহাই প্রদান করিয়া স্বামীগৃহে পাঠাইলেন। বালিকা মনে মনে আবৃত্তি করিল,—"স্বামী নারায়ণ।" কিন্তু সে এখনও জানে না, স্বামী জিনিসটা কি?

বিবাহের পর সুখে দুঃখে প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই দশ বৎসর পতি-গৃহে থাকিয়া—পতির পাদপদ্ম পূজা করিয়া, সরলা বালিকা বস্তুতঃই, হৃদয়ে উপলব্ধি করিল যে, স্বামী নারায়ণ। বালিকা কায়মনোপ্রাণে পতি-পদ্ম সেবা করিয়া সুখী হইল; আপনার নারীজন্ম সার্থক জ্ঞান করিল।

আনন্দময়ী যোগী জাতীয় মহিলা। বস্ত্র বয়ন ও বস্ত্র বিক্রয় করাই এ জাতির জাতীয় ব্যবসা। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে এই ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্ত্রী লোকেরা বাড়ী বসিয়া সূত্র প্রস্তুত ও তাঁতে বস্ত্র বয়ন করেন এবং পুরুষেরা স্ত্রীলোকের বয়ন কার্য্যে সহায়তা ও হাটে বাজারে লইয়া বস্ত্র বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাই ইহাদের জাতীয় জীবিকা।

একদা আনন্দময়ীর স্বামীকে বিক্রয়ার্থ বস্ত্র লইয়া গ্রাম্যান্তরে বহুদূরে এক হাটে যাইতে হইল। ক্রমে দুই দিন কাটিয়া গেল তিনি বাড়ী ফিরিলেন না। পতির অদর্শনে সতী স্ত্রী বড় চিন্তিতা হইলেন। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইল; তথাপি তাঁহার স্বামী গৃহে ফিরিলেন না। বাড়ীর আত্মীয় স্বজনগণ সকলেই একটুকু চিন্তিত হইলেন। স্বামীর চিন্তায় আজ দুই দিবস পতিব্রতা সতী আনন্দময়ী প্রত্যাহিক আহার্য্য অন্ন দূরে থাকুক, জল গণ্ডূষও গ্রহণ করেন নাই। দৈনিক গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি নিশিথে পতিপদ চিন্তা করিতে করিতে তুলসী তলায় বসিয়া একতান প্রাণে স্বামী-নারায়ণ জ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। জপ করিতে করিতে সহসা তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ও গো তোমরা সকলে এস, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; গত কল্য ঠিক এমনি সময় হাটের পথে আমার স্বামী অনন্ত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তাঁহার শবদেহ লইয়া এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে; আসিবেন এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।" এই বলিয়া বালিকা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। একটুকু পরে তাঁহার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন,—"স্বামী নারায়ণ—আমাকেও তাঁহার পূজার জন্য এখনই যাইতে হইবে; নতুবা দেবতার পূজার ব্যঘাত হইবে—পূজা-ভক্তির ক্রটী হইলে তিনি রাগ করিবেন; তোমরা আমায় বিদায় দাও।" এই বলিয়া তিনি সমাগত গুরুজনদিগের পদে প্রণাম করিয়া ধ্যানস্থা যোগিনীর ন্যায় পুনঃরায় যোগমগ্ন হইলেন। সকলে ভাবিল, বধূ সহসা উন্মাদিনী হইয়াছেন।

রাত্রি এক প্রহর অতীত প্রায়। তখনও পতিব্রতা সতী তুলসী তলে যোগমগ্ন। আত্মীয়েরা অদূরে বসিয়া উপস্থিত বিষয়ের কিংকর্ত্তব্য অবধারণ করিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহার স্বামীর শবদেহ-বাহি লোকেরা শবদেহ সহ তথায় উপনীত হইল। আত্মীয়েরা কুররী কণ্ঠে উচ্চ বিলাপ-নিনাদে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। যখন ক্রোন্দন-বিলাপ কোলাহল একটুকু হ্রাস হইল, তখন সকলে চাহিয়া দেখিল, পতি-পদতলে সতী চির নিদ্রিতা! সতী

আনন্দময়ী পতিসহ মহানন্দে চির আনন্দময় ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। সতীর পতি-ভক্তি স্বার্থক হইয়াছে।

পতিসহ সতীর শব একই শ্মশানে—এক চিতায় ভস্মিভূত হইল। নিশিথে কুররী চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিল,—"স্বামী নারায়ণ," নৈশ সমীরণ "হু হু" করিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "স্বামী নারায়ণ" প্রতিবাসিনী অবলাগণ সুষুপ্তির সুখ ভুলিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "বালিকা বধূ সত্যই বুঝিয়াছিল, পতি নারায়ণ—পতি পূজা করিলেই শ্রীহরি শ্রীনারায়ণ তৃপ্ত হন, সতীর নিকট পতি পূজাই শ্রীহরি পূজা।

জল চিকিৎসা।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধন্বন্তরী।

হিন্দুদিগের নিকট "জল" দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে। জল না হইলে জীব জীবনধারণ করিতে পারে না। এই জন্য জলের আর একটি নাম জীবন। ঋগ্বেদে উক্ত আছে," অপ্‌ স্বপ্তংরম মৃতমপ্‌সু ভেষজং আপমানো প্রশস্তয়ে," অর্থাৎ জলেতেই আন্তরিক অমৃত, জলেতেই ঔষধ, জল আমাদিগের অমঙ্গলের নিমিত্ত নহে।

জল রোগবিশেষে যে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে, তাহা অনেকেই জানেন। শুদ্ধ শীতল জল ইচ্ছামত পান করাইয়া কলেরা রোগীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করান যায়। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে যে উৎকট ব্যাধির সৃজন হয় তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। ডাক্তার বা বৈদ্যগণ যে রোগীকে ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিতে অসমর্থ হন—সেই রোগীকে জল হাওয়া ভাল স্থানে পাঠাইয়া রোগমুক্ত করিয়াছেন।

জল চিকিৎসাকে ইংরাজীতে হাইড্রোপ্যাথি (Hydro pathy) বলে। ইউরোপেও এই চিকিৎসার আদর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ চিকিৎসা প্রথমতঃ অষ্ট্রীয়ার অন্তর্গত হাঙ্গেরি নিবাসী প্রেস্‌নিজ নামক একজন কৃষক আবিষ্কার করেন। তিনি জল দ্বারা অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড দেশের মেল বারণ নামক একটী স্থানে জলচিকিৎসালয় আছে। সেখানে জলের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রোগ আরাম হইয়া থাকে।

বৈদ্যশাস্ত্রে উক্ত আছেঃ—"কাশ শ্বাসাতিসার জ্বর বম থুকটীকোঠকুষ্ঠ মুত্রাঘাতো দরার্শঃ শ্বয় যুগল শিরঃ শ্রোত্রনাসাক্ষিরোগায় যে চান্যে বাতপিত্ত ক্ষয়জ কফকৃতা ব্যাযয়ঃ সন্তি জন্তো স্তাং স্তানভ্যাস যোগাদপ নয়তি পয়ঃ পীত মণ্ডে নিশায়াঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভ্যাস যোগ দ্বারায় নিশাজল পান করেন তাঁহার সামান্য শ্বাসকাশ,অতিসার,জ্বর,গা বমি বমি করা,কোটি দেশের রোগ,চক্রাকৃত কুষ্ট,সাধারণ কুষ্ঠ,মুত্রাঘাত,উদরের পীড়া অর্শরোগ,শোথ রোগ,গলায়,মাথায়, কর্ণে ও নাসিকার রোগ এবং এতদ্ভিন্ন-বাত,পিত্ত ও কফ দ্বারায় যে সকল রোগ জন্মে এবং ধাতুক্ষয় জনিত রোগ সকল ও কফজ ব্যাধি সমূহ অচিরে নষ্ট হইয়া যায়।

"বিগত ঘন নিশীথে প্রাতরুত্থায় নিত্যং
পিবতি খলুনরো যো নাসারন্ধ্রেণ বারি।
স ভবতি মতি পূর্ণশ্চ ক্ষুষা তার্ক্ষ্য তুল্যো
বলি পলিত বিহীনঃ সর্ব্ব রোগৈর্বিমুক্তঃ॥"

অর্থাৎ মেঘ শূন্য অৰ্দ্ধ রাত্রে কিম্বা প্রত্যুষে প্রত্যহ যে ব্যক্তি নাসিকা দ্বারা জল পান করে, সে ব্যক্তির চক্ষু গড়ুরের ন্যায় অত্যন্ত তেজস্বী আর শরীর বলি পলিত বিহীন হয় ও সে সকল প্রকার রোগ হইতে মুক্ত হয়।

উক্ত দুই শ্লোক দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, জল দ্বারা কত রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

অপরিপাক জনিত পেট ফাঁপিলে আমরা ঠাণ্ডা জল পান দ্বারা তাহার উপশম করিতে পারি।

গরম জল পান করিলে বক্ষস্থ শ্বাস কাশের উপশম হয়।

গরম জল পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে বদ্ধ মল নির্গত হয়।

প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার সময়ে পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইয়া চক্ষুতে তিনবার জলের ঝাপটা দিলে দৃষ্টি শক্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া স্নান করিলে দুর্ব্বল শরীরে বলাধান হয়।

বিকারের সময় রোগীর মস্তকে ঠাণ্ডাজলের জলপটী দিলে বিকারের অনেক উপশম হয়।

গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখিলে সর্দ্দির উপকার হয়।

কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে নাভির উপর একটী গ্রীমলা বা কোন বড় জলপাত্র রাখিয়া উপর হইতে ঠাণ্ডা জলের ধারা উক্ত জলপাত্রের উপর ফেলিলে উদরস্থ মল নির্গত হইয়া যায়।

কালের কবি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

কবি নই কাব্য লিখি বড় বিড়ম্বনা।
ছন্দ মিলাইতে গিয়া ভাব যে ফোটে না।
নাইবা মিলিল ছন্দ কিবা আসে যায়॥
নাইবা ফুটিল ভাব কিবা ক্ষতি তায়।
মনে যা আসিবে তাই লিখিয়া যাইবে।
পদ্যের ছাঁদেতে মাত্র পংক্তি সাজাইবে॥*
কমা ও কোলেন ড্যাস থাকুক কল্যাণে।
তাদের মহিমা ভাই অজ্ঞানে কি জানে॥
পাশ্চাত্য বিদ্যায় যাঁরা প্রগাঢ় পণ্ডিত।
বহুবিধ গুণে হয় মানস মণ্ডিত॥
তাঁদের মুখেতে ভাই সাবাস সাবাস।
নিশ্চয় শুনিবে এই রাখহ বিশ্বাস॥
ছাই ভষ্ম যাই লিখ দরেতে বিকাবে।
অবশ্য নামেতে পুচ্ছ লাগাইতে হবে॥
তাহারি ভাবনা কিবা ভাল লাগে যাই।
"কাব্য বন্ধু" "ভাব সিন্ধু" কিম্বা ধকাধ্যায়ী॥
অশাস্ত্রিক কত শাস্ত্রী দেখ মনে গণি।
কেননা হইবে শাস্ত্রী আপনা আপনি॥
শাস্ত্রীই হইতে হবে হেন কথা নাই।
যাই মনে লাগে ভাল বসাইবে তাই॥
"ভূষণ" লাগাও যদি "কবি" বা "বিদ্যায়"।
দেখ দেখি মনে মিষ্ট লাগে কিনা তায়॥
সভাসমিতিতে গিয়া হাঁকিয়া ডাকিয়া।
জাহির করিবে তাই কুণ্ঠিত না হৈয়া॥
যেখানে আপন নাম লিখিতে হইবে।
আপনার পুচ্ছ নিজে টানিয়া লইবে॥
বংশের উপাধি ভাই কদাচ না ল'বে।
তা' হলে সকলি কিন্তু পণ্ড হ'য়ে যাবে॥

এইরূপে কিছুদিন লিখিতে লিখিতে।
উপাধি বাহাল হবে অদৃষ্ট খুলিবে ॥
মাইকেল দীনবন্ধু হেম কিম্বা রবি।
হইয়া যাইবে একটা অতিকায় কবি ॥
কালিকাপ্রসন্ন দত্ত অক্ষয় সাগর।
বঙ্কিমী ভাষার আর রবেনা আদর ॥
যা লিখিবে তাই ভাষা হইবে এখন।
দূরে ফেল অলঙ্কার আর ব্যাকরণ ॥
পড়িয়াছে পোহাবার কালের কবির।
মূর্খের লাগিবে ধন্দ বুঝহ সুধীর ॥
দ্বিজ কবি চন্দ্রে গায় ব্যাসের আদেশে।
এই কি মা বীণাপাণি ছিল অবশেষে ॥

কীর্ত্তন।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বগলা কুমার দে বি, এ,

কলার মাহাত্ম্য কথা করিব বর্ণন।
শুন শুন ভাই সব শুন দিয়া মন ॥

অমৃতময় সত্যযুগে 'কলা' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানি না। অতএব ত্রেতাযুগে এই সুমিষ্ট রসাল-ফল জন্ম-গ্রহণ করেন। ত্রেতা যুগে কলা বেশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বানরেরা কলা খাইয়াই পরাক্রমের সহিত বাঁচিয়া ছিল। শুধু তা'নয়ঃ—

হনুমান যবে লঙ্কায় করিল গমন।
নইলে কলা বল ভাই কি হত তখন ॥

কলা খেয়ে হনুমান খুব খুসি হ'ল। গায়ে জোর পেল—ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। লাফিয়ে আগাছা ডিঙ্গিয়ে নাচবে বলে ভরসা হ'ল। তারপর তীরে বসে—

কলার নাম মধুর নাম যবে উচ্চারিল—
কলার প্রভু রাম তখন ভাবিতে লাগিল।

রামচন্দ্র ভাব্‌লেন হনুমান বোধ হয় কলা খেতে না পেয়ে আমাকে স্মরণ কর্‌ছে কিছু কলা পাঠিয়ে দেওয়া যাক্—কি করেন্—পাঠাবার যোগাড় নেই —তখন চোখ বুজে ধ্যান কর্‌তে লাগ্‌লেন:—

কলা ব্রহ্মা কলা বিষ্ণু কলা মহেশ্বর—
যাও কলা আন গিয়ে হনুমানে ঘর।

(২)

কলিকালে কলার আধিপত্য আরও বেশী পায়। হিন্দুরা কলাপ্রিয় যেই হিন্দু ঘর বাড়ী হ'তে এক পা নড়ে না, কলারা কততীর্থ ঘুরে, এল সেটী কেমন ?

কলার কথা যবে হিন্দু করিল শ্রবণ ;
বাড়ী ঘর ছেড়ে সাবাই চলিল তখন ॥

সাবাই যেয়ে কলার মায়ায় দেশের কথা ভুলিল। তখন কলা থাড়া আর কিছুই চায় না—কলাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল—হায়! হায়!

যে মজেছে কলার সে জানে কারণ।
কিসের ছলনে ভুলে এ তিন ভুবন ॥

৩

ভারতে আসতে না আসতেই দেশে বিদেশে খবর গেল। তখন লোক 'খাই' 'খাই' করে ছুটতে লাগল। জল মানে না—পাহাড় মানে না—পর্ব্বত মানে না—কোথায় কলা কোথায় কলা বলে পাগল হ'য়ে উঠলো।

(৪)

কলার বাল্যকালের নাম 'কাঁচকলা' যৌবন কালের নাম 'পাকা কলা' উভয় কালেই অনন্ত প্রভাব। বাল্যকালে তরকারী চলে—সিদ্ধ কর্‌লে নুন দিয়ে খাওয়া যায়—কবিরাজ রোগীর পথ্য কাঁচকলা দিয়ে থাকেন—আর পাকা হলেইত কথা নাই :—

টপাটপ গিলা যায় না করে চর্ব্বণ
যত ইচ্ছা তত পার করিতে ভোজন।

(৫)

কাঁচকলার রং নবদুর্ব্বাদলশ্যাম। পাকাকলার রং পশ্চিমাকাশের লোহিত সূর্য্যের ন্যায়। দেখলেই মনটী ফুলিয়া উঠে, যেম্নি রং তেম্তি নরম, তেম্নি মিষ্টি। গরু কলা খেতে পায়না বলে মনের দুঃখে ছোবলা ভোজন করে মানুষের বদভ্যাস—

চক্ষু মুদে যবে কলার রূপ করি চিন্তা।
মহাদেব মহাবিষ্ণু দেন দরশন॥

(৬)

কলা পূজায় চলে, তত্ত্বে চলে। উপহারে হাতে হাতে চলেনা বটে, টেবিলের উপর রেখে রসনার আনন্দ বর্দ্ধন করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ কলার লোভে গোবর্দ্ধন ধারণ করেন—রাধিকা সাধকরে শ্রীবৃন্দাবন বিলাসিনী হয়েন। এমন কলাকে যে ভজনা করে না, তার মনুষ্য জন্ম বৃথা—অতএব

কলা ভজ কলা চিন্ত কলা কর সার।
পরিণামে পাবে পদ পরম পিতার॥

সমালোচনা।

ভক্তেরজয়। তৃতীয় উল্লাস প্রভুপাদপণ্ডিত শ্রীযুক্তঅতুলকৃষ্ণ গোস্বমী বিরচিত। কলিকাতা ৪০নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ছাপা কাগজ বাঁধাই উৎকৃষ্ট; মূল্য একটাকা মাত্র। বঙ্গসাহিত্য সংসারে প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের স্থান অতি উচ্চে; বঙ্গীয় পাঠক সম্প্রদায়কে ইহাঁর রচনার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না,গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত মণীষী সুলেখক, সুবক্তা, আদর্শ চরিত্র মহানুভব ব্যক্তি আজ কাল বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভক্তের জয়গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় উল্লাসের সমালোচনা যথা সময়ে জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় উল্লাসে ত্রয়োদশটী ভক্ত চরিত্র স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে, প্রত্যেক চরিত্রে মানবজীবনের পূর্ণতম সাধনা প্রেম ভক্তি ও মুক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,গ্রন্থের ভাষা সরল প্রঞ্জল ও সতেজ বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী। বঙ্গভাষায় উপন্যাসের প্রণালীতে ভক্ত চরিত্র চিত্রাঙ্কণ করিবার শক্তি বোধ হয়

একমাত্র প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়েরই আছে। আমরা চিরদিনই ইহাঁর সুযুক্তি ও গবেষণাপূর্ণ রচনার অনুরাগী ও পক্ষপাতী। গোস্বামী মহাশয় আমাদের বঙ্গসাহিত্যের গৌরব, নিত্যানন্দ বংশের অলঙ্কার স্বরূপ। আমরা ভগবানের নিকটে প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের নীরোগ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

স্নেহময়ী। উপন্যাস তৃতীয় সংস্করণ অথর্ব্ববেদের বঙ্গানুবাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস, প্রণীত। কবিরাজ শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মুল্য একটাকা মাত্র।

গ্রন্থকার নিজগুণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত সুচিকিৎসা সম্প্রদায়ের মধ্যে ও সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত, স্নেহময়ী উপন্যাসের আদরও সর্ব্বত্র, ইতিপূর্ব্বে স্নেহময়ীর দুইটি সংস্করণ অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; ইহা গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের গুণ গৌরবের পরিচয় সন্দেহ নাই।

স্নেহময়ী—উপন্যাসের ভূমিকায় সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত সুলেখক শ্রীযুক্ত জলধরসেন মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—"স্নেহময়ী" উপন্যাস নহে,—ইহা গীতার ব্যাখ্যা! গীতাকার শ্লোকের দ্বারা সত্য প্রচার করিয়াছেন, আর সুরেন্দ্র বাবু নরনারীকে সেই সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদের কার্য্য দেখাইয়া দিয়াছেন আদর্শ বড়ই উচ্চ! কিন্তু যে দেশের লোকে এখনও গীতা পাঠ করিয়া থাকেন, সে দেশে সুরেন্দ্র বাবুর "স্নেহময়ীর" আদর্শ উচ্চ হইলেও তাহা অনুকরণীয়,—সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। (Sensalional) যিনি কিছু চাহেন তিনি হয়ত "স্নেহময়ী" পড়িবেন না ;—কিন্তু যিনি শান্তিলাভ করিতে চাহেন, মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে চাহেন, তিনি এই পুস্তক খানি অবশ্যই পাঠ করিবেন। আমরা লেখকের উচ্চ হৃদয় প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব, অকৃত্রিম স্বদেশ হিতৈষণার শতমুখে প্রশংসা করি স্নেহময়ী প্রত্যেক স্নেহময়ী মাতা ভগিনী, কন্যা সহধর্ম্মিণীর দৈনিক পাঠ্য হওয়া উচিত।"

স্নেহময়ী উপন্যাস পাঠ করিয়া ভূমিকা লেখক শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর উপরোক্ত কথাগুলির সার্থকতা আমরা বর্ণে বর্ণে অনুভব করিলাম,—বঙ্গ সাহিত্যে এ শ্রেণীর উপন্যাসের যতই প্রচার ও সমাদর হইবে, সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; আমরা বঙ্গভাষাভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণকে স্নেহময়ী উপন্যাস খানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা।—পরিশিষ্ট খণ্ড (আয়ুর্ব্বেদে-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।)

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ প্রণীত। ১৭ নং কাশীদত্তের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত বিনোদলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। উপরোক্ত কবিরাজ মহাশয় প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা নামক গ্রন্থের সমালোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। বর্ত্তমান পঞ্চম খণ্ড পুস্তকে কবিরাজ মহাশয় আয়ুর্ব্বেদে-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের সনাতন আয়ুর্ব্বেদ সূক্ষ্মবৈজ্ঞানির তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই গ্রন্থে পাশ্চাত্যমতের সহিত নব্য মতের আলোচনা দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্র সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক সেই সকল অমিমাংসিত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের মীমাংসা করিয়া গ্রন্থে কবিরাজ মহাশয় অসাধারণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার ন্যায় নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক আলোচনা পূর্ণ গ্রন্থ আমরা ইতিপূর্ব্বে আর দর্শন করি নাই,—অহিফেনের মাদকতা দূরীকরণ অধ্যায়ে কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—

"আমাদেরও সবছিল একথা ঠিক, এখনও আছে, সেকথাও ঠিক, কিন্তু" ছিল বা আছে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না; লোকে কার্য্য দেখিতে চায়। আরও একটা কথা এই ছিল বা আছে বলিয়া নিজের মনটাকেই যে প্রবোধ দেওয়া যায় না, তাইতো আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরাও কথায় কথায় ডাক্তার ডাকি, ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করি। কেন করি? তাহার একমাত্র উত্তর আমাদের যোগ্যতার অভাব, নিজেদের যোগ্যতার উপর নিজেদেরই বিশ্বাস নাই, এ অবস্থায় অন্যেই বা আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে কেন? তাই আমাগিকে পুরাতন ছেঁড়া কাঁথার দ্বারাই কম্বলের সাধ মিটাইতে হয়। পুরাতন ২।৪টি রোগ ব্যতীত আমাদিগকে কেহই ডাকে না। এই গেল রোগের ব্যাপার এতদ্ব্যতীত আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলেও তথৈবচ। কেহ যদি আত্মহত্যার জন্য অহিফেন সেবন করে, আমরা তার কিছু করিতে পারি না। অথচ মুখে বলি আমাদের ও সবই আছে, সুতারাং আছে কথাটার সার্থকতা কোথায়"।

পশ্চাত্য চিকিৎসা প্রভাবে মুনিঋষীগণের গবেষণা হেতু প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ সাস্ত্রের সূক্ষ্মার্থ অনুষ্কান বিমুখ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগের প্রতিলোকের অশ্রদ্ধা জন্মিতেছিল, আমাদের বিশ্বাস আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার ন্যায় গ্রন্থ প্রচারে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থী ও অজ্ঞচিকিৎসকদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবে।



ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তবীর

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। ১৩২০ সাল, কার্ত্তিক। ৭ম সংখ্যা।

SUCCESS.

কৃতার্থতা বা কৃতকার্য্যতা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায় গুণসাগর।

পৃথিবীতে এমন একটী বড়লোক দেখিতে পাইনা, যিনি প্রথম জীবনে বা প্রথম উদ্যমে বা প্রথম অনুষ্ঠানে কৃতার্থতা বা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। যিনি প্রথম পরাজয়ের পর পুনরায় নব উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জয়লাভ করেন, তিনিই প্রকৃত কার্য্যবীর—তিনিই ধন্য। প্রথম পরাজয় লজ্জার কারণ নহে, পরাজয়ের পর পুনরায় চেষ্টা না করিয়া পলায়ন করাই লজ্জার কারণ। শিক্ষিত সমাজের সকলেই জানেন, মহামন্ত্রী লর্ড বিকন্সফীল্ড বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রথম বক্তৃতা করিতে উঠিয়া "হাততালি" খাইয়াছিলেন। তিনি সেই মহাসভায় হাস্যাস্পদ হইলে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, অনন্য—সাধারণ,—সহিষ্ণুতা সহকারে, অদ্ভুত আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-ক্ষমতায় বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছিলেন,

"আমি অনেক সময় অনেক কার্য্য আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ পরাজয় পরিশেষে জয়লাভ করিয়াছি। আজ আমি হাস্যাস্পদ হইয়া বসিলাম, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন আপনাদের সকলকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটনের পিতা সুবিখ্যাত উপন্যাসকার লর্ড লিটন বহুবার বহু বিষয়ে অকৃত কার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস কিছুই হয় নাই,—তাঁহার প্রথম নাটকও তাই—তাঁহার প্রথম কাব্যও তাই। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না,—তিনি প্রথম উদ্যমে অকৃত কার্য্য হইলেও নিরাশ হইতেন না,—নিরাশ তাঁহার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই। তিনি পুনরায় নবউদ্যমে লেখনী ধারণ করিয়া বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাটক গুলির মধ্যে দুইখানি নাটক বিলাতের রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যিনি পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের পর পরিশেষে কৃতার্থতা বা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত প্রতিভাশালী পুরুষ। কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষ তিন প্রকার।

উত্তম, মধ্যম, অধম।

প্রথম।—যিনি, পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়াও, কার্য্যক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন না, বরং অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে অবলম্বিত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হন,—তিনিই উত্তম পুরুষ।

দ্বিতীয়।—যিনি একবার বা একাধিকবার অকৃতকার্য্য হইয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন,—তিনি মধ্যম পুরুষ।

তৃতীয়।—যিনি, অকৃতকার্য্য হইবার আশঙ্কায়, নিজেও কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না, এবং অপরকেও বাধা দিতে কুণ্ঠিত হন না,—তিনি অধম পুরুষ।

POVERTY OR ADVERSITY.

দরিদ্রতা বা দুর্ভাগ্য।

কবিবর ভারতচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন,—"যত অমঙ্গল সকলই মঙ্গল!"—সংস্কৃত গ্রন্থেও একটী নীতি-পূর্ণ গল্প আছে, তাহার মর্ম্ম,—"ভগবান যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন!" তাই বলি, দরিদ্রতায় দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। দরিদ্রতার উপকারিতা অনেক—উপযোগিতাও যথেষ্ট। দরিদ্রতায় আলস্যের বিনাশ ও পরিশ্রম প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। দরিদ্র হইলে লোকে শ্রমশীল না হইয়া পারে

না। কারণ, অভাব এবং উপায় একত্র অবস্থিতি করে। * পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কর্ম্মবীরই জীবনের প্রথম অবস্থায় দরিদ্র ছিলেন। লক্, নিউটন, মিল্টন, সেক্সপিয়র, স্পেন্সর এবং ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ প্রভৃতি প্রধান প্রধান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কবিগণ প্রথমতঃ নিতান্ত উপায়হীন ছিলেন। একমাত্র দরিদ্রতায় জন্সনের তেজস্বিতার উৎপত্তি হয়। তিনি দরিদ্র ছিলেন বলিয়াই চরিত্রবান্ এবং চরিত্রবান্ ছিলেন বলিয়াই বিদ্বান্ হইতে পারিয়াছিলেন। ডাক্তার জন্সন্ এরূপ উপায়হীন ছিলেন যে, অভাবের তাড়নায় তিনি এবং তাঁহার সহচর রিচার্ড স্যাভেজ প্রায় সমস্ত রাত্রি নানা বিষয়িনী কথা কহিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা যখন জঠর জ্বালায় অস্থির ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেন, তখনও কেবল মাত্র সাড়ে চারি পেন্সের সাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের কঠোর জঠর জ্বালা নিবারণ করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ দরিদ্রতায় হৃদয়কে সুনীতি, সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ও সমবেদনা শিক্ষা দিয়া থাকে। যে নিজ অভাবগ্রস্ত, সে পরের অভাব উপলব্ধি করিতে পারে। যে নিজে কষ্ট ভোগ করে, সে পরের কষ্ট বুঝিতে পারে।

তৃতীয়তঃ দরিদ্রতায় সংসারের কোনরূপ প্রলোভনেই মনকে মুগ্ধ করিতে পারে না। দরিদ্রব্যক্তি, প্রকৃতির অনুপম শোভা সন্দর্শন ও সমালোচন করিয়া, অতুলনীয় তৃপ্তি লাভ করে, এবং সর্ব্ব-সন্তাপহারী সদ্গ্রন্থ সমূহকে সঙ্গী করিয়া সর্ব্বদা পরমসুখে সময় যাপন করে।

যিনি দরিদ্র হইয়াও সৎপথে দণ্ডায়মান থাকেন, তিনি সজ্জন কর্ত্তৃক সম্মানিত এবং জগৎ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ঋণ রাক্ষসী আক্রমণ করিলেও, যিনি মিতব্যায়িতার অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহার দরিদ্রতা অচিরেই দূর হইয়া থাকে।

সুখার্থীর কখনও বিদ্যা হয় না।—বিদ্যার্থীরও প্রথমতঃ সুখ হয় না। সুতরাং সুখার্থীকে বিদ্যার আশা ও বিদ্যার্থীকে প্রথমতঃ সুখের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। কষ্ট কুঝটিকার আক্রমণ বিড়ম্বনা বায়ুর বিবর্ত্তন ও দুর্ভাগ্য মেঘের দুর্ভোগ সহ্য করিতে না পারিলে, কাহারও সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হয় না।

---

* "Ability and necessity dwell near each other,—" Pythogoros,

কাশী-বারাণসী।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, বিরচিত।

(সুর "আমার জন্মভূমি")

(১)

কত পুণ্য তীর্থে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে তীর্থ এক সকল তীর্থ-সেরা.—
ধ্যানে গড়া তীর্থ সে যে, সাধনাতে ঘেরা ;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী বারাণসী।

(২)

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, মান-মন্দির উজল করা ;
সবাই পূজেন বিশ্বনাথে পায়ে মাথা রেখে,
তারা আরত্রিকে ঘুমিয়ে, উঠে আরত্রিকে জেগে,
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

(৩)

এমন পুণ্য নদী কাহার, কোথায় এমন তটের বাহার,
ও পারেতে ব্যাসের ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে ;
যুগল-চরণ ধৌত করে অসি বরুণা এসে ;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

(৪)

মন্দিরেতে ভরা পুরী, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ভূরি ;
সুদূর হতে আসে যাত্রী ভক্তি অর্ঘ লয়ে,
তারা চরণ-তলে লুটিয়ে পড়ে চরণ ধূলি খেয়ে ;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

(৫)

অন্নপূর্ণার পুণ্য স্নেহ, কোথায় এমন পাবে কেহ,
ছিলেন শিব আত্ম ভুলি ভিক্ষা-দণ্ড ধরি ;
ঐ চরণের ধুলি যেন সদা মাথায় করি ;
হায় রে যেমন তারার মাঝে পূর্ণিমার শশী,
সকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী।

মহাষ্টমী ১৩২০ সাল।

সঙ্গীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গীত কি মধুর! সঙ্গীত শ্রবণে কে না আত্মহারা হয়! মরুভূমির মধ্যে নির্ম্মল জলের উৎস দেখিয়া পথশ্রান্ত কোন পথিক না পুলকিত হয়!

সঙ্গীতই এই শোকতাপদগ্ধ জীবনে শান্তিময় নির্ম্মল উৎস। সঙ্গীতই এই হিংসাবৈরীময় সংসারে শান্তিপ্রদ দেবদূত। শরতের নীল নৈশ নিলীমা হইতে নিহার বিন্দু যেরূপ ধীরে অতি ধীরে মর্ত্তভূমে অবতরণ করে, অবতরণ করিয়া যেরূপ নিদাঘতপ্ত ধরাতলকে শীতল করে, সঙ্গীতও সেইরূপ কোন অদৃষ্ট সুদূর ঊর্দ্ধ প্রদেশ হইতে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে নামিয়া আসিয়া শোকতপ্ত মানবহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়শীতল করে। সঙ্গীতের মোহিনী মায়ায় বদ্ধ হইয়া মানব হৃদয়ের সব জ্বালা ভুলিয়া যায়। সঙ্গীতমোহিত মানব তাহার এ মরজগতের ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়। সঙ্গীতে কোন প্রাণী না আত্মবিস্মৃত হয়। সঙ্গীতে ত্রিজগৎ স্তম্ভিত হয়, আর মর্ত্ত্যবাসী ক্ষুদ্র প্রাণী ভুলিবে না?

জীবনের প্রারম্ভে শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই কিছুক্ষণ কাঁদে, কাঁদিয়া হাসে, আবার হাসিয়া কাঁদে। শিশুর এই হাসি কান্নার মধ্যে তাহার জীবনসঙ্গীত নিহিত থাকে। ক্ষুদ্র নগণ্য শিশু জগতকে বুঝাইয়া—দেয় সে জীবনপথে যত অগ্রসর হইবে তাহার এই হাস্য ক্রন্দন মিলিত সঙ্গীত ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইবে। তাহার জীবনে কতবার সুখের আলিঙ্গনে ও বিপদের তাড়নায় হাস্য ক্রন্দনের রোল উঠিবে।

জীবনের বসন্তে যখন আমোদ—প্রমোদ মানবকে দৃঢ় ভাবে বেষ্টন করে এবং অধিকতর সুখলালসায় মানব যখন উন্মত্ত ভাবে ধাবিত হয়, তখন তাহার হৃদয় হইতে এক সঙ্গীত বাহির হয়,—সেই সঙ্গীতে তাহার মানসিক সুখ জগতে প্রকটিত হয়।

জীবনে শীত আসিলে যখন মানবের (তার) সুখপাদপ পত্র হীন হয়, যখন তাহার ভূতপূর্ব্ব প্রমোদ সহচরগণের মর্ম্মান্তিক মন্তব্য শীত পবনের ন্যায় তাহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইতে থাকে, যখন তাহার সুখের সাজান বাগান দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রধনুর ন্যায় শূন্যে মিশাইয়া যায়, তখন একটি সঙ্গীত তাহার হৃদয় দ্বিধা করিয়া বাহির হয়, সেই সঙ্গীতে তাহার সেই দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালাময় গীতে জগৎ স্তম্ভিত হয়। জগৎ নির্ব্বাক হইয়া সেই গীত শ্রবণ করে; শ্রবণ

যমুনার উপকূলে বৃন্দাবনে শ্যামল বিটপী মূলে যশোদার আদরের শ্যাম বঙ্কিম ওষ্ঠে বংশী স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই বংশীধ্বনি তাঁহার সেই মধুময় গীত ব্রজাঙ্গনার কাণের ভিতর দিয়া মরমে-পশিয়াছিল, মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়াছিল, গৃহকর্ম্ম সাজ-সজ্জা, বসন,ভূষণ, পতি-পুত্র, মান,ঐশ্বর্য্য সব ফেলিয়া ব্রজাঙ্গনা শ্যাম দর্শনে ছুটিয়াছিল, যমুনাতটে রূপের হাট বসাইয়াছিল, যমুনা উজান বহিয়াছিল।

ধবলা গিরির সানু-প্রদেশে সতী-বিরহে কাতর মহাদেব নন্দীমুখে দক্ষযজ্ঞের মর্ম্ম -স্পর্শী বার্ত্তা শুনিয়াছিলেন, তিনি গম্ভীর বদনে বিষ তুলিয়া লইয়া ছিলেন দক্ষ যজ্ঞ পণ্ড হইয়াছিল, সতী বিয়োগের প্রতিশোধ সাধন হইয়াছিল।

যখন কিছুই ছিলনা। যখন চন্দ্র সূর্য্য জলস্থল লতাবৃক্ষ পশু পক্ষী কিছুই ছিলনা সঙ্গীত গীত হইয়াছিল,—কোন অজ্ঞাত কোন সুদূর শূন্য প্রদেশ হইতে কোন প্রেমময় সেই-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। সেই গীতে জগতের সৃষ্টি হইল, গ্রহ নক্ষত্র কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল, গীতের সেই পঞ্চমসুরে সুর মিলাইয়া প্রকৃতি হাসিয়া উঠিল, সেই গীতে মুগ্ধ হইয়া জগৎ স্বীয় গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিল।

বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ মন্দ পদবিক্ষেপে নিঃশব্দে বহিয়া যায়, ক্ষুদ্রাস্রোতা স্বতী কুলকুল নাদে সাগর উদ্দেশে আপন মনে উদাস-প্রাণে ধীরে ধীরে বহিয়া চলে। গাছের পাতার ভিতরদিয়া জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি নদীবক্ষে পড়িয়া সাঁতার দেয়; ঝোপের ভিতর হইতে কোকিল পাপিয়া দোয়েল চন্দনা মধুকলরবে শ্রবণ জুড়ায়, নিরব-গুণ্ঠিতা যুথিকা মল্লিকার মুখে হাসি ধরে না সংসারে সুখের হাট বসে, তাহার মধ্য হইতে একটী মধুময় গীত উথিত হইয়া উর্দ্ধে অনন্ত শূন্যে লীন হয়।

সমর ক্ষেত্রে মৃত্যুরলীলা ক্ষেত্রে যে, সঙ্গীত গীত হয়, তাহাতে দেশের মান রক্ষিত হয়। বিলাসীর প্রমোদোদ্যানে যে সঙ্গীত গীত হয়, তাহাতে আত্মা কুলষিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সুরম্য প্রকোষ্ঠে নানাবিধ বাদিত্র লইয়া যে সঙ্গীতের আলোচনা হয়, তাহাতে বৃথা সময় নষ্ট ভিন্ন আর কিছুই হয় না।

অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে,যখন ভারতবাসী ধর্ম্ম বিশ্বাস হারায় নাই,যখন ভারত বাসী আনন্দে দিন কাটাইতেন,যখন ভারত বাসী লোভ হিংসা দ্বেষের দাস ছিলেন না তখন ভারতবাসী বীণাহস্তে হোমানলের পার্শ্বে বসিয়া দেবগণের স্তুতি গানকরিতেন, তাঁহাদের উচ্চারিত সেই গম্ভীর গীত আজ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের কি মোহিনী শক্তি, সঙ্গীতের প্রভাবে প্রস্তর

সংসারের মাঝে সুখের দীপ জ্বলিয়া উঠে। জগতে সঙ্গীতের অখণ্ড প্রতাপ মানব হইতে ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত সঙ্গীতে বিমুগ্ধ। চেতন অচেতন সকল পদার্থই সঙ্গীতে মুগ্ধ। ভগবানের সৃষ্ট জীবের মধ্যে ভূজঙ্গ অপেক্ষা খল প্রাণী আর নাই, কিন্তু এত হিংস্রক জীবও সঙ্গীতে আত্মবিস্মৃত হইয়া শক্রু করে আত্মসমর্পণ করে।

সঙ্গীতে যে মানব আকৃষ্ট না হয়, সঙ্গীতে যাহার মন গলে না, সে যত বিদ্বান যত ধার্ম্মিক হউক না কেন, সে সর্প অপেক্ষা ও ক্রুরতর লৌহ অপেক্ষাও কঠিনতর সে মনুষ্য পদবাচ্য নহে, সে এ পৃথিবীর যোগ্য নহে।

সঙ্গীত আত্মাকে কোমল করে, মনের উদ্বেগ প্রশমিত করে। মানব সুখে দুঃখে সঙ্গীতের আলোচনা করিয়া শান্তিলাভ করে। এ সংসারে আঁধারের পার্শ্বে আলো বিষাদের পার্শ্বে হর্ষ সাজান আছে। এ সংসারে মানবের নিজের কিছুই নাই,—তাঁহারই "দেওয়া প্রাণে তাঁহারই সুখ দুঃখ" তবে মানব একেবারেই নিঃস্ব নহে। মানবের নিজের বলিতে একটি দ্রব্য আছে, কৃতজ্ঞতা। মানবের সেই—কৃতজ্ঞতা গীত ভগবানের কর্ণে পৌছায়। সে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত তাহাতে ভগবানও মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। যখন মানব পাপের পঙ্কিল প্রবাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়, তখন স্বভাবতঃই মানব গাহিয়া থাকে,—

"জানামি ধর্ম্মং, নচমে প্রবৃত্তি
জনাম্য ধর্ম্ম, নচমে নিবৃত্তি
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

এস সঙ্গীত, মর্ত্তে এস। তুমি না আসিলে, মানবের দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা কে নিবাইবে? মানবের তপ্ত আঁখিজল কে মুছাইবে; মানবের প্রাণের আবেগ ভগবানের নিকট কে লইয়া যাইবে, এ জগৎ কে শাসন করিবে। তুমি না আসিলে, মানব কাহার নিকট তাহার মনের জ্বালা জানাইবে, কাহার নিকট সান্ত্বনা পাইবে, জগৎ যে বিশৃঙ্খল হইবে। ক্রমশঃ।

—:০:—

স্বর্গবাসিনী জননী।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত।

(১)

আছে ত সকলি তবু কেন যেন ভিখারি!
আছে সাধ, আছে হাসি, ঝরে কেন নেত্রবারি!
জুড়াইতে অভাগার আকুল জীবন!
তাপিত পথিক (আমি) কারে করি সম্ভাষণ?

(২)

হা হুতাশ বিনা (কিছু) নাহি আর অন্য সুর,
জীবন বহিয়া যায়, বাকি আর কত দূর?
তাপিত অধীর প্রাণে সহিতে পারি না আর!
দেখা-দাও মাজননি! ডাকি আমি বারবার!

(৩)

না হেরি ওপাদ-পদ্ম, বৃথা এ জীবন ভার,—
বহিতেছি! হেরিতেছি—মরুময় এ সংসার!
শান্তির ভিখারী আমি তাই কাঁদি অবিরল,
নেত্রে সদা অশ্রু ঝরে নিবাইতে চিতানল!

(৪)

সংসারের শোকে তাপে সন্তাপিত দেহ মন,
স্নিগ্ধকর মা আমারে আশু দিয়ে দরশন!
এসো মা! এসো মা! বলি সদা ডাকি মা তোমায়,
এসো মা জীবনেশ্বরি! আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়!

(৫)

সন্তানেরে কৃপাকরি দেহ দেবী পদাশ্রয়,
দেখিতে পারিনা আর বিভীষিকা অভিনয়!
সপ্তবর্ষ স্মৃতি হৃদে জাগে অনিবার,
দহেপ্রাণ, শূন্য ময় হেরি ত্রিসংসার।

(৬)

বর্ষে বর্ষে ত্রুটী হয় পূজাতে তোমার!
লোকাচারে হেন পূজা করিব না আর!
ধ্যানে জ্ঞানে হৃদিমাঝে হও মা উদয়!
করিয়ে মানস পূজা জুড়াব হৃদয়॥

(৭)

সপ্তবর্ষ কাল দেবী গিয়াছ চলিয়ে,
স্নেহমায়া কাটাইয়ে রহেছ ভুলিয়ে!
ভাগ্যহীন মোরা আছি নশ্বর সংসারে,
পলকেও তব স্মৃত্তি নারি ভুলিবারে!

(৮)

দেবীমূর্ত্তি ধরিয়াছ স্বর্গধামে পশি,
তব সহ অহ-রহ হাসে রবি শশী,
মোসবারে ভুলে আছ, ফিরায়েছ মন,
দেবী হয়ে হয়েছ কি নিঠুরা এমন?

(৯)

ব্রহ্মময়ীর পদতলে জুড়াইয়া আছ,
আমাদের ভালবাসা ভুলিয়া গিয়াছ!
বেঁচে শুধু আছি মোরা সংসার ভিতরে,
মা তোমার নাম স্মরি কাঁদিবার তরে!

(১০)

সংসার তরঙ্গে আমি দিবানিশি ভাসি।
কোলে কোরে তুলে লও হাসি হাসি আসি॥
মা তোমার হাসিমুখ করি দরশন।
মুছিয়ে চক্ষের জল, পূজিব চরণ॥

(১১)

ত্রিজগৎ প্রসবিনী দেব্যা মহেশ্বরি!
সকাতরে তব পদে এই ভিক্ষা করি,
বাঞ্ছাময়ী বাঞ্ছাপূর্ণ কর মা আমার!
মা তোমার শ্রীচরণে শত নমস্কার॥*

দ্বিজেন্দ্র প্রসঙ্গ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী।

শৈশব,—

শৈশবে দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সংসারে তিনি যে মহাব্রত লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া কোথায় যাইবেন? যতদিন না তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছিল, ততদিন মৃত্যু

---

* বিগত ১৩১৪ সাল ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার মধ্যাহ্ন বেলা ১২টা ১০ মিঃ সময় পরমারাধ্য পরম পূজনীয়া স্নেহময়ী জননী আমাদিগকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ৭ম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে লিখিত, লেখক।

বারংবার প্রসিক্ত হইয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারে নাই; আর আজ বোধহয় তাঁহার এজন্মের কার্য্য সমাধা করা হইয়াছিল, তাই কালের একবারকার সামান্য আহ্বানে, অকালে, কার্য্য করিতে করিতেই হস্তস্থিত লেখনী ফেলিয়া সহসা চলিয়া গেলেন, একবার একটা কথাও কহিলেন না; প্রাণের মায়া, মমত্ব, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব কাতর দৃষ্টিতে মুখপানে চাহিয়া রহিল, তিনি ফিরিয়াও দেখিলেন না।

যখন দ্বিজেন্দ্রের বয়স ছয়মাস মাত্র, তখন পড়িয়া গিয়া এমন গুরুতর আহত হন, যে, সেযাত্রা কষ্টে তাঁহার জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু মুখ বাঁকিয়া গেল, মুখের সে বক্রভাব এপর্য্যন্ত একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত। আর একবার ৯।১০ বৎসর বয়সে ঢেঁকি হইতে পড়িয়া হাত ভাঙ্গিয়া ছিলেন। দ্বিজেন্দ্র অতি অল্পবয়সে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শান্তিপুরে তাঁহার মাতুলালয়ে গমন করেন। তিনি অদ্বৈত প্রভুর বংশধর শান্তিপুরের গোস্বামী-বংশের দৌহিত্র ছিলেন। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্র পঞ্চম বর্ষীয় শিশু মাত্র। সন১২৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসের রাত্রে যে দ্বিতীয় ঝড় হয়, সে সময় তিনি শান্তিপুরে। যে বাটীতে তাঁহারা ছিলেন, সেবাটীর অবস্থা সন্দেহ-জনক মনে করিয়া তাঁহার জননী তাঁহাকে ও তাঁহার কনিষ্ঠাসহোদরা মালতীকে লইয়া একখানি পালকীতে উঠিয়া ডাকঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পালকী খানি তাঁহার মাতুলালয়ে পড়িয়া থাকিত। তাঁহারা পালকীতে উঠিয়া শতহস্ত পথ অতিক্রম করিতে না করিতে বাটীখানি একেবারে ভূমিসাৎ হইল। এদিকে পালকী খানি ডাকঘরে পৌছিলে, সকলে তাহা হইতে নামিবার সময় দেখাগেল, পালকীর মধ্যে এক বৃহৎ গোক্ষুরা সর্প, এককোনে লুকাইয়া আছে। সম্ভবতঃ ঝড়ের সময় প্রাণভয়ে পালকীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাই তাঁহাদিগকে দংশন করে নাই।

সেদিন গৃহপাত ও সর্পের মুখ হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু দুরন্ত ম্যালেরিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িল না। কৃষ্ণনগর অঞ্চল অত্যন্ত ম্যালেরিয়া পূর্ণস্থান, রাশি রাশি কুইনাইন সেবন করিয়াও ম্যালেরিয়াকে দূর করিতে পারিলেন না, ভ্রাতা ও ভগিনী রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া কঙ্কালমাত্রাবশেষ হইলেন, দ্বিজেন্দ্রের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল, উদর প্লীহায় পূর্ণ এবং মুখে ক্ষত হইল। অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসক (ডাক্তার কালীবাবু) বলিলেন, "আর জীবনের আশা নাই।" তখন আর তাঁহাদের আহারাদি সম্বন্ধে বড় ধরা বাঁধা করা হইল না। সকলেই মনে করিলেন, যে কয়েকদিন আছে, সাধ মিটাইয়া আহার করুক তাঁহারাও অবাধে দধি ভক্ষণ আরম্ভ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত

বাঁধা বাঁধিতেও যে রোগ কিছুতেই ছাড়ে নাই,—আহারের অনিয়মে ও দধি ভক্ষণের গুণে সে রোগও পলায়ন করিল। এখন চিকিৎসকেরা দধির যে গুণে মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন, দেখা যায় যে, দধিতে বহুকাল হইতেই সে গুণ আছে, কেবল ইংরাজি চিকিৎসকেরাই তাহা জানিতেন না। এখনও তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞতায় বিশ্বাস করিয়া শরীরের কত অনিষ্ট করিতেছি কে জানে ?

যাহা হউক, সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন, তবে কৃষ্ণনগরের জলবায়ুর দোষে মধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়া ধরিত। যখন রেভেলগঞ্জে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন. তখনও তাঁহার শরীর অসুস্থ; বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াও আর একবার ম্যালেরিয়ায় বিলক্ষণ কষ্ট পান। সে সময় ৺ বিহারিলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে থাকেন।

আর একবার দ্বিজেন্দ্র ইচ্ছাকরিয়া বিপদে পড়িয়াছিলেন। ইংলণ্ডে থাকার সময় একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে উঠিবার সংকল্প হয়। সঙ্গে শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও আশুতোষ চৌধুরি মহাশয় ছিলেন। তাঁহারা অন্যপথে পাহাড়ের উপর উঠিয়া দ্বিজেন্দ্রকে ডাকিতে থাকেন। দ্বিজেন্দ্র অন্যপথে না গিয়া ঋজুভাবে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। পাহাড়টি ছোট হইলেও, যে স্থান দিয়া দ্বিজেন্দ্র উঠিতেছিলেন, সে স্থানটি এত খাড়া উঠিয়াছে যে, কিয়দ্দূর উঠিয়া আর উঠিবার উপায় পাইলেন না; নামিবারও উপায় নাই,যে সকল প্রস্তরখণ্ড অবলম্বনে কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে পারিয়াছেন, তাহাধরিয়া নামিতে গেলে ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা। সঙ্গীগণ তাঁহাকে "দ্বিজু দ্বিজু"বলিয়া ডাকিতেছেন,তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন,কিন্তু উত্তর দিতে—পারিতেছেন না; সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত,হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; একবার গড়াইতে আরম্ভকরিলে আর রক্ষা নাই,নীচে মাংসপিণ্ডাকারে পতিত হইতে হইবে। তখন বৃক্ষমূল আর তৃণ-গুচ্ছাবলম্বনে উপরে উঠিবার চেষ্টাকরা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিলনা। সাহসে ভর করিয়া উঠিতেই,আরম্ভ করিলেন। একটি বৃক্ষমূল ছিন্ন বা হস্ত-স্খলিত হইলে, এক গুচ্ছ তৃণ উৎপাটিত হইয়া আসিলে, আর কোনমতে রক্ষা নাই, তথাপি উঠিতে লাগিলেন,শরীরে দ্বিগুণ বল ও মনে দ্বিগুণ উৎসাহ আসিল। সে যাত্রা ভগবান্ রক্ষা করিলেন নির্ব্বিঘ্নে উপরে উঠিয়া নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলেন। উপরে উঠিয়াই একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, মনুষ্যের স্বভাবই এই যে,যতক্ষণ বিপদের হস্ত হইতে নিস্কৃতি না পাওয়া যায়, ততক্ষণ উদ্যম ও সাহস বৃদ্ধি পায়, পরে ভয়ের কারণ অতীত হইবামাত্র অতিরিক্ত উদ্যম ও ক্লেশজনিত অবসাদ আসিয়া পড়ে।

প্রতিভার আভাস।

"অঙ্কুরে বৃক্ষের গুণ থাকে।" প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রতিভার আভাস শৈশব হইতেই মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রের বয়ঃক্রম যখন চারি পাঁচ বৎসর মাত্র, ম্যালেরিয়ায় শরীর শীর্ণ, তখন একদিন তাঁহার পিতার নিকট শয়ন করিয়া আছেন, কার্ত্তিকেয় রায় মহাশয় হারমোনিয়ম বাজাইয়া "ক্যায়সে কায়টে পেয়ালা মেয় নাগরী" খেয়ালটী গাহিতে ছিলেন। তিনি সুকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্র মনোযোগ পূর্ব্বক যন্ত্রের উপর পিতার হস্ত চালন লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন। গানটী শেষ করিয়া রায় মহাশয় একবার বাহিরে যান। তখন হারমোনিয়ম এ দেশে নূতন আসিয়াছে, মূল্যও অধিক, সুতরাং, পাছে ছেলেরা যন্ত্রটী নষ্ট করে বলিয়া সেটিকে সাবধানে রাখিতেন। এদিন দ্বিজেন্দ্র যন্ত্রটীকে হাতে পাইয়া চাবিগুলি টিপিয়া ধীরে ধীরে সুর বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন, ইত্যবসরে তাঁহার পিতা ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, দ্বিজেন্দ্র তাঁহার গানটি বাজাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তখন তিনি দ্বিজেন্দ্রকে গানটি বাজাইতে অনুমতি দেওয়ায়, দ্বিজেন্দ্র সেই সুরের একরকম চলনসই অনুকরণ করিয়া বাজাইতে পারিলেন দেখিয়া চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইলেন।

সাত আট বৎসর বয়ঃক্রমের সময় একদিন বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়া অনুচ্চ প্রচীরের উপর উঠিয়া ভৃত্যাদিগের সমক্ষে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। সেইদিন পণ্ডিতপ্রবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পিতার অতিথি। তিনি কার্ত্তিকেয়বাবুর সঙ্গেদ্বিজেন্দ্র লালের অলক্ষিতে পশ্চাদ্‌ভাগে দাঁড়াইয়া সেই বক্তৃতা শ্রবণ করতঃ কার্ত্তিকেয় বাবুকে বলেন, "এছেলে একদিন বড় লোক হইবে।" তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

যখন দ্বিজেন্দ্র ইংরাজী বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র,তখন একদিন তাঁহার শিক্ষক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়তাঁহার শ্রেণীর ছাত্রদিগকে একটী পাঠ অভ্যাস করিয়া আনিতে বলেন। দ্বিজেন্দ্রের পুস্তক ছিলনা,তাঁহার পাঠ অভ্যাস হয় নাই। শিক্ষক মহাশয় যাহাদের পাঠ অভ্যাস হয় নাই শুনিলেন, তাহাদিগকে সর্ব্বশেষে দাঁড়াইয়া পাঠ অভ্যাস করিতে অনুমতি দিয়া,যাহাদিগের পাঠ অভ্যস্ত হইয়াছিল,তাহাদিগের আবৃত্তি শুনিতে লাগিলেন। যাহাদের বই ছিল, তাহারা পুস্তক দেখিয়া অভ্যাস করিতে লাগিল দ্বিজেন্দ্রের পুস্তক নাই,দাঁড়াইয়া সহপাঠীদিগের আবৃত্তি শুনিতে লাগিলেন। সকলের আবৃত্তি শেষ হইলে, যাহাদের পূর্ব্বে অভ্যাস হয় নাই, তাহারাও কেহ

কেহ যথাসাধ্য বলিল, তখন শিক্ষকমহাশয় দ্বিজেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার ত বই নাই,তুমি আর কি করিবে ?" দ্বিজেন্দ্র বলিলেন, "আমার অভ্যাস হইয়াছে।" বলিয়া সুন্দর রূপে আবৃত্তি করিলেন, শিক্ষক মহাশয় চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে অভ্যাস করিলে ?" দ্বিজেন্দ্র উত্তর করিলেন, "সকলের বলা শুনিয়া।" চন্দ্রবাবু সন্তুষ্ট হইলেন,এবং কার্ত্তিকেয় বাবুর নিকট সবিশেষ বর্ণনা করতঃ বলিলেন, "আপনার এমন প্রতিভাশালী পুত্রকে পাঠ্য পুস্তক দানে কৃপণতা করিবেন না।" সেই দিনই পুস্তক আসিল। দ্বিজেন্দ্র পিতাকে এত ভয় করিতেন,যে কোন দ্রব্যের অভাব তাঁহাকে সহজে জ্ঞাপন করিতে চাহিতেন না। একবার পাদুকার অভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়াও পিতৃসমীপে বলিতে সাহস পান নাই; পরে সহোদরদিগের অনুরোধে পিতার নিকট গিয়া ইংরাজীতে বলেন, "Father! I have no shoes." ইংরাজীতে বলার কারণ, তাঁহাব বিশ্বাস ছিল, ইংরাজীতে বলিলে পিতা সন্তুষ্ট হইবেন।

কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে বারদোলের সময় অত্যন্ত ধূমধাম হয়। এক বৎসর তাঁহার পঞ্চম সহোদরের সঙ্গে বারদোল দেখিতে যান। তাঁহার উক্ত ভ্রাতা তখন 2nd year ক্লাশে পড়েন, তিনি রঘুবংশ ও ভট্টিকাব্যের শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে পথে যাইতে ছিলেন, দ্বিজেন্দ্র স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র মাত্র, রঘু ভট্টির ধার ধারেন না, অথচ একটা কিছু আবৃত্তি না করিলে ভাল দেখায় না মনে করিয়া ব্যাকরণের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন। এইখানে কবিবাক্য মনে হয়,—"নতেজস্তেজস্বী প্রসৃতমপরেষাম্প্র সহতে।"

কৈশোরে দ্বিজেন্দ্র কবিবর মধুসূদনের ও হেমচন্দ্রের কবিতা সকল কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, এবং তাহা সুন্দররূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মহারাজ ৺ সতীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রের পিতৃবন্ধু ৺ দীনবন্ধু মিত্র, ৺ দ্বারকানাথ দে, ৺ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৺ পূর্ণচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ কৌতুহলী হইয়া দ্বিজেন্দ্রের আবৃত্তি শুনিতেন। সেই সময় হইতে দ্বিজেন্দ্র নিজেও কবিতা ও গান লিখিবার চেষ্টা করেন। একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার তৃতীয় সহোদর বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহাকে বলেন, "তুমি কেমন কবিতা লিখিতে পার, নক্ষত্রের বিষয় একটা কবিতা লেখ দেখি।" সেখানে লিখিবার সরঞ্জাম ছিল না, দ্বিজেন্দ্র সে সকল সংগ্রহ করিতে না উঠিয়া মনে মনে এক গান রচনা করিলেন;

দ্বিজেন্দ্রলাল "গভীর নিশীথ কালে নিরজনে আসিয়া, কে তোমরা প্রতি নিশি রহ নভ শোভিয়া—" ইত্যাদি গানটি আবৃত্তি করিলেন। ঐ গানটি পরে "আর্য্যগাথা প্রথম ভাগে" মুদ্রিত হয়। গানটি সেইখানে বসিয়া রচিত হইয়াছে শুনিয়া জ্ঞানেন্দ্রবাবু চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যজীবনের ঘটনা সমূহ লিখিয়া আর অনর্থক প্রবন্ধের কলেবর পুষ্ট করার প্রয়োজন কি? যাঁহারা তাঁহার বাল্য জীবনের বিষয় কথঞ্চিৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কৌতুহল নিবারনার্থ, এবং ভবিষ্যতে যদি কেহ দ্বিজেন্দ্রের বিস্তারিত জীবনী লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্যেও যতটুকু লিখিত হইল, তাহাই যথেষ্ট মনে করি। মনীষি ব্যক্তিগণের পরিণত বয়সের আচরণই লিপিবদ্ধ থাকিলে সাধারণের উপকারে আসিতে পারে। দ্বিজেন্দ্র চরিত্রে এরূপ অনেক কথা বলিবার আছে, তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, সরল উদার চরিত্রবান পুরুষ সংসারে অতি বিরল পরে তাহা বলিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। একটা কথা বলিবার আছে। জননী যখন পুত্রশোকে অধীরা হইয়া, সহোদরা যখন ভ্রাতৃশোকে কাতরা হইয়া, তাহাদের গুণ বর্ণনা করতঃ বিনাইয়া বিনাইয়া রোদন করেন, তখন কি জননী কিংবা সহোদরার সে গুণ বর্ণনা অন্যের ভাল লাগিবে কি না, তাহাতে অপরের কোন উপকার হইবে কি না, সে বিষয় ভাবেন? না সে কথা ভাবিবার অবসর তাঁহাদের থাকে? তাঁহারা নিজের মনের আবেগেই সেই গুণ বর্ণনা করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করেন মাত্র। সে রোদন তাঁহাদের নিজের জন্য, অপরের জন্য নয়। সে কাহিনীর মধ্যে যে কি মোহিনী শক্তি কি শান্তি নিহিত আছে, অন্যে তাহার কি বুঝিবে? (ক্রমশঃ)

কমলা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

এই দিন আহারাদির পর, কমলা রাঙা ঠানদিদির সহিত শাশুড়ীর আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। ক্রমে রাত্রি আগমন করিল এবং অতিবাহিতও হইল। প্রাতঃকালে কমলা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক শাশুড়ীর পদধূলি মস্তকে লইলেন। তারপর সরলা, সরলার

মাতা ২ রাঙ্গাঠানদিদীর নিকট বিদায় লইয়া, রঘুপতির কর্ম্মস্থান আবাদে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে রাঙ্গাঠানদিদির পদধূলি লইতে বিস্মৃত হয়েন নাই। কমলার শাশুড়ী পুত্র রঘুপতির উদ্দেশ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন।

কমলা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর তারকেশ্বরে আগমন করিলেন। ৺তারকনাথকে বলিলেন, "বাবা! যদি স্বামীকে পাই, তাহা হইলে সনাথ তোমার নিকট আগমন করিয়া তোমার পূজা দিব।" তারকেশ্বরে একদিন অতিবাহিত করিয়া, সিঙ্গুর, গোপাল নগর অতিক্রম করিয়া, বৈদ্যবাটী আগমন করিলেন। বৈদ্যবাটীতে পাতকনাশিনী ভাগিরথী নীরে অবগাহন করিয়া সরোদনে স্বামী-সম্মিলনের প্রার্থনা জানাইলেন। যখন গঙ্গাস্নান করেন তখন এক প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণ রমণীর সহিত তাঁহার আলাপ হইল। রমণীর স্বামী কলিকাতায় কোন গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম করেন। তিনি কমলাকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া পরমযত্নে আহার করাইলেন। তাঁহার অনুরোধে কমলা সেইদিন তথায় অবস্থান করিয়া, পরদিন গঙ্গা পার হইয়া বারাকপুর হইতে যে রাস্তা বারাসাতে গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া বারাসাতে আসিলেন। এই রাস্তা বারাসাতে বহরমপুর রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে। তথা হইতে সামান্য দূর মাত্র গিয়াই যশোহর রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে। যশোহর হইতে একটী শাখা টাকী, টাকী হইতে হাঁসানাবাদ চলিয়া গিয়াছে। কমলা এই রাস্তা ধরিয়া আশাশুনী থানার অন্তর্গত সুন্দরবনের আবাদে গমন করিতে লাগিলেন।

কমলা বাটী হইতে গমন করিবার পর, তাঁহাদের গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে কমলার সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ স্নানের ঘাটে রমণীমহলে কতই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। সরলাও সেই ঘাটে ছিল। একজন বলিল, "রঘুপতির স্ত্রী নাকি কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার স্বামী কি আছে যে, আনিতে গেল! সেত বাঘের পেটে গিয়াছে।" তাহার কথা শুনিয়া আর এক জন বলিল, "সতী সাবিত্রী, সতী সাবিত্রী, মৃত পতি যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিবে।" অন্য আর একজন বলিল, তাই বটে।

সরলা বলিল, "শাশুড়ীর কষ্ট হইবে বলিয়া যে বাপের বাড়ী গেল না, সে মন্দ কাজ করিবে? যাহারা সইয়ের নামে কুৎসা রটাইবে, তাহাদের মুখ খসিয়া যাইবে। এই কথায় স্ত্রীলোকদিগের সহিত সরলার বেশ কলহ হইয়া গেল। কমলার শাশুড়ী শুনিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন ভিন্ন তাঁহার কি সম্বল আছে?

এদিকে ভট্টাচার্য্যদের চণ্ডিমণ্ডপে, মুখোর্য্যেদের দালানে, বোসেদের বৈঠক-খানায়, কমলার কথা লইয়া খুবই আন্দোলন হইতে লাগিল। রঘুপতির স্ত্রীটার পেটে পেটে এত বুদ্ধি দেখা গেল। বোস বুড়া বলিল, আশ্চার্য্য! স্ত্রী চরিত্র বুঝা ভার। আমার ঐ স্ত্রী লোকটার উপর বড়ই ভক্তি ছিল। এর কাণ্ড দেখিয়া স্ত্রী জাতির উপর ঘৃণা জন্মিয়া গেল। কালীভৈরব একপার্শ্বে বসিয়া ছিল, সে তাঁহার কথার পোষকতা করিয়া বলিল, স্ত্রীলোকটা বড় সহজ নহে। আপনারা জানেন, রঘুপতির সঙ্গে আমার কত প্রণয় ছিল।

বোসবুড়ো। হাঁ তাত জানি। তোমরা যেন দুটী মাণিকযোড় ছিলে। তারপর?

কালী। সে চাকুরীতে যাইবার সময়ে, আমাকে তাহার মাতা ও স্ত্রীর তত্বাবধান করিবার ভার দিয়া যায়। আমিও প্রাণপণে তত্বাবধান করিতাম, কিন্তু ইদানীং রঘুপতির স্ত্রীটার ভাব গতিক দেখিয়া আর ওস্থানে যাই না।

বোসবুড়ো। সরলাটা কে?

কালী। ঐ যে গদার বোন।

পার্শ্বস্থ মুখোয্যে মহাশয় বলিলেন, তা আর বলতে। কিন্তু তিনি কালী-ভৈরবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কালীভৈরব তোমার মুখখানা এত বিষণ্ণ কেন? তুমি হাসিতে হাসিতে বলিতেছ বটে কিন্তু তোমার মুখের ম্লান ভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, ইহার কারণ কি?

কালী। আজ্ঞা! আমার আজ চারি পাঁচ দিন হইল অসুখ হইয়াছে, তাহাতে মনটা বড়ই খারাপ আছে।

রে দুরাত্মা কালীভৈরব! তোমার ইহকালও নাই এবং পরকালও নাই। তোমার নরকেও স্থান হইবে না। তোমার মুখ কেন বিষণ্ণ হইয়াছে, আমরা ত সবিশেষ সমস্তই জানি। আর সপ্তাহ দুই অপেক্ষা কর, তোমার নষ্টামির পরিচয় গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই পাইবে।

পাঠক এখন কমলা কি করিতেছেন, একবার দর্শন করুন। কমলা এইরূপে গমন করিয়া সপ্তম দিনে রঘুপতির কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। পথে তিন দিন আহার হয় নাই; কেবল পিপাসার সময় জল পান করিয়া দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া জ্বর।

আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।

লেখক,—আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাতীর্থ কবিরাজ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ বি,এ,এল,এম,এস।

যাঁহারা সহরে বাস করেন, এবং পল্লীগ্রামের বিশেষ কোন সংবাদ রাখেন না, তাঁহারা হয়ত অনুমান করিতে পারিবেন না,—পাড়াগেঁয়ে লোক আমরা আমাদের আজ কি দুরাবস্থা! মানুষের যতকিছু সুখ আছে, তাহার মধ্যে স্বাস্থ্যই তাহার পরম সুখ, আর যত প্রকার দুর্গতি আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গতি জ্বরে জ্বরে ভুগিয়া মরার মত বাঁচিয়া থাকা। এই সুখ হইতে যেমন আমরা আজ বঞ্চিত, এই দুর্গতিও আজ আমাদের ঘরে ঘরে। ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণে সকল পরিবারে—সমস্ত পল্লীগ্রামে, যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহা যাঁহারা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, মানবের যত প্রকার দুর্গতি আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গতি ম্যালেরিয়া। এই ব্যাধির দারুণ আক্রমণে মানুষ মানুষ থাকে না। তাহার শোভা সৌন্দর্য্য, বল বুদ্ধি কার্য্য পটুতা আত্মোন্নতির দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা সমস্তই ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাই বলিতেছি, যদি একবার এই পাপ ব্যাধি শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে মানুষ মানুষ থাকে না। ম্যালিরিয়া এখন আমাদের গৃহে গৃহে—আমাদের পুত্র কন্যা, জনক জননী, পত্নী সোদর সোদরা এমন খুব কমই আছেন, যিনি আজ এই প্রবল পীড়ায় প্রপীড়িত নহেন? প্রাতে ও সন্ধ্যায় পল্লীর বক্ষে যে সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনি উঠে, বলিতে কি—তাহার তিন ভাগেরও বেশী—এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির বিজয় সঙ্গীত। বাঙ্গলা দেশের যত কিছু অবনতি, ধরিতে গেলে, তাহার অধিকাংশেরই মূলে ম্যালেরিয়া অনেক পরিমাণে দণ্ডায়মান।

কৃষকের ক্ষেত্রে ভাল করিয়া আর যে শস্য সমুৎপন্ন হয় না, তাহার কারণ ভূমির উর্ব্বরতার তত বৃদ্ধি নহে, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া বিচার করিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, চাষার হাতের কব্জীতে বল নাই, চরণে শক্তি নাই, লাঙ্গলের ফাল জোর করিয়া মাটীর ভিতর সে অনেক্ষণ ধরিয়া বসাইয়া রাখিতে পারেনা—এই জন্য ষোল্‌আনা ফসলের জায়গায় সে কোনরূপে ছয়আনা ফসল পায়, আর আধপেটে খাইয়া তাহার পুত্র পরিবার কোনরূপে অতিকষ্টে জীবন ধারণ করে। এই দীন পরিবারের উপর গঙ্গার

বাণের মত এই ব্যাধির আক্রমণের যত জোর। কম্পজ্বরে কাঁথা মুড়ি দিয়া বেলা দশটার পর হইতে সে শোয়, আর সূর্য্যদেব পাটে বসিলে সে উঠে — প্রত্যুষের কয়েক ঘণ্টা তাহাতে জমী ভাল করিয়া চষা তাহার পক্ষে সম্ভব কি? ম্যালেরিয়ায় আমাদের দেশের উন্নতির প্রথমস্তর বিধ্বস্ত! সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই পূত জন্মভূমির দক্ষিণহস্ত ম্যালেরিয়ায় আজ এইরূপে একরূপ নিস্তেজ! দেশের আশা ভরসা, ভবিষ্যতের আলো,—আমাদের ছাত্রসমাজ তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন,—কি দেখিবেন, দেখিবেন, তাহাদের উজ্জ্বল নয়ন জ্যোতিশূন্য, মুখ মলিন, চক্ষুর কোণে রক্ত নাই,—উদর প্লীহায় অর্দ্ধেক জুড়িয়া গিয়াছে! যকৃতেও অপরার্দ্ধ পূর্ণ! মনে উৎসাহ থাকিলেও শরীরে সামর্থ্য নাই, পড়াশুনা করিবে কি? মস্তিষ্ক ২।১ ঘণ্টা না পড়িতেই অবসন্ন হইয়া আসে! জন্মভূমির প্রফুল্ল মুখচ্ছবি তাই আজ নিরানন্দে পরিপূর্ণ। এই সুখের শরৎ—এই কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ — উষ্ণদেশে কত আনন্দের দিন! কত উৎসবের দিন! কিন্তু পরিবারের মধ্যে এমন লোক নাই যে, একজন বল করিয়া আর একজনের সেবা করে,—গৃহলক্ষ্মী যিনি তিনিও যেমন দুর্ব্বল ও পীড়িত, তেমনি তাঁহার আশ্রিত যাহারা তাহারাও দুর্ব্বল ও পীড়িত। এমন পরিবার অনেক, যে ঘরে চাল ডালের সংস্থান থাকিতেও রাঁধিবার লোকের অভাবে তাহাদের উনুনে আগুন জ্বলে না। ম্যালেরিয়ায় দেশ বাস্তবিকই অবসন্ন, মৃত্যু সংখ্যাও ইহাতে এত বেশী যে, অন্য কোন ব্যাধির সহিত ইহার তুলনাই হয় না! শুনিলেও হৃৎকম্প হয়,—যে নদীয়ার প্রায় অর্দ্ধেক লোক, যশোহরের প্রায় তিনভাগ লোক, এই ব্যাধির আক্রমণে আজ আক্রান্ত। ম্যালেরিয়া আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। নৈহাটী, কাচড়াপাড়া হালিসহর, গুপ্তিপাড়া, সোমরা, বলাগড়, উলো প্রভৃতি প্রাচীন বহু বিখ্যাত বিখ্যাত পল্লী আজ যে এক প্রকার জনশূন্য, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আজ যে পেচকের, বাদুড়ের ও কপোতের লীলাগৃহ, পথ ঘাট যে অরণ্যে ভরিয়া গিয়াছে —কে বলিবেন ম্যালেরিয়া তাহার কারণ নহে? ম্যালেরিয়ায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া গিয়াছে, যাইতেছে ও যাইবে, ইহাতে প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই। গৃহের পর গৃহ, পল্লীর পর পল্লী, গ্রামের পর গ্রাম, জেলার পর জেলা, অধিকার করিয়া ম্যালেরিয়া এখন সহরেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্রই এখন ম্যালেরিয়া! কিন্তু এই প্রবল পাপ কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল, কবে আসিল, কেহ সুনিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন কি? কমিশনের পর কমি-

শন বসিয়াছে ও বসিতেছে, কিন্তু অদ্যাবধি ভাল করিয়া স্থির হইল না, ইহার মূল কিসে? ইহার প্রতিকারের উপায় কি? দয়ালু গভর্ণমেন্ট এই বিপৎপাত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিতেছেন, কিন্তু উশোর মড়কের সঙ্গে সঙ্গে সেই যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহার আর নিবৃত্তি নাই! কিসে এই পাপ ব্যাধি এদেশ হইতে দূরীভূত হইবে, কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। কেহ বলিতেছেন, নদীর অপ্রবলতা দূর করিলেই দেশ ম্যালেরিয়া হইতে বিমুক্ত হইবে, কেহ বলিতেছেন, অরণ্যানিই ইহার মূল, কেহ বলিতেছেন, রেলপথ, কেহ বলিতেছেন অন্নকষ্ট, কেহ বলিতেছেন, দুষ্ট গ্রহ, কেহ বলিতেছেন, দুষ্টজল, যাহার যেমন প্রবৃত্তি তিনি সেইকথা বলিয়া ইহার প্রতীকারের সদুপায় স্থির করিতেছেন—কিন্তু বলিতে কষ্ট হয়—প্রতী-কার এখনও সদূরপরাহত। মশকে ম্যালেরিয়া আনয়ন করে, মশকের ধ্বংস সাধন ইহার একমাত্র উপায়, এইমত আজ অধিকাংশ প্রাচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানবিৎ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদের অনেকেই বোধহয় জানেন না, আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া নূতন নহে,—ইহার অতি প্রসরতা নূতন হইলেও ইহার উৎপত্তি এ দেশে বহু প্রাচীন। তখন ইহার ভিন্ন নাম ছিল,—এমন ভিন্ন নাম, যে আমাদের বহু প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদও সে নাম জানিতেন না। আজ কাল আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া কি, তাহা জানে, কিন্তু "তক্মন্" বলিলে কি বুঝায়, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? এখন-কার ম্যালেরিয়া আর তখনকার তক্মন্ একই রোগ। অথর্ব্ববেদের একটী সূত্রের আমি যে অনুবাদ করিয়াছি, তাহাতে আছে—"হে কৃচ্ছ্রজীবনকারী শীতজ্বরের উৎপাদক তক্মন্! তোমাকে নমস্কার! হে শীতানন্তর সঞ্জাত জ্বর! তোমাকে নমস্কার! হে সন্তাপ জনক জ্বর! তোমাকে নমস্কার! হে ঐকাহিক দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থকজ্বর! তোমাদিগকেও নমস্কার! এই নমস্কার দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাও!" যে সূক্তে এই কথাগুলি আছে, সে সূক্তটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নমঃ শীতায় তক্মনে
নমঃ রূড়ায় শোচিষে কৃণোমি॥
যো অন্যেদ্যুরুভয়দ্যুরভ্যেতি
তৃতীয়কায়-নমো অস্তু তক্মনে॥

সায়ণ "তক্মন" শব্দের অর্থ করিয়াছেন,— "কৃচ্ছ্রজীবন কারিণে রোগায়",

আয়ুর্ব্বেদের অনেক সূক্তে এইরূপ ও জ্বর-চিকিৎসার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ যে সময়ের পুস্তক, সে সময়ে এদেশে যে ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল, এই সূক্তের মত বহু সূক্তে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদে জ্বরের উৎপত্তির কাল ও ইতিহাস যাহা বর্ণিত আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি,—দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংসের পরই, এদেশে আটটি মহাবল ব্যাধির উৎপত্তি ঘটে— দক্ষাধ্বরের পূর্ব্বে গুল্ম, কুষ্ঠ, প্রমেহ, উন্মাদ, অপস্মার, রক্তপিত্ত এবং জ্বর ছিল না। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় হইতে এই ব্যাধি কয়েকটির উৎপত্তি ঘটে। জ্বরও এই সময়ে প্রথম সমুৎপন্ন হয়।

মহর্ষি পুনর্ব্বসু লিখিয়াছেন——

" তস্মিন হি দক্ষাধ্বরোধ্বংসে দেহিনাং দিক্ষু
বিদ্রবতামতিসরণ প্লবন লঙ্ঘনাদ্যৈদেহ
বিক্ষোভনৈঃ পুরা গুল্মোৎপত্তিরভূৎ।
হবিপ্রাশনান্মেহ কুষ্ঠানাং, ভয়োত্রাসশোকৈ
রুন্মাদানাম্ বিবিধ ভূতাশুচিসংস্পর্শাৎ
অপস্মারাণাম্, জ্বরস্তু খলু
মহেশ্বরললাটপ্রভবঃ; তৎসন্তাপা
দ্রক্তপিত্তম্। অতিব্যবায়াৎ
পুনর্নক্ষত্ররাজস্য রাজযক্ষ্মেতি।"

"দক্ষযজ্ঞের সঙ্গে বা ইহার কিছু পরে, আয়ুর্ব্বেদমতে জ্বরের উৎপত্তি হইলেও ইহার প্রকৃত আকার আয়ুর্ব্বেদের সূক্তেই স্ফুটতরভাবে চিত্রিত দেখিতে পাই। দেখি, ইহা ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক ও চাতুর্থকরূপে মানবের জীবন অতিশয় কৃচ্ছ্র করিয়া তুলে। ইহাতে প্রথম শীত করে, শীতের পর জ্বর স্পষ্ট প্রকাশ পায়। জ্বর স্পষ্ট প্রকাশ পাইলে, শরীর অত্যুষ্ণ হয়, তা ছাড়া ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক ও চাতুর্থকরূপে ইহা মুক্তানুবন্ধী এবং ইহার বিষময় ফল এই হয়—যে, ইহাতে শরীরের রক্ত এত কমিয়া যায় যে, তাহা হরিদ্বর্ণের আকার ধারণ করে।" অথর্ব্ববেদের অন্যত্র এই হরিদ্বর্ণের কথা আছে; ঋষি বলিতেছেন, হে তক্মন্! যদিও তুমি উষ্ণ গুণবিশিষ্ট, যদিও তুমি শরীরের সন্তাপকারী, যদিও অগ্নিতে তোমার জন্ম, তথাপি তোমার আর একটী নাম রূঢ়, অর্থাৎ হরিদ্বর্ণের উৎপাদক। "রূঢ়ুর্নামাসি হরিতস্য"

সায়ণ এইখানে বলিতেছেন,—"যদ্যপি তে বহুনি নামানি সন্তি তথাপি ইদমেব

নাম প্রসিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। আমরা এইরূপ জ্বরের বর্ণনা পাঠ করিয়া অবশ্য মনে করিতে বাধ্য হই, যে আমাদের দেশে এখন ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া যাহা সুপরিচিত, খুব কম হইলেও ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশেই তাহার উৎপত্তি, তখনও ইহা মানবের জীবন যেমন কৃচ্ছ্র করিয়া দিত, এখনও সেইরূপ দেয়,— তবে তখনকার লোক ইহাকে তক্মন্ বলিয়া জানিত, এখন লোকে সে কথা ভুলিয়া নূতন নামে ইহার নামকরণ করিয়া বলে—ম্যালেরিয়া।

অথর্ব্ববেদের তক্মন্ জানি না কেন আয়ুর্ব্বেদে ঠিক এই নামেই অভিসংজ্ঞিত হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদে ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক, চাতুর্থক জ্বর সকলেই জানেন, বিষমজ্বর বলিয়া উক্ত। বিষমজ্বর বলিয়া উক্ত হইলেও, আমার বিশ্বাস আমরা জানি না কিম্বা জানিতে চেষ্টা করি না যে, ম্যালেরিয়া ও বিষমজ্বর এক। যদি জানিতাম ম্যালেরিয়ার সহিত বিষমজ্বরের একতা আছে,—তাহা হইলে জ্বরের তরুণ অবস্থায় রোগীকে ডাক্তারের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া বিষমজ্বরের জন্য আমরা নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতাম কি? আর এইরূপ বসিয়া থাকিতে গিয়া এ কুল ও কুল দুকুল বিসর্জ্জন দিয়া পল্লীগ্রামের একটি হ্যাট কোট পরা ঘোড়ায় চড়া কম্পাউণ্ডারের অভ্যুত্থান দেখিয়া আপনাদের অন্নের অসংস্থান ভাবিতে ভাবিতে বিষাদে, হিংসায়, ঈর্ষায়, অভিমানে এত জর্জ্জরিত হইতাম কি? আমরা বুঝিয়াছি,— কুম্ভীরের বুদ্ধিতে— বর্ষা না আসিলে মস্তোকপরি উপবিষ্ট কাককে খাইতে পারিব না; আমরা বুঝিয়াছি, কুইনাইন আটকাইলেই রোগী আমাদের হাতে আসিবে— আমরা তাই কুইনাইন আটকান জ্বর আর বিষম জ্বর এক করিয়া ফেলিয়াছি; করিয়া ভাবি, ম্যালেরিয়া আগে—পরে, অনেক পরে বিষম জ্বর। আগে ডাক্তার পরে আমরা। এইরূপ পর পর করিতে গিয়া, আমরা আপনার পায়ে আপনি যে দারুণ কুঠারাঘাত করিয়াছি, তাহা আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না। জ্বরের চিকিৎসা—তরুণ, মধ্যম, এমন কি যাহাকে আমরা বিষম জ্বর বলি, সেই জীর্ণ জ্বরেরও চিকিৎসা আমাদের হাত হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। এখন কয়েকটি যক্ষ্মা, কয়েকটি শোথ, কয়েকটি উদরাময়, দুদশটি প্রমেহ বা সামান্য সামান্য আর কিছু ইহাই ভাগা ভাগি কাড়া কাড়ি করিয়া আমরা যা দু পয়সা উপার্জ্জন করি! দেশের তিনভাগ বা অধিক লোক যে ব্যাধিতে অহর্নিশ কষ্ট পাইতেছে, তাহার সংবাদ আমরা সত্য সত্যই রাখিনা; রাখিলেও, কি আক্ষেপের বিষয়! আমরা নিজেই এমন কি নিজের ঘরের রোগী ডাক্তারের হস্তে

তুলিয় দিয়া মনে করি " আঃ বাঁচিলাম।' বর্ষা আসিলে কাককে জব্দ করিব, এই কুন্তারবুদ্ধিই আমাদিগের এই পরাজয়, এই জাতীয় অবমাননার মূলে দণ্ডায়মান। ম্যালেরিয়া ও বিষম জ্বর এক এই কথাটি মনে করা। এই টুকু মনে না করায় আমরা দিন দিন এ কূল ওকুল দুকুল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। আমরা তাই আজ নিরন্ন! তাই আজ শতকরা ৯৯ জন কবিরাজের গৃহে গ্রাসাচ্ছদনের অভাব! একজন কম্পাউণ্ডার যেখানে ১০০ টাকা মাসিক হাসিতে হাসিতে উপার্জ্জনা করে, সেখানে একজন ব্যাকরণতীর্থ—কাব্যতীর্থ—সাংখ্যতীর্থ—ন্যায়তীর্থ—কবিরাজ ১৫ ২০ টাকা—তাহাও পান কি না সন্দেহ! সহরের ২।৪ জন কবিরাজের সৌভাগ্যের কথা আমি বলিতেছি না, আমি বলিতেছি,— তাঁহাদেরই কথা যাহারা পল্লীতে পল্লীতে অধিষ্ঠিত, সচ্চরিত্র গুণবান বিদ্বান ও ধার্ম্মিক বলিয়া সমাদৃত,— আমি বলিতেছি, আমাদের দরিদ্র কবিরাজ মণ্ডলীর কথা।

ম্যালেরিয়াকে বিষম জ্বর বলিয়া বুঝিলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতে হইত না। আমি দেখাইব, আয়ুর্ব্বেদের ভিতর এমন সকল ঔষধ আছে, যাহারদ্বারা বিষমজ্বর মনে করিয়া ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করিলে নিশ্চয়ই জ্বরের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু সেকথা বলিবার পূর্ব্বে আমাকে দেখাইতে হইবে যে, ম্যালেরিয়া এবং বিষমজ্বর—এক—একই তত্ত্ব।

চরক এবং সুশ্রুতাদি প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে আমি আপনাদিগকে এই সমতা বুঝাইয়া দিতে পারিব না, পারিলে আপনারা নিজেই দেখিতেন, বিষমজ্বর এবং ম্যালেরিয়া সমানার্থক শব্দ।

আয়ুর্ব্বেদের " জ্বরোৎসৃষ্টস্য বাপুনঃ " ইত্যাদি শ্লোকের ও ইহার টিকাটিপ্পনির প্রকৃত মর্ম্ম আপনারা যেরূপ বুঝিবেন, সেইরূপ বুঝিতে হইলে, আমাকে বহুদিন ধরিয়া আপনাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকিতে হয়। চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থ করুণাময়ী বাগ্‌দেবী আপনাদিগকে বুঝিতে যেরূপ অবসর দিয়াছেন, সেরূপ অবসর আমাকে দেন নাই। সংস্কৃতাভিজ্ঞতায় আমি আপনাদিগের দাসানুদাসেরও উপযুক্ত নহি। তথাপি যে আমি বলিতেছি, আমি ম্যালেরিয়া জ্বর এবং বিষমজ্বরের সমতা প্রতিপাদন করিতে পারিব, তাহা অন্য উপায়ে—তাহা বুদ্ধিতে বা বিদ্যাতে নহে,—যুক্তিতে, আয়ুর্ব্বেদের তন্ত্রে নহে—পুরাণের সাহায্যে আমি যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিব যে, বিষম জ্বর এবং ম্যালেরিয়া একই বস্তু। কিন্তু এইরূপ প্রতিপন্ন করিবার পূর্ব্বে দয়া করিয়া আপনাদিগকে আমার একটি

কথায় কিছুক্ষণের জন্য মনোযোগী হইতে হইবে। আমি আয়ুর্ব্বেদের ভূত বিদ্যার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া যাহা যাহা পাইয়াছি আবান্তর প্রসঙ্গ হইলেও আপনাদিগকে ধৈর্য্য ধরিয়া তাহা একটু শুনিতে হইবে। "জন্মভূমি" নামে সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় যদিও ধারাবাহিকরূপে আমি এইসকল বিষয় লিখিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আপনাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। এখানে সেইজন্য সেইসকল কথাই পুনরায় বলিতে হইবে।

আমি সুশ্রুতের "অমানুষ প্রতিষেধ" অধ্যায় অধ্যয়ন করিবার সময়—বালগ্রহ প্রতিষেধাধ্যায়ও পাঠ করি, এবং তাহার পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের ব্রণবন্ধনাদি উপদেশ সকলও মনোযোগের সহিত প্রতীচ্য বিজ্ঞানের আলোকের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করি। এইসময়ে আমার সুদৃঢ় ধারণা জন্মে, যে আয়ুর্ব্বেদের ভূতবিদ্যা প্রতীচ্যবিজ্ঞানের Bacteriology র অনুরূপ কোন তত্ত্ব। আয়ুর্ব্বেদের ভূতাভিষঙ্গোত্থরোগের চিকিৎসা Antiseptic চিকিৎসা ও শুচির সমাধান। আমি এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যে দিন সুশ্রুতের যুক্তসেনীয় অধ্যায় পাঠ করি, সেই দিন দেখিতে পাই, আমাদের দেশে ধন্বন্তরিযুগে বা তাহার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে, রাজার স্কন্ধাবাসে একজন বৈদ্য এবং একজন পুরোহিতকে একত্র রাজচিকিৎসার জন্য অবস্থিতি করিতে হইত। পুরোহিতের কার্য্য ছিল,—দৈব ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা; বৈদ্য যুক্তি ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ছিলেন। পুরোহিত ব্রহ্মবংশীয় বলিয়া উচ্চ সম্মান তাঁহার ছিল, বৈদ্যকে পুরোহিতের অনুবর্ত্তী হইয়া চিকিৎসা করিতে হইত, কিন্তু কথায় ভাবে বুঝা যায়, বৈদ্যের বিদ্যাবত্তা তখন পুরোহিতের অনেক ঊর্দ্ধে। কেবল ব্রাহ্মেতরবংশীয় বলিয়া আভিজাত্যে বৈদ্যকে পুরোহিতের নিম্নে অবস্থিতি করিতে হইত। বৈদ্য বহুবিদ্যাসম্পন্ন বলিয়া সমুদ্রিতধ্বজের মত তখন সকলেরই ভক্তির পাত্র। সহস্র সহস্র রোগী তাহার চিকিৎসালাভার্থ সেখানে সমবেত হইতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে পুরোহিতের যাহাকিছু সম্মান তাহা আভিজাত্যে।

সুশ্রুতের ব্রণবিজ্ঞানাধ্যায়ে এই পুরোহিত এবং বৈদ্যকে পাশাপাশি সমান ভাবে ব্রণরোগীর চিকিৎসার্থ নিযুক্ত দেখি। কিন্তু যুক্তসেনীয় অধ্যায়ে দেখি, বিদ্যাবত্তায় বৈদ্য পুরোহিত অপেক্ষা সাধারণের নিকট অধিক পূজনীয়।

তারপর কল্পস্থানে দেখি—পুরোহিতের চিকিৎসার উপর লোকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেনা। সাপের বিষ নামাইতে পুরোহিত চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু লোকে একজন বৈদ্যকে ডাকিয়া আনিয়া সেখানে

রাখিয়াছে। যদি পুরোহিতের উচ্চারণ দোষে মন্ত্র কার্য্যকরী না হয়, তাহা হইলে বৈদ্য তৎক্ষণাৎ অগদ প্রয়োগ করিবেন। বৈদ্যের বুদ্ধি প্রসূত অগদ সকলেই জানে অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন। এইখানে পুরোহিতের অধঃপতন স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়।

তারপর বালরোগ প্রতিষেধ্যায়ে দেখি পুরোহিতের এমন অবোন্নতি ঘটিয়াছে যে, তাঁহারা ব্রহ্মবংশীয় হইলেও জানেন না, স্কন্দ ও স্কন্দাপস্মার বিভিন্ন কিনা! সুশ্রুত পুরোহিতকে গালি দিতেছেন, অবিজ্ঞান ধরিয়া দেহ চিন্তক বলিয়া।

ইহার পর অমানুষ প্রতিষেধাধ্যায়। এখানে কি দেখি? দেখি পুরোহিতের এমন দুর্দ্দশা—যে তাহাকে ভূতবিদ্যার অধিকার হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য প্রস্তাবনা হইতেছে। বৈদ্য এখন নিজ হস্তে দৈব এবং যুক্তি উভয় ভেষজ প্রয়োগেরই ভার গ্রহণ করিয়াছেন; পুরোহিতের আর চিকিৎসা ক্ষেত্রে এখন না থাকিলেও চলে। বৈদ্যই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। কালের পরিবর্ত্তনে পুরোহিতের এই পরিবর্ত্তন যখন, তখন আয়ুর্ব্বেদে নূতন করিয়া অনেক পরিভাষা সংগঠিত হয়। তাহার মধ্যে আমি একটির কথা এথানে আপনাদিগকে জানাইতেছি। পূর্ব্বে পুরোহিতদিগের সময়ে লোকে মনে করিত, দেবতারা মানুষের শরীরে নিজেই আবিষ্ট হয়েন, হইয়া অমানুষ রোগ প্রভৃতি উৎপাদন করেন। প্রাচীন কলডিয়া, প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া, প্রাচীন এসিরিয়া প্রাচীন ইরাণে ব্যাধির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিশ্বাস বা সিদ্ধান্ত, এথানেও সেই বিশ্বাস বা সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে তখন বৈদ্য জাতির অভ্যুদয়ে এক নূতন আলোক প্রবিষ্ট হইয়াছে। বৈদ্য নূতন পরিভাষা পরিগঠন করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে সংস্থাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তিনি বুঝাইতেছেন, পূর্ব্বে যে লোকে বিশ্বাস করিত, দেবতারা নিজেই মানুষের শরীরে আবিষ্ট হইয়া তাহাতে নানাবিধ ব্যাধির উৎপাদন করেন, একথা সত্য নহে। দেবতারা নিজে মানুষের শরীরে আবিষ্ট হওয়া ত দূরের কথা স্পর্শও করেন না। দেবতাদিগের অযুত সহস্র পদ্ম বা অপরিসংখ্যার পরিচারক আছে, যাহারা অসৃগ্‌বসমাংসভুক্ এবং জিঘাংসু; ইহারাই মানুষের শরীরকে অশুচি বা ক্ষতযুক্ত পাইলেই তাহাতে আবিষ্ট হয় এবং নানাবিধ ব্যাধির সৃষ্টি করে। বেদে এই সকল জিঘাংসু পদার্থ "নৈর্ঋতেরা" বা নির্ঋতি বা তাহার প্রসব বলিয়া অভিহিত। কিন্তু এখন হইতে এই-

সকল জিঘাংসু পদার্থের সংজ্ঞা হইল "ভূত" তা ছাড়া এ সময়ে প্রচারিত হয়, আরও একটি কথা, সে কথাটি এই যে, দেবতারা নিজে ত মানুষের শরীরে আবিষ্ট হয়েন না, তা ছাড়া তাঁহাদের যে সকল অনুচর দেবতাত্মক তাহারাও দেবপ্রকৃতিত্বহেতু মানুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করেন না। যাহারা রাক্ষস প্রকৃতিক—নৈর্ঋতেয়া বা তাহাদের বংশ তাহাদেরই এই ক্রম।

নির্ঋতে র্যাহুহিতর স্তাসাং স প্রসবঃ স্মৃতঃ।

ভূতের এই নূতন সংজ্ঞা করিতে গিয়া—যে সকল উপদেশ—সুশ্রুতগ্রন্থে অধ্যাহৃত হইয়াছে, সেই উপদেশ সকল আপনারা সুশ্রুতগ্রন্থে শ্লোকাকারে যথাযথ-ভাবে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। প্রবন্ধের দীর্ঘায়তন লাঘব করিবার জন্য সে শ্লোকগুলির সকল এখানে উদ্ধৃত হইল না। কেবল মাত্র একটি শ্লোক যাহাতে আমার সব কথাগুলি কিছু কিছু প্রতিফলিত আছে, তাহাই আপনাদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছি— শ্লোকটি এই—

নতে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি
ন বা মনুষ্যান্ কচিদাবিশন্তি
যে বা সংবিশান্তীতি বদন্তি মোহাৎ
তে ভূতবিদ্যাবিষয়াদপোহ্যাঃ।

সুতরাং বলিতে হইবে, নূতন মতে দেবতাদিগের অসংখ্য জিঘাংসাপ্রকৃতিক পরিচারকই ভূত সংজ্ঞায় অভিহিত। মার্কণ্ডেয়পুরাণ পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে এই নৈর্ঋতেয়গণ কি ভয়ানক অনিষ্ট জনক পদার্থ! আর জানিতে পারি যে—এই ভূত সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—এমন ক্ষুদ্র যে চর্ম্মচক্ষের অগ্রাহ্য পদার্থ। বর্ণহা, শস্যহা, স্নেহহা, রেতোহা—ইহাদের নানা জাতি, নানাকারে বায়ুমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া বেড়াইতেছে। রক্ষো-দ্বেষী এই সকল পদার্থকে অথর্ব্ববেদ "কিমিদিন" বলিয়াছেন। যাহা হউক সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বলিতে হয়, প্রাচীন চিকিৎসাক্ষেত্রে ধন্বন্তরিযুগে যেমন ভূতের নূতন সংজ্ঞা, নূতন পরিভাষা পরিগঠিত হয়—সেইরূপ সেই সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন বৈদিক বা পুরোহিত সম্প্রদায় চিকিৎসা ক্ষেত্রের একদিকে নিষ্প্রভ জ্যোতিতে দণ্ডায়মান; আর এক দিকে সমুচ্ছ্রিত ধ্বজের মত উদীয়মান এক সম্প্রদায় আপনাদিগের প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার জয়পতাকা হস্তে করিয়া ও আধিপত্য ঘোষণা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র সুশ্রুত সংহিতায় এই নব সম্প্রদায়ের

অভ্যুত্থানের কথা স্পষ্টতঃ না হইলেও, স্থানে স্থানে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হই-য়াছে। চরকসংহিতা কিম্বা অন্য কোন গ্রন্থে এ সকল কথা নাই। আর যেখানে আছে, সেখানেও পূর্ব্বোক্ত শব্দের যথাযথ অর্থের পরিবর্ত্তে তাহার বিকৃতিই উদ্ভাবিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাবপ্রকাশের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—ভাব প্রকাশের টীকায় পুরোহিত শব্দের অর্থ মন্ত্রী এইরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। সুশ্রুত সংহিতা হইতেই জানিতে পারা-যায় যে ধন্বন্তরি যুগে দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরস্পর বিবদমান হইয়া আপনাদিগের প্রতিভার পরিচয় দিতেছিলেন।

চরক এবং সুশ্রুতসংহিতা বৈদিক গ্রন্থ। প্রাচীন ঋষিদিগের মত ইহারা উভয়েই স্পষ্ট করিয়া তারস্বরে অমীমাংস্যানি অচিন্ত্যানি ইত্যাদী শব্দের দ্বারা—সন্দেহের সোপানের অতি উর্দ্ধে সংস্থাপন করিতে সবিশেষ প্রযত্ন-শীল হইয়াছেন। এইরূপ প্রযত্নশীল হইলেও, সুশ্রুত স্থানবিশেষে তাঁহার উদারতার পরিচয় স্বরূপ বৈদিক মতের প্রতিদ্বন্দ্বী এই সম্প্রদায়ের অস্তি-ত্বের আভাস আমাদিগকে জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

এই নবসম্প্রদায়ের নূতন প্রচারিত মতের উপর নির্ভর করিয়া আমি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব যে—বিষমজ্বর এবং ম্যালেরিয়াজ্বর একই—একই তত্ত্বা ভূতবিশেষের সংসর্গে উভয়ই সমুৎপন্ন, এবং সেই সঙ্গে দেখা-ইব, আয়ুর্ব্বেদে বিষমজ্বরের ভূতাভিষঙ্গ ধরিয়া যে সংপ্রাপ্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তা ছাড়া বিষমজ্বরের আর একটি সম্প্রাপ্তি আছে এবং সে সংস্প্রাপ্তির কথা আমাদের আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে এমন অস্ফুট অস্পষ্ট এবং উপেক্ষার ভাবে লিখিত হইয়াছে, যে তাহাতে পাঠকের দৃষ্টি পড়ে কি না পড়ে।

যাহা অতি উজ্জল স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার কথা— তুলাদণ্ডে ওজন করিলে ওজনে দ্বাদশ সহস্রী চরক সংহিতা— তথৈব সুশ্রুত সংহিতা একদিকে আর যে অর্দ্ধ শ্লোক একদিকে সমগরিমা বহন করে, সেই অর্দ্ধ শ্লোককে এমন উপেক্ষার ভাবে লিখিয়া সাধারণের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিয়া রাখায় যে ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতির আর কি পূরণ আছে? আয়ুর্ব্বেদ আজ যে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের সংঘর্ষে এতাদৃশ লাঞ্ছিত অপমানিত ও পরাজিত—আয়ুর্ব্বেদোপজীবী চিকিৎসকগণ আজ যে দুরবস্থাপন্ন— দুর্ব্বল ও নিস্তেজ আমার মনে হয়; ঐ শ্লোকার্দ্ধকে যথোপযুক্ত আকারে প্রকটিত হইতে না দেওয়াই তাহার কারণ। এই শ্লোকার্দ্ধটি কি তাহা জানিবার জন্য আপ-

নাদের কৌতুহল হইতেছে; কিন্তু সেই চরণটি এখানে আবৃত্তি করিবার পূর্ব্বে আমি বলিতে চাই——

আয়ুর্ব্বেদে বিষমজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর একই তত্ত্ব।

যাঁহারা চরক সুশ্রুতাদি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, জ্বরের উৎপত্তি কথায় প্রাচীন ঋষিদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া "কেচিৎ" শব্দে অভিসংজ্ঞিত একদল লোক—তাহাদের নিজের মত প্রচার করিবার জন্য যত্নশীল। এই "কেচিৎ" শব্দাভিসংজ্ঞিত ব্যক্তিগণের নাম যদিও আমরা ভাল করিয়া অদ্যাবধি জানিতে পারি নাই, তথাপি আমরা ইহার কতকটা আভাস যে না দিতে পারি এমন নহে। ডল্লনের নিবন্ধ সংগ্রহের এক স্থানে লেখা আছে ——

"ইদানীং ভেড় ভালুকি
পুষ্কলবাণাদিনাং অল্পতন্ত্রবিদাং
মতেন বিষমজ্বরোৎপত্তিমাভিধায় ইত্যাদি।

এই লেখাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে সাহসী হই যে, আয়ুর্ব্বেদে জ্বরোৎপত্তির সূত্রে "কেচিৎ" শব্দাভিসংজ্ঞিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পূর্ব্বকথিত ভেল, ভালুকি, বাণ পুষ্কলাবত প্রভৃতি যে সকল খ্যাতনামা চিকিৎসক বিদ্যমান্ ছিলেন, তাঁহারা প্রচার করিতে ছিলেন, অহিত সমুথ বিষমজ্বর এই বৈদিক মতের বিরুদ্ধে যে বিষমজ্বর "ভূতাভিষঙ্গোত্থ"

"কেচিৎ ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরম॥"

যদিও এই শ্লোকের ভাবমিশ্রাদির অনুবাদক কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন, "ভূতাভিষঙ্গোত্থ জ্বরকে কেহ কেহ বিষম জ্বর বলেন," কিন্তু প্রনিধান করিয়া দেখিলে, ইহার অর্থ এইরূপ না হইয়া এইরূপ হওয়াই উচিত, যে, "কেহ কেহ কেহ বলেন, বিষম জ্বর ভূতাভিষঙ্গোত্থ।"

মাধব তাঁহার জ্বরনিদানে বিষমজ্বরের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই শ্লোকার্দ্ধ অধ্যাহৃত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থ সুশ্রুতেও এই শ্লোকার্দ্ধ বিষম জ্বরের প্রকরণেই পরিপঠিত হইয়াছে। ডল্লনের নিবন্ধ সংগ্রহেও এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লেখা আছে,

"বিষমজ্বরে ভূতাদি হেতুরুক্তঃ
তস্য সমর্থনমাহ আগন্তুরিত্যাদি।"

তা ছাড়া বিজয় তাঁহার মধুকোষে লিখিয়াছেন——

" কেচিদিত্যাদি———
পরবচনমপ্রতিষিদ্ধমনুমতং
সুশ্রুতেন।—

অতএব বিষমজ্বরে দৈবাশ্রয়ং বলিহোমাদি ভূতোচিতং যুক্তিব্যবব্যাপপাশ্রয়ং কষায় পাচনাদি দোষোচিতং বিধিয়তে।"

যদিও ডল্লন এই মতাবলম্বিব্যক্তিদিগকে অল্প তন্ত্রবিদ্ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু বিজয়ের কথার ভাবে আমরা বুঝিতে পারি, এই মত অপ্রতিষিদ্ধ হইলেও উপেক্ষণীয় নহে, কেন না —

" অনুমতং সুশ্রুতেন "

সুশ্রুত যখন এই মত নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন বলিতে হইবে, প্রকারান্তরে তিনিও ইহার, সম্পূর্ণ না হইলেও কথঞ্চিৎ, পক্ষপাতী।

বিষমজ্বর অহিত সম্ভূত প্রাচীন ঋষিদিগের এই বিশ্বাস। নূতন সম্প্রদায় বলিতেছিলেন, না তাহা নহে.— বিষম জ্বর ভূতাভিষঙ্গোত্থ। যদি এই শেষোক্ত মত সুশ্রুতের অনুমতই হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সকলকে স্বীকার করিতে হইবে,— ধন্বন্তরির যুগে এদেশে বিষম জ্বরের উৎপত্তির প্রসঙ্গেও দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী মত বিদ্যমান্ ছিল। এক সম্প্রদায় বলিতেছিলেন " অপথ্য বিষম জ্বর আনয়ন করে, " আর এক সম্প্রদায় বলিতেছিলেন যে, ভূতাভিষঙ্গেই বিষম জ্বর সমুৎপন্ন হয়। যাঁহারা এই শেষোক্ত মতের পরিপোষক, তাহারা যে অল্প তন্ত্রবিদ্,— ঠিক একথা বলিতে পারা যায় না; তবে বলিতে পারা যায়, যে তাঁহারা এই নূতন মত প্রচারে বদ্ধপরিকর হইলেও, ধন্বন্তরি যুগে এ অভিনব উপদেশ বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া তেমন প্রসিদ্ধি ও প্রসরতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহা চিকিৎসা ক্ষেত্রে অপ্রতিষিদ্ধ বলিয়া কতক পরিমাণে উপেক্ষিত হইতেছিল।

বৈদিক ঋষিদিগের কথার উপর কথা কহিবার সে সময় নহে, তথাপিও যে কথা উঠিয়াছিল, তাহাতেই আমাদের মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে যে, এই নবীন বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এমন কোন অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা লোকের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে পারিতেন যে,— বিষম জ্বর সত্য সত্যই ভূতাভিষঙ্গোত্থ।

বৈদিক ঋষি বাক্য দুইটি জিনিষকে ভয় করে, প্রথম প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। বেদকে লণ্ড ভণ্ড করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। ইন্দ্রপূজা রহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার ভগবত্ব দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থা-

পন করেন, বোধ হয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সে কথা নূতন করিয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। তবে একটি কথা বলিয়া রাখি, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষবাদী,—তিনি দর্শনকে আপনার চক্র স্বরূপ সাদরে গ্রহণ করিয়া অপ্রত্যক্ষ কাল্পনিক বৈদিকবাদের উপর জয় লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি প্রত্যক্ষের দেবতা— প্রত্যক্ষের পূজক, প্রত্যক্ষের উপর আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত সংস্থাপন করিয়া জয়যুক্ত।

ভেড়, ভালুকি, বাণ, পুস্কলাবত নবসম্প্রদায়ের জয় পতাকা হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেও বিষমজ্বর যে ভূতাভিষঙ্গোত্থ, এমত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজের! তিনিই এই অভিনব মত প্রচার করিয়া, আমরা বলি—কেবল ভারতে কেন, সমস্ত জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যদেশে আর্য্যজাতীর যে কিছু গৌরব—তাহা গীতার উপদেষ্টা এই পরম পুরুষের! আমি যে এ সকল কথা বলিতেছি, ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত নহে; যদিও শুনিতে উপন্যাসের মত বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি এখনই প্রমাণ দিয়া দেখাইব যে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য—অতি সত্য অতিরঞ্জিত বলিয়া ইহাতে বিশ্বাসের অযোগ্য কিছুই নাই।

আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা এখন যে স্রোত পথে প্রবাহিত, তাহাতে এসকল কথার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা কেবল চরক এবং সুশ্রুতের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ না করিয়া, বেদ পুরাণাদি গ্রন্থেকেও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া অনুভব করিয়া, ঐ সকল পুস্তক সযত্নে পাঠ করিতে ব্যাকুল হন্, তাঁহারা অবশ্য বলিলেই বুঝিবেন, জ্বর— শিবজ্বর ও বৈষ্ণবজ্বর ভেদে দ্বিবিধ। মাধবনিদানে জ্বরের প্রাগুৎপত্তি কথায় যে দক্ষাপমান সংক্রুদ্ধ রুদ্র নিশ্বাস সম্ভব অষ্টধা জ্বরের উল্লেখ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ এ নহে, যে জ্বর শিবের নিশ্বাস হইতেই সমুৎপন্ন, ইহার অর্থ এক কথায় "শিবজ্বর অষ্টধা।" সংক্রুদ্ধ রুদ্রের প্রতপ্ত নিশ্বাস হইতেই জ্বরের উৎপত্তি, এ কথা মান্য করিলে, যেখানে ললাট হইতে, তৃতীয় চক্ষু হইতে জ্বরের উৎপত্তির উল্লেখ আছে, সেখানে মত ভেদের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিলে, বলিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় নিশ্বাস ললাট, তৃতীয় চক্ষু, সমানার্থক শব্দ। ফলতঃ যেখান হইতেই জ্বরের উৎপত্তি হউক না কেন এজ্বর যে শিবজ্বর,—তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ বা সন্দেহ নাই; এবং ইহা যে শিবজ্বর তাহার প্রমাণও বেশী দূরে যাইতে হইবে না, শব্দ-

কল্পদ্রুম অভিধানেই অপনারা প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে মাধবের জ্বর নিদানই উদ্ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রথমেই লেখা আছে, "শিবজ্বরোৎপত্তিমাহ।"

আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসার অধিকৃত যে জ্বর—সে জ্বর শিবজ্বর,—বৈষ্ণব জ্বর নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সমাচার জগতে প্রথম প্রচার করেন। তিনি ভ্রাতার শরীরে, নিজের শরীরে,—নিজের সৈন্যদলের প্রত্যেকের শরীরে,—এমন কি পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গে, তরু গুল্ম, ভূমি, জল প্রত্যেকের উপর একে একে পরীক্ষা করিয়া জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীত হন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, হরিবংশ প্রভৃতি, ভারতের পুরাণের অধ্যায়ের পর অধ্যায়, সেই কথায় পরিপূর্ণ। দেখিতে চাহেন ত আমি আপনাদিগকে তাহা দেখাইতে পারি, আর এত না দেখিতে পারেন, কেবল শব্দকল্পদ্রুম অভিধানখানি একবার খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য কি না! শব্দকল্পদ্রুমে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এবং হরিবংশ হইতে যে কয়েকটি শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে;——

১। জ্বর – বৈষ্ণবজ্বর ও শিবজ্বরভেদে দ্বিবিধ।

২। শিবজ্বর এবং বৈষ্ণবজ্বরে মহা যুদ্ধ ঘটে, সেই যুদ্ধে শিবজ্বর বৈষ্ণবজ্বরের নিকট পরাজিত হয়।

৩। পরাজিত হইয়া, শিবজ্বর ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করে যে, এখন হইতে জগতে শিবজ্বরই যেন এক মাত্র জ্বর রূপে আধিপত্য করিতে পারে।

৪। ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া বরদান করেন।

৫। বৈষ্ণবজ্বর মহাবলবান্ ও সমর বিজয়ী হইলেও ভগবানের আদেশে তাহা তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে, শিবজ্বর জগতে আধিপত্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু—

৬। ভগবান্ শরণাগত শিবজ্বরের সহিত এই সত্ব করেন যে, একমাত্র তুমিই এখন হইতে জগতে আধিপত্য লাভ করিবে বটে, কিন্তু একটি কথা তোমাকে পালন করিতে হইবে,—কথাটি এই যে, মানব দেহে প্রবেশ করিতে হইলে তোমাকে কেবলমাত্র

সন্তত, অন্যেদ্যুঃ
তৃতীয়ক এবং
চতুর্থক

জ্বর রূপে প্রবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা যাহাকে,

বিষম জ্বর বলিয়া থাকেন, সেই বিষম জ্বরের আকারে তোমাকে আকারিত হইয়া মনুষ্য দেহ অধিকার করিতে হইবে। অন্যবিধ আকারে মনুষ্য দেহে তুমি প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না।

পত্র পুষ্প ফলে, গোমহিষাদি পশুতে কিম্বা দ্বিপদ পক্ষীতে, জলে, ভুমিতে, তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে নানাকারে, কিন্তু মানব শরীরে প্রবেশ করিতে হইলে— তোমাকে একমাত্র বিষমজ্বরের আকারে আকারিত হইয়া প্রবেশ করিতে হইবে।

কথাগুলি শুনিয়া হয়ত আপনারা প্রমাণের জন্য ইহার পরিপোষক শ্লোক-গুলি শুনিতে ব্যাকুল হইতেছেন, আমি সে ব্যাকুলতা বুঝিয়াও যদি শ্লোক-গুলি এখানে আবৃত্তি না করি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন,— বিশেষ কারণ আছে, আপনারা দয়া করিয়া শ্লোকগুলি নিজেই একবার পাঠ করিবেন।

মূল শ্লোকগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ হইলেও ৺ কালিপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ তাহার যে অনুবাদ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, তাহাতে আমি যে সকল কথা বলিয়াছি, অবিকল তাহাই আছে। এখন যদি দয়া করিয়া আপনারা স্বীকার করিয়া লয়েন যে, জ্বর শিবজ্বর ও বৈষ্ণবজ্বর ভেদে দ্বিবিধ, আর একমাত্র বিষমজ্বরই ভগবানের আদেশে মানব দেহে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে আপনাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে,— জ্বর মাত্রেই——

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে
বিষমজ্বর —
এবং সততকাদি ভেদে ইহা
পঞ্চবিধ।
আর শিবজ্বর বলিয়া ইহার নিশ্চয়ই
যে ভূর্তাভিষঙ্গোত্থ

ভগবানকে এ কথা বলিয়া দিতে হয় নাই। চরকে জ্বরের উৎপত্তির ইতিহাসে ঠিক এ কথা স্পষ্ট না থাকুক, ইহার টীকায় সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাধর তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভার সাহায্যে একথা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি তাঁহার "জল্পকল্পতরুতে" লিখিয়াছেন——

শিবস্যেত্যাদি— ততো ভূতানাং শিবায়
শৌবভাবোস্থতং শিবং জ্বাত্বা কৃতা

গ্ললিঃ সন্ ক্রোধাগ্নির্বালো বীর
ভদ্রোদেবং শিবমুক্তবানহং তে তব
কিং করবাণি।
তমিত্যাদি—তং ক্রোধং ক্রোধাগ্নি
রূ।ং বালমীশ্বরঃ শিব উবাচ।
ত্বং লোকে জ্বরো ভাবষ্যসি।

শিবানুচর যে ভূতযোনি তদ্বিষয়ে হিন্দু মাত্রের আবালবৃদ্ধবনিতা, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, সকলেই সম্যক অভিজ্ঞ। তবে এখানে একটী কথা নিবেদন করিবার আছে; পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেবতার অনুচর বলিয়া শিবানুচর নিজে মনুষ্য দেহে আবিষ্ট হয়েন না। প্রাচীন পুরোহিতগণ বিশ্বাস করিতেন বটে, যে দেবতা ও দেবতাদিগের অনুচর সকল মনুষ্যদেহে আবিষ্ট হয়, কিন্তু ধন্ব-ন্তরি নূতন সিদ্ধান্ত এই হয় যে, যেসকল অনুচর দেবতাত্মক, তাঁহারা নিজে মনুষ্য শরীর স্পর্শ করেন না, তাঁহাদের অযুতকোটীপদ্ম সংখ্যক পরিচারক আছে, অসৃগবসামাংস লোভে তাহারাই মনুষ্য দেহে আবিষ্ট হয়; জিঘাংসু প্রকৃতিক ইহারা তেষাংগ্রহানাং পরিচারকা যে কোটীসহস্রযুতপদ্মাসংখ্যা অসৃগসমাংসভুজঃ সভা নিশাবিহারা তমাবিশান্ত বেদে ইহারা নৈঋর্তেয়া বলিয়া বর্ণিত; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ নূতন সংজ্ঞায় ইহাদিগকে "ভূত" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ ভূত বলিতে ভগবান্ ধন্বন্তরি আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিয়াছি— উদ্ভিজ্জাণু বা জীবাণু কিম্বা অদৃশ্য ও দৃশ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম কৃমি বিশেষ, মাছি, মশা, চিল, শকুন, কুকুর, ছাগ, শূকর, গর্দ্ধভাদি পশু, পক্ষী, কীট ও এই ভূতসংজ্ঞায় অভিধেয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই "নৈঋতেয়াগণের" কথার প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, কুসুম ফুলের বর্ণ, দুগ্ধের স্নেহ, শস্যের সার রজঃ এবং রেত হইতে তাহার বীজ যাহারা অপহরণ করে, তাহারাও ভূত; এবং "যুকা, লিখ্যা" তাহারাও ভূত। তালপ্রাংশু মহাভুজ কোটরগত চক্ষু অনুনাসিক কণ্ঠস্বর না হইলে যে ভূত হইবেনা, এমন কোন অর্থ নাই। বর্ত্তমান্ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-গণের মনগড়া ভূতের সহিত আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষীকৃত ভূতের কোন মিল নাই। মিল নাই তাহার কারণ আমাদের দোষ; আমরা দর্শন বা বিজ্ঞান, প্রত্যক্ষের দিক হইতে না দেখিয়া, অপ্রত্যক্ষ অনুমানের দিক হইতে দেখিতে চাই, এবং এই দেখার দোষে চালুনিদ্বারা চালিয়া পরিমার্জ্জিত। ক্রমশঃ

উষা ও যামিনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"দিদি এমন অসময়ে এঁরা দুই ভাই কলিকাতা গেলেন কেন?"

দ্বিতলের সোপান হইতে নামিতে নামিতে যামিনী উষাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। উষা বাটীর বড় বধূ, যামিনী ছোট্ট বধূ।

উষা উত্তর দিল, "কলিকাতায় বিশেষ আবশ্যক আছে।"

যামিনী। "আজ পত্র আসিবামাত্র দু ভাইয়ে চলে গেলেন! এমন কখনও যান্‌নি। সেখানে বাবা তো ভাল আছেন?"

উষা ও যামিনী শ্বশুরকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া থাকে।

উষা। বাবা সেখানে ভাল আছেন। চল অন্য কথা ঘাটে গিয়া কহিব।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে; দুই ভ্রাতৃজায়া অন্দরমহলের পুষ্করিণীর দিকে চলিয়া গেল। চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত নানাবিধ বৃক্ষ লতা পরিপূর্ণ সুন্দর সরোবর নির্ম্মল বারি পূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে। এখন আষাঢ় মাস আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ গুলি বায়ুভরে ইতস্ততঃ ভাসিয়া যাইতেছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত কিরণ রাগ সেই সব মেঘ খণ্ডে নানাবর্ণে পরিস্ফুট! কচিৎ মেঘের গাঢ় তমোরাশি গাঢ়তর! আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকৃতিকে হাস্যময়ী করিয়াছে।

উষা ও যামিনী সোপানে বসিয়া সরোবরের চঞ্চল ও ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ দেখিতে লাগিল—উভয়েই নির্ব্বাক! প্রকৃতির সে সময়ের মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিলেই জীব মাত্রেই বাহিরের বাক্য বন্ধ করিয়া অন্তরে তাহা অনুভব করিতে থাকে। ইহাকেই কি ধ্যান বলে?

উষাও যামিনী ধনবান গৃহস্থের কুল বধূ। উষা যামিনী অপেক্ষা ৮।১০ বৎসরের বড়। উভয়েই সুন্দরী বঙ্গীয় গৃহস্থ কুলবধুর ন্যায় সুন্দরী। উপন্যাস লেখকের কল্পনা প্রসূত অতুলনীয়া সুন্দরী নহে।

উষা গৌরাঙ্গী সে গৌরাঙ্গ দেখিলে হৃদয়ে অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভূত হয়! সে গৌরাঙ্গের কমনীয় কান্তি উষাকে সর্ব্বাংশে মহিমাময়ী করিয়া রাখিয়াছে। বয়স অনুমান ৩০।৩২। উষা ধনবানের কন্যা নহে, উষা জন্মিবার ৪।৫ বৎসর পরেই তাহার পিতামাতা পরলোকে গমন করেন এবং বিবাহের পর শ্বশুরঘর করিতে আসিবার পরই শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়। বালিকা অবস্থা হইতে

উষা শ্বশুর গৃহে থাকিয়া গৃহিণীপণা কার্য্যে সুদক্ষা হইয়াছিল। উষার চাহনিতে চঞ্চলতা নাই, উষার কথায় তীব্রতা নাই, বিধি ব্যবস্থায় পক্ষপাতি নাই। উষা গৃহিণীপনার ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহিতে অভ্যাস করিয়াছিল। উষা এ জ্বালাপূর্ণ মরু সংসারের সুমিষ্ট বারি এবং সুশীতল ছায়া।

যামিনী শ্যামাঙ্গী—কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি। যামিনী ধনবানের কন্যা—পিতামাতার বড় আদরের কন্যা। যামিনী যখন শ্বশুরঘর করিতে আসিল, তখন উষা পূর্ণ রূপে গৃহিণীপণার ভার লইয়াছে। পিতার সংসারের আদুরে মেয়েকে ছেলে বেলার অনেক কুঅভ্যাস ভুলিতে হইল। প্রথম প্রথম ইহাতে যামিনীকে একটু কষ্ট ভোগকরিতে হইত—সেকষ্ট উষা বুঝিতে পারিত; তাই সে এত যত্নে এতস্নেহে এবং এমন কৌশলে কার্য্য নির্ব্বাহ করিত যে, যামিনীর তাহাতে কষ্ট হইত না এবং সে রাগও করিতে পারিত না। অবশ্য যামিনীরও হৃদয়ে সুবীজ ছিল নচেৎ শুধু বাহিরের শিক্ষায় এতটা কুলায় না। অন্তরে সুবীজ এবং বাহিরে সৎসঙ্গ এ দুয়েরই সংযোগ আবশ্যক যামিনী সর্ব্বতোভাবে উষার "কথার ভিতর" ছিল, তবে ছেলে বেলার অভ্যাসে মাঝে মাঝে দু একটা ভুলও করিত।

বলিতে ছিলাম, দুইজনে বাঁধাঘাটে বসিয়া তাহদের প্রস্ফুটিত নয়নেন্দীবর মেলিয়া সরোবরের তরঙ্গ লীলা দেখিতেছিল, ঠিক যেন ধ্যান মগ্ন হইয়া দেখিতে ছিল, দেখিতে দেখিতে এমন অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তার পর সন্ধ্যা যেমন অন্ধকারের আবরণে সহসা ধরাবক্ষ ঢাকিয়া ফেলিল, তখন দুইজনের চমক ভাঙ্গিল উষা যামিনীকে বলিল—"যামিনী, সন্ধ্যা হল।" যামিনী কহিল—"চল দিদি, গা ধুয়ে ঘরে যাই।" উভয়ে জলে নামিল তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া ঘরে চলিল, যাইতে যাইতে যামিনী উষাকে বলিল, "দিদি একবার সেকথাটা বলনা।"

উষা। শোন বোন কলিকাতা হ'তে বড় দুঃসংবাদ এসেছে! তাই এঁরা দুই ভাই গেলেন। উষা যামিনীকে কলিকাতার কারবার সম্পর্কীয় অনেক কথা বলিল।

বলিতে বলিতে উষা একটু অন্য মনস্ক হইল, প্রাচীরের দ্বারপানে চাহিয়া রহিল, যামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছ দিদি?"

উষাকহিল—"যেন কার কাপড়ের আঁচল উড়ছে না? কে বুঝি লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছে।" উষা ও যামিনী একবার এধার ওধার দেখিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া সত্বর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইল, দীপ জ্বলিল। উভয়ে আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিল। সেই সময়ে যামিনীর পিত্রালয়ের পরিচারিকা আসিয়া উপস্থিত হইল, ঊষাও তাহাকে বিশেষ যত্ন করিল; কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া সে চলিয়া গেল।

ঊষা কহিল—"দেখ যামিনী ঠিক এই রংএর কাপড় বরুণা যা পরে এসেছিলো,আমি তখন উড়তে দেখেছি—আমার বোধ হ'চ্ছে,ও তখন লুকিয়ে ছিল। পরিচারিকার নাম বরুণা।

যামিনী। আশ্চর্য্য নয়, দিদি, আড়াশিপাতা অভ্যাসটা বরুণার বরাবর আছে।

ঊষা। আমি ভাই বরুণাকে চোখে দেখিনি তবে কাপড়টা একরকমের বলে মনে সন্দেহ হয়।

যামিনী। ও গিয়ে ঠিকমাকে শ্বশুরের দেনার কথা বল্‌বে এই শুনে মা একটা প্রমাদ করবেন। লাগান ভাঙ্গান বদ রীত বরুণার কিছুতেই গেলনা।

সহসা সেখানে মনোরমা আসিয়া উপস্থিত, সে ঊষার দিকে চাহিয়া কহিল,—"দুইজায়ে ব'সে কি কথা হ'চ্ছে ভাই।"

ঊষা কহিল,—"এসংসারে দুঃখসুখের কথা কত আছে বোন।"

মনোরমা ঊষার কাণেকাণে কি বলিল, ঊষা যামিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমরা যা বল্‌ছিলাম, তাই! বরুণা মনোরমার কাছে বসে কলিকাতার সব কথা বলে গেছে।" সকলেই বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রত্নেশ্বর নদের পশ্চিম তীরে উদয়পুরগ্রাম, এই গ্রামের দত্ত গোষ্ঠী বহু পুরাতন অধিবাসী ইহাঁরা বর্গীহাঙ্গামার সময়ে জাহানাবাদ অঞ্চল হইতে উঠিয়া আসিয়া এখানে উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন, ইহাঁদের গোষ্ঠীর বহু কীর্ত্তি দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের পুরাতন গোষ্টিদের নানা কীর্ত্তি কাহিনী একত্রে লিপিবদ্ধ হইলে পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস অপেক্ষা ইহা অপ্রসিদ্ধ হইবেনা— সম্প্রতি এ প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালের জমিদারগণের নিয়ম অনুসারে দত্তদের বাটি নির্ম্মিত, দ্বিতল প্রকাণ্ড বাটী; সদর কাছারী বাটী, অন্দরমহল, ঠাকুরবাটী, নাটমন্দির, অতিথিশালা এইরূপ নানা বিভাগে বাটীখানি বিভক্ত। শালগ্রামের নিত্যসেবা এবং প্রত্যহ ১০। ১৫ টী অতিথি সৎকার যথানিয়মে হইয়া থাকে।

সম্প্রতি বিশ্বেশ্বর দত্ত বাটীর কর্ত্তা, তিনি বাল্য কাল হইতে ব্যবসা বাণিজ্য ভাল বুঝেন বলিয়া জমিদারী বিক্রয় করিয়া সমস্ত টাকা তাঁহার কলিকাতার ব্যবসা বাণিজ্যে লাগাইয়া ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার রেশম পাট ও তুলার বড় কারবার, অনেক ইংরাজ ফরাসী ও জর্ম্মান সওদাগরের সহিত তাঁহার ব্যবসা সম্বন্ধ বহু লোকজন তাঁহার কারবারের কার্য্যে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। জমিদারী গুলি বিক্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু পাঁচ ছয় শত বিঘা লাখেরাজ, জমি বিক্রয় করেন নাই। তাঁহার দূর সম্পর্কীয় এক ভ্রাতৃ জামাতা নিমাই চাঁদ এই লাখেরাজ মহলের হিসাব নিকাশ রাখিয়া থাকেন। এই নিমাইয়ের স্ত্রী মনোরমা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ঊষা যামিনীর সহিত মনোরমার কথাবার্ত্তা পাটক মহাশয় অবগত আছেন।

সংসারে বিশ্বনাথের দুই পুত্র জিতেন্দ্রনাথ ও হিতেন্দ্রনাথ। হিতেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ট হইবার পরই বিশ্বনাথের সহধর্ম্মিণী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই অবধি বিশ্বনাথ আর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে দুইটী পুত্রকে সুবিদ্বান করিয়াছিলেন। দুই ভ্রাতাই বি,এ,গ্রাজুয়েট বুদ্ধিমান,বিনয়ী পিতৃভক্ত, পিতারই ন্যায় দয়ালু এবং কার্য্য কুশল। কলিকাতার ব্যবসা বাণিজ্য এবং দেশের বিষয় আশয় পিতা ও পুত্রগণ পর্য্যায় ক্রমে পরিদর্শন করেন।

বিশ্বনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্রনাথের রাধানগর গ্রামে পিতৃমাতৃহীনা সুলক্ষণা এক দরিদ্রা কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এইকৃষ্ণনগর গ্রামেই কনিষ্ঠ হিতেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল। হিতেন্দ্রনাথের শ্বশুর ধনবান কিন্তু আধুনিক ও কৃপণ

বিশ্বনাথের এই দুই পুত্রবধুই আমাদের এ ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার ঊষা ও যামিনী সংসারে অনেক গুলি দাসদাসী ; কিন্তু বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বিশ্বনাথের পিতার আমলের পুরাতন ভৃত্য বিপ্রদাস। দত্তবাড়ী ব্যতীত বিপ্রদাসের এ সংসারে আর কেহ ছিলনা। স্বয়ং বিশ্বনাথ বিপ্রদাসকে খুড়া সম্বোধন করিতেন, জিতেন্দ্র হিতেন্দ্র, ঊষা ও যামিনী বিপ্রদাসকে দাদা বলিয়া ডাকিত। বিপ্রখুড়ারই পছন্দমত বিশ্বনাথ ঊষা ও যামিনীকে পুত্র বধূ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা বিডন্ ষ্ট্রীটের একটী ত্রিতলগৃহে একদিন রাত্রে একটেবেলের দুই-পার্শ্বে তিনটী ভদ্রলোক নিস্তব্ধ ও গাঢ় চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, গৃহমধ্যে ইলেক্ট্রীক পাখা চলিতেছে, ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে, ফানুষ হইতে বিচ্ছুরিত কিরণ যেন কিছু ম্লান।

চিন্তামগ্ন ছিলেন, বিশ্বনাথ জিতেন্দ্রনাথ ও হিতেন্দ্রনাথ।

ক্ষণেক পরে বিশ্বনাথ বলিলেন—"শোন জিতু হিতু।"

জিতেন্দ্রনাথ সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন—"আজ্ঞাকরুন।"

বিশ্ব। যে জন্য তোমাদিগকে হঠাৎ আনিয়াছি, তাহা এখনও বলা হয়নি। এবার আমাদের বড়ই দুঃসময় দেখছি, আজ ৩। ৪ বৎসর যাবৎ আমি কোন কার্য্যেই সুবিধা করে উঠতে পাচ্ছিনা। তোমরা অবশ্যই তুলার বাজারের টেলিগ্রাম দেখছ ক্রমশঃই বাজার খাটতি হ'চ্ছে এরূপ যদি দিন কয়েক চল্‌তে থাকে, প্রতি গাঁট পিছু ১৲ হিঃ লোকসান হবে। আমরা এবৎসর একলক্ষ গাঁট সওদা ক'রে রেখিছি, একলক্ষ টাকা লোকসান। একেবারে সবটাকা দিতে পারিলে বাজার আমাদিগকে দশ হাজার টাকা দয়া করিবে। আর দুইহপ্তা পরে ডিউ এসম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি?

জিতেন্দ্র। ইহাতে আবার আমাদের কি মতামত আছে বাবা? আপনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।

বিশ্বনাথ। না বাবা ও কথা বলিলে তো চলিবে না। আমি পিতা বলিয়া আমার সব কথা অভ্রান্ত ভাবিলে চলিবেনা। তোমারা যোগ্য ছেলে বিশেষ বুঝিয়া বল এ ক্ষেত্রে বাজারের সহিত তোমাদের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

জিতেন্দ্র। যেরূপেই হউক বাজার সম্ভ্রম রাখা চাই।

বিশ্বনাথ। কেমন চাই— তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই তো? দেখ।

জিতেন্দ্র। কোন সন্দেহ নাই।

বিশ্বনাথ। পূর্ব্বে পাটে ও রেশমে জমি জায়গা বাড়ী ঘর বন্দক পড়েছে, এবার বিক্রয় হয়ে যাবে। পথে বা গাছ তলায় দাঁড়াতে হবে। কিন্তু বাড়ী ঘর বিক্রয় করিলেও এত টাকা উঠবে না।

জিতেন্দ্র। একলক্ষ টাকা যে কোনরূপে হউক উঠাইতে হইবে এবং তাহা উঠবে।

বিশ্বনাথ। কিরূপে উঠিবে?

জিতেন্দ্র। বড় বধূ ছোটবধূর গহনাপত্র, বাড়ী ঘর ষ্টেট পত্র জমি জায়গা বিক্রয়! কেমন হিতু?

হিতেন্দ্র। হাঁ দাদা, যেরূপে হউক বাজার দেনা মিটাইতে হইবে।

বিশ্বনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া উর্দ্ধে আকাশপানে চাহিয়া বলিলেন, "দয়াময় হরি তুমি সর্ব্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও পরম দয়াল তোমরুই

অসীম দয়াতে এই অমূল্য নিধি দুইটী পুত্ররূপে আমার গৃহ আলোকিত করেছে, দেখো প্রভু, ইহাদিগকে দীর্ঘজীবী করিও। বাবা জিতু হিতু, আর সময় নাই, তোমরা আজই প্রত্যূষে উদয়পুর যাত্রা কর। তোমরা যাইয়া টাকা সংগ্রহ কর, সুখে থাক। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক।

বিশ্বনাথের চক্ষুদিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। পুত্রগণের সৎসিদ্ধান্তে তিনি একান্ত পুলকিত। কয়দিন ভাবিয়াছিলেন, যদি পুত্রগণ তাঁহার সহিত একমত না হয়, তাঁহার হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লাগিবে।

বিশ্বনাথ বিশ্বপ্রভুকে ধন্যবাদ দিতেছেন, আর প্রেমাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। জিতেন্দ্রনাথ হিতেন্দ্রনাথ অধোবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, তাহাদের হৃদয়ের অবস্থা বিশ্লেষ করিয়া বুঝাইতে পারিব না।

বিশ্বনাথ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "বাবা জিতেন্দ্র এখানে সেখানে প্রায় ৫০টী লোক আমাদের পোষ্য, ইহারা দরিদ্র কোথায় যাইবে?

জিতেন্দ্র অধোবদনে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "বাবা ঈশ্বর দয়াময় আপনিই ধন্য তা নাহ'লে কি এসময়ে এ চিন্তায় আপনি আকুল হন? আমরা আপনার পুত্র হইয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি। ইহাদের সম্বন্ধে আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন।"

বিশ্বনাথ একেবারে আত্মহারা জ্ঞানহারার ন্যায় দুই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহারাও পিতার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত কলেবর হইয়া অশ্রুরাশিতে পিতৃচরণ সিক্ত করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সৃষ্টি ও সংহার তত্ত্ব আমি বুঝিতে পারিলাম না; কেনই বা উদ্ভব হয়, কেনই বা লয় পায়! কেন হয়, কেন যায়! শাস্ত্রকার, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এতত্ত্ব বহু প্রকারে বুঝাইয়াছেন।

পুরাণে বর্ণিত আছে, সমুদ্র মন্থনে অমৃত এবং হলাহল দুই উঠিয়াছিল, লক্ষ্মীরও উদ্ভব হইয়াছিল, বজ্রও জন্মিয়াছিল! একি সুর এবং অসুরের মন্থনের ফল, না সমুদ্রের ভিতর ভালমন্দ দুইই বীজরূপে লুকাইয়াছিল! যেখানে সু সেখানে কু! ভালর পাশেই মন্দ! আঁধারের পিছনে আলো! এ রহস্য কে বুঝাইবে?

আমরা এ ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাতে কু লইয়া বড় আলোচনা করিব না; তবে সুকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কুর অবতারণা করিতে হইবে। কোয়াসা কাটিয়া গেলে সূর্য্যের দীপ্তি বড় প্রখর হয়।

অধিক ভূমিকায় আবশ্যক নাই—আসল কথা লিখি ; বরুণাদাসী দত্তদের বাটী হইতে বাহির হইয়া রাত্রি একপ্রহরের সময় কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইল,—সে খুব দ্রুত চলিয়াছিল ; সে বোধ করি ভাবিতেছিল, তার পাখা থাকিলে আজ বড় সুবিধা হইতো সে গৃহিণীকে বিশ্বনাথদত্তর দেনার কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল।

যামিনীর পিতার নাম নটবর দে। পুরুষানুক্রমিক তেজারতি এবং বন্দকী কারবার লাখেরাজ জমি যায়গাও বিস্তর। বহু ব্যক্তি নটবরের নিকট ঋণ গ্রহণ করে। নটবরের নিকট ধার লইলে আর রক্ষা নাই ; সুদ, তস্য সুদ ধরিয়া ঋণ বহুকাল ব্যাপী হইবে। তবে নটবরের একটা গুণ ছিল, তিনি প্রায়ই আদালতের সাহায্যে টাকা আদায় করিতেন না। খাতকদের বাটীতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতেন। আত্মীয় লোককে টাকা ধার দিতে তিনি আদৌ ভালবাসিতেন না।

বলিতেছিলাম, বরুণাদাসী এক পা ধূলা লইয়া যেখানে নটবর পত্নী গৃহ মধ্যে বসিয়াছিল সেখানে উপস্থিত। গৃহিণীর জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই বরুণা আরম্ভ করিল,—"মাগো এবার সর্ব্বনাশ হ'ল।"

গৃহিণী উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সর্ব্বনাশ, কার সর্ব্বনাশ, খুলে বল মা, বরুণা।"

বরুণা মা, বেশী ভেবোনা, যামিনীর শ্বশুরের বুঝি সর্ব্বনাশ হ'লো।

গৃহিণী উঠিয়া আসিয়া বরুণার সম্মুখে বসিল।

বরুণা কহিল,—"শুনে আসচি, কল্‌কেতায় তোমার বেই য়ের লাখ টাকা দেনা হ'য়েছে।"

গৃহিণী। এ কি সত্য কথা।

বরুণা। সত্য মিথ্যে যমজানে কিন্তু কলকেতাথেকে এই রূপ চিঠি এসেছে তোমার জামাইরা দুভাই আজ কল্‌কেতা গেছে।

গৃহিণী। মিন্সের কপাল বড়ই মন্দ, আর মিন্সে নিজের ওজন বুঝেও চল্‌তে জানে না। এখন আমার টাকার উপায় কি হয়? কর্ত্তা আপনার লোককে কখনও টাকা ধার দেন না! কিন্তু কি গ্রহর ফের! আমারও মন হ'য়ে গেল আর যামিনীর শ্বশুর নিজে টাকাধার করতে এলো আমরা না দিয়ে থাক্‌তে পারলুমনা এখন উপায় কি?

বরুণা। কর্ত্তাকে উপায় করতে বল! তুমি জোর ক'রে টাকা চাওনা

কিছুতেই নরম হইওনা তোমার বেয়াই এসে নিজে বল্লেও যেন নরম হয়ে যেওনা।

গৃহিণী কিছুতেই না মা।

বরুণা। মা তুমি আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছ! তোমরা যামিনীকে ৩।৪ হাজার টাকার গহণা দিয়েছ ; এবার বুঝি গহণা গুলি সব যায়!

ইহা বরুণার অনধিকার চর্চ্চা।

গৃহিণী। সে গহণাতে আর আমাদের অধিকার কি মা!

বরুণা। আমি অত কথা জানি না মা। সে গহনা গুলি বাঁচাবার চেষ্টা করবেনা?

গৃহিণী। যদি পারিস্, চেষ্টা কর না মা। বরুণা আমি উপায় ঠিক করেছি! দেখি কতদূর কি হয়? যামিনী যে হাতের ভিতর নয়! ওর জায়ের হাতে কলের পুতুল! তবু দেখা যাক।

গৃহিণী। দেখ মা আমি তোর বুদ্ধিতেই দাঁড়িয়ে আছি।

বরুণা উঠিয়া গম্ভির ভাবে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, গৃহিণী বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। এই জগতের রঙ্গভূমিটা বড় মজার যায়গা, অভিনেতা, অভিনেত্রীরা জানে না,—ভাবেনা,এমন অনেক ব্যাপার দূরে অদৃশ্যে ঘটিতেছে! ব্যাধ কোথায় বসিয়া ফাঁদ পাতে, তা কে জানে। কিন্তু সুন্দর পাখীটী সরল প্রাণে উড়িয়া আসিয়া তাহাতে গলা বাড়াইয়া দেয়। ক্রমশঃ

সমালোচনা।

চিত্রাবলী।—সুবিখ্যাত মণিশঙ্কর গোবিন্দজী বৈদ্যশাস্ত্রীকে ও তাঁহার আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের নাম বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন, কবিরাজ৪৫২।০১৯৮ আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের অনেকগুলি শাখা ঔষধালয় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আদি ও শাখা ঔষধালয়গুলির ও উপরোক্ত কবিরাজ মহাশয় ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রাদির সুদৃশ্য হাফটোন চিত্র উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত করিয়া সম্প্রতি পুস্তকাকারে উত্তমরূপে বান্ধাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা একখণ্ড উপহার পাইয়াছি। এই চিত্রপুস্তক খানি দর্শন করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়, আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়গুলির প্রসারতা যথেষ্ট লাভ করিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় সকল বিষয়েই সৌভাগ্যশালী ; পুত্রগণ সকলেই সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য, জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত সুশিক্ষিত যুবক। তিনি আদি ও শাখা ঔষধালয় গুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। আমরা আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের আরও উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। | ১৩২০ সাল, অগ্রহায়ণ। | ৮ম সংখ্যা।

চিন্তা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিন্তে, তুমি কে? তুমি স্বর্গের কি নরকের তাহা জানি না। তবে পৃথিবী যে তোমার লীলাভূমি এইমাত্র জানি। তোমাকে হৃদয় হইতে এক কালীন নিষ্কাসিত করিয়া দেয় এরূপ লোক নিতান্তই বিরল। একজন তোমায় ভালবাসে, অপরে হয়ত তোমার নামে শিহরিয়া উঠে। চিন্তে, তোমায় আমি ভালবাসি। ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে যতটুকু ভালবাসা থাকিতে পারে, ততটুকু সবই আমি তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি। অনেকে বলে ভালবাসা মনের উত্তেজনা মাত্র—ক্ষণিকের জন্য; কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালবাসা সে রীতির নহে। ভূমিষ্ঠ হইয়া আমি তোমায় ভালবাসিয়া ছিলাম; বোধহয় তাহার পূর্ব্বেও ভাল বাসিতাম; এখনও ভালবাসি; পরেও বাসিব; ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণকালীন তোমাকে সঙ্গে লইয়া অনন্ত পথের পথিক হইব।

চিন্তে, আমি তোমায় ছাড়িব না; অন্ততঃ তোমায় ছাড়িবার শক্তি আমার নাই। তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমার অস্তিত্ব আমিই ভুলিয়া যাই, জগৎ ত ভুলিবেই। এস চিন্তে, আমরা দুইজনে অনন্ত কালস্রোতে ভাসিয়া যাই,—কেহ দেখিবে না, কেহ শুনিবেও না।

শাস্ত্রে আছে,—

"চিতা দহতি নির্জ্জীবং,
চিন্তা দহতি সজীবম্।
চিতাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে,
চিন্তা নাম গরীয়সী॥"

কি সর্ব্বনাশ! "চিন্তা দহতি সজীবং" চিন্তা সজীব বস্তুকে দগ্ধ করে? একথা শত সহস্রবার অস্বীকার্য্য। ভ্রমশীল মানবের ইহা একটী ভ্রান্ত বিশ্বাস। চিন্তা যদি মানবকে দগ্ধ করে, তবে দগ্ধ মানবকে সান্ত্বনা কে দেয়? মানব যখন শোকভারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, মানবের শিরে যখন ভীষণ ভাবে বিপদের করকাভিঘাত হইতে থাকে, মানবের উন্মুক্ত পৃষ্ঠে যখন দারিদ্রের নিষ্ঠুর কশাঘাত হইতে থাকে, মানব যখন এই বিশাল সংসারে মস্তক রক্ষার স্থানের জন্য ব্যাকুল হয়,—আশ্রয় পায় না, মানবের ক্ষুদ্র ভারাক্রান্ত জীবনতরী যখন আর চলে না, মানব যখন ভয়ে আত্মহারা হইয়া চক্ষুপল্লব মুদ্রিত করে, তখন কে তাহার অন্তশ্চক্ষুর সন্মুখে সুখের চিত্র স্থাপন করে, তখন কাহার অস্ফুট অভয়বাণীতে মানব হৃদয়ে সঞ্জিবনী শক্তির সঞ্চার হয়; মানব আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে; তখন তাহার অন্ধকার হৃদয়পুরে, আশার দীপ কে জ্বালিয়া দেয়; তখন কে তাহার হৃদয় মরুভূমে সুরম্য উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করে?

কিন্তু চিন্তার প্রতি শাস্ত্রকারগণের কি ভীষণ আক্রমণ! তাঁহারা অবলীলাক্রমে বলিলেন, "চিন্তা দহতি সজীবং।" ভাবিয়া দেখিলেন না,—যদি চিন্তা না থাকিত, তবে কোন বলে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশে সমর্থ হইতেন?

না, শাস্ত্রকারগণ ভ্রান্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা ঠিকই বলিয়াছেন, চিন্তা সজীব বস্তুকে দগ্ধ করে। মানবের চিত্ত যতই স্থির হউক না কেন, সামান্য মাত্র দুশ্চিন্তা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলে।

চিন্তে, তুমি বহুরূপী। কখন কি বেশে, কি উদ্দেশে আবির্ভূতা হও, তাহা কেহই জানে না। আমি তোমাকে চিনিতে পারিলাম না, বোধহয় জীবনব্যাপী

চেষ্টা করিয়াও পারিব না। কখন ভাবি তুমি অনিন্দ্য সুন্দরী, সুখপ্রদা, শান্তিময়ী,—আবার কখনও ভাবি তুমি কুৎসিতা, দুঃখদায়িনী, বিভীষিকাময়ী। এই দেখিতেছি, তোমার ছলনায় প্রতারিত হইয়া একজন আশায় বুক বাঁধিয়া কোন অজ্ঞাত সুন্দর পদার্থ পাইবার জন্য ধাবিত হইল। কিছুদূর যাইতে না যাইতে সে দেখিতে পাইল,—যাহার উদ্দেশে সে যাইতেছে, যে মনোহর বস্তুর লাভের জন্য সে উন্মত্ত ভাবে ছুটিয়াছে, তাহা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় দেখিতে দেখিতে কোথায় মিশাইয়া গেল, তাহার হৃদয়ে আশার দীপ নিবিয়া গেল। সে পশ্চাতে চাহিল,—তোমায় দেখিবার জন্য। সে কি দেখিল? তোমার সেই মোহিনী মূর্ত্তি সে আর দেখিতে পাইল না; তাহার পরিবর্ত্তে সে দেখিল, তোমার বিভীষিকাময়ী আঁধার প্রতীমা। সে কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না। সে আপনাকে ধিক্কার দিয়া পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। সেই অবস্থাতেই তাহার জীবনের সাধ মিটিয়া গেল। সে ভাবিল,—যখন হৃদয়বাসিনী চিন্তা এত প্রতারণাময়ী, তখন হৃদয়ের বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহাদের ত কথাই নাই। ছলনাময়ী চিন্তে, ইহা দেখিয়া কি বোধ হয় না যে তুমি নরকের?

আবার দেখিতেছি, তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একজন সুখের সংসার ভুলিয়া গেল। জগতে যাহা কিছু সুন্দর আছে, তাহাতে সে ভুলিল না। সংসারকে প্রতারণাময় জ্ঞান করিল। তোমার সাহায্যে সে এক অখণ্ড সুখ, নিরবচ্ছিন্ন আমোদ লাভ করিবার জন্য চাতকের ন্যায় দূর নীলিমার প্রতি চাহিয়া রহিল। তোমার সাহায্যে সে দেখিতে পাইল, মেঘের কোলে সৌদামিনী লইয়া প্রেমময় খেলা করিতেছেন। তোমার সাহায্যে সে দেখিতে পাইল, সাগরের বীচিবিক্ষোভিত বক্ষে লীলাময় আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। তোমার সাহায্যে সে দেখিতে পাইল, কুঞ্জবনে লতিকাপার্শ্বে কিশোর বালক পাখীর ডাকের সহিত বাঁশরীর সুর মিলাইতেছেন। তুমিই তাহাকে বুঝাইয়া দাও, জগতে যাহাকে লোকে সুন্দর বলে, তাহাই কালো, যাহাকে কালো বলে তাহাই সুন্দর। এই সব দেখিয়া মনে ভাবি,—তুমি কি নরকের? না, না, অসম্ভব। তুমি যদি নরকের হইবে তবে স্বর্গের কে?

আবার বলি চিন্তে, আমি তোমায় চিনিতে পারিলাম না। যখন তুমি হাসিতে থাক, তখন মানব হৃদয়ে সুখের হিল্লোল উঠে। তোমার হাসিতে সুর মিলাইয়া কবি বীণার ঝঙ্কার দেয়, বৈজ্ঞানিক বিশ্বহিতে তৎপর হয়,

ঊষা ও যামিনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রাতে যখন ঊষা ও যামিনী, মনোরমার সহিত কথা কহিতেছেন, তখন বিপ্রদাস আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কি যামিনীর বাপের বাড়ী যেতে হবে?

ঊষা কহিল,—"খাওয়া দাওয়ার পর যেও।"

বিপ্রদাস,—তোমরা কাল রাত্রে—ভাবনাতে কিছুই খেলেনা, বাবু শুন্‌লে কি বল্‌বেন?

মনোরমা। তুমি ও বিপ্রদাদা কাল রাত্রে উপবাস দিয়েছ।

ঊষা। কেন, মনোরমা, বিপ্রদাদাও কাল কিছুই খান নাই?

মনোরমা। একেবারে জল স্পর্শ নয়।

ঊষা ক্ষণেক স্থির হইয়া কি ভাবিল, পরে বলিল, "কেন বিপ্রদাদা, তুমি খেলে না কেন?"

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া আপন মনে কি বলিতে বলিতে বাহিরে গেল।

ঊষাকহিল,—"কাল আমরা খাইনি বলে, বিপ্রদাদাও কিছু খায়নি! আজ তাই সকাল বেলাই আমাদের খবরাখবর রাখছে! বিপ্রদাদা আর জন্মে দত্ত গোষ্টির কেও ছিল।"

অপরাহ্নের পূর্ব্বে বিপ্রদাস যামিনীর পিত্রালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময়ে বরুণাদাসী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। বরুণা আজ রঙ্গিণ কাপড় খানি পরে নাই;—একখানি সাদা ধপধপে কাপড় পরিয়া আসিয়াছে। তাম্বূলের রক্তিম রাগে অধর যুগল রঞ্জিত। বরুণা বিপ্রদাসকে দেখিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল "কিদাদা চূড়াধড়া পবে এমন সময়ে কোথা যাও?"

বিপ্রদাসও হাসিতে হাসিতে বলিল,—এই তোমারই সন্ধানে।

বরুণা। পোড়া কপাল আমার তুমি আবার আমার সন্ধানে যাবে?

বিপ্রদাস। বিশ্বাস না কর তো কি কর্‌তে পারি বল?

বরুণা। দাদা, রাগ কর্‌লে নাকি?

বিপ্রদাসও বরুণার দুই একটী রঙ্গরসের কথা হইল। শেষে আসল কথা বিপ্রদাস জানিল যে, বরুণা যামিনীকে লইতে আসিয়াছে। বিপ্রদাস একেবারে রাগ করিয়া বরুণাকে দুএকটী কথা (কড়াগোচ) শুনাইয়া দিল, যামিনীকে কিছুতেই পাঠান হইবে না বলিল।

বরুণা কহিল,"আচ্ছাদাদা কুটুম্বের অপমান করে না পাঠাও এম্নি ফিরে যাব। বরুণা অনেক ছল জানে।

বিপ্র। আমি তো ফিরে যেতে বলছিনা,তবে যখন তখন নিয়ে যাওয়া আমার মনিব পছন্দ করেন না।

এই ভাবের কথা উষারও কাছে বরুণা শুনিল। বরুণা আর বেশী কথা কহিল না। মুখের স্বাভাবিক হাসি ঢাকিয়া মুখবিবন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উষা সবদিক ভাবিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া যামিনীকে পাঠাইয়া দিল। যাইবার সময় যামিনীকে নিভৃতে ঘরের এককোনে লইয়া যাইয়া কহিল,—"যামিনী আজ, আমার তোমাকে পাঠাইতে মন সরে না, কেবল ভয়ে পাঠাইলাম। দেখো বোন, আমি যেন তোমার জন্য কাঁদিয়া আকুল না হই।"

উষার চক্ষু জলভারাক্রান্ত—"যামিনীও কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কিতে উঠিয়া পিত্রালয়ে গেল।

যামিনীর চোখে জল দেখিয়া বরুণা তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল,—"মোর সব উল্টাধারা! আমরা শ্বশুর ঘর করতে গেলে কান্নার চোটে পাড়া মাথায় করতুম। এখনকার সব বউ বাপের বাড়ী যেতে গেলে ফুঁপিয়ে কাঁদে।"

পাল্কি যখন দত্তদের সীমার অন্তরালে গিয়া পড়িল, বরুণা তখন শূন্যমার্গে তর্জ্জনী হেলন করিয়া আপনা আপনি কহিল,—"এবার তো এক চাল চেলে দিলুম দেখি কোথাকার জল কোথায় মরে।"

বোধকরি বরুণার এসময়কার ভাব ভঙ্গি ও কথাবার্ত্তা আর কেহ—জানিতে পারিলনা; কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ প্রকৃতির নির্ম্মল শূন্যময় কলেবরে একটা রেখাপাত করিয়া রাখিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মেঘাবৃত অন্ধকারময়ী রজনী! ঘন তামস রাশি বিশ্বজগৎ গ্রাসকরিয়াছে—; মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে; প্রবল বায়ু আকাশে অনন্ত মেঘরাশি-মধ্যে নানা উপদ্রব করিতেছে, এবং ধরিত্রীর উপর কখনও নদীবক্ষে অনন্ত তরঙ্গ তুলিয়া কাচদ্বাঘন বিন্যস্ত শ্রেণী বদ্ধ অশ্বত্থ ও তাল বৃক্ষের অভ্যান্তরে নানারূপ গর্জ্জন করিতেছে।

এইরূপ সময়ে রত্নেশ্বর নদের খেয়াঘাটে একটী বৃদ্ধ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া, সম্মুখে একটী লণ্ঠন রাখিয়া বসিয়া রহিয়াছে। লণ্ঠনের ভিতর সেই ক্ষুদ্র দীপ শিখার অধিকার, নিশীথে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে, সমীরণ তাড়নে কম্পিত হইতেছে; মনুষ্য যেমন বিপৎপাতে কম্পিত হয় এও সেইরূপ কম্পিত হইতেছে।

বৃদ্ধ নদীর পানে দৃষ্টিপাত করিল; গাঢ় অন্ধকার ব্যতীত কিছুই নয়নগোচর হইল না; জল রাশির অনন্ত কল কল শব্দ ব্যতীত কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না। বৃদ্ধ উর্দ্ধে গগনপানে চাহিয়া দেখিল, সেখানেও রাশি রাশি অন্ধকার একটী মাত্র নক্ষত্র দৃষ্টি গোচর হইলনা; কত রাত্রি হইয়াছে, সে অনুমান করিতে পারিল না বৃদ্ধ নিরাশ হইয়া আপনাআপনি কহিল,—"এখনও নৌকা আসিলনা কেন?"

আবার কতক্ষণ কাটিয়া গেল, সহসা যেন মনুষ্যের পদশব্দ বৃদ্ধের কর্ণে গেল, সে লণ্ঠন হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রত্নেশ্বরের তীর ভূমি বড়ই উচ্চনীচ; প্রায়সর্ব্বত্র অসমানভূমি কোথাও কতকাংশ পরিস্কৃত কতকাংশ বন্য লতাগুল্মে আবৃত বৃদ্ধ লণ্ঠন উত্তোলনকরিয়া চারিদিক দেখিল; কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে শূন্য মার্গে চীৎকার করিয়া ডাকিল "পার ঘাটে কে আসে হে?" নেপথ্যে কে উত্তর দিল—"বিপ্রদাদা কোথায় আছে? আমি অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করিতে পারিতেছি না।"

বৃদ্ধ বাটীর পুরাতন ভৃত্য বিপ্রদাস।

বিপ্রদাস সজোরে উত্তর দিল— 'আমি খেয়াঘাটে আছি নিমাই চাঁদ।"

হুহুকরিয়া জোর বাতাস আসিয়া বিপ্রদাসের নাকে মুখে ঢুকিতে লাগিল; সে তৎক্ষণাৎ আলো ঘুরাইয়া ধরিল—নিমাই চাঁদ সেই আলোকধরিয়া বিপ্রদাসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিপ্রদাস নিমাইচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিল,—"নিমাই এখনও কেন নৌকা এলনা?"

নিমাই। আমারও বড় ভাবনাহচ্ছে!— বাড়ীতে মেয়েরাও বড় ভাবছে তাই আমি আসছি। রাত্রি প্রায় ১টা বাজে। তবে আজ নদীতে বান পড়েছে একটানা পাও! তাই বোধ হয় নৌকা উঠতে দেরী হচ্ছে।

নৈশঅন্ধকারে রত্নেশ্বরের তরঙ্গ ভঙ্গলীলা দৃষ্টি গোচর হইতেছেনা কিন্তু বহুদূর হইতে কলনাদ শ্রুতি গোচর হইতেছে। বিপ্রদাস ও নিমাই চাঁদ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; সহসা সেই নদী তরঙ্গের কল কল ধ্বনিমধ্যে ক্ষেপনীর শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

বিপ্রদাস। ঐ যেন দাঁড়ের শব্দ না? বোধকরি এইবার আসছে।

নিমাই। দেখ দাদা।

ধীরে ধীরে একখানি নৌকা আসিয়া খেয়া ঘাটে লাগিল; ভিতর হইতে কে একজন কহিল,—"কে বিপ্রদাস নাকি?" ওকে নিমাই ভায়া এসেছ?

বিপ্রদাস আলো লইয়া নৌকার ধারে আসিল, নৌকার ভিতর হইতে জিতেন্দ্র ও হিতেন্দ্র দুই সহোদর বাহিরে আসিলেন।

বিপ্রদাস। এত রাত্ত হ'য়ে গেল?

জিতেন্দ্র। নদীতে বান পড়েছে—ভয়ানক জোরে জল নাবছে অতি কষ্টে নৌকা উঠ্‌লো।

জিতেন্দ্র ও হিতেন্দ্র, বিপ্রদাস ও নিতাইচাঁদের সহিত বাটীতে উপস্থিত হইলেন; তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে; তাঁহারা যৎ কিঞ্চিৎ আহার করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া জ্বর।

আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।

লেখক,—আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাতীর্থ কবিরাজ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ বি, এ, এল, এম, এস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

করা সাধ্বীলক্ষ্মী ও শ্রীসম্পন্ন সংস্কৃত শব্দের এমন অর্থ করিয়া বসি যে, বিজ্ঞান তাহা শুনিয়া হাসে; এবং আমাদিগকে, "কোয়াক্" বা হাতুড়ে বলিয়া গালি দেয়।

আয়ুর্ব্বেদের ভূতবিদ্যা বড় উচ্চদরের বস্তু। প্রত্যক্ষের পতাকা ইহার শীর্ষদেশ সুশোভিত করিয়া দণ্ডায়মান। এই ভূতবিদ্যার সমুন্নত বিজ্ঞানমঞ্চে দাঁড়াইয়া ভগবান শৈশব অবস্থায় জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন, পুতনা অহিপুতনা প্রভৃতি বালরোগ ভূতাভিষঙ্গোত্থ। যৌবনে প্রত্যক্ষের জয় পতাকা হস্তে করিয়া ভূতযোনি লইয়া একে একে

উষ্ণরক্ত

১। ঘোটক	৬। হস্তী	১১। পত্র	১৬। পর্ব্বত
২। উষ্ট্র	৭। ব্যাঘ্র	১২। ফুল	
৩। গর্দ্দভ	৮। ময়ূর এবং শীতরক্ত	১৩। ফল	
৪। মহিষ	৯। সর্প	১৪। ভূমি	
৫। গো	১০। বৃক্ষ	১৫। জল	

প্রভৃতি প্রতি বস্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করেন,

জ্বরের ভূতাণু

ত্রিপাদ, ত্রিশিরা, ষড়ভুজ, নবলোচন, ভস্মপ্রহরণ এবং

(সম্ভবতঃ Colourdel plate-এ)

বৈয়াঘ্রচর্ম্মবসন।

তারপর নিজদেহেও পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন, ইহা সর্ব্বত্রই সন্তাপ লক্ষণ হইলেও মানবদেহে শীতজ্বর এবং উষ্ণজ্বর ভেদে দ্বিবিধ আকারে প্রকাশিত হয়, ও বিষমজ্বরের আকার ধারণ করে। অবিরাম ও সবিরাম জ্বরমাত্রেই স্থিরীকৃত হয়, যে তাহা ভূতাভিষঙ্গোত্থ এবং বিষমজ্বর।

পূর্ব্বে বৈদিক প্রাচীন ঋষিদিগের জ্বরের নিদান পূর্ব্বকাসংপ্রাপ্তি ছিল,—

মিথ্যাহারবিহার ও

বাতাদি দোষ;

তাঁহাদের জ্বরের বিভাগ ছিল,

পৃথক্—

দ্বন্দ
সন্নিপাতিক এবং
আগন্তুজ।

চিকিৎসা ছিল,—রক্তমোক্ষণ বমন ও বিরেচন প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্ম। তাঁহাদের যাহা যাহা ছিল, এদেশে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আধিপত্য বিস্তারের প্রারম্ভে ডাক্তরী হাঁসপাতালেও ঠিক তাহাই ছিল। এক মাসে জেনারাল হাঁসপাতালে,—আমার ঠিক মনে নাই, প্রায় ১০ হাজার গ্রেণ কি অধিক ক্যালোমেল খরচ হয়, জ্বর চিকিৎসায় কেবল বিরেচনার্থ। তা ছাড়া রক্তমোক্ষণ তাহারও সীমা ছিল না।

বমন, চিকিৎসার অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। তাঁহাদেরও ধারণা ছিল, দুর্জ্জল বা আর কিছু এদেশের জ্বরোৎপত্তির মূলে দণ্ডায়মান। ভাবপ্রকাশে যে দুর্জ্জল জনিত জ্বরের কথা আছে, মনে হয়, ইহা এই প্রাচীন প্রতীচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্ গণের নিকট হইতে ধার করা।

বেশাদিনের কথা নহে, "কোয়েনের" পুরাতন "ডিকসানারী অফ মেডিসিনে দেখিবেন, ম্যালেরিয়ার ভূতাভিষঙ্গোথত্ব লইয়া কত রঙ্গ রস চলিয়াছে, এমন কি আমরা যখন মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করি, তখনও এই ভূতাভিষঙ্গোত্থের কথা ভালরূপে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু আজ কি দেখিতেছেন, দেখিতেছেন বিজ্ঞান মঞ্চের শীর্ষ দেশে ভূতবিদ্যা জয় পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান।

জ্বর, বিসর্প, হাম, অপস্মার, প্রবাহিকা, উপদংশ
যক্ষ্মা, বিস্ফোটক, বসন্ত, ধনুষ্টঙ্কার, গ্রহিণী, প্রমেহ

সব এক গোড়ে গোড়্। ভূতাভিষঙ্গোত্থের গভীর হুঙ্কারে বিজ্ঞানের রঙ্গমঞ্চ আজ প্রকম্পিত। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখুন, খুব কম হইলেও পাঁচ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে এই ভারতে এমন এক অসাধারণ ধীসম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন, যাহার অমিত প্রতিভায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল,—এদেশের জ্বর মাত্রেই ভূযাভিষঙ্গোথ।

"কেচিৎ" শব্দে অভিহিত এই দল, তাই বলিয়াছি, কেবল ভেড় ভালুকী বাণ পুষ্কলাবতকে লইয়া পর্য্যবসিত হয় নাই। এই দলের নেতা যিনি— এই মতের সংস্থাপক যিনি—তিনি অন্যান্য গুণে যেমন ভুবন বিজয়ী, তেমনি দর্শনও বিজ্ঞানের দিক দিয়াও ভুবন বিজয়ী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিষমজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর একই কথা। আয়ুর্ব্বেদের জ্বর, চরক সুশ্রুত না বলিলেও, আমরা আমাদের ইহকাল পরকালের নিয়ন্তা ঐ শ্যাম স্নিগ্ধ জ্যোতির

প্রতি চাহিয়া বলিতে পারি, বিষমজ্বর বর্ণে বর্ণে; ম্যালেরিয়া জ্বরেরই সংবাদ। ইহার সংখ্যা সংপ্রাপ্তি, ইহার নিদান, ইহার উপশয়, ইহার চিকিৎসা, ইহার উৎপত্তির ইতিহাস,—

ম্যালেরিয়ারই ইতিহাস,
ম্যালেরিয়ারই সংখ্যা,
ম্যালেরিয়ারই সংপ্রাপ্তি,
ম্যালেরিয়ারই নিদান,
ম্যালেরিয়ারই চিকিৎসা।

আমরা ভুলক্রমে বুঝি, জ্বর অষ্টধা—পৃথক্, দ্বন্দ, সন্নিপাত ও আগন্তুক। ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া দেখিলে এরূপ দেখা যায়, সত্য, কিন্তু মূল বিভাগ যাহা, তাহাতে বলে, জ্বর বিষমজ্বর, আর বিষমজ্বর যাহা তাহা

সন্তুতক
সততক
অন্যেদ্যুষ্ক
তৃতীয়ক এবং
চতুর্থক রূপেই দণ্ডায়মান;

আর তাহারই বিভাগ—

অষ্টধা
সপ্তধা
পঞ্চধা
দ্বিবিধ
ত্রিবিধ
চতুর্ব্বিধ।

মাধবের অষ্টধা বিভাগ প্রথমেই না পড়িয়া; যদি আমরা চরকের বিজ্ঞান সূত্রটি আগে পড়িতাম, তাহা হইলে, জ্বর চিকিৎসায় ডাক্তারেরা যে আমাদিগকে আজ কোণ ঠেশা করিয়া অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গাল করিয়া তুলিতেছেন, তাহা পারিতেন কি? জ্বরচিকিৎসা যে আমাদের হাত হইতে একরূপ বাহির হইয়া গিয়াছে, কথায় কথায় যে ইহার জন্য এদেশের লোক ডাক্তার খুজিয়া বেড়ায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অমৃতত্ত্ববিদ্ বলিয়া গালি দিয়া তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্তে আমাদের এই শাস্তি!

এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের যে শেষ নাই, তাহা নহে। এখন হইতে আমাদিগকে জ্বর চিকিৎসা এমনভাবে করিতে হইবে, যাহাতে আমরা বিস্মৃত না হই, সেই দেববাক্য সেই— দেবকথা, যাহাতে লেখা আছে—

"কৃষ্ণ কহিলেন, জ্বর যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে প্রণাম করিয়া, এই সমরপ্রকটিত তোমার ও আমার পরাক্রম বিষয় পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি বিগত জ্বর হইবে।"

ফলকথা বিগতজ্বর হইতে হইলে, ভগবানের পরিকল্পিত এই জ্বর বিবরণ আমাদের সকলের পাঠ করা উচিত। আয়ুর্ব্বেদের জ্বর চিকিৎসা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এখন হইতে তাঁহার প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হউক! যাহাতে ভূতাভিষঙ্গ নিবারিত হয়, তাহার চেষ্টা আমাদের জ্বর চিকিৎসার প্রথমে হউক! মধ্যে হউক! এখন হইতে সর্ব্বাগ্রে ইহার সমাচরণ করিতে হইবে!

শুধু চিকিৎসায় নহে, আমাদের অধ্যয়নে যেন আমরা বুঝিতে পারি—

জ্বর পঞ্চবিধ

যথা— সন্ততক

সততক

অন্যেদ্যুষ্ক

তৃতীয়ক এবং

চতুর্থক, কিম্বা ইহাদের বিপর্য্যয়।

বিধিভেদে দ্বিবিধ— যথা

শারীর	কিম্বা	মানস
সৌম্য	"	আগ্নেয়
অন্তর্ব্বেগ	"	বহির্ব্বেগ
সাম	"	নিরাম
সাধ্য	"	অসাধ্য।

ব্যাপ্তিভেদে ত্রিবিধ— যথা

তরুণ

মধ্য

জীর্ণ।

সাধ্যাসাধ্যভেদে চতুর্ব্বিধ— যথা

মৃদুসাধ্য

কৃচ্ছ্র সাধ্য
যাপ্য
অসাধ্য।

ধাতু বিশেষের আশ্রয়ভেদে সপ্তবিধ— যথা

রসস্থ
রক্তস্থ
মাংসস্থ
মেদস্থ
মজ্জাস্থিত
অস্থিগত
শুক্রগত

এবং ভিন্নকারণ ভেদে অষ্টবিধ— যথা

বাতিক
পৈত্তিক
শ্লৈষ্মিক
বাত পৈত্তিক
বাত শ্লৈষ্মিক
পিত্ত শ্লৈষ্মিক
সান্নিপাতিক ও
আগন্তুজ।

অর্থাৎ প্রথম বিভাগ বিষমজ্বর ধরিয়া; তাহার পর তাহার উপর অপরাপর বিভাগ। মূলে জ্বরকে বিষম জ্বর বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। তার পর সাধ্য ও অসাধ্যের কথা, বাতিক পৈত্তিকের কথা, অন্তর্ব্বেগ বহির্ব্বেগের কথা, শীত উষ্ণের কথা, রসস্থ রক্তস্থের কথা। মূলে জ্বরকে পৃথক, দন্দ্ব, সান্নিপাতিক ধরিয়া খেই হারাইয়া, পরে বিষমজ্বর বলা আয়ুর্ব্বেদের মতে ঠিক না হইলেও, পৌরাণিক মতে ভ্রান্তি। ভ্রান্তি না হইলে, কবিরাজদিগকে জ্বর চিকিৎসায় এমন করিয়া পরাজয় মানিতে হইবে কেন?

তাই বলিতেছি, এখন হইতে মাধবনিদানে জ্বরাধ্যায়ের "দক্ষাপমান সংক্রুদ্ধ" প্রভৃতি না পড়িয়া, তাহার স্থলে, পরিপঠিত হউক——

"দ্বিবিধো বিধিভেদেন জ্বরাঃ শারীর মানসাঃ।

পুনশ্চ দ্বিবিধো দৃষ্টঃ সৌম্যাশ্চাগ্নেয় এবচ॥
অন্তর্ব্বেগো বহির্ব্বেগো দ্বিবিধ পুনরুচ্যতে।
প্রাকৃত বৈকৃতশ্চৈব, সাধ্যাশ্চাসাধ্য এবচ॥
পুনঃ পঞ্চবিধো দৃষ্টঃ দোষকালবলাবলাৎ।
সন্ততঃ সততোঽন্যেদ্যু স্তৃতীয়ক চতুর্থকৌ॥
পুনরাশ্রয়ভেদেন ধাতুনাং সপ্তধা মতঃ।
ভিন্ন কারণ ভেদেন পুনরষ্টবিধোজ্বর॥

এতগুলি শ্লোক পড়িয়া, তার পর পড়িতে হইবে, মাধবের সেই অসম্পুর্ণ শ্লোকসকল যাহাতে আছে, শেষের কথা আগে, আগের কথা শেষে—আছে

জ্বরোষ্টধা পৃথক্
দ্বন্দ্ব
সংঘতা
গন্তুকঃ স্মৃতঃ।

এ কথা যেমন সব শেষের কথা তেমনি, "পুনঃ কারণ ভেদেন" এই বাক্য সমাযুক্ত না হওয়ায় অসম্পূর্ণ ঋষিবাক্য। ফলতঃ এতক্ষণ আমি জ্বরের যে বিভাগের কথা বলিতেছি, ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে,—ইহার সম্প্রাপ্তি সত্য হইবে।

পেরু দেশের "সিন্‌কোনা বার্ক" আমরা অগে পাই নাই বলিয়া, আমাদের লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। আমাদের জ্বরের Pathology ঠিক হইলেই বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চয়ই জয়!

বিষমজ্বর ধরিয়া জ্বরের পূর্ব্বোক্ত বিভাগ পরিকল্পনা করিলে সন্ততক জ্বরের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া প্রথমতঃ একটু গোলোযোগ ঘটিতে পারে, কিন্তু সে গোলযোগ আয়ুর্ব্বেদ নিজেই মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

সন্ততক জ্বর বিষমজ্বর কি না, এই প্রসঙ্গ লইয়া যে বাদানুবাদ ও সিদ্ধান্ত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে আমরা দেখি, তাহা আপনারা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন।

এই বাদানুবাদে মহর্ষি পুনর্ব্বসু একদিকের নেতা, আর একদিকের নেতা—মহামতি খরনাদ। খরনাদ বলেন, সততক, অন্যেদ্যুঃ, তৃতীয়ক, চাতুর্থক কিম্বা তদ্বিপর্য্যয়ই বিষমজ্বর। বিষমজ্বর চারিটি; সন্ততজ্বর বিষমজ্বর নহে। তাঁহার কথাগুলি এই—

জ্বরাপূর্ব্বং ময়োক্তা যে
পঞ্চ সন্ততকাদয়ঃ
চত্বারঃ সন্ততং হিত্বা
জ্ঞেয়াস্তে বিষমজ্বরঃ॥

সন্ততকে, বিষমজ্বর না বলিবার কারণ, তিনি বলেন, মুক্তানুবন্ধিত্ব লইয়াই বিষমজ্বর, কিন্তু সন্ততজ্বরে মুক্তানুবন্ধিত্ব কোথায়? বিজয় তাঁহার কথাগুলির প্রতিধ্বনি স্বরূপ লিখিয়াছেন,—

যদুক্তং খরনাদেন জ্বরঃ ইতি
তৎ সন্ততে মুক্তানুবন্ধিত্বস্য
একদা ভাবিত্বাদল্পত্বাচ্চ ন তদ্ব্যপদেশঃ
একতণ্ডুলাভ্যবহারোঽনশনশব্দস্য ব্যপদেশাৎ।
ন তৃতীয়কাদিবৎ আবৃত্ত্যা মুক্তানু
বন্ধিত্বমস্তেতি অভিপ্রায়েন দ্রষ্টব্যঃ।

অর্থাৎ মুক্তানুবন্ধিত্ব—যাহা বিষমজ্বরের লক্ষণ, সন্ততজ্বরে তাহার সঙ্গতি নাই মুক্তত্ব অনুবন্ধিত্ব এখানে কোথায়? মুক্তত্ব থাকিলেও এই মুক্তত্ব ও অতি অল্প; সুতরাং এক তণ্ডুল ভক্ষণ যেমন অনশনেরই ভিতর,— সেইরূপ সন্ততঃ জ্বরে মুক্তত্ব— অমুক্তত্বই।

তৃতীয়কাদি জ্বরে যেরূপ মুক্তানুবন্ধিত্ব আবৃত্তিপরায়ণ, এখানে সেরূপ আবৃত্তি না থাকায়, ইহা বিষমজ্বর বলিয়া কখনই পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, জ্বর একদিকে অবিসর্গী—সন্ততক এবং অন্যদিকে বিসর্গী সতত, অন্যেদ্যুঃ, তৃতীয়ক, চতুর্থক ভেদে চতুর্দ্ধা বিভক্ত। সন্ততজ্বর একদিকে আর একদিকে আবৃত্তিপরায়ণ মুক্তানুবন্ধিসততকাদি " চত্বারঃ। ” জ্বরের একদিকে অবিরাম জ্বর, আর এক দিকে সবিরাম জ্বর। চরকের মত পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বিষমজ্বর বলিতে

সন্ততক
সততক
অন্যেদ্যুঃ
তৃতীয়ক ও
চাতুর্থক

এই পঞ্চবিধ জ্বরই গ্রহণ করিয়াছেন।

বিজয় চরকের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, চরক সন্ততকে বিষমজ্বর বলিবার পূর্ব্বে, দেখাইয়াছেন যে সন্তত জ্বরেও মুক্তানুবন্ধিত্ব আছে।

"অন্যৈন তথা ভাবাৎ তল্লক্ষণে চরকঃ——

বিসর্গং দ্বাদশে কৃত্বা
দিবসেব্যক্ত লক্ষণঃ
জ্বর্ভোপশমঃ কালং
দীর্ঘমপ্যনুবর্ত্ততে ॥"

অর্থাৎ দ্বাদশ দিবসে সন্তত জ্বর একবার স্পষ্ট ছাড়িয়া যায়,— গিয়া দীর্ঘ-কাল ধরিয়া আর উপশম হয় না—ভোগ করিয়া থাকে। যখন স্পষ্ট ছাড়িয়া আবার ভোগ হয়, তখন মুক্তানুবান্ধিত্ব একবারে নাই, একথা বলা চলে না।

"মুক্তনুবন্ধিত্বং বিষমত্বং
তচ্চাত্র নাস্তি —নৈবং।"

জ্বরের সংজ্ঞায় সন্ততজ্বরকে ফেলিতে গিয়া আয়ুর্ব্বেদে এই বাদানুবাদ,— ইহা অতীব সমীচীন। মহর্ষি পুনর্ব্বসু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য এবং খরনাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য। উভয়ের মতই সত্য, অথচ পরস্পরে মিল নাই, এমন ঘটনা হইতে পারে কি? হইতে পারে বলিয়াই বলিতেছি, আয়ুর্ব্বেদে সন্ততক জ্বর লইয়া এই বাদানুবাদ অতীব সমীচীন। কেবল সমীচীন নহে, এ দেশের চিকিৎসকগণের সূক্ষ্মদর্শিতারই ইহা বিশেষ পরিচায়ক। মোট কথা, এইরূপ বাদানুবাদ আছে বলিয়াই, আমরা বলিতে বাধ্য, সন্ততক জ্বর এবং সততকাদি চতুর্ব্বিধ জ্বর উভয়েই বিষমজ্বর। উভয়েই ম্যালিরিয়া বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্যও আছে। সে পার্থক্য, সন্ততকজ্বর যে ভূতবিশেষের অনুষঙ্গে সমুৎপন্ন— সততকাদি সে ভূতবিশেষের অনুষঙ্গে সমুৎপন্ন নহে।

সততকাদি জ্বরের Parasite আর সন্ততকাদি জ্বরের Parasite প্রত্যক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, পরস্পর বিভিন্ন।

ডাক্তারেরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ পার্থক্য উভয়ের জাতি বিশেষের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া সততকাদিকে অবৃত্ত্যা মুক্তানুবন্ধিত্বপরায়ণ বা Regularly Intermittent fever এর শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, সন্ততজ্বর Irregularly intermittnt or remittent or bilious remittent or Pernicious Malaria— এক কথায় Æstivo-Au-

tumnal Fever বা ঋতু বিপর্য্যয়হেতু—অতীব ভয়াবহ অবিসর্গী জ্বর।

আয়ুর্ব্বেদের মতে যেমন সততকাদি চতুর্ব্বিধ জ্বর, এক হইতে অন্যে পরিণত হইতে পারে, ডাক্তারেরাও ঠিক সেই কথাই বলেন; তাঁহাদের মতে, সততকাদি জ্বর যে সন্তত জ্বরের আকার ধারণ করিতে পারে না, তাহার কারণ সন্তত জ্বরের Parasite সততকাদি জ্বরের Parasite হইতে ভিন্ন জাতীয়। তবে বিসর্গী জ্বর ক্রমে অবিসর্গী হইয়া যাইতে পারে। অবিসর্গী হইলেও ইহার ভূতাভিষঙ্গে সন্তত জ্বরের ভূতযোনি হইতে ভিন্ন জাতীয়। সতত জ্বরের Parasite এর নামের আগে—Benign বিশেষণ, সন্তকজ্বরের Parasite এর নামের আগে বিশেষণ Malignant

আয়ুর্ব্বেদে সততকাদিজ্বর কেন নিয়ম পূর্ব্বক ভোগ করে ও ত্যাগ পায়, তাহার কারণ প্রদত্ত হইয়াছে। ডাক্তারেরাও ইহার নিয়মে সেইরূপ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন।

মোটকথা, প্রতীচ্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান বহুপরিশ্রম ও বহুগবেষণার পর, আজ কয়েক বৎসর হইল ম্যালেরিয়া বা বিষমজ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদে ঠিক সেই সিদ্ধান্ত—সেই কথা—সেই রস রক্তাদি আশ্রয়,—সেই নিয়ম পূর্ব্বক জ্বরের অভিব্যক্তি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সবই একরূপ।

আমরা বিষমজ্বরকে ম্যালেরিয়া বলিয়া না বুঝায়, এতদিন, এত গোলযোগ ঘটিয়াছে। বিষমজ্বর আর জীর্ণ, পুরাতন, পুনরাবৃত্ত জ্বর এক মনে করায় এ কুফল। এখন হইতে বিষমজ্বরকে ম্যালেরিয়া মনে করিতে হইবে, করিলে কুইনাইন প্রয়োগ না করিয়াও আমরা আমাদের স্বদেশ সঞ্জাত দ্রব্যগুণে তরুণ জ্বর, মধ্য জ্বর, জীর্ণ জ্বর, দূরীভূত করিয়া ডাক্তারদিগের মত বিজ্ঞান ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইব।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা এ দেশে প্রচলিত হইবার সঙ্গে যে সকল খ্যাতনামা ডাক্তার জ্বর চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া এই প্রবল ব্যাধির আক্রমণ হইতে এ দেশবাসিদিগকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়েন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল ব্যক্তি কোন্ কোন্ সময়ে এ দেশে অবস্থিতি করিয়া জ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতা কি ভাবে ব্যক্ত করেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে প্রদান করিতেছি:—

১৭৫৭ খৃঃ ——১৮০৪ খৃঃ

জেমস লিনডে—জন ক্লার্ক এবং উইলিয়ম হণ্টার নামক তিনজন ডাক্তার জাহাজের কর্ম্ম লইয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এদেশে আগমন করেন। ইহাদের আগমনের পূর্ব্বে সিঙ্কোনা বার্কের আবিষ্কার হয়। স্পানিয়ার্ডগণ ১৬৩২ খৃঃ পেরু হইতে এই ঔষধ ইয়ুরোপদেশে আনয়ন করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে জ্বর চিকিৎসায় সিঙ্কোনা প্রথম ব্যবহৃত হয়। তখন ইহার নাম ছিল জেসুইট বার্ক। মিসনারীগণ নানা দেশে এই বার্ক দিয়া জ্বর আরোগ্য করিতে আরম্ভ করেন। ডাক্তার বোগ বলিয়া একজন চিকিৎসক ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বর্ষাকালজাত জ্বরে ইহা প্রথম ব্যবহার করেন। জেম্‌স লিনডে ১৭৬৫ সালে নিম্নবঙ্গে প্রায় ৪০০ শত ৫০০ শত রোগীর সবিরাম ও অবিরাম জ্বর এই ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য করেন। ইহাতে ১৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১।০র বার্ক খরচ হয়। কেবল মাত্র ২ টী রোগী এই ঔষধে রোগমুক্ত না হইয়া কাল কবলিত হয়। কিন্তু তাহারা এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করে নাই। ডাক্তার লিনডে জ্বরের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, সে সময়ে এদেশে জ্বর ত্রিবিধ আকারে প্রকাশিত হইত। যথা——

(১) Intermittent fever,

(২) Remittent fever.

(৩) Continued fever.

শেষোক্ত জ্বরে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ না হইলেও সময়ে সময়ে উত্তাপের হ্রাস যে না ঘটিত, তাহা নহে। অধিকাংশ স্থলেই বেগের অল্পত্বই পরিলক্ষিত হইত, (Having also a great tendency to remit) তিনি বলিয়াছেন, এ সময় এদেশে জ্বরের চিকিৎসা ছিল রক্তমোক্ষণ, বমন কিম্বা বিরেচন। ফল কথা যে ঔষধ প্রযুক্ত হইত, তাহার উদ্দেশ্য ছিল ঘর্ম্ম আনয়ন, কিম্বা এমন কোন আচরণ, যাহাতে শরীরের উত্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। জ্বর বিচ্ছেদ পাইলে ১ হইতে ২ ড্রাম মাত্রায় বার্ক প্রযুক্ত হইত। রক্তমোক্ষণ অতি সতর্কতার সহিত সম্পাদিত করা, তখন নিয়ম ছিল। বার্ক প্রয়োগে অধিকাংশ জ্বরই আরোগ্য হইত; তবে লোকের একটা মহাভুল ধারণা ছিল—তাহারা অতিরিক্ত বার্ক সেবনের প্রতিক্রিয়াকে মনে করিত, জ্বর শরীর হইতে ত্যাগ পায় নাই। বার্কে জ্বর অটকাইয়া গেল। তাই এত কষ্ট!

যেখানে বার্ক সেবন সহ্য হইত না, সেখানে বস্তি প্রদান করা হইত। বার্কে জ্বর বন্ধ ত হইতই, এবং তাঁহার ধারণা ছিল, পূর্ব্ব হইতে বার্ক ব্যবহার করিলে জ্বর উৎপন্নও হয় না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হণ্টার বার্ক চিকিৎসাই জ্বরের একমাত্র প্রতিষেধক বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহার মাত্রা ১ ড্রামই যথেষ্ট। উত্তাপের মাত্রার কিঞ্চিৎ হ্রাস ঘটিলেই ইহা প্রযোজ্য।

১৭৬৮——১৭৭১ খৃঃ

জন ক্লার্ক দুইবার এদেশে আগমন করেন, প্রথম ১৭৬৮ সালে, দ্বিতীয়বার ১৭৭১ সালে। বঙ্গদেশের মহামারির সময় তিনি এদেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, এরূপ সাংঘাতিক জ্বর তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তাঁহারও অভিমত, জ্বর সর্ব্বত্রই একরূপ; তাহাদের ভিতর কোনরূপ শ্রেণী বিভাগ বা পার্থক্য নাই। (Yes in every part of the world, fevers are essentialy the same or in other words consist of only one genus) সর্ব্বত্রই জ্বরের আকার

হয়— Intermittent

না হয়— Remittent

না হয়— Continued.

চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি উষ্ণদেশে রক্ত মোক্ষণের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে বমন (Tartar emetic) বিরেচন, অন্ত্র পরিষ্কার করিতে Glaubers Salt এবং পিত্ত নিঃসরণ করিতে Calomel প্রদেয়। ইহার সঙ্গে আফিং নিদ্রাকারক, ঘর্ম্মকারক, বেদনা প্রশমক, সর্দ্দি নাশক বলিয়া অনেক সময়ে প্রদত্ত হইত। বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে বার্ক সহ্য হইত না, সেখানে আগে আফিং দেওয়াই নিয়ম ছিল। আফিং দিলে বার্ক উদরে থাকিত।

তিনি লিখিয়াছেন, অন্য ঔষধে রোগীর উপসর্গ দমন হইত, কিন্তু জ্বর বন্ধ করিতে বার্ক চাই-ই-চাই। বিচ্ছেদ না হয়, বার্ক দেওয়াই চাই। ফুটিলেও কোন কোন স্থানে বার্ক প্রয়োগ করিয়া সুফল লাভ ঘটিয়াছে। তবে উত্তাপ হ্রাস হইলে বার্ক অব্যর্থ। উত্তাপ যেখানে সহজে হ্রাস না হয়, সেখানে দিন কতক উপরি উপরি বার্ক দেওয়ার প্রয়োজন। আর বার্ক দিলে আর একটি শুভ ফল এই হয় যে, জ্বর পরিণামে বিপজ্জনক হইতে পারে না। (Prevent from growing dangerous or maligant) এই

সময়ে কুইনাইনের আবিষ্কার হয় নাই, বার্কই দেওয়া হইত।

কিন্তু একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বার্কের এত উপকারিতা সত্ত্বেও ৪০ বৎসরের জন্য এদেশে জ্বরে বার্ক প্রয়োগ উঠিয়া যায়। তখন চিকিৎসা একমাত্র refrigerent প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। তিনি লিখিয়াছেন,—কিছু না করিয়া কিছু করিলাম, এই ধারণা ভিন্ন ইহার আর কি উপযোগিতা আছে? তবে একটা মঙ্গল এই যে, উপকার করিতে না পারিলেও ইহাতে কোনও অপকার করা হইত না।

১৮০৪ —— ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ।

এই দীর্ঘকালের জন্য জ্বরে বার্ক প্রয়োগ এদেশে একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। এবং তৎপরিবর্ত্তে যে চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা ভয়ানক মারাত্মক।

ডাক্তার জেমস্ জনসন্ নামক এক ব্যক্তি এই চিকিৎসার জন্য দায়ী। তিনি ১৮০৪ সালে এদেশে জাহাজে কর্ম্ম লইয়া আগমন করেন। এই সময়ে এদেশে সেপ্টেম্বর মাসের সঙ্গে ভয়ানক জ্বর আবির্ভূত হইত। তিনি প্রথমে ডাক্তার লিনডে এবং ডাক্তার ক্লার্কের জ্বর চিকিৎসার পুস্তক পাঠ করিয়া বার্ক প্রয়োগে একটী রোগীকে আরোগ্য করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যে কোন কারণে রোগীটি তাহার হাতে মারা যায়। তিনি এই রোগীর শবদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, যে তাহার যকৃতে ভয়ানক প্রদাহ জন্মিয়াছে এবং মস্তিষ্কের শিরা সকলে রক্ত জমিয়া আছে। ইহার পর তিনি আর একটি জ্বর রোগীর চিকিৎসা করেন, তাহাতে বার্ক না দিয়া বমন, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ প্রভৃতি আসুরিক চিকিৎসা অবলম্বনে তাহাকে দুর্ভাগ্যক্রমে আরোগ্য করেন। করিয়া তাহার ধারণা হয়, জ্বরে বার্ক অপকারী এবং বমনাদি কর্ম্মই উপকারী। জ্বর রোগী পাইলেই তখন তিনি আর কোন চিকিৎসা না করিয়া তাহার রোগ মুক্তির জন্য প্রথমেই আমর্দ্দন দ্বারা রস প্রয়োগ করিতে থাকেন। মুখ আসিলেই তাহাকে বিরেচন দেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করেন। বিরেচনার্থ কুড়ি গ্রেণ ক্যালোমেল তাঁহার অল্প মাত্রা।

ডাক্তার জেমস দেশে ফিরিয়া গিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, সেই পুস্তকখানি এত বহুল প্রচারিত হয়, যে উপর্য্যুপরি তাহার ৬টি সংস্করণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে; ইহার ফলে এই ঘটে— যে কয় বৎসরের পরী-

ক্ষিত যে বার্ক জ্বরে ধন্বন্তরি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহার ব্যবহার একবারে স্থগিত হইয়া যায়। বার্কের একমাত্র ব্যবহার যাহা থাকে, তাহা এই যে, জিহ্বা পরিষ্কার হইলে এবং জ্বর ছাড়িয়া গেলে বলকারক ঔষধ রূপে ইহার প্রয়োগ। জ্বর সম্বন্ধে জনসনের চিকিৎসায় রস প্রয়োগে মুখ আনয়ন সর্ব্বত্র ঘটিয়া উঠিত না, ফলে জ্বর ছাড়িয়া ঐ ভয়ঙ্কর রসমাত্রা শরীরের মধ্যে শোষিত হওয়ায় এমন সকল ঘটনা ঘটিত, যাহাতে লোকের মাড়ি পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িয়াছে।

১৮১৬ সালে ডাক্তার হ্যালিডে যে পুস্তক সংকলন করেন, তাহাতে জনসনের চিকিৎসার পরিণাম ও কুফল নিনাদিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন, এক একটি রোগীতে এই সময় প্রায় ৬০০ হইতে ৮০০ গ্রেণ ক্যালোমেল দেওয়া হইত। জেনারল্ হাসপাতালে পূর্ব্বে বলিয়াছি, ১ মাসের ক্যালোমেল খরচ ১৩,৩৩৭ গ্রেণ। লোকে ক্রমে এই ভয়ানক চিকিৎসার ব্যাপত্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়; প্রাচীন প্রাচীন যত লোকের মাড়ি খসা দেখিতে পাইবেন, তাহার অধিকাংশ এই চিকিৎসার ফল।

লোকে এইরূপ চিকিৎসার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করে, তখন ডাক্তার জনসন বাধ্য হইয়া, এদেশ পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে বাধ্য হন, কিন্তু তাঁহার যাওয়ার পরও অনেক দিন ধরিয়া এদেশে ক্যালোমেল চিকিৎসা বন্ধ হয় নাই। তবে একটা নিয়ম হয় যে ২০ গ্রেণের অধিক ক্যালোমেল না দেওয়া।

ইহার পর ডাক্তার জেমস্ এদেশে চিকিৎসক হইয়া আসেন। তিনি এই সময়কার জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মত প্রচলিত দেখেন, তাহা এই জ্বর বায়ু মণ্ডলের বিদ্যুতের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত জড়িত; বিদ্যুৎ না হইলেও বায়ুমণ্ডলে এমন কোন পরিবর্ত্তন ঘটে— যাহাতে জ্বর জন্মায়। এ ছাড়া জ্বরের অন্য কোন কারণ নাই। অন্যান্য কারণ কল্পনামাত্র।

ডাক্তার জেমস্ জ্বরকে নিম্নলিখিত বিভাগে বিভাজিত করেন—

১। শরৎ এবং শীত ঋতুতে সমুৎপন্ন সবিরাম জ্বর যথা—

ঐকাহিক

দ্ব্যাহিক

ত্র্যাহিক— ইত্যাদি।

২। বর্ষার প্রারম্ভে জাত এবং গ্রীষ্মকাল জাত অতীব্র প্রদাহযুক্ত অবিরাম-

জ্বর। বর্ষার পরে জ্বর বহু বিপৎজ্জনক, যদি তাহা পৈত্তিক হয়।

৩। অবিরাম একজ্বরী অবস্থাযুক্ত জ্বর প্রদাহ যুক্ত, গ্রীষ্মের প্রখর উষ্ণতা এই জ্বরের হেতু।

এই জ্বরে, তিনি বলিয়াছেন, অন্ত্রে ক্ষত জন্মে। (অর্থাৎ যে জ্বর এখন টাইফইড্ বলিয়া ধারণা করা যায়।) তাঁহার মতে চিকিৎসা,— উষ্ণ অবস্থায় শীত প্রয়োগ, শীত অবস্থায় উষ্ণ প্রয়োগ; উষ্ণতায় রক্তমোক্ষণ, ঘর্ম্মানয়ন, শীতল জলধারা প্রদান, তারপব ১৫।২০ গ্রেণ ক্যালোমেল ব্যবহার। দোষ শরীর হইতে বহির্নিঃসরণ করাই এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। তিনি বলিয়াছেন, আগে বমনাদি প্রয়োগ না করিলে বার্কে কোন ফল হয় না। প্রথমতঃ ইহা পেটে থাকে না; থাকিলেও জ্বর বন্ধ করিতে পারে না। বরং প্লীহাদির বৃদ্ধি সাধন করে! তাঁহার মতে প্লীহার বৃদ্ধি কম না হইলে ক্যালোমেল ব্যবহার নিষিদ্ধ! ইনি জ্বরের প্রতিষেধার্থ মশারী ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। মশক ম্যালেরিয়া আনয়ন করে, ইহা সেই তত্ত্বের প্রতিধ্বনি। যাহা হউক, ডাক্তারী চিকিৎসার যে ক্রম উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে, আপনাদিগের অবশ্য প্রথম ধারণা জন্মিবে এদেশে জ্বর তখনও যেমন এখনও তেমন—

অর্থাৎ Intermittent
Remittent এবং
Continued

যে স্থান বিশেষে অন্ত্রের ক্ষত উপলব্ধি করা যাইত, তাহা এই Continued fever এর মধ্যে তখন বিবেচিত হইত। দ্বিতীয়তঃ মনে হইবে, শীত, শরৎ, বর্ষা, গ্রীষ্ম ধরিয়া ঋতু বিশেষে জ্বরের প্রাদুর্ভাব। তৃতীয়ত গ্রীষ্মের জ্বর অবিরামজ্বর; অন্য ঋতুর জ্বর সবিরাম। চতুর্থ— মহামারির সময়ও জ্বরের যে রূপ অন্য সময়েও জ্বরের সেই রূপ। যখন যে জ্বরই হউক না কেন, সব জ্বরই এক জাতীয়। তবে ভিন্ন কারণ ভেদে শ্রেণীগত পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ আছে।

অনেকদিন ধরিয়া ডাক্তারদিগের চিকিৎসার শেষ এই প্রমাণিত হয় যে বার্ক এই সকল জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

রক্তমোক্ষণ,
বমন,
বিরেচন,
রস প্রয়োগ,

স্থল বিশেষে কচিৎ কখন উপকারী হইলেও ইহার কুফলই অধিক। এমন সকল ব্যপত্তি ইহাতে ঘটে, যাহা অতি ভয়ঙ্কর।

আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসার ফলাফল ডাক্তারদিগের এই বহুদর্শিতার আলোকে এখন আমাদিগকে বিচারপরায়ণ হইয়া দেখিতে হইবে। এবং সেইসঙ্গে দেখিতে হইবে বিষমজ্বর চিকিৎসায় আমাদের কোন পথ অবলম্বনীয়?

আয়ুর্ব্বেদ সভায় বিগত মাসিক অধিবেশনে আমি আপনাদিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহাতে আমি নিজের কোন মতামত ব্যক্ত করি নাই; আমি উক্ত প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতে হয়ত আপনাদের ধারণা জন্মিয়াছে, যে আমাদের দেশে এক দিন বিষমজ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া একদল প্রচার করিতেছিলেন, অহিতাচার হইতে অনোৎসৃষ্ট ব্যক্তির বিষমজ্বর আবির্ভূত হয়, আর একদল বলিতেছিলেন, বিষমজ্বর ভূতাভিষঙ্গোত্থ। এই উভয় মতের মধ্যে প্রাচীন ঋষিদিগের মতই আয়ুর্ব্বেদ সাদরে আপন বক্ষে স্থান দান করিয়া আসিতেছেন। অপর মত পৌরাণিক মত। ভেড় ভালুকি পুষ্কলাবত বাণ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এই মতের পক্ষপাতী হইলেও আমি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, মূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভূতাভিসঙ্গোত্থ বিষমজ্বর এই তত্ত্ব জন সমাজে যেমন প্রচার করেন, তেমনি ইহাও প্রচার করেন, যে মনুষ্যদেহে একমাত্র বিষমজ্বরই আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। অর্থাৎ জ্বরকে মানবদেহে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাকে বিষমজ্বরের আকারে আকারিত হইয়া আসিতে হয়। স্থূলতঃ আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসায় অধিকৃত জ্বর বিষমজ্বর। বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক দ্বন্দ্বজ, এবং সান্নিপাতিকাদি ইহার যে সকল বিভাগ আছে, তাহা বিষমজ্বরেরই বিভাগ। মাধব তাঁহার নিদান গ্রন্থে জ্বরকে যে অষ্টধা বিভাগ করিয়াছেন, তাহা জ্বর বিভাগের একদেশমাত্র। ঋষিবাক্যের প্রতিধ্বনি হইলেও, ইহা সম্পূর্ণ ঋষিবাক্য নহে;—"কারণ ভেদে জ্বর অষ্টধা" একথা না বলিয়া মাধব তাঁহার নিদান গ্রন্থে "জ্বর

অষ্টধা বলিয়াছেন। কারণভেদে যে ইহা অষ্টধা এইরূপ কোন আভাস বা আলাপ করেন নাই। সুতরং ফলে এই দাড়ায়াছে, যে সাধারণতঃ আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থীর মনে এই সংস্কার জন্মে, যে বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক দ্বন্দ্বজ সংসর্গজ এবং আগন্তুক ছাড়া, বিষমজ্বর জ্বরের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ — জ্বর ছাড়িয়া গিয়া কুপথ্য হইতে যদি আবার জ্বর পালটায়, তাহা হইলে সেই জ্বরকে বিষমজ্বর কহে। পালটান জ্বর — স্থলবিশেষে কুইনাইন আটকান জ্বরের মধ্যেও এই কারণে অধিকাংশ স্থলে পরিগণিত হইয়া কুইনাইনের অপবাদ পরিঘোষণা করে। মোট কথা আয়ুর্ব্বেদের দিক দিয়া না হইলেও বিষমজ্বর পৌরাণিক মতে জ্বরের আদ্য মধ্য এবং শেষ,— তবে ইহা বিধিভেদে দ্বিবিধ হইতে পারে যথা——

(১) শরীর বা মানস (২) সৌম্য বা আগ্নেয় (৩) অন্তর্ব্বেগ বা বহির্ব্বেগ (৪) প্রকৃত বা বৈকৃত (৫) সাধ্য বা অসাধ্য (৬) সাম বা নিরাম।

দোষ কাল বলাবল ভেদে পঞ্চবিধ হইতে পারে যথা—

সন্তত বা সতত বা অন্যেদ্যু বা তৃতীয়ক বা চতুর্থক বা ইহাদিগের বিপর্য্যয়।

আশ্রয় ভেদে সপ্তবিধ হইতে পারে যথা——

রসস্থ বা রক্তস্থ বা মাংসস্থ ব মেদস্থ বা অস্থিগত বা মজ্জাগত বা শুক্রগত।

ভিন্ন কারণভেদে অষ্টবিধ হইতে পারে যথা

পৃথক্ অর্থাৎ বাতিক বা
পৈত্তিক বা
শ্লৈষ্মিক ৩

দ্বন্দ্বজ যথা——
বাতপৈত্তিক বা
বাত শ্লৈষ্মিক বা
পিত্তশ্লৈষ্মিক ৩

সংসর্গজ — যথা——
বাতপিত্তশ্লৈষ্মিক ১

আগন্তুক——— ১ মোট এই অষ্টবিধ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বা আদেশে যখন বিষমজ্বর ভিন্ন অন্য কোন আকারে জ্বর মনুষ্য শরীরে প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বলিতে হইবে, জ্বর পরে যেরূপ লক্ষণেই লক্ষণান্বিত হউক না কেন সমস্ত জ্বরই মূলে বিষম জ্বর।

গীতোক্ত ধর্ম্ম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জ্ঞান।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়কে জ্ঞান বলা হইয়াছে, এই অধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ, তথাপি গীতোক্তধর্ম্মে এই জ্ঞান ও কর্ম্মই একমাত্র লক্ষ্য, ফল মোক্ষ। এই জ্ঞান কর্ম্মকে গীতায় জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ বলা হইয়াছে, কেননা যোগাবলম্বনই জীবের জীবন্মুক্তাবস্থা একক্ষণে দেখা যাক জ্ঞান কাহাকে বলে, এবং জ্ঞান সম্বন্ধে গীতা কি বলিতেছেন, গীতা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, একদিকে যেমন বলা হইয়াছে, আত্মসংযমী হইয়া শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানলাভে অধিকারী হইতে পারা যায়। আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে, শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারা যায় না।

প্রথমেই দেখা যাউক, মানুষ কি চায়, মানুষ শান্তি চায়, মানুষ ইহজীবনে শান্তি না পাইয়া দিবানিশি হা হুতাশে দগ্ধ হইয়া পরকালের জন্য শান্তি চায়, এই শান্তিকে শাস্ত্রে মুক্তি বলা হইয়াছে, এই মুক্তি আত্মার, অতএব বুঝা গেল যে, এই মুক্তিই মনুষ্য জীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য, সম্প্রদায় বিশেষে মুক্তির নানা-বিধ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি সেইসব অবস্থা অর্থাৎ সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য একত্ব, নির্ব্বাণ বা সেবাভিলাষী, যাহাই কেন মানুষ প্রার্থনা করুক উহা যে একমাত্র মুক্তিরই নামান্তর ইহাতে কোন সংশয় আসিতে পারে না। গীতা বলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত জ্ঞান লাভ না হইতেছে, ততক্ষণ মুক্তির পথ সুদূরপরাহত, কি করিলে এই জ্ঞান লাভ করা যায়। বিবেচনা করিলে দেখা যায় পৃথিবীতে যাবতীয় ধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীভগবান সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের ন্যায়, বিচার পরায়ণ ধর্ম্মশাস্ত্র আর নাই। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিলে দেখা যায়, এই জীবা-ত্মার পরিণাম সম্বন্ধে বিরোধ থাকিলেও এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র পূর্ণ বিশ্বজগতের যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত, মীমাংসা পূর্ণ দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বর নিরাকরণ বিষয়ে হিন্দুর বেদান্তদর্শন একমাত্র অদ্বিতীয় গ্রন্থ, এই বেদান্তের প্রথম সূত্র।

"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "অথ অর্থাৎ অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, ইহা কিরূপে হইতে পারে, কেননা পূর্ব্বে কোন কথার উত্থাপন না করিয়া, একেবারে অনন্তর শব্দ কেন? অনন্তর বলিলেই কি

বুঝিতে হইবে না যে, অনন্তর অর্থাৎ কাহার পর, অর্থাৎ কোন কার্য্যের বা কোন প্রশ্নের পর, তাহাতে শঙ্করাচার্য্যই বলিতেছেন যে, অনন্তর অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যা-বলম্বী হইয়া শম (অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ) দম (বহিরেন্দ্রিয় নিগ্রহ) তিতিক্ষাদির (সহিষ্ণুতাদির) পরে ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবান কি, ইহা জানিতে চাহিও, (পাঠক বুঝিবেন ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়া তাহাতে প্রগাঢ় অর্থাৎ অটল বিশ্বাসী হইতে কি প্রকার আত্মসংযমের আবশ্যক) মীমাংসাময় দর্শন শাস্ত্র বলিতেছেন, শম দম তিতিক্ষা না হইলে সেই অনির্ব্বচনীয় ভগবতত্ত্ব কেবল মাত্র শাস্ত্র পাঠে বুঝিতে পারিবে না, এই ত গেল প্রথম সুত্র তার পর দ্বিতীয় সুত্রে বলা হইতেছে, "জন্মাদাস্য যতঃ ইহা প্রমথ সুত্রেরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে, প্রথমে বলা হইল ঈশ্বর কি? এবারে বলা হইল, জন্মাদ্যস্য যতঃ অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই বিশ্ব সংসারের জন্ম (সৃষ্টি) হইয়াছে। তা হলে বুঝিলাম, ভগবান কি, না যাঁহা হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

গীতা বলিতেছেন, বেদান্তের এই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" যাঁহা হইতে সৃজন হইয়াছে, এই শক্তি সমন্বিত সৃষ্টিকর্ত্তাই, সর্ব্বকালে লোক সকলের নিয়ন্তা এবং তাঁহার উপাধিই আকার উকার এবং মকর অর্থাৎ ওঁ (প্রণব) সেই সৃষ্টি কর্ত্তা বা ওঁঙ্কার কে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারাই জ্ঞানী. সেই জ্ঞানীরাই মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার অধিকারী, আবার অথবা সেই প্রণব (ওঁ) উপাধি ধারি নারায়ণ যাঁহার প্রতি দৃষ্টি করেন, তিনিই এই জ্ঞানকে লাভ করিয়া থাকেন. এই জ্ঞানের পূর্ণতায় প্রকৃত ভক্তি। এ কথা পরে বলিব, এই জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে অষ্টাঙ্গ যোগ এবং যোগ রূপ কর্ম্মাবলম্বন আবশ্যক, এই যোগ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়া থাকে, তখন মনপ্রাণ ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত হইয়া আনন্দ রাজ্যে গমন করে, এই আনন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে মন ভক্তি শেষে প্রেম প্রবাহে ডুবিয়া যায় এই প্রবাহ স্থায়ী হওয়ার নামই "ব্রাহ্মীস্থিতি" এজন্য গীতার সর্ব্বস্ব যে দ্বিতীয় অধ্যায় যে অধ্যায়কে পণ্ডিতগণ গীতা সুত্র বলিয়া থাকেন, সেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতার যাবতীয় সারার্থ প্রকাশ করিয়া সংক্ষেপে গীতোক্ত ধর্ম্মের যাবতীয় উপদেশ দিয়া ভগবান শেষ শ্লোকে বলিতেছেন :—

"এষাব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মা নির্ব্বাণ মৃচ্ছতি॥

(২য় অধ্যায় ৭২ শ্লোক)

ইহার নাম ব্রহ্মানন্দে অবস্থান, এই অবস্থা আসিলে বা প্রাপ্ত হইলে আর

মোহ আসিতে পারে না। এমন কি ভগবান বলিতেছেন, "স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি" অর্থাৎ জীবনান্ত কালেও (মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেও) যদি এই ব্রহ্মানন্দে স্থিতিলাভ করা যায় তাহা হইলেও ব্রহ্ম নির্ব্বাণ (মোক্ষ) লাভ হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ হইতে আর মৃত্যু অবধি এই ব্রহ্মনির্ব্বাণ জনিত জ্ঞানের অন্তরায় কেবল একমাত্র আমিত্ব জ্ঞান, সকল বিষয় বুঝিয়াও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়াও আমার এই আমিত্ব থাকিতে শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও তুমিত্ব আসিতে পারেনা, এই আমি আমি করিতে করিতে আমার আমার করিয়া একটা অতি বড় প্রবল আসক্তি জীব হৃদয়ে চালিত হইতেছে, কাযেই প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হইয়া পতনের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, এই আমি ভাব যাহার যতটুকু কমিয়াছে,জ্ঞানও তাহার ততটুকু লাভ হইয়াছে,সাধক কবি গাহিয়াছেন,—

"কোন পথে গেলে পরে, আমি মিলে দে মা ব'লে।"

এ কথার উত্তর কেবল গীতাই দিতেছেন, গীতা বলেন, পথ দুইটী একটী— প্রবৃত্তির এবং একটী নিবৃত্তির, যাঁহাদের ভোগবাসনা প্রবল যাঁহারা ইহ-সংসারের ধন দৌলৎ প্রণয়, ভালবাসা, স্ত্রী, পুত্র, মায়া মমতা লইয়া সতত ব্যতিব্যস্ত তাহারা প্রবৃত্তি মার্গের লোক, আর যাঁহারা একমাত্র শ্রীভগবান ভিন্ন মায়া মমতা প্রণয় ভালবাসা ইহ-জগতের কিছুই চায় না,বরং ইহজগতের এই ত্রিতাপজনিত হাহুতাশে সর্ব্বদা বিদ্ধস্ত হইয়া ইহজগতের তাবৎ বিষয়ই অশান্তিপূর্ণ জানিয়া একমাত্র সেই আমার প্রাণারাম আত্মদেব রমণীয় দর্শন শ্রীভগবানই সুন্দর তা ছাড়া সকলি অসুন্দর, তাঁহারাই নিবৃত্তি মার্গের লোক। এই নিবৃত্তি মার্গে গমণ ব্যতীত কেহই এই আমিত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু মানব কত কোটী কোটী জন্মগ্রহণ জনিত প্রত্যেক বারেই স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এবং তাহাদের প্রতি মমতাযুক্ত হইয়া এতই প্রকৃতি গত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার প্রকৃত পাকা আমিকে সে আর খুঁজিয়াও দেখিতে পাইতেছে না, কাজেই তাহাকে প্রবৃত্তি মার্গে গমন ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। এ অবস্থায় তাহার সাধ্য কি যে সে, নিবৃত্তি মার্গে গমণ করে,নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বনের এই সকল অতি বড় অন্তরায় বুঝিতে পারিয়াই, শ্রীভগবান গীতায় নিস্কাম কর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন, নিবৃত্তিমার্গে গমন জন্যই কর্ম্মযোগী হইতে হইবে। এই কর্ম্মযোগের কর্ম্মকৌশলের দ্বারাই চিত্তকে শনৈঃ শনৈঃ নিবৃত্তি মার্গে লইয়া যাইবে। এই কর্ম্ম কৌশলের কথা কর্ম্মযোগে বলা হইয়াছে।

তা হ'লে বুঝাগেল, নিবৃত্তি পথাবলম্বন ভিন্ন আমিত্ব যাইতে পারে না, আবার

এই আমিত্ব না গেলেও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইবে না, আবার প্রকৃত জ্ঞান লাভে,—জ্ঞানী না হইলেও ব্রাহ্মীস্থিতি বা তুরিত্ব লাভ হইবে না।

অজ্ঞানন্ধ লোক সকল কখনই শ্রীভগবানকে পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে না যাঁহারা শাস্ত্রাদি পাঠে চিত্তের মলিতা দূর করিয়া বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া উপযুক্ত গুরু আনুগত্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল জ্ঞানলাভে অধিকারী হইয়া ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে সংশয়শূন্য হইয়াছেন, শ্রীভগবান সর্ব্বদাই তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, নতুবা ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া যথাবিধি গুরু আনুগত্য গ্রহণ না করিয়া, কেবল কুতর্ক দ্বারা যাঁহারা চিত্তকে সন্দিহান করিয়া তুলেন, তাঁহারা কখনই তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিতে পারেন না, শাস্ত্র প্রণেতা ঋষিগণ সাংখ্যযোগ, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, অতএব প্রথমেই আমাকে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা পাইতে হইবে, যেহেতু প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই দেখা যাইবে, এই জগৎটা কেবল অজ্ঞানীর পক্ষেই আছে, নতুবা জ্ঞানলাভ হইলে সেই জ্ঞানীর পক্ষে ইহা সমস্তই সেই বিশ্ব প্রকাশক নারায়ণের মূর্ত্তি বৈ আর কিছুই নহে। ভ্রান্তগণেই জগৎকে সত্য বলিয়া অনুভব করে, নতুবা ভগবৎ পরায়ণ অভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, শ্রীভগবানের এই মায়াময় জগতে তিনি তাঁহার বিশ্বনর্ত্তকী মায়ার সহিত নিয়ত খেলা করিতেছেন মাত্র এ খেলা সৃষ্টির আদি হইতে চলিতেছে, সেই বিশ্ব প্রকাশক শক্তিমান শ্রীভগবানও যেরূপ চৈতন্য স্বরূপ অখণ্ড তাঁহার শক্তি বা মায়াও সেইরূপ অখণ্ড, কেবল মাত্র তাঁহার সেই বিশ্ববিমোহিনী মায়া বা শক্তিই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া খণ্ড চৈতন্য ও খণ্ড শক্তিযুক্ত অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা সেই পরমাত্মরূপী শ্রীভগবান তাঁহার প্রকৃতি বা মায়ার সহিত যোগ হইয়া প্রাণীজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্যই সৃষ্টি কর্ত্তাকে সগুণ ব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং মানুষ যতক্ষণ তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্য সমূহ বুঝিতে না পারিতেছে, ততক্ষণ কোন প্রকারেই জ্ঞানী হইতে পারিবে না। প্রকৃত জ্ঞানী ইহ জীবেনই বন্ধনমুক্ত হইতে পারেন। এই তত্ত্ব জানিবার জন্যই তাঁহার কাছে প্রার্থনা বা তাঁহাকে উপাসনা করিতে হয়, খণ্ড শক্তি যুক্ত জীব অখণ্ড শক্তি সমন্বিত শ্রীভগবানের দিকে গমন করিবার জন্যই উপাসনার প্রয়োজন, এই উপাসনা বা সাধনা সিদ্ধ হইলেই তাঁহার সহিত মিলন অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানলাভ। এ সামর্থ্য বা এ শক্তি অন্য কোন জীবের নাই। কেবল মাত্র এ শক্তি মনুষ্যেরই

আছে, এই জন্যই মানব জন্মকে দুর্লভ জন্ম বলা হইয়াছে, মানুষই কেবল এই উপাসনা বা সাধনার একমাত্র অধিকারী এই উপাসনার সর্ব্বনিম্নাবস্থা তাঁহার নিকট প্রার্থনা। এই প্রার্থনাও কেবলমাত্র তাঁহাকে জানিবার জন্য, অন্যথা নাই, নতুবা ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, এ সব প্রার্থনা নিষ্কাম ধর্ম্মের ঘোর অন্তরায়। মহাভারতে বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে বহু প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই প্রশ্নের মধ্যে একস্থানে বক বলিতেছেন,"মহারাজ! বিষ কি?" উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "প্রার্থনা অর্থাৎ এই প্রকৃতিগত আমিত্বের ইহ কালোচিত ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি প্রভৃতি প্রার্থনা, অতএব যতক্ষণ তাঁহাকে না জানা যাইতেছে, ততক্ষণই যদি প্রার্থনা করিতে হয়,তবে সে প্রার্থনা এই হওয়া উচিত যে শ্রীভগবান! আমার আমিত্ব ঘুচাইয়া, যাহাতে তোমাকে জানিতে পারি, আমি কেবল সেই প্রার্থনা করি।" শাস্ত্র প্রমাণে শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুব বিমাতার কর্কশ বাক্যে বনে গমন করেন, উদ্দেশ্য তাঁহার কাছে প্রার্থনা;—প্রার্থনা কি! না সেই ধনং দেহিং বিদ্যাং দেহি, ইত্যাদি যাই হোক কিন্তু শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী শ্রীভগবান যখন ধ্রুবকে দেখা দিলেন, তখন কিন্তু ধ্রুব কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল, শ্রীভগবান কহিলেন, কেমন ধ্রুব! এক্ষণে বর লও, ধ্রুব কাঁদিয়া আকুল, ধ্রুব শ্রীভগবানকে পাইয়াছে, তাঁহার রূপে মোহিত হইয়াছে, আর কি তাঁহার রাজ্যধন প্রভৃতি লাভজনিত সুখের আকাঙ্ক্ষা আছে? ধ্রুব কাঁদিয়া বলিল,"না প্রভু! যতক্ষণ তোমাকে না দেখিয়াছিলাম,ততক্ষণ বর প্রার্থী হইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া আমার সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে,প্রভু! তুমি এত সুন্দর, আমি রাজ্য চাই না, ধন চাই না, বিদ্যা চাই না, আমি তোমাকে চাই।" তারপর ধ্রুবের জন্য শ্রীভগবান কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ভাগবত পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই, এই প্রার্থনা সর্ব্বনিম্নাবস্থা বলা হইয়াছে, অতএব প্রথমে প্রার্থনা পরে কর্ম্মযোগ (নিষ্কাম কর্ম্ম কৌশল) পরিশেষে উপাসনা বা সাধনা, এই সাধনার সিদ্ধিই জ্ঞান। এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এই জ্ঞান হইলেই মানুষের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইয়া মানুষ জীবন্মুক্ত হইতে পারে। এই জ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থা হইতে শেষাবধি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে নিরাকার একেশ্বরবাদের ঐকান্তিক ধর্ম্মই গীতোক্ত ধর্ম্মের উপদেশ এবং এই নিরাকার একেশ্বরবাদই ধর্ম্মজগতের একমাত্র বীজ, এখন বুঝিলাম, ব্রহ্ম কি, ইহা জানিয়া তাহাতে স্থিতি লাভ করাই জ্ঞান। এখন দেখা যাউক, ইহার অন্তরায় কি, এবং প্রাগুক্ত আমিত্ব জ্ঞানই বা কেন এত প্রবল। বেদান্ত সূত্রে বলা হইয়াছে, শম দম তিতিক্ষাদির পরে, ব্রহ্ম কে জানিতে চেষ্টা করিও, এখানে একটী কথা আছে,

কথা এই যে, এই যে শম দম তিতিক্ষা প্রথমে দেখা যাউক কি জন্য মানুষ ইহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে না। কারণ এই——বাহিরে এই জগৎ প্রপঞ্চ এবং ভিতরে এই সংকল্প বিকল্প বিশিষ্ট মন এই দুইটীতে মানুষকে সদা সর্ব্বদার জন্য অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, ইহার মূলে কিন্তু আশা ও বাসনা এ কথা কর্ম্মতত্ত্বে বলা হইয়াছে। তবেই হইল, এই আশা বাসনা জনিত শম দম তিতিক্ষাদির অভাবে আমাকে জ্ঞানী হইতে দিতেছে না, এই জন্যই গীতা কর্ম্ম সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছেন, বলিয়াছি তো জ্ঞান কি ভক্তি, কি যোগ সকল বিষয়ই দেখিবে, গীতা একমাত্র কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই উপদেশ দিতেছেন, সুতরাং শম দম তিতিক্ষাদির সাধারণ মানবের সাধ্যাতীত দেখিয়া গীতা বলিতেছেন,—সাংখ্য-জ্ঞানের বিশেষত্ব যেমন আত্মবিচার, সেইরূপ এই নিষ্কাম কর্ম্মের বিশেষত্ব ও ঈশ্বর প্রণিধান।

তুমি যেমন এই ক্ষিত্যপতেজ এবং এই মরুদ্ব্যোম সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডকে দেখিতেছ, এবং স্পর্শ করিতেছ, তাহারাও তেমনি তোমাকে দেখিতেছে এবং স্পর্শ করিতেছে, কেননা অধিষ্ঠান বা পূর্ব্ব কথিত খণ্ড চৈতন্য একমাত্র তোমার শরীরেই সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি তোমার শরীরে থাকিয়াও যেমন এই জড় জগতের দ্রষ্টা হইয়াছেন, সেইরূপ এই জড় জগতের ভিতরে যিনি অধিষ্ঠান চৈতন্য-রূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনি ও ঠিক তোমারই দর্শন স্পর্শনের ন্যায় তোমাকে দর্শন করিতেছেন। সুতরাং জড় দেখিতে না পাইলেও তন্মধ্যস্থ অধিষ্ঠান চৈতন্য যে সর্ব্বসাক্ষীরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বদ্রষ্টা ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত, অতএব সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বর প্রণিধান করাই কর্ত্তব্য, কেননা ঈশ্বর প্রণিধান না হইলে প্রকৃত কর্ম্ম কৌশল বুঝিতে পারিবে না. এই ঈশ্বর প্রণিধান—করিতে করিতে যখন বুঝিতে পারিলাম যে, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে সর্ব্বতোভাবে আমি তাঁহারই অধীন, তখন ইহাও বুঝিলাম যে. সর্ব্বদাই আমি তাঁহারই আশ্রয়ে আশ্রিত, তাঁহারই আশ্রয়ে নিদ্রা যাইতেছি,তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার কর্ম্ম করিতেছি,এই জ্ঞান ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তম হইলে তখন তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া প্রত্যেক কর্ম্মেই তাঁহার নিকট থাকিয়া বুঝিতে না পারিলে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া * কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে তাঁহার প্রসন্নতা অনুভব করিতে

* অনেকে বলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি মাষ্টার মহাশয়ের মত হাতে ধরিয়া বুঝাইয়া দিবেন ? উত্তরে বলিব, প্রকৃত জ্ঞানলাভ কর,জ্ঞানী হও, তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস রাখিয়া, তাঁহার শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা কর, প্রভু ! আমাকে ইহা বুঝাইয়া দেও, দেখিবে, সেই অন্তর্যামী তোমার হৃদয়াকাশে উদয় হইয়া তোমার চিত্তে অবস্থান করিয়াই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

পারিবে। মনিবের সাক্ষাতে কর্ম্মচারি যেমন অতি মনোযোগের সহিত কর্ম্ম করে, তেমনই ঐ আকাশ ঐ জল ঐ বায়ু ঐ বৃক্ষলতা প্রভৃতির মধ্যস্থ অধিষ্ঠান চৈতন্য-রূপী শ্রীভগবান সদা সর্ব্বদার জন্য তোমার কর্ম্মের দ্রষ্টা, এই বিশ্বাস যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ করা কোন রূপেই সম্ভব হইবে না। ঈশ্বর প্রণিধানে কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার নিকটে সর্ব্ব কার্য্যে শরণাগত হইয়া তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেই জ্ঞানলাভ হইবে। জ্ঞানী জরা মরণের ভয় করেন না, তিনি জয় পরাজয় বা লাভ অলাভ কিছুতেই বিচলিত হয়েন না, তাঁহাকে রোগ— শোকাদিতে আর্ত্ত করিতে পারে না, কেন না জ্ঞানীর মন প্রাণ তখন প্রকৃতি-গত প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বী নহে, জ্ঞানী জানেন, তাঁহার জীবনের ভাল মন্দ সম্বন্ধে তিনি অপেক্ষা তাঁহার সেই আত্মদেব শ্রীভগবান ভাল বুঝেন, জ্ঞানী সর্ব্বদা তাঁহার সমক্ষে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার হইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং কেনই বা সে মৃত্যুকে ভয় করিবে? ইহা অতি সত্য যে, জ্ঞান বা ভক্তি যাহার যত কম, মৃত্যু ভয়, তাহার তত বেশী, একজন ভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন,

"আমার মাকে মা বলিতে যাদের হয় না চিত।
শ্মশানে ভয় পায় তারাই তো নিশ্চিত।
(নইলে) তারার তনয় যারা তারা তো নয় ভীত দেখিয়ে মৃত্যুর দর্প অতিশয়॥

যদি জরা মরণকেই অতিক্রম করিতে না পারিলাম, যদি মৃত্যু সংসার উত্তীর্ণ হইতেই না পারিলাম, তবে আর জ্ঞানলাভ হইল কিসে? যাহা হউক এই ঈশ্বর প্রণিধান জন্যই পূর্ব্বে কর্ম্মযোগে কর্ম্ম সম্বন্ধে এত কথা বলা হইয়াছে, কেননা সাধারণতঃ দেখিতে গেলে একমাত্র এই কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞানলাভে অধিকারি হইতে পারা যায়।

পূর্ব্বে যাহাকে আত্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে, সেই আত্মতত্ত্ব বোধের নামও জ্ঞান, তবে সেই জ্ঞান শুধু কর্ম্ম কৌশলে লাভ হয় না, তাঁহাকে আরও একটু উপরে উঠিতে হয়। আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহাকে গীতোক্ত যোগাবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু এই যোগ এক্ষণে লুপ্তপ্রায় পূর্ব্বে শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে যাহা বলিয়া আসিতেছিল, জানি না কি জন্য অথবা কালনিয়মে উহা ভারত হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তবে এ কথা বলা যায় না যে, এ ভারতবর্ষে একেবারেই তেমন যোগী নাই, হিমালয়ে বা কোন প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে অর্থাৎ হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে আজও ২। ১ জন যোগী দেখা যায় বটে, কিন্তু

ভারতের হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় উহা বড়ই কম, এমন কি কিছুই নয়, বলিলেও চলে, শুনিতেছি, আজ কাল আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের কথা অনুধাবন করিয়া অনেকে নিরামিষভোজী কেহ বা হবিষ্যাশি হইয়া এই যোগতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পরিণাম এই হইতেছে, প্রকৃত যোগতত্ত্বের মূলের সন্ধান না পাইয়া তাহার শাখা প্রশাখা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, এবং তাহারই সামান্যমাত্র কার্য্য দর্শন করিয়া বিশ্ব জগৎ মোহিত হইতেছে, হিন্দু সন্তানের তো কথাই নাই। নতুবা সামান্য ইচ্ছাশক্তির (Will force.) কার্য্য দেখিয়া আজ হিন্দু ঋষির বংশধরের এ জয় গান কেন? জয় আমেরিকা বলিয়া তাণ্ডব নৃত্য কেন? এখনও দেশে ঋষিকল্প কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণগণ থাকিতে আনী বেশান্তের জয় গানে ভারত গগণ বিদীর্ণ হয় কেন? হায়রে অধঃপতন! হায় রে কালধর্ম্ম!! যাহা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অতি ক্লেশ সহ্য করিয়া শেষে উপযুক্ত কৃতবিদ্য কর্ম্মী গুরুর আনুকূল্য ব্যতীত কিছুতেই হইবার নহে, সেই চতুর্বর্গফলের চিরাজ্জিত ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম জগতের বড় প্রিয়তম ধন এই যোগ যদি কাঁচকলা আর আলোচালের ভাত খাইয়া আমেরিকা লাভ করিতে পারে, তবে ভারতের সেই স্বর্ণযুগের পূর্ব্ব গৌরব দুর্ভাগ্যের অতল সাগরে ডুবিয়া যাইবে। জানি না হতভাগিনী ভারত মাতাকে এবং তাঁহার হতভাগ্য সন্তানদিগকে ধর্ম্মের দুর্গতি আরও কত দেখিতে হইবে।

যোগের কথা বলিতে গিয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, হাঁ বলিতেছিলাম, তেমন যোগী এখন আর প্রায় দেখা যায় না; গীতোক্ত ধর্ম্মে শ্রীভগবান এই যোগাবলম্বনকেই জীবের চরম পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগতত্ত্ব বুঝাইয়া শেষে বলা হইয়াছে,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥

যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, হে অর্জ্জুন! তাতেই বলি, তুমি যোগী হও।

এখানে বুঝিলাম তপস্যা জ্ঞান এবং কর্ম্ম অপেক্ষা যোগাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মুক্তি বা নির্ব্বাণ যাহা মানুষ চায়, সেই মুক্তি বা নির্ব্বাণ কি যোগী না হইলে হইবে না? অবশ্য হইবে, কেননা জ্ঞান কর্ম্মের ন্যায় যোগের পরিণামও যখন সেই মুক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়, তখন কেনই বা জ্ঞানলাভে মুক্তি হইবে না? যদি বল তবে এই কর্ম্মে মুক্তির উপায় থাকিতে অর্জ্জনকে এই আয়াসসাধ্য যোগী হইতে বলিতেছেন কেন?

গীতাই ইহার উত্তর দিয়াছেন, গীতা বলিতেছেন, প্রথমে আত্মতত্ত্ব, পরে কর্ম্ম, পরে জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদির পরে যোগ, এই কয়টী বলা হইতেছে. কিন্তু ইহার মধ্যে যে কোন একটী দ্বারাই জীব মোক্ষলাভে অধিকারি। কেননা কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি-যোগ ইহাদের সকলেরই শেষলক্ষ্য ঐ মুক্তি। সুতরাং কর্ম্মজ্ঞানই বা কেন উহা না হইবে? কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে, কথা এই যে, কর্ম্মী জ্ঞানী অথবা ভক্ত ইহাদের শেষলক্ষ্য মুক্তি, সুতরাং ইহাদিগকে মমুক্ষু বলিতে পারা যায়, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের পর যোগী ইহজীবনেই জীবন্মুক্ত। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তবে কি যোগী না হইলে জ্ঞান কর্ম্মে ইহ-জীবনে জীবন্মুক্ত হইবার আশা নাই? উত্তরে বলিব হাঁ আছে. কিন্তু একটু বিশেষত্বঃ আছে, সেটি এই যে, শক্তি যেমন শক্তি মনে আনিয়া মিলিত হয়েন, তেমনই যোগীর আত্মা আত্মারামে মিশিয়া থাকেন, এই যোগী আত্মজ্ঞ হইয়া জীবন্মুক্ত প্রকৃত জীবন্মুক্ত বলিতে হইলেও আত্মজ্ঞ ভিন্ন বলা যায় না. কর্ম্মী বা জ্ঞানী অথবা জ্ঞান কর্ম্মের সমবায়ে যে অবস্থা উহা শ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস জনিত জীবন্মুক্ত। এই আত্মজ্ঞ বলিয়া যোগীর পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থমাত্রেই ব্রহ্মময়, জ্ঞানকর্ম্মেও জগৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান হয়, বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে যোগ আর জ্ঞান কর্ম্মে যে টুকু ফাঁক সে টুকু ক্রিয়া না করিলে মানব বুদ্ধির অগম্য প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ যোগী ভিন্ন উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই।

অতএব বুঝা গেল একমাত্র জ্ঞান লাভ হইলে তাঁহাকে অনুভব করিবার শক্তি হয়, জ্ঞানীর প্রথম বিশ্বাস আমি দেহ নহি. তবে খণ্ড চৈতন্য তার পর বুঝেন, ব্রহ্মচৈতন্য এবং জীবচৈতন্য একই পদার্থ, ইহার পরেই সমদর্শন বা অভেদ দর্শন, ক্রমে শ্রীভগবানের নাম রূপ সব মিথ্যা হইয়া যাইবে, মূর্খেরাই শ্রীভগবানের নাম ও রূপ লইয়া বিবাদ করে, জ্ঞানী জানেন, যিনি সর্ব্বাবস্থায় বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে যিনি বিরাজিত তাঁহার আবার রূপই বা কি! আর নামই বা কি, সকলই যখন তিনি, তখন তাঁহার আবার নামের সংখ্যাই বা কি, শব্দব্রহ্মময়, মুখদিয়া যাহাই উচ্চারণ করি, সকলই তাঁর নাম। চক্ষে যাহা দেখি, সকলই তাঁহার রূপ।

এখানে একটি গল্প মনে হোলো; গল্পটি একখানি ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছিলাম,—

একদিন রাখালেরা গাভী সকল লইয়া মাঠ হইতে বাটী আসিতেছিল, তাহারা গ্রামের ভিতর না পৌছিতেই ভয়ঙ্কর ঝড় জল এবং শিলাবর্ষণ আরম্ভ

হইল, এই আকস্মিক বিপদে রাখালেরা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া ও যোব! ও যোব!! আমাদের রক্ষা কর, বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, ঠিক সেই সময়ে তাঁহাদের পশ্চাতে একজন পাদ্রি আসিতেছিলেন, তিনি বালকগণের ঐ অশুদ্ধ যোব কথা শুনিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎসগণ! তাহার নাম যোব নহে, তাঁহার নাম যিহোবা তোমরা যিহোবা বলিয়া ডাক, পাদ্রির মুখদিয়া ঐ কথা বাহির হইবামাত্র আকাশ-বাণীর ন্যায় উর্দ্ধ হইতে কে বলিল, আমার নাম যোবও নহে যিহোবাও নহে, বিশ্বাস ভক্তির সকল শব্দই আমার নাম।

(ক্রমশঃ)

গান।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্চী।

কত দিন আমি রয়েচি যে ব'সে
তোমা লাগি তা'ত মনে নাই।
কত দিন হ'তে ও চরণ-ধ্বনি
শুনি কানে পথ পানে চাই॥
তোমার নীরব আবাহন গীতি,
বাতাসে ভাসিয়া আসে নিতি নিতি,
প্রাণ মাতাইতে কি পুলক-প্রীতি,
এই আসে—আর নাহি পাই।
নিশাকালে যবে চাহি ও আকাশে,
হেরি তব হাসি তারাশশী হাসে,
কত কথা কহে রবহীন ভাষে
কর-পরশনে ডাকে "ভাই"॥
তোমার বাসনা আমার এ মনে,
উঠে যে জাগিয়া ঘুমে-জাগরণে,
তবু সন্দেহ উঠে অকারণে,
কেন উঠে নাহি বুঝি তাই।
জীবন মরণ মোর জ্ঞান মন,
সঁপি তোমা সব করহে গ্রহণ,
আমি যেন তব ছায়ার মতন
তব অভিলাষে হ'য়ে যাই॥

নাড়ী বিজ্ঞান।

(বৈজ্ঞানিক মীমাংসা)

লেখক,—শ্রীযুক্ত অমৃতলালগুপ্ত কবিরাজ।

নাড়ীবিজ্ঞানে একটি জটিল প্রশ্ন এই যে, একটি শিরার উপর তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় স্থাপন করিয়া পরস্পর বিরোধী বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিরুদ্ধ ক্রিয়া কিপ্রকারে উপলব্ধি হইতে পারে? বায়ু পৃথক পদার্থ, পিত্ত পৃথক পদার্থ, এবং শ্লেষ্মাও পৃথক পদার্থ। বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা কি? বায়ু জীবের চেতনা, বায়ু জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস, বায়ু জীবের প্রাণ। চরকে দেখিতে পাই—

"বায়ু রায়ু র্বলং বায়ু র্বায়ু র্ধাতা শরীরিণাং।
বায়ু র্বিশ্বমিদং সর্ব্বং প্রভুর্বায়ুশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥"

বায়ুই শরীরীদিগের আয়ু, বায়ুই বল, বায়ুই বিধাতা। বায়ুই সমস্ত বিশ্ব এবং বায়ুই প্রভু বলিয়া কীর্ত্তিত।

পিত্তকি? চরকে দেখিতে পাই—

অগ্নিরেব পিত্তান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি। অগ্নিই শরীরস্থ পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শুভ ও অশুভ ফলপ্রদান করে।

শ্লেষ্মাকি? চরকে দেখিতে পাই—

সোম এবং শরীরে শ্লেষ্মান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি। সোমই শরীরে শ্লেষ্মায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া শুভাশুভ ফলদান করে।

এক্ষণে দেখা গেল। বায়ু জীবের প্রাণ। অগ্নি পিত্ত ও সোম শ্লেষ্মা মূলপদার্থ পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। পঞ্চ ভূতের লক্ষণ এই—

আন্তরীক্ষাস্তু শব্দঃ শব্দেন্দ্রিয়ং সর্ব্বচ্ছিদ্রসমূহো বিবিক্ততাচ।
বায়ব্যাস্তু স্পর্শং স্পর্শেন্দ্রিয়ং সর্ব্বচেষ্টাসমূহঃ সর্ব্বশরীরস্পন্দনং লঘুতা চ।
তৈজসাস্তু রূপং রূপেন্দ্রিয়ং বর্ণঃ সন্তাপো ভ্রাজিষ্ণুতা পক্তিরমর্ষ স্তৈক্ষ্ণ্যং শৌর্য্যঞ্চ
আপ্যাস্তু রসো রসনেন্দ্রিয়ং সর্ব্বদ্রবসমূহো গুরুতা শৈত্যং স্নেহো রেতশ্চ।
পার্থিবাস্তু গন্ধো গন্ধেন্দ্রিয়ং সর্ব্বমূর্ত্তিসমূহো গুরুতা চেতি।

শব্দ, শব্দেন্দ্রিয়, সচ্ছিদ্রতা ও অসৃস্পক্ততা আকাশের লক্ষণ। স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়, ক্রিয়াশক্তি, শরীরের স্পন্দন ও লঘুতা এই কয়েকটী বায়ুর লক্ষণ, রূপ, দর্শনেন্দ্রিয় বর্ণ, তাপ, দীপ্তি, পরিপাকশক্তি, ক্রোধ তীক্ষ্ণতা ও শূরত্ব তেজের লক্ষণ। রস, রসনেন্দ্রিয়, সকল দ্রবপদার্থ, গুরুতা, শৈত্য, স্নেহ ও শুক্র ইহারা জলীয় পদার্থ।

গন্ধ, গন্ধেন্দ্রিয়, সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তি ও গুরুতা ইহারা পার্থিব পদার্থ। যে পদার্থে আকাশের গুণ অধিক, তাহাকে আকাশীয়, যাহাতে বায়ুর আধিক্য, তাহাকে বায়বীয়, যাহাতে তেজের অংশ অধিক তাহাকে তৈজস, যাহাতে জলের অংশ অধিক, তাহাকে জলীয় বা আপ্য এবং যাহাতে পৃথিবীর অংশ অধিক তাহাকে পার্থিব পদার্থ বলা যায়। ক্ষিতি কঠিন পদার্থ, অপ বা জল তরল, তেজ লঘু, বায়ু ও আকাশ সূক্ষ্ম পদার্থ। পরিদৃশ্যমান জগতে পদার্থের কঠিন অংশ যেটুকু তাহাই ক্ষিতি বা পৃথিবী, পদার্থের তরল অংশ অপ বায়ু, জল, উষ্ণ লঘু অংশ তেজ, ক্ষিতি, অপ ও তেজ দৃশ্যমান, এবং বায়ু ও আকাশ সূক্ষ্ম বলিয়া তাহারা অদৃশ্য, কিন্তু সূক্ষ্মত হেতু দৃষ্ট না হইলেও বায়ু ও আকাশ বলিয়া যে দুইটী পদার্থ আছে, তাহা ঐ দুইটী পদার্থের ক্রিয়া দ্বারা উপলব্ধি হয়।

আকাশের লক্ষণ। আকাশের একটী গুণ শব্দ, আকাশব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। শব্দ যে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে, তাহাতেও আকাশের গুণ বহুল রূপে বিদ্যমান, কারণ আকাশগুণবিশিষ্ট শব্দ আকাশ গুণ বহুল পদার্থ ব্যতীত অন্য পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে না। পদার্থের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, তাহারা সমগুণবিশিষ্ট হইলেই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই জন্য কর্ণ ব্যতীত অন্য চারি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দজ্ঞান হয় না। জগতের সমস্ত পদার্থই ছিদ্রবিশিষ্ট, এমন যে কাঠ পাথর সোনা রূপা ও লৌহাদি কঠিন পদার্থ, তাহাতেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্র বিদ্যমান, এই ছিদ্র আকাশের লক্ষণ, আকাশের আর একটী গুণ এই যে, উহা কিছুরই সহিত মিশ্রিত হয় না, সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ।

বায়ুর লক্ষণ।

বায়ুর একটী গুণ স্পর্শ, বায়ু না থাকিলে কোনও পদার্থের অনুভূতি হয় না। ত্বক দ্বারা অনুভূতি, বা স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ত্বক দ্বারা যে স্পর্শজ্ঞান জন্মে, তাহা বায়ুর ক্রিয়া। সুতরাং ত্বক বায়ু বহুল পদার্থ বা ত্বকে বায়ু বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। তজ্জন্য সমধর্ম্মা সমধর্ম্মাকে আকর্ষণ করে ও ভিন্ন ধর্ম্ম অন্য চারিটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান জন্মে না। বায়ুর অপর একটী গুণ ক্রিয়াশীলতা। পঞ্চভূতের মধ্যে অন্য চারি পদার্থ বায়ুর ন্যায় ক্রিয়াশীল নহে। বায়ু গতিশীল পদার্থ, যেখানে গতি, সেখানেই ক্রিয়া, গতিব্যতীত কার্য্য হয় না। জগতের সমস্ত পদার্থই সক্রিয়, কিন্তু জড় পদার্থে চৈতন্যের অত্যন্ত অভাব বলিয়া তাহার ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না বা জড় পদার্থ স্বয়ং গমনাগমন প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু চেতন পদার্থে চৈতন্যের ভাব সুস্পষ্ট বিদ্যমান, তজ্জন্য জীব

জন্তু প্রাণিবর্গ নানা প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হয় ইহাই বায়ুর ক্রিয়া। জগতের সমস্ত পদার্থে বায়ু বিদ্যমান থাকিলেও জীব জন্তুর শরীরে বায়ুর প্রভাব-সুস্পষ্ট বিদ্যমান। বায়ু গতিশীল পদার্থ, কিন্তু এই গতিশীলতা বা ক্রিয়াশীলতার মধ্যে একটু রহস্য আছে। বায়ুর গতি স্থির নহে চঞ্চল, এই চাঞ্চল্য চেতন পদার্থে বিশিষ্ট রূপে বিদ্যমান। শ্বাস প্রশ্বাস জীব জন্তুর প্রাণ, এই শ্বাস প্রশ্বাস বায়ুর ক্রিয়া, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য চেতন পদার্থ সচল বা সক্রিয়। যাহাদের প্রাণ আছে, কিন্তু প্রাণের স্ফুর্ত্তি নাই অর্থাৎ ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমনের শক্তি নাই, তাহারা অচেতন। জীবের প্রাণের এই স্ফুর্ত্তি না থাকিলেই তাহাদিগকে মৃত বলা যায়। উদ্ভিদেরও প্রাণ বা চৈতন্য আছে। কিন্তু সে চৈতন্যে স্ফুর্ত্তি নাই। তাহা জড় চৈতন্য, এই জন্য তাহারা এক স্থান হইতে অন্যত্র গমনাগমন করিতে পারে না। চেতন পদার্থের এই যে সচল ভাব, ইহাই চঞ্চল বায়ুর ক্রিয়া। চঞ্চল বায়ুর চাঞ্চল্য দ্বারা জীবের সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। সকল শরীরে যে স্পন্দন হয়, তাহাও বায়ুর, ক্রিয়া। মৃতদেহে স্পন্দন বা কম্পন থাকে না। বায়ুর আর একটী গুণ লঘুতা লঘু বলিয়া বায়ুর স্থান উর্দ্ধে, জল গুরু পদার্থ, কিন্তু তাহা অগ্নি সংযোগে লঘু হইয়া বাষ্পাকারে উর্দ্ধগামী হয়। লঘু পদার্থ উর্দ্ধগামী, ইহাই বায়ুর লঘুতা গুণ।

রূপের লক্ষণ।

রূপ যে পদার্থ তাহা তেজ এবং রূপ যে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে সেই দর্শনেন্দ্রিয়ও তেজ এই জন্য তৈজস দর্শনেন্দ্রিয়ে যে তেজ নিহিত থাকে, তদ্দারা যাবতীয় সমধর্ম্ম পদার্থের রূপ বা তেজ দৃষ্ট হয়। বর্ণ যে পদার্থ তাহাও তেজ, তৈজস দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা সেই বর্ণ দৃষ্ট হয়। সন্তাপ বা তাপ যাহার ক্রিয়া তাহাও তেজ, দীপ্তি যাহার ক্রিয়া তাহাও তেজ, ভুক্ত দ্রব্য যাহার প্রভাবে পরিপক্ক হয়, তাহাও তেজ, যে শক্তির প্রভাবে ক্রোধ ও শূরত্ব জন্মে এবং তীক্ষ্ণতা গুণ যাহাতে আছে, তাহাও তেজ।

জলের লক্ষণ।

কটু,তিক্ত,কষায়,অম্ল মধুরাদি ছয় রস আপ্য বা জলীয় পদার্থ। এই ছয় রস যে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে,সেই রসনেন্দ্রিয়ও আপ্য, রসনেন্দ্রিয় আপ্য বলিয়া সমধর্ম্মা আপ্য ছয় রসকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তরলতা জলের প্রধান গুণ, সুতারাং সমস্ত তরল দ্রব্য জলীয় পদার্থ, গুরুতা জলের অপর গুণ, শীতলতা অন্য তম গুণ' স্নেহ

বা ঘৃত তৈলাদি পদার্থ জলীয়পদার্থ, কারণ তরল দ্রব্য মাত্রেই অপ্য এবং রেতঃ বা শুক্র ও জলীয় পদার্থ।

পৃথিবীর লক্ষণ।

পৃথিবীর প্রধান গুণ গন্ধ, পৃথিবীতে যে সকল পদার্থ গন্ধবিশিষ্ট, তাহারা পার্থিব। এই জন্য কেবল মাত্র নাসিকা সমধর্ম্মা পদার্থ গন্ধগ্রহণে সমর্থ হয়। জগতে যে কোন ও মূর্ত্তি বা অবয়ববিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহারা পার্থিব, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ ইহারা সকলেই পার্থিব, পৃথিবীর অপর গুণ গুরুতা, কারণ পৃথিবী এ চারিটী পদার্থ অপেক্ষা ভারী। এই জন্য পৃথিবী, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই চারি পদার্থের নিম্নস্তরে অবস্থিত।

লঘু গুরু।

এই পঞ্চ পদার্থের মধ্যে পৃথিবী ও জল গুরু পদার্থ, গুরু পদার্থের স্থান নিম্নে। এই জন্য নদী খাল বিলের গর্ত্তে জলের স্থান, এবং একটুকরা মৃত্তিকা জলের মধ্যে নিঃক্ষেপ করিলে, তাহা জল অপেক্ষা গুরু বলিয়া জলে নিমগ্ন হয়। পৃথিবীও গুরু এবং জলও গুরু, এই জন্য উভয় পদার্থ উভয় পদার্থের নিকটবর্ত্তী, কিন্তু পৃথিবী অপেক্ষা জল গুরু বলিয়া পৃথিবীর উপরে জলের স্থিতি। পৃথিবী ও জল অপেক্ষা তেজ ও বায়ু উভয় পদার্থ লঘু, এই লঘুতা হেতু পৃথিবী ও জলের ন্যায় উভয়ে পরস্পর নিকটবর্ত্তী ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু তেজ অপেক্ষা বায়ু অধিকতর সূক্ষ্ম ও লঘু বলিয়া জলের ন্যায় বায়ুর স্থান তেজের উর্দ্ধে, আর আকাশ বা ব্যোম সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ও সূক্ষ্মবলিয়া তাহার স্থান—সকলের উর্দ্ধে,এতদ্ভিন্ন লঘুগুরুর আরও একটু রহস্য আছে, গুরু দ্রব্য অধিক ভারী ও কঠিন, এই জন্য গুরু দ্রব্য অল্পস্থান ব্যাপক এবং লঘু দ্রব্য লঘু ও সূক্ষ্ম বলিয়া অধিকস্থান ব্যাপক। গুরু কঠিন দ্রব্যের পরমানু অত্যন্ত ঘনসংযোগ বা নিবিড় অবয়ব বিশিষ্ট, এই জন্য একমন লৌহ যত টুকু স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে, একমন তুলা তদপেক্ষা অনেক অধিক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে। কারণ লৌহের অবয়ব যেমন ঘনসংযোগ বিশিষ্ট, তুলার অবয়ব তদ্রূপ নহে। তুলা পার্থিবপদার্থ হইলেও তন্মধ্যে আকাশ ও বায়ুর অধিক বর্ত্তমান থাকায় তুলা ছিদ্রবহুল পদার্থ, এবং আকাশমার্গে বিচরণশীল, আকাশীয় পদার্থ ব্যতীত অন্য পদার্থ আকাশে বিচরণ করিতে পারে না। আর বায়ুবহুল পদার্থ না হইলে বায়ু লাগিলেই তাহা শূন্যে উত্থিত হইতে পারে না।

লঘু গুরুর এই বিভিন্ন ধর্ম্ম দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, গুরু পদার্থ অল্প স্থান ব্যাপক ও লঘু পদার্থ অধিক স্থান ব্যাপক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও

প্রমাণ করিয়াছেন যে, পৃথিবী অপেক্ষা জল তিন গুণ বেশী, আমাদের মতে, পৃথিবী অপেক্ষা জল অধিক স্থান ব্যাপক, জল অপেক্ষা তেজ অধিক ব্যাপক, তেজ অপেক্ষা বায়ু অধিক ব্যাপক, এবং বায়ু অপেক্ষা আকাশ অধিক ব্যাপক, পরন্তু এতদ্বারা ইহাও স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, স্থূল গুরু পদার্থের অন্তর্গত লঘু সূক্ষ্ম পদার্থ বিদ্যমান। কিন্তু লঘু সূক্ষ্মপদার্থে স্থূল গুরু পদার্থ বিদ্যমান নাই। ক্ষিতিতে জল আছে, কিন্তু জলে ক্ষিতির অভাব, পৃথিবী ও জলে তেজ বিদ্যমান, কিন্তু তেজে পৃথিবী ও জলের অভাব, পৃথিবী, জল ও তেজে বায়ু ও আকাশ আছে। কিন্তু বায়ু ও আকাশে ক্ষিতি, জল ও তেজের অভাব, ইহার কারণ আকাশ অতি সূক্ষ্ম, এই অতিসূক্ষ্মতা হেতু, এবং আকাশ হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিরচিত বলিয়া আকাশ বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই পদার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান। আবার বায়ু সূক্ষ্ম বলিয়া তেজ, জল ও ক্ষিতিতে বিদ্যমান। তেজ লঘু বলিয়া জল ও ক্ষিতিতে বিদ্যমান। জল তরল বলিয়া ক্ষিতিতেই উহার অবস্থান, ক্ষিতি উক্ত পদার্থ চতুষ্টয় অপেক্ষা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, পরন্তু উহাদের মধ্যবর্ত্তী, পৃথিবী বা ক্ষিতি অপ দ্বারা আবৃত, অপ তেজ দ্বারা আবৃত, তেজ বায়ু দ্বারা আবৃত, বায়ু আকাশের দ্বারা আবৃত, আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, বায়ু আকাশ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও আকাশের মধ্যবর্ত্তী, তেজ বায়ু অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও বায়ুর মধ্যবর্ত্তী,জল তেজ অপেক্ষা সীমাবিশিষ্ট ও তেজের মধ্যবর্ত্তী। প্রথমতঃ মহৎ আকাশ হইতে বায়ুর প্রকাশমাত্রই আকাশ দ্বারা বায়ু আবৃত, গৃহ মধ্যে আবদ্ধ জীব জন্তুর ন্যায় বায়ুর চঞ্চল ভাবে চতুর্দ্দিকে গমন, এই চঞ্চল গমনে আকাশের সহিত বায়ুর সজ্ঘর্ষণে তাপের উদ্ভব, আকাশ, বায়ু ও তাপের মিশ্রণে জলের উদ্ভব, এই পদার্থ চতুষ্টয়ের মিশ্রণে ক্ষিতি বা পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশের মুল উর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে। আত্মার চাঞ্চল্যে আকাশের প্রকাশ এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়াছে। আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ, তাহারই চাপে ক্রমশঃ অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থের বিকাশ; অনবরত চাপে পদার্থ সমুহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূল পদার্থে পরিণত হইয়াছে। এই জন্য সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল পদার্থ পৃথিবী সপ্ত স্তরের মধ্যবর্ত্তী রহিয়াছে।

আমরা এক্ষণে বুঝিলাম, যেমন বহির্জ্জগতে ক্ষিতির উর্দ্ধে জল, জলের উর্দ্ধে তেজ, তেজের উর্দ্ধে বায়ু ও বায়ুর উর্দ্ধে আকাশ বর্ত্তমান, তদ্রূপ একটি নাড়ীতে তিনটি অঙ্গুলি স্থাপন করিলে, উর্দ্ধে তর্জ্জনীনিবেশ স্থলে বায়ুর, গতি তন্নিম্নে মধ্যমাতে পিত্তের গতি ও তন্নিম্নে শ্লেষ্মার গতি অনুভূত হয়। শ্লেষ্মা সোম

অর্থাৎ আপ্য বা জলীয় পদার্থ বলিয়া গুরুত্বাবশতঃ সকলের নিম্নে তাহার স্থান, পিত্ত তৈজস বা আগ্নেয় পদার্থ বলিয়া লঘুতা বশতঃ আপ্যশ্লেষ্মার উপরে তাহার স্থান এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা অপেক্ষা বায়ু লঘু বলিয়া সর্ব্বোপরি তাহার স্থান। যেমন প্রদীপের নিম্নে আপ্য তৈল থাকে, ঊর্দ্ধে তেজ ও তেজের ঊর্দ্ধে, বাষ্প থাকে, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মার স্থিতিও তদ্রূপ। একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। পৃথিবীর উপরে যদি জলের স্থান হয়, তবে জীবজন্তু কি প্রকারে পৃথিবীর উপরে বাস করে? বস্তুতঃ পৃথিবী জল দ্বারা বেষ্টিত, জল তেজ দ্বারা আবৃত, তেজ বায়ু দ্বারা আবৃত, বায়ু আকাশ দ্বারা আবৃত। পৃথিবী এই পঞ্চস্তরের মধ্যবর্ত্তী স্তর। পৃথিবী জল দ্বারা আবৃত থাকিলেও জল আবার তেজ বা সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা আবৃত থাকায়, পৃথিবীর জলীয়াংশ ঐ তেজে সর্ব্বদা শোষণ করে, এই জন্য পৃথিবীতে জীবজন্তু অনায়াসে বাস করিতে পারে।

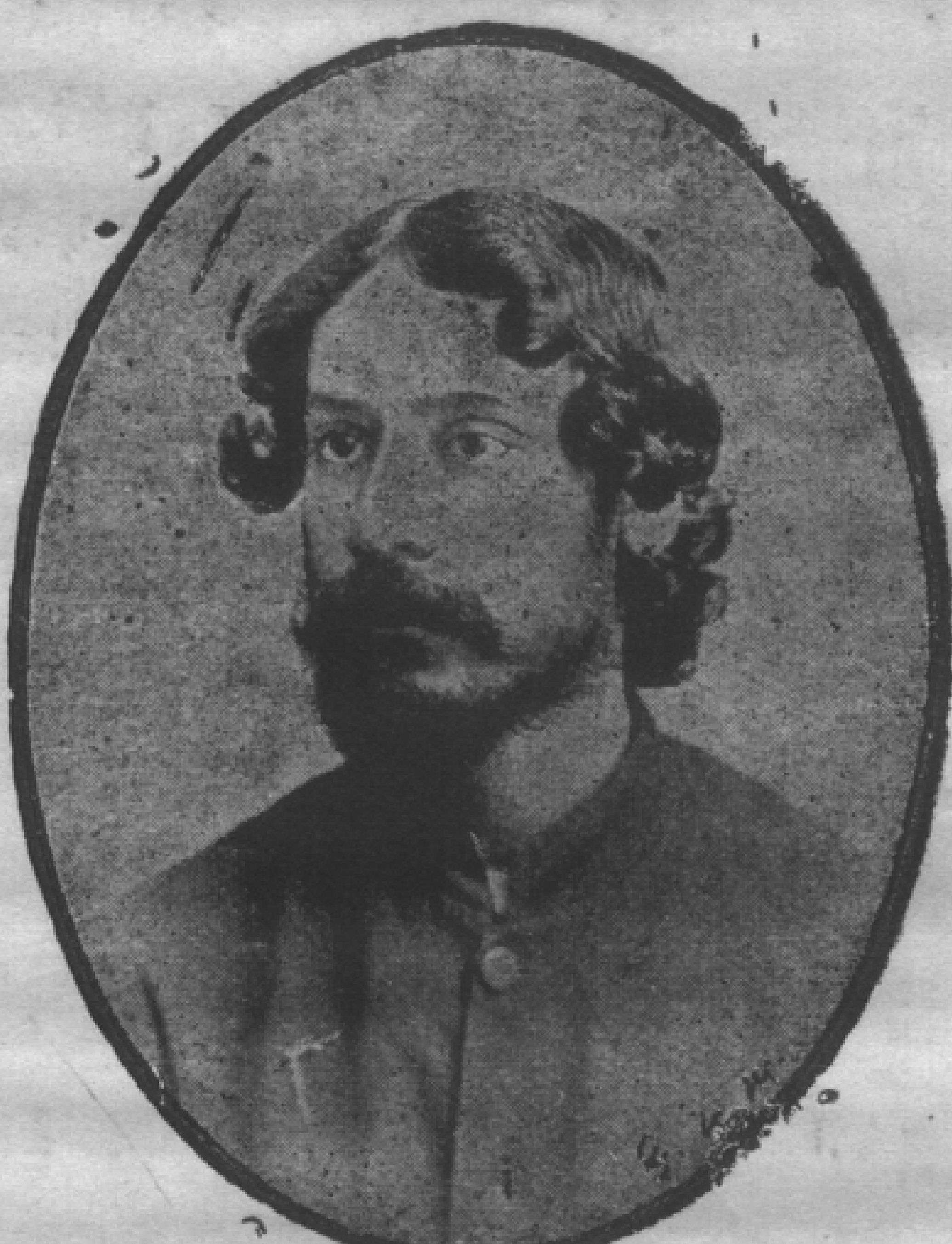
সমালোচনা।

মালঞ্চ।—(খণ্ড কাব্য) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ বিরচিত। মূল্য আটআনা মাত্র। কাব্যখানি কতকগুলি সুমধুর কবিতা সমষ্টিতে পূর্ণ; গ্রন্থকার বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত, বিবিধপত্র ও পত্রিকার সুলেখক, ইতিপূর্ব্বে "অবকাশ" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়া নানা দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনা করতঃ সাহিত্যসমাজে যশস্বী হইয়াছেন; অতএব গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের ও কৃতিত্বের পরিচয় নূতন প্রদান নিষ্প্রয়োজন।

মালঞ্চে প্রকাশিত চিত্তাকর্ষক মধুময়ী কবিতাসমষ্টি পাঠ করিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। প্রত্যেক কবিতার ভাব ও রচনা লালিত্যে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব সমুজ্জ্বল। মালঞ্চের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে মাধুরী ঝরিতেছে।

ভারতভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন।—শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট; মূল্য দেড়টাকা মাত্র। পুস্তকখানি একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। গ্রন্থকার হিমালয় প্রভৃতি নানাপ্রদেশ ও তীর্থস্থান সমূহ ভ্রমণ করিয়া আলোচ্যগ্রন্থে সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; গ্রন্থে রেলওয়ে, ষ্টীমারে, নৌকায়, গাড়ী ও একায় যাতায়াতের কোনস্থানের কিরূপ সুবিধা ও অসুবিধা তাহা বর্ণনা করিয়াছেন, পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি; সুধী সমাজে গ্রন্থখানির সমাদর হইলে সুখী হইব।

জন্মভূমি,—১৩২০ সাল,২১শ বর্ষ।



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। } ১৩২০ সাল, পৌষ। { ৯ম সংখ্যা।

শারীরক্ষ সূত্রভাষ্য বিবৃতি।

লেখক—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"

অথ—অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অথ শব্দের কএকটী অর্থ প্রশ্ন, মঙ্গল কার্য্যের আরম্ভ, আনন্তর্য্য অধিকার প্রতিজ্ঞা, কথিতানুকথন। এস্থলে আনন্তর্য্য অর্থই গ্রহণ করা হইল। অধিকার অর্থ হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকার করা হইল—ইহা সম্ভব নহে। "অথ শব্দানুশাসনং" এই প্রকার জিজ্ঞাসার বিশেষণ বলিয়া ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারার্থ সম্ভব হইলেও জ্ঞানের ইচ্ছা কথনই অধিকার্য্যা হইতে পারে না।

অথ শব্দের সহিত ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানের এস্থলে কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব "অথ—অনন্তর ব্রহ্মমীমাংসার অধিকার করা হইল" এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে না।

মঙ্গলাচার্য্যেও অথ শব্দের প্রয়োগ সমীচীন নহে। কারণ আনন্তর্য্য অর্থে অথ শব্দের প্রয়োগ হইলেও মঙ্গলার্থ হইবার কোন বাধা নাই। অথ শব্দের যে অর্থই ব্যবহৃত হউক না কেন, শ্রবণ মাত্রেই উহা মঙ্গলার্থ হইবে। বাক্যার্থে মঙ্গলের সমন্বয় নাই। শব্দার্থের বাক্যার্থের সহিতই সমন্বয়। এস্থলে শব্দের অর্থ মঙ্গল নহে। মৃদঙ্গধ্বনিবৎ স্বভাবতই মঙ্গলহেতুক। অথ শব্দের আনন্তর্য্য অর্থের লাভ আছে। বিঘ্নের শান্তি, শিষ্টাচার রক্ষা করিবার জন্যই মঙ্গলবাচক শব্দ। ওঙ্কার ও অথ এই দুইটি শব্দ "ব্রহ্মণ কণ্ঠং ভিত্বা বি নির্য্যাতৌ" বলিয়া মাঙ্গলিক। পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষ এই অর্থ আনন্তর্য্যের অন্তর্গত। পূর্ব্ব প্রকৃতাপেক্ষ— (পূর্ব্বে আরব্ধ এমন কিছু অপেক্ষা করিয়া পক্ষ্যান্তরোপন্যাস।) এক্ষণে অর্থ শব্দের আনন্তর্য্যই স্বীকৃত হইল।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা যেরূপ নিয়তই পূর্ব্ব আরব্ধ অসাধারণ কারণ বেদাধ্যয়নের অপেক্ষা করে, এই প্রকার ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও কোন অসাধারণ কারণের অপেক্ষা করিবেই। যাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, সেই পূর্ব্ব আরব্ধ বিষয়টি কি, তাহা বলা আবশ্যক। বেদাধ্যয়ণকে পূর্ব্ব আরব্ধ বিষয় বলিলে কোন ফল হয় না। কারণ ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই উভয় জিজ্ঞাসার পূর্ব্ব আরব্ধ বিষয়ই বেদাধ্যায়ণ হইল। যদি ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়েই বেদাধ্যয়ণের গম্য তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষই থাকে না।

ইহার উত্তরে পূর্ব্বাপক্ষী বলিতেছেন যে, কর্ম্মাবরোধ কর্ম্মজ্ঞানই এ স্থলে পূর্ব্বআরব্ধ অসাধারণ কারণ, বিশেষ ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য কর্ম্মজ্ঞান। সেই কর্ম্মজ্ঞানের অন্তরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। কর্ম্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ।

দীর্ঘকাল উপাসনা-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায়। শ্রেয় বিঘ্নকর পাপধ্বংস দ্বারাও কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। যজ্ঞাদিদ্বারা সংস্কৃত পুরুষ দীর্ঘকাল ব্রহ্মভাবনারূপ কর্ম্মদ্বারা অবিদ্যাবাসনার উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয়, অবিদ্যাবাসনার উচ্ছেদ হইলেই সুপ্রসন্ন প্রত্যগাত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। অথবা কর্ম্মসমুন্বিত ব্রহ্মোপসনাই অবিদ্যার উচ্ছেদ করতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ মোক্ষের জনয়িত্রী—অতএব ব্রহ্মজ্ঞানার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। কর্ম্মাববোধের অনন্তর বলিলে কর্ম্মানুষ্ঠান সহকৃত কর্ম্মাবরোধ পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্তী (ভাষ্যকার) বলিতেছেন—ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে কেহ যদি বেদের অধ্যায়ণ করেন, তিনিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহারা কর্ম্মাবরোধ কর্ম্মজ্ঞানের কোন আবশ্যক নাই। কর্ম্ম-

জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পূর্ব্বপক্ষের এই উত্তর অসমীচীন। কর্ম্মদ্বারা পাপক্ষয় হইলে পর জ্ঞান উৎপন্ন হয়. এই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কর্ম্ম উপকারক। সাক্ষাৎ উপকারক নহে, কারণ কোন ব্যক্তি যদি পূর্ব্বজন্মে কর্ম্মদ্বারা আপনার পাপধ্বংস করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহজন্মে তাঁহাকে আর কর্ম্ম করিতে হইবে না। এই জন্য জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপযোগী নাও হইতে পারে। কর্ম্ম জ্ঞানের জনক হয় না। জ্ঞানত স্বপ্রকাশ। জ্ঞানের উৎপত্তি নাই। উৎপত্তি হইলে জ্ঞান উৎপাদ্য; তাহা হইলে জ্ঞান অনিত্য হইয়া পড়ে। যাহা উৎপাদ্য তাহা বিনাশী। তবে কর্ম্ম পাপধ্বংস দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জনক। অবশ্য চিত্তশুদ্ধি না হইলে স্বতঃ প্রকাশ জ্ঞানের * প্রকাশ হইবে না। "কর্ম্মনা সংসিদ্ধিং গতাঃ।" চিত্তও শুদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম মুক্তির কারণ। কর্ম্ম ভেদ মূলক। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অহঙ্কার ইত্যাদি ভেদজ্ঞানই কর্ম্মের প্রয়োজক।

অবিদ্যাবশতই কর্ম্ম। এই অবিদ্যাজাত কর্ম্ম কখনই স্বপ্রকাশ নিত্য জ্ঞানের সাক্ষাৎ উপকারক হইতে পারে না। কর্ম্ম অবিদ্যাজাত বলিয়া অন্ধকারস্বরূপ। জ্ঞান স্বপ্রকাশ বলিয়া আলোক স্বরূপ, অন্ধকার নাশে আলোকের আবির্ভাব; অন্ধকার আলোকের প্রকাশক নহে। অজ্ঞানের নাশেই জ্ঞানের উদয়। অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের প্রকাশক হয় না। কর্ম্ম-সমুচ্চিত ভাবনা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জন্মে না। কর্ম্ম অবিদ্যা সম্ভূত বিধায় অবিদ্যার নাশক হইতে পারে না। একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক।

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনে র্যোগং কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব কর্ম্মকারণমুচ্যতে॥"

কর্ম্ম দ্বারা শরীর ও মন সংস্কৃত হয়। শরীর মন সংস্কৃত হইলে পর শরীর ও অন্তঃকরণাভিমানী অহঙ্কারোপলক্ষিত জীবাত্মা আপনাকে সংস্কৃত মনে করে মাত্র। কর্ম্মদ্বারা প্রকৃত আত্মা সংস্কৃত হয়েন না।*

বলা হইয়াছে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেও অধীত বেদান্ত পুরুষ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে পারেন। ক্রমানুসারে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আরম্ভ

* জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ কিন্তু আবৃত বৎ থাকে সেই আবরণ নাশে জ্ঞানের প্রকাশ বলা হয়।

* মীমাংসকোক্ত দৃষ্টান্ত আধুনিক যুক্তির অনুমোদিত নহে বলিয়া ত্যাগ করা হইল। যথা প্রযজাদি যাগ অঙ্গস্বরূপ। লেখক।

নহে। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্যে "ক্রম বা শেষশেষিত্ব (অঙ্গাঙ্গিত্ব) বক্তার অভিপ্রেত নহে।

কেন তাহা বলা যাইতেছে ঃ—

ধর্ম্মজিজ্ঞাস ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফলগত ও জিজ্ঞাস্যগত প্রভেদ বর্ত্তমান। ধর্ম্ম জ্ঞানের ফল অভ্যুদয় ঐহিক ও পারলৌকিক আত্মোন্নতি। আত্যন্তিকী মুক্তি নহে।

আর ধর্ম্মজ্ঞান—অনুষ্ঠান সাপেক্ষ। ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল (জ্ঞান জিজ্ঞাসাধীন বলিয়া জ্ঞান ফল ও জিজ্ঞাসার ফল একই) নিঃশ্রেয়স্ আত্যন্তিকী মুক্তি। আর এই ব্রহ্মবিজ্ঞান অনুষ্ঠান সাপেক্ষ নহে। এই হেতু পরস্পরের মধ্যে ক্রম বা শেষ শেষিত্ব থাকিতে পারে না)। ধর্ম্মজিজ্ঞাসাস্থলে জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম ধর্ম্ম ভব্য ভাবী অর্থাৎ কার্য্য, এই কারণে জ্ঞানকালে কার্য্য-স্বরূপ ধর্ম্মের অবস্থিতি সম্ভব নহে; কেন না ধর্ম্ম—কার্য্য চোদনা (প্রেরণা) ব্যাপারের অধীন। চোদনা বৈদিক শব্দ অর্থ প্রেরণা। "চোদনা লক্ষণোধর্ম্মঃ।"

এই প্রকারে প্রেরণা করে বলিয়াই "চোদনা লক্ষণোধর্ম্মঃ।" ব্রহ্ম—ভূত। ভুত অর্থ সিদ্ধ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্থলে সিদ্ধ ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য। যাহা সিদ্ধ, তাহা কার্য্য নহে; যাহা কার্য্য নহে অথচ সিদ্ধ, তাহাই নিত্য, নিত্য বলিয়াই পুরুষ-ব্যাপারের অধীন নহে। প্রেরণাপ্রবৃত্তির বৈলক্ষণ্য হেতু, পুরুষব্যাপারের অধীন নহে। বলিয়াছি চোদনাই ধর্ম্মের লক্ষণ। সেই চোদনা প্রেরণাই স্ব বিষয়ে পুরুষকে নিযুক্ত করতঃ কর্ম্মাবরোধ—ধর্ম্মজ্ঞান জাগাইয়া দেয় (ধর্ম্মো যাগাদিঃ)। ব্রহ্ম প্রেরণামাত্র পুরুষকে কেবল ব্রহ্মবোধ করাইয়া দেয়। বিষয় নাই বলিয়া স্ব বিষয়ে আর নিযুক্ত করে না, ইহাই প্রেরণা (চোদনা) প্রবৃত্তির বৈলক্ষণ্য। অবরোধ বা জ্ঞানের প্রতি চোদনা কারণ নহে; কারণ নহে বলিয়া পুরুষকে জ্ঞানে নিযুক্ত করিতে পারেন না।

তাহা হইলে কাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরব্ধ হইতেছে ইহা বলা প্রয়োজন অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্ব আরব্ধ বিষয়টি কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে;—নিত্য ও অনিত্য বস্তু বিচার ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে বিতৃষ্ণা,* শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান—এই ছয়টি সাধন সম্পত্তি, (মুমুক্ষুতা) মুক্তির ইচ্ছা। এই চারিটীই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্ব আরব্ধ বা পূর্ব্ববৃত্ত।

* চিত্তসংযম শম; বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ দম; শীত গ্রীষ্ম, সুখদুঃখ সহিষ্ণুতা তিতিক্ষা; কাম্যবিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ সন্ন্যাসন উপরতি, গুরু ও বেদান্ত বিশ্বাস শ্রদ্ধা। চিত্তের একাগ্রতা সমাধান।

এই পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সাধনানন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার জন্মে। অন্যথা জন্মে না। সমাদি সংস্কৃত মনই আত্মদর্শনের করণ, কর্ত্তা নহে। অতএব ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পর অথবা পূর্ব্বেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। অতএব ধর্ম্মজিজ্ঞাসার সহিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ক্রম বা শেষ শেষিত্ব সম্ভব নহে। শেষ শেষিত্ব, অঙ্গাদিত্ব।

অতঃ হেত্বর্থ—এই হেতু। যেহেতু—অভ্যুদয় সাধন অগ্নিহোত্রাদি যাগের ফল অনিত্য তাহা বেদেই দৃষ্ট হয়। তদ্বথেই কর্ম্মচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে এতৎ পুণ্যচিতোলোক ক্ষীয়তে।" কর্ম্মার্জ্জিত লোক যেমন ইহকালে ক্ষয়পায়, তদ্রূপ পুণ্যার্জ্জিত লোকও পরলোকে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে যে পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি ঘটে, তাহা "ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতিপরং" ইত্যাদি প্রমাণেই জানা যায়।

তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সাধন সম্পত্তির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই কর্ত্তব্য। ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার কর্ম্ম ব্রহ্ম। এস্থলে কর্ম্মনিষষ্ঠী "প্রতিপদভিধা কৃত্যোগা ষষ্ঠী সমস্ততে" এই বিধানানুসারে কর্ম্মনি ষষ্ঠী নিবিদ্ধ হইলেও "কৃত্যোগা ষষ্ঠী সমস্যতে" এই বিশেষ সূত্রানুসারে সমাস হইয়াছে। জিজ্ঞাসা মাত্রেই জিজ্ঞাস্যকে অপেক্ষা করে, আর এ ক্ষেত্রে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কেহ জিজ্ঞাস্যও নাই—অতএব জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রের সম্মান।

বঙ্গের কবীন্দ্র রবীন্দ্র—সাদাসিধা কথায় বাঙ্গালীর "রবিঠাকুর" এ বৎসর বিখ্যাত "নোবল প্রাইজ" পাইয়াছেন। ডিনামাইটের উদ্ভাবক, জগদ্বিখ্যাত সুইডিস্ বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড্ নোবল মহোদয় সাড়ে সতের লক্ষ পাউণ্ড—প্রায় ২ কোটী ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি রাখিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে পরলোকগমন করেন। তাঁহার অন্তিম-নির্দেশ অনুযায়ী ঐ অগাধ অর্থের আয় হইতে (১) Physics বা পদার্থবিদ্যা, (২) Chemistry বা রসায়ন, (৩) Medicine বা ভৈষজ্য বিজ্ঞান, অথবা Physiology অর্থাৎ শারীরবিদ্যা, (৪) Literature বা সাহিত্য এবং (৫) Preservation of Peace অর্থাৎ জগতের শান্তিরক্ষা, এই পাঁচটী বিষয়ে যাঁহাদের রচনা মনুষ্যসমাজের হিতার্থে বিশেষ উপযোগিনী বলিয়া (contribute most largely to the common good) বিবেচিত

হয়, তাঁহাদের মধ্যে প্রতিবৎসর ৮ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মিঃ নোবলের মৃত্যুর ৪ বৎসর পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মিঃ আর, এফ, এ, সুলি-প্রধান সর্ব্বপ্রথম ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাহার পর একে একে—

১৯০২	খৃষ্টাব্দে	মিঃ টি, মমসেন,
১৯০৩	,,	বি, বর্ণসন,
১৯০৪	,,	এফ, হিষ্ট্রাল এবং জে, ইচিগেরে,
১৯০৫	,,	এক, জে, সিঙ্কিঈজ,
১৯০৬	,,	জি, কার্দ্দশী,
১৯০৭	,,	আর, কীপলিং,
১৯০৮	,,	আর, ইউকেন,
১৯০৯	,,	এস, ল্যাজারলফ,
১৯১০	,,	পি, হেস,
১৯১১	,,	এম, মেটারলিঙ্ক,
	এবং	
১৯১২	,,	,, জি হটম্যান,

এই পুরস্কার পাইয়াছেন। উল্লিখিত তালিকা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে, এ পর্য্যন্ত নোবল প্রাইজ পাশ্চাত্য সাহিত্যিক জড়বৈজ্ঞানিক, অথবা চিকিৎসা-বিদ্যা তথা শরীরবিদ্যা তথা রসায়ন-বিদ্যা-বিশারদদিগের মধ্যেই বিতরিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচ্যখণ্ডের কোন বিদ্যা-বিশারদই এ পর্য্যন্ত ঐ পুরস্কার পান নাই। এবার আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ উহা পাইলেন। ইহাতে কেবল বাঙ্গালা নহে, ভারত নহে; সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডের গৌরব বাড়িল। জড়-বিজ্ঞানে প্রতীচ্য এক্ষণে গৌরব-গিরির উচ্চতম শিখরে সমাসীন; সে ক্ষেত্রে প্রতীচ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সমকক্ষতা করিবার সামর্থ্য প্রাচ্যের নাই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে প্রাচ্য চিরদিনই জগদ্‌গুরুর আসনে সমাসীন। মানুষ কি,—জীবন কি,—আত্মা কি,—আমি কে,—তুমি কে,—কেন আসিলাম, কি করিতেছি,—কেন করিতেছি,—আত্মার পরিণাম কি,—ইহকাল কি,—পরকাল কি,—পরকাল আছে কি না ?—এ সকল গভীর তত্ত্বের সন্ধানে প্রতীচ্য অনেক দিন হইতেই ঘুরিতেছেন;—প্রতীচ্যের মনীষীই এই সকল গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন; কিন্তু বিশেষ যত্নচেষ্টা করিয়াও কেহ উহার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। প্রাচ্যের—ভারতের মনীষিগণ কিন্তু প্রতীচ্য জগতের সভ্যতালোকপ্রাপ্তির বহুশত—

সহস্র সহস্র-বৎসর পূর্ব্বে সেই গভীর আধ্যাত্মিকসিন্ধু মন্থন করিয়া সে সকল নিগূঢ় তত্ত্বের উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্র আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণের সেই তত্ত্বসুধাসিন্ধুর লহরীমালায় ঝাঁপ দিয়া যে কাব্যসুধার সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার রচিত কবিতাগ্রন্থে সেই স্বর্গীয় সুধারসেরই কিঞ্চিৎ ঢালিয়া দিয়া জ্ঞান-রত্নানুসন্ধিৎসু প্রতীচ্যের বিদ্বদ্মণ্ডলীকে বিমোহিত করিয়াছেন। তাহারই ফলে এবার নোবেল প্রাইজের ১,২০০,০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়া নিজে ধন্য হইলেন,—বঙ্গভূমিকে ধন্য করিলেন,—ভারতের গৌরব বাড়াইলেন,—প্রাচ্যের গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন। ভগবদ্ভক্তি, প্রীতি ও প্রেম—এই তিন অপার্থিব স্বর্গীয়সুধারসে রবীন্দ্রের কাব্য পরিপূরিত,—প্রতীচ্য সুধীগণকেই সুধারসের আস্বাদন করিয়া আজ প্রীত—মোহিত—চমকিত। প্রাচ্যের ঈশ্বরবাদের নিকট আজ প্রতীচ্যের জড়বাদ পরাস্ত। বঙ্গের রবীন্দ্র—বাঙ্গালার কবীন্দ্র রবীন্দ্রের 'গীতাঞ্জলি' শুভক্ষণেই সুললিত ইংরাজী গদ্যে অনুদিত হইয়া প্রতীচ্য সুধিমণ্ডলীর নয়নপথে ধৃত হইয়াছিল! যদি রবীন্দ্রের মূলবাক্য—কবিতার অপূর্ব্ব সুধারসাস্বাদনে তাঁহারা সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে আজ কি কলিতেন—জানি না।

ইঙ্গিত।

লেখক—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

তোমারে পূজিতে দেবী, অর্ঘ হাতে যবে—
একাকী বাহিরি আমি উষা স্নিগ্ধ ভবে—
তোমারি মন্দির দ্বারে, চৌদিক মুখরি—
দিশে দিশে বিলাইয়ে সু-স্বর-লহরী—
নব জাগরিত কত বিহঙ্গনিকর—
গেয়ে উঠে সুধা-কণ্ঠে, মোহি চরাচর—
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটে কলি বহে সমীরণ—
মৃদুমন্দ—কি আনন্দে করিয়া লুণ্ঠন—
প্রতি চুম্বনেতে তার ফুল্ল পরিমল!—
নিশির শিশির ঝরে শ্যাম তৃণদল—
আদ্র করি স্নেহভরে সবাই ইঙ্গিতে—
তোমারে জানায় যেন অয়ি শুচিস্মিতে,
প্রাণের অঞ্জলি মোর অর্পিতে ও পায়,—
আমি আসিয়াছি—আমি আসিয়াছি হায়!!!

প্রার্থনা।

লেখক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন পাইন।

দেব! মত্ত মন ধায় চারিধারে—
বাধা, বিঘ্ন নাই মানে কিছু।
শুনিয়াছি, এই বিশ্ব তোমার—
সৃজিত বিশ্ববাসীনরনারী পবিত্র
ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতব ; তবে সেই
নরকুলে লভিয়ে জনম কেন--
মত্ত মন না শুনি বারণ ধায়—
চারিধারে নিজ ইচ্ছামত। তাই
তোমা কহি বিশ্বপতি, অগতির
কিবা হবে গতি! কোন্ পথ
করিলে আশ্রয়, কার নাম
জপিলে হৃদয়ে এই পাপপূর্ণ
ধরা মাঝে মত্তমনে তব চরণের
তলে লয়ে যাব স্থির চিত্তে।
ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, যৌবনে মত্ত
করে ভ্রান্ত মনে! শুনাইয়ে
দেয় কত কথা কল্পনার তানে!
ভুলাইয়ে তব শ্রীচরণ লয়ে
যায় কোন দুর অজানা পথেতে।
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, বিরহ,
বিচ্ছেদ এনে দেয় মনোমাঝে।
খেদ, শান্তি নাহি পাই যেদিকে
তাকাই বিষপূর্ণ হেরি হে সকলি।
তাই তোমা ডাকি দয়াময় কহ হে
উপায়, কেমনে ফিরাব মনে।
মুর্খ আমি তত্ত্বকথা নাহি জানি
কিছু শাস্ত্র কভু করি নাই পাঠ,—
মনোমধ্যে উঠে বহুতর্ক কেমনে বিশ্বাস
ভক্তি হইবে তোমাতে! তাই পুনঃ
কহিহে দয়াল! এই মাত্র চাহে এ
কাঙ্গাল যেন তব জ্ঞানালোক
আসি মনোমাঝে বসি নাশি
দেয় অজ্ঞান তিমির রাশি।

আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া জ্বর।

আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।

লেখক,—আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাতীর্থ কবিরাজ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ বি, এ, এল, এম, এস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জ্বর সর্ব্বত্রই একরূপ, তাহার ভিতর কোনরূপ জাতিগত পার্থক্য নাই; (মহামারির সময়ই হউক, আর অন্য কারণেই হউক।) Yet in every hart of the world feiers a.e the same or in other words feavers are essentially only of one genus.

১৭৬৮ ও ১৭৭১ সালে ডাক্তার জন ক্লার্ক দুইবার এদেশে আগমন করেন। যে সময়ে তিনি এদেশে আসেন, সে সময় বঙ্গদেশে মহামারি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। তিনি ঐ মহামারি স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

তাঁহার মতে জ্বর—

Intermittent

Remittent এবং

Continious

এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—শ্রেণীগত তাহাদের পার্থক্য থাকিলেও কিন্তু জাতিগত কোন পার্থক্য নাই।

ডাক্তার জেমস্ এদেশে অসেন, ১৮১৬ সালের পর। তিনি জ্বরকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করেন,

(১) শরৎ বা শীতঋতু সঞ্জাত সবিরাম জ্বর যথা—

ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ইত্যাদি

(২) বর্ষার প্রারম্ভে সঞ্জাত এবং গ্রীষ্মকালজাত অতিতীব্র প্রদাহযুক্ত অবিরাম জ্বর—বর্ষার জ্বর বহুবিপজ্জনক, বিশেষতঃ যদি তাহা পৈত্তিক হয়।

(৩) গ্রীষ্মের সময় সমুৎপন্ন অবিরাম বা একজ্বরী জ্বর, ইহাতে অন্ত্রে ক্ষত জন্মে।

এই ত্রিবিধ জ্বরই তিনি ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া পরিগণনা করিয়াছেন।

ঐকাহিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক আদি জ্বর যে ম্যালেরিয়া তদ্বিষয়ে—মতদ্বৈধ একরূপ নাই বলিলেও হয়, তবে অপর বিষয়ে জ্বরের মধ্যে প্রথম কয়েকটি ম্যালেরিয়া

হইলেও, শেষোক্তটি এখন টাইফয়েড জ্বর বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন। ইহা ম্যালেরিয়া হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন জাতীয়।

ত্রৈকাহিকাদি জ্বর এবং বর্ষা বা গ্রীষ্ম ঋতু জাত জ্বর যাহা প্রায়শঃ সান্নিপাতিকের আকার ধারণ করে, এতদুভয়কে ডাক্তার আসলার প্রভৃতি খ্যাতনামা চিকিৎকগণ জাতিব হিসাবে ম্যালেরিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীর হিসাবে প্রথমটির নাম Ragularly intermittent এবং দ্বিতীয়টির নাম Æstvio antumnal fever.

আমি এইজন্য পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, মাধবনিদানে জ্বরের উৎপত্তি কথা অধ্যয়ন এবং অধ্যপনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে প্রথমে চরকের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পৌরাণিক মতের দিক দিয়া এইরূপ ভাবে পাঠ করিতে হইবে, যথা—

দ্বিবিধো বিধিভেদেন জ্বর শারীর মানসঃ।
পুনশ্চ দ্বিবিধো দৃষ্টঃ সৌমশ্চাগ্নেয় এবচ॥
অন্তর্ব্বেগো বহির্ব্বেগো দ্বিবিধঃ পুনরুচ্যতে।
প্রাকৃতো বৈকৃতঃ সাধ্যশ্চাসাধ্য এবচ॥
পুন পঞ্চবিধো দৃষ্টাঃ দোষ কাল বলাবলাৎ।
সন্তুতঃ সততোঽন্যেদ্যুস্তৃতীয়ক চতুর্থকৌ॥
পুনরাশ্রয়ভেদেন ধাতুনাং সপ্তধা মতঃ।
ভিন্নঃ কারণভেদেন পুনরষ্টবিধঃ জ্বরঃ।

যদিও চক্রদত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত টীকাকারগণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্পষ্টই বলিয়াছেন—

পুনঃ পঞ্চবিধো দৃষ্ট ইত্যত্র
ন পঞ্চবিধেন ভেদেন সর্ব্বজ্বর ব্যাপ্তিঃ
যতঃ
(১) প্রায়শঃ সন্নিপাতেন, দৃষ্টঃ,
পঞ্চবিধো জ্বর ইতি চ বক্ষতি,
ততঃ
(২) কেবলবাতাদি জ্বরাণাং ন সন্ততাদি
ভেদেন গ্রহণম, তথা সন্তনাদীনাং
(৩) কালোঽ নিয়তাঃ তে সন্ততাদি ভিন্নাএক

তস্মাদ্ দোষকালবলাবলাদ্ যে জ্বরা
ভবন্তি তে পঞ্চবিধা এবেতি বাক্যার্থঃ।

অর্থাৎ সমস্ত জ্বর পঞ্চবিধ একথা বলা অনুচিত কারণ —

পঞ্চবিধ জ্বর প্রায়শঃ সান্নিপাতিক।

তাছাড়া কেবল বতাদি জ্বর সন্ততাদি ভেদে গৃহীত হয় নাই।

তারপর আর একটি কথা—

সন্ততাদি জ্বরে কালের একটা নিয়ম আছে, কালানিয়ত যে জ্বর সুতরাং স্বীকার্য্য তাহা সন্ততাদি ভিন্ন।

এই সব কারণে জ্বরের পঞ্চবিধত্ব অষ্টবিধত্ব হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আমি বলিতেছি, চক্রদত্ত যে কথা বলিয়াছেন, ঋষিদিগের মতে— এবং আয়ুর্ব্বেদের মতে তাহাই বটে, কিন্তু পৌরাণিক মতে যখন বিষমজ্বর ছাড়া আর জ্বর নাই তখন— এই মতে ঐ সকল যুক্তি তর্কের কোন অবসর থাকে না, বা আসে না। বিষমজ্বর বৈকৃত কিম্বা প্রাকৃত হইলেও যদি বর্ষকালোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা প্রায়শঃ সান্নিপাতিকে পরিণত হয়—ইহা আপনারা যেমন প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তেমনি প্রতীচ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্‌গণও অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন। এই দ্বিতীয় প্রকার জ্বর আয়ুর্ব্বেদের পরিভাষায় সন্তত জ্বর কিম্বা তৎসদৃশ। খরনাদ ইহাকে বিষমজ্বর বলিয়া পরিগণনা করিতে প্রস্তুত নহেন, মহর্ষি পুনর্ব্বসু বলেন,— ইহা বিষমজ্বরই বটে।

একতণ্ডুলাভ্যবহার অনশনব্যপদেশবৎ মুক্তানুবন্ধিত্বের আবৃত্তি না থাকায় এবং অল্পত্ব হেতু, এই সন্তত জ্বরের জাতি নির্ণয়ে এই মতদ্বৈধ। ডাক্তারেরা বলেন,—একজাতীয় যে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; তবে ভূতাভিষঙ্গের হিসাবে, সততকাদি হইতে সন্তত পৃথক কেননা, সততকাদিতে যে ভূত বিশেষের অভিষঙ্গ ঘটে, সন্ততকে ঠিক সেই ভূত বিশেষ পরিদৃষ্ট হয় না। তবে উভয়েই animal parasite। টাইফয়েড জ্বর কিম্বা কালাজ্বরের Parasite উদ্ভিজ্জাণু সুতরাং ইহারা ম্যালেরিয়া হইতে স্বতন্ত্র জ্বর— এই সকল জ্বরে কুইনাইন সেবন কার্যকারী হয় না। উপকার দেখিয়া ও বলিতে পারা যায় যে উদ্ভিজ্জাণু হইতে সমুৎপন্ন টাইফয়েড প্রভৃতি সংসর্গজ জ্বর Infectious specific জ্বর ম্যালেরিয়া ; হইতে ভিন্ন জাতীয় ব্যাধি। পৌরাণিক মতকে আশ্রয় করিয়া এখন যদি ধরা যায়, বিষমজ্বর এবং ম্যালেরিয়া একই তত্ত্ব, তাহা হইলে—

সততক ও সন্ততক লইয়া খরনাদ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের মধ্যে যে মতদ্বৈধ, তাহার কারণ বেশ সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

তা ছাড়া আর একটি কথা এখানে আপনাদিগকে জানান আমি প্রয়োজন মনে করি। আমার মনে হয়, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের, কেহ কেহ উপশমের দ্বারাও স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সততকাদি জ্বর সন্ততকাদি জ্বর হইতে ভিন্ন কিনা।

বিজয় তাঁহার মধুকোষে খরনাদের মত উল্লেখ করিয়া অনুমান করিতেছেন, খরনাদ যে সন্ততকে বিষমজ্বরের মধ্যে পরিগণনা করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহার কারণ—

ন তৃতীয়কাদিবৎ, আবৃত্ত্যামুক্ত্যানুবন্ধিত্বমস্ত্যেত্যভিপ্রায়েণ অথবা

যা বিষমজ্বরোল্লেখেনোক্তা সা চিকিৎসা সন্ততবর্জ্জং সততকাদিষু কার্য্যেতি প্রতিপাদনার্থং—

হরিচন্দ্রেণাপি কর্ম্মসাধারণং জহ্যাৎ তৃতীয়ক চতুর্থকবেতি চরকবচনাৎ বিষমজ্বরোক্তচিকিৎসা তৃতীয়ক চতুর্থকয়োরেব।

অন্যেতু দোষপ্রত্যনীক চিকিৎসা কার্য্যেতি ব্যাখ্যাতং

অস্যাং হরিচন্দ্রব্যাখ্যায়াং কর্ম্ম সাধারণং সর্ব্বত্রৈব বিষমজ্বরেকার্য্যং বিশেষণ অন্যথা উক্ত তন্ত্রান্তরবিরোধঃ॥

তৃতীয়ক চতুর্থকয়োরেব দ্রষ্টব্যং।

বিজয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, ঔষধে বা যে প্রণালীর চিকিৎসায় সন্ততজ্বর ভাল হয়, সততকাদিতে ঠিক সে ঔষধ বা সেই প্রণালীর চিকিৎসা বিশেষ ফলদায়ী হয় না; এই জন্য সন্ততজ্বর বিষমজ্বরের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। ফলতঃ উপকার ধরিয়া বিচার করিতে গিয়া আমরা যদি ডাক্তারি মতের অনুবর্ত্তন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই,—কিম্বা এইরূপ অনুমান করিতে পারি, যে সন্ততজ্বরকে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ প্রকৃতপক্ষে দুই ভাগেই বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, এক শ্রেণীতে— যে ঔষধ ফলবতী হয়, অপর শ্রেণীতে সে ঔষধ উপকার আনয়ন করিতে পারে না। এক প্রকার সন্ততজ্বর— বিষমজ্বর আর এক প্রকার সন্ততজ্বর—উপশয়ের দিক দিয়া দেখিলে, বিষমজ্বর নহে—যেমন Æstivo autnmnal fevers এবং Typhoid কিম্বা Kalazar। Æstivo-antnmel fever malaria বলিয়া এখানে কুইনাইন অব্যর্থ, আর Typhoid বা কালাজ্বর malaria নহে

বলিয়া এখানে কুইনাইন তেমন সুফলদায়ক হয় না।

আমি এতক্ষণ সন্তত এবং সততকাদি বিষমজ্বর ধরিয়া যে সকল কথা বলিলাম, খোঁচ খাঁচ যেখানে যাগ আছে ইহাতেও তৎসমস্তই— ম্যালেরিয়া মত— যেখানে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ পরস্পর বিবদমান, ডাক্তারেরাও তাঁহাদের Malaria এবং Inficetive specific disease সম্বন্ধে সেইরূপ নানা বিচার বিতর্ক— এমন কি ঠিক আয়ুর্ব্বেদের যথাযথ অনুকরণে বাদানুবাদ পরিগঠিত করিয়াছেন। এখন যদি ধরিয়া লওয়া যায়, ভূতাভিষঙ্গ বলিতে (আয়ুর্ব্বেদ নয়) পুরাণ জীবাণু এবং উদ্ভিজ্জাণু এতদুভয়কে ভূতশব্দ বাচ্য মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে স্বীকার্য্য যে এই পৌরাণিক সম্প্রদায়ের মতে— জ্বরের বিভাগ নিম্নলিখিত রূপ —জ্বর

বৈষ্ণবজ্বর শিবজ্বর

|

ভূতাভিষঙ্গোত্থ

|

ভূত—

উদ্ভিজ্জাণু	বা	জীবাণু
উদ্ভিজ্জাণু হইতে উৎপন্ন		জীবাণু হইতে উৎপন্ন
সততক ও সন্ততকাদি জ্বর		(১) সততকাদি জ্বর
যাহা প্রাচ্য বিজ্ঞানে,		যাহা আবৃত্তি সহ
Infective specifc		মুক্তানুবন্ধী বা বিসর্গী
diseases		(২) অবিসর্গী।
বা		যথা সন্ততকাদি
সংসর্গজ রোগ।		

ভাবমিশ্র ও সুশ্রুতের মতে এই সংসর্গজ রোগ

জ্বর	মেহ	ব্রণ	কণ্ডু	ভূতোন্মাঙ্গ
যক্ষ্মা	কুষ্ঠ	নেত্রাভিষ্যঙ্গ রোগ	উপদংশ	

এবং মসূরিকাদি ঔপসর্গিক রোগ অর্থাৎ রোমান্তিকা, পানিবসন্ত, শীতলা (বড় জাত বসন্ত) বিসর্প অর্থাৎ যে সকল রোগ

প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রতিনিয়ত মৈথুন (কেহ কেহ বলেন)

গাত্রসংস্পর্শ

নিশ্বাস

একত্র ভোজন

একশয্যা বা আসন

ব্যবহৃত বস্ত্র মাল্যানুলেপন বশতঃ

একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রামিত হয়, তাহাই সংসর্গজ রোগ— ইংরাজিতে Infective deseases চরক প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্যগণ এই সকল রোগে সাধারণ ক্রিয়া হিতকরী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ যুক্তব্যাপাশ্রয় দোষ-প্রত্যনীক চিকিৎসা বা ঔষধি প্রয়োগের সহিত দৈব ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা অর্থাৎ হোমাদি ইংরাজিতে যাহাকে antieiseptic treatment ও Faith cure কহে। আমাদের অপরাজিতা মহেশ্বর ধূপাদিও এ স্থানে উল্লেখযোগ্য।

ডাক্তারদিগের মতের সহিত আমাদের আয়ুর্ব্বেদের প্রতি তথ্যকে যে মিলিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই,— মিলাইলেও অতি সতর্কতার সহিত মিলান কর্ত্তব্য— কেন না আমাদের আয়ুর্ব্বেদ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে সত্য আজও যেমন ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও তেমন। প্রতীচ্যবিজ্ঞান এখনও সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দাড়াইতে পারে নাই। আজ যে মত কাল সে মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং অতি সাবধানে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের মত আয়ুর্ব্বেদের ভিতর আনিতে হইবে। তাই বলিতেছি আয়ুর্ব্বেদে জ্বরের বিভাগ প্রতীচ্য বিজ্ঞানের সহিত কোন কোন স্থানে সদৃশ তত্বের উদ্‌ঘাটন না করিলেও, আমাদের তজ্জন্য লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই! এবং আশা করা যাইতে পারে--প্রতীচ্য বিজ্ঞান কালে এই মতের অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। তবে যতদূর যাহা মিলে, আজ তাহাই আমি এখানে উল্লেখ করিতেছি। এবং উল্লেখ করিতে গিগা এই মাত্র বলিতেছি, যে পৌরাণিক মত ধরিয়া বিষমজ্বরকে সর্ব্বজ্বরব্যাপ্তি বলিয়া স্বীকার করিলে, এবং সেই সঙ্গে ভূতাভিষঙ্গই ইহার মূলে অবস্থিত, এইরূপ মনে করিলে আমাদের এই লাভ হয়, যে তরুণ জ্বরেকে ভয় করিয়া ছাড়িয়া দিয়া বিষমজ্বরের জন্য আমা-দিগকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। দেশের তিনভাগ রোগী যাহা আমাদের হাত হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার আমরা ফিরিয় পাই— এবং পাইয়া দেখাইতে পারি, আয়ুর্ব্বেদ যেমন যক্ষ্মায় জয়যুক্ত, যেমন শোথে ইহার তুল্য আর ফলপ্রদ কোন ঔষধ নাই, উদরাময়ে, অজীর্ণে ইহা ধন্বন্তরি, সেইরূপ তরুণজ্বর, মধ্যজ্বর, জীর্ণজ্বরেও আয়ুর্ব্বেদ বিজয় দুন্দুভি

হস্তে স্ফুরিয়া দণ্ডায়মান হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

যে প্রণালীর চিকিৎসা অবলম্বন করিলে তরুণ জ্বরের চিকিৎসায় আমরা পুনরায় যশস্বী হইতে পারি, এখন আমি তাহাই আপনাদিগকে বলিতে যাইতেছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন এই বিষয় অপনাদিগের তুষ্টিজনক করিয়া বলিতে আজ সক্ষম হই!

আপনারা যদি মনোযোগের সহিত আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন, ইহার দুই স্থানে দুইটি সূত্র আছে, তাহারা পরস্পর কত বিসদৃশ।

প্রথম সূত্রটি মহর্ষি পুনর্ব্বসুর নিজের উক্তি; দ্বিতীয়টি কাহার আমি এ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারি নাই। তবে সূত্রটি এই—

> ন দোষাণাং ন রোগাণাং
> ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্
> ন দেশানং ন কালানং
> কার্য্যং রসচিকিৎসিতে!

শ্রদ্ধাস্পদ বিনোদলাল সেন ইহার অর্থ করিয়াছেন—

"রস চিকিৎসায় দোষ, রোগ, ব্যক্তি, দেশ, কাল, ইহার কিছুই পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।"

প্রথম সূত্রটি এই—

> সূক্ষ্মাণি হি দোষ-ভেষজ-দেশ কাল-বল
> শরীরাআহারসাত্ম্য-সত্ত্ব-প্রকৃতি
> বয়সামবস্থান্তরাণি যান্যনুচিন্ত্যমানানি
> বিমল বিপুল বুদ্ধেরপি বুদ্ধিমালীকুর্য্যুঃ
> কিং পুনরল্প বুদ্ধেঃ।

অর্থাৎ দোষ, ঔষধ, দেশ, কাল, বল, শরীর, আহার, সাত্ম্য সত্ত্ব, প্রকৃতি, বয়সের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এত সূক্ষ্ম যে তাহা চিন্তা করিয়া কার্য্য করা বিমল বিপুলবুদ্ধি লোকের ও সাধ্য হয় না; অল্প বুদ্ধির ত কথাই নাই।

—(বঙ্গবাসী সংস্করণে চরকের অনুবাদ।)

এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই দুইটি সূত্র কত বিসদৃশ! একটিতে দোষাদির বিষয় বিশেষ চিন্তা করিতে বলে; আর একটিতে বলিতেছে, রস চিকিৎসায় এ সকল দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ

জ্বর— চিকিৎসায় ঋষিদিগের ব্যবস্থাপিত পাচন, কষায়, শমন, শোধন ও লঙ্ঘন কখন দিবে বা কখন দিবে না এ সকল তর্ক যুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। জ্বর তা তরুণই হউক, মধ্যই হউক, জীর্ণই হউক, পরক্ষণের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, একবারে (চোখ বুজিয়া রস) প্রয়োগ করিবে।

রস শব্দে যদিও নানা জন নানা অর্থ করেন, কিন্তু এখানে রস অর্থ যে মার্কুরিয়া বা পারা তাহার কোন সন্দেহ নাই।

জ্বররোগী পাইলেই রস প্রয়োগ কর্ত্তব্য প্রাচীন ঋষিদিগের এইমত নহে, কেন না পারদের ব্যবহার তখন প্রচলিত ছিলনা। বৈদিক সময় হইতে পরবর্ত্তী কালীন এই তান্ত্রিক মত। রস প্রয়োগ, তার সঙ্গে জয়পাল প্রভৃতি তীব্র বিরেচনের ব্যবস্থা, কে না জানেন, ভৈষজ্যরত্নাবলীর প্রথম হইতে—৫।৭ পৃষ্ঠায় যে যে ঔষধ আছে, তাহার অধিকাংশেরই ভিতর বিদ্যমান? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি এখানে তরুণ জ্বরের কয়েকটি ঔষধের নাম উল্লেখ করিতেছি—

(১) শীতভঞ্জী রস

ইহাতে পারা, গন্ধক, জয়পাল ও দন্তী আছে।

(২) তরুণ জ্বরারি—

—উপাদান পারা, গন্ধক, বিষ, জয়পাল, ঘৃতকুমারী।

(৩) শ্রীরামরস—

—উপাদান পারা, গন্ধক, মরিচ, জয়পাল, দন্তী।

(৪) নব জ্বরাঙ্কুশ—

—উপাদান, পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল, জয়পাল, দন্তী।

(৫) প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস—

উপাদান হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খই, জয়পাল।

তরুণ জ্বরে রস এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন তীব্র জয়পালের মত বিরেচন, ভৈষজ্যরত্নাবলীর রস চিকিৎসার ক্রম। বিচার বিবেচনা শূন্য এই রস চিকিৎসা।

এইরূপ ঔষধ প্রয়োগের কুফল— আমরা নিজে ভুক্তভোগী না হইলেও বা ভুক্তভোগী হইয়া নিজে নিজে ব্যক্ত না করিলেও, ডাক্তারেরা এই প্রণালীতে জ্বর চিকিৎসা করিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের প্রণীত পুস্তকে এখনও উজ্জ্বল অক্ষরে যে লিপিবদ্ধ তাহা আমি পূর্ব্বেই জানাইয়াছি জানাইয়াছি যে ডাক্তার লিনডে লিখিয়াছেন এ দেশে বয়োবৃদ্ধের মধ্যে যে

ঐতিহাসিক প্রমাদ।

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

সম্প্রতিবঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে রামাই পণ্ডিতের শূণ্য পুরাণ খানি প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের একটী অভাব মিটিয়াছে একথা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে। ইহার ৭৫ পৃষ্ঠা ব্যাপিনী একটা ভূমিকাও লিখিত হইয়াছে। তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা রামাই পণ্ডিতের জন্মস্থান, কর্ম্মস্থান, প্রভাব প্রতিপত্তির স্থান, তাঁহার প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে এবং তদানুসঙ্গিক অনেক বিষয়ের অনেক কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু রেল গাড়ীতে ১৸৶০ আনা ভাড়া, আরও একটাকা জাহাজের ভাড়া দিলে সে স্থানে পৌছিয়া, সেইরূপ ব্যয়ে ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে কলিকাতায় ফিরিয়া আসা যায় সে স্থানের তথ্যাবধারণে ঐতিহাসিক সত্যের এতটা অপলাপ* ঘটিবে ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না। সম্পাদক মহাশয় একজন নামজাদা প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁহার দ্বারা যে এতবড় কাজটা এরূপ ভাবে সম্পন্ন হইবে ইহা কে ভাবিতে পারিয়া ছিল। তাহার নামের এতটা মোহ ও মহিমা যে, তিনি যাহা লিখেন তাহাই সাধারণে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। তিনি যেরূপ ভাবে মুখবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় না যে তিনি আলোচ্য পুস্তক খানিকে আদ্যোপান্ত আপনার দৃষ্টিপথে স্থান দিয়াছিলেন।

"শূন্য পুরাণে অপর মুনির কথা না থাকিলেও মার্কণ্ড মুনির কথা পাইতেছি,"—কিন্তু মূল শূন্য পুরাণের ৩৫ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই—

জেমন আছিল পূর্ব্বে দেব নিবন্ধিত।
বসিষ্ঠ নারদ আইল কুল পুরোহিত॥
আইল্যা কপিল মুনি পরভুর সাক্ষাতে।
ইন্দ্র সুরপতি আইল্যা চাপি ঐরাবতে॥
অগস্ত পুলস্ত আর বাল্মিক আপুনি।
কুঁবের বরুণ আইল্যা জত সব মুনি॥

বড় বড় সমস্ত নামজাদা ঋষিরইত নাম পাওয়া গেল। পুনরায় ১০৬ পৃষ্ঠায়—

* ভূমিকা ৩৸৶ পৃষ্ঠা

"আমরা রামাই পণ্ডিতের পরিচয় প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে হাকন্দ নামক স্থানে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি সেখানে রাণী রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়াছিলেন, সেই চাপাই নামক স্থানের নিকটেই হাকন্দ গ্রাম।"॥

সম্পাদক মহাশয় যেমন বাঁকুড়া ময়নাপুরে ত্রিরাত্রবাসী কাহার নিকট শুনিয়া হাকন্দপুরের হুবহু পরিচয় দিয়াছেন, আমরাও তেমনি ঐ অঞ্চলে একাধিক করিবার ৭।৮ দিন করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলাম। তাহাতে হাকন্দ গ্রামের অস্তিত্বের কথাও শুনি নাই। ভূমিকা পড়িয়া বড়ই সন্দেহ জন্মিল আমার পরম স্নেহাস্পদ টানাদীঘি নিবাসী শ্রীমান্ শ্রীনাথ মণ্ডল ভি, এল, এম, এস ঐ অঞ্চলের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ও সম্মানিত চিকিৎসককে পত্র দ্বারা হাকন্দের অনুসন্ধান জন্য লিখিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন, চাঁপাই ও ময়নাপুরের মধ্যে বা আশপাশে কোথাও হাকন্দ নামে গ্রাম নাই। গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত গ্রাম তালিকাতেও পাইলাম না ধর্ম্মমঙ্গল সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক কথা লিখিয়াছেন, সে সকল প্রবন্ধান্তরে বলিব। কে সম্পাদক মহাশয়কে সংবাদ দিল ;—

"পূর্ব্বোক্ত চাঁপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যে সেই হাকন্দ গ্রাম বিদ্যমান। এখানে বহু প্রাচীন শাক্তকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান।"

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

"সেই সময়ে রামাই পণ্ডিত হাকন্দ নামক স্থানে যোগবলে দেহত্যাগ করেন।" ইহার পাদ টীকায় ঘনরামের এই কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

রামাই পণ্ডিত তনুত্যাগ কৈল যোগে।
সবৎস কপিলা মোল সেনের বিয়োগে॥

(ঘনরাম)

রামাই নরদেহধারী অবশ্য তিনি মরিয়াছেন সত্য কিন্তু সে যাত্রায় নহে। তিনি সিদ্ধ পুরুষ—তাঁহার মত লোকের মরণ বাঁচন ইচ্ছাধীন। পশ্চিম উদয়ের পালায় তিনি যোগে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে আবার ধর্ম্মপূজার ঘট বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন,—

রমাই পণ্ডিত ঘটে দিল বিসর্জ্জন।
নিজস্থানে গেলা প্রভু লয়ে নিজগণ॥*

ঘনরাম বঙ্গবাসী সং ৩২২ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ।

রামাই পণ্ডিতের পিতা বিশ্বনাথ ঠাকুর দ্বারকাপুরী নামক স্থানে অবস্থিতি

* ঐ ২৮৵ পৃষ্ঠা

করিয়া ধর্ম্মসেবা করিতেন, এই দ্বারকা বিষ্ণুপুরের অদূরবর্ত্তী দারকেশ্বর তীরে অবস্থিত, এক্ষণে "দোয়ারকে" নামে প্রসিদ্ধ। দ্বারকার অপভ্রংশে দোয়ারকে বই আর কিছু হইতে পারে না। তাম্রধীরণের পর রামাই এই দ্বারকায় বা দোয়ারকেই আসিয়া যে বাস করিতেন তাহা ঐ পদ্ধতিতেই লিখিত আছে।

ভূমিকা লেখক সম্পাদক মহাশয় আর একটী বড় বীভৎস রসের কথায় পাঠকগণকে স্তম্ভিত করিয়াছেন,—

"যাত্রাসিদ্ধির পদ্ধতি হইতে জানা যায় যে তিনি (রামাই পণ্ডিত) ধর্ম্মমত স্থাপন করিবার উদ্দেশে ও বংশ রক্ষার নিমিত্ত বৃদ্ধ বয়সে কেশবতী নামে এক কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। এই কন্যার সম্ভবতঃ জাতিকুল কিছুই ঠিক ছিলনা, এ কারণেই ধর্ম্মের পাণ্ডাগণ তাঁহাকে ধর্ম্মের দক্ষিণ চরণ সম্ভূতা অযোনিসম্ভবা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাহা হউক এই অজ্ঞাত কুলশীলা কুমারীর গর্ভে বৃদ্ধ রামাই পণ্ডিতের ঔরসে ধর্ম্মদাস জন্মগ্রহণ করিলেন।" *

কিন্তু ময়নাপুরের ডোম পণ্ডিতদের ঘরের যে পদ্ধতিপুস্তক অবলম্বনে উহা লিখিত তাহাতে দেখিতে পাই—*

স্তবে তুষ্ট হয়ে তখন বলে চক্রপাণি।
হাসিয়া ঈষদ বাক্য বলিলেন তিনি ॥
কি মানস তব বাছা বলহ সত্বর।
যাহা চাহ তাহা দিব না হব কাতর ॥
শ্রীরামাই পণ্ডিত বলে শুন মোর বাণী।
এই সময় সেবাযোগ্য পাত্র দেহ আনি ॥
এত শুনি ধর্ম্মরায় ভাবিল অন্তরে।
দক্ষিণ চরণে এক কন্যা জন্ম করে ॥
জন্মমাত্র কন্যা বলে জুড়ি দুই কর।
কি কর্ম্ম করিব বল সংসার ভিতর ॥
ধর্ম্ম বলে কেশবতী নাম যে তোমার।
ধর্ম্মে মতি রবে তব সাধ্বী সতী সার ॥

* ভূমিকা ২৮০ পৃষ্ঠা।
* ঐ ১৲ পৃষ্ঠা।
* ঐ ৮০ পৃষ্ঠা।

রামাইয়ের সেবা কর যাবৎ জীবন।
অন্তকালে মম পদে মিশিবে তখন॥
দাসী দিয়া প্রভু গেলা বৈকুণ্ঠ ভবন।
দাসী পেয়ে রামাইয়ের হরষিত মন॥
রামাই বলে কোলে লহ তুমি ত জননী।
ধর্ম্ম সেবার আয়োজন দেহ সব আনি॥

* * *

অন্যত্র—শ্রীধর্ম্ম বলিয়া রামাই কন্যার গর্ভে হস্ত দিল।
সেই গর্ভে তবে এক বালক জন্মিল॥

একি বিষম রুচিভ্রম! ধর্ম্মঠাকুর আপনার দক্ষিণ চরণে কেশবতীর জন্ম দিয়া রামাই পণ্ডিতের দাসিত্বে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন; রামাই সিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ—কন্যাকে মাতৃ সম্বোধন করিলেন। তাঁহার গর্ভে পুত্রোৎপাদন কালে তিনি তাহার গর্ভে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় রামাইকে কামাতুর সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার মানবীয় চরিত্র চিত্রিত করিয়া কি গর্হিত কাজই করিয়াছেন, রামাই কি পশুভাবাপন্ন যে যাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিলেন, তাহাতেই উপগত হইয়া তাহারই গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিলেন। হিন্দুর অনেক পুরাণেই যে ঋষিতপস্বীগণের দ্বারা এরূপ পুত্রোৎপাদনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সে গুলি কি কাল্পনিক? সম্পাদক মহাশয় হিন্দু হইয়া হিন্দু সমাজে অবস্থিতি করিয়া এমন কথা কেমন করিয়া লিখিলেন?

সম্পাদক মহাশয় আবার এক আজগুবি কথা বলিয়াছেন,—

"সৃষ্টি পতনে একটী নিজস্ব আছে,—যাহা ধর্ম্ম মঙ্গল ছাড়া আর কোথাও পাইতেছিনা,—তাহা উলুক ও বলুকা নদী। রামাই পণ্ডিত এ দুইটীকে কোথা হইতে বাহির করিলেন, তাহা অনুসন্ধেয়।"

আমরা বলি অনুসন্ধান জানিতে হইবে না—বঙ্গবাসীর স্বর্গীয় স্বত্বাধিকারী ৺যোগেন্দ্র চন্দ্রের কল্যাণে আজি বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে শাস্ত্রগ্রন্থ পাওয়া যায়, আলস্য ত্যাগ করিয়া অদ্ভুত রামায়ণের ২২ পৃষ্ঠা দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে,—উলুক পক্ষী জাতীয়—মহর্ষি নারদের সঙ্গীত শিক্ষার গুরু। তিনি মুনী মধ্যে পরিগণিত। আজি এই পর্য্যন্ত বা বারান্তরে ভূমিকার অন্যান্য অংশের আলোচনা করিব।

গীতোক্ত ধর্ম্ম।

লেখক—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল।

জ্ঞান।

ভারতবর্ষ যে জ্ঞান প্রার্থনা করে, তাহাকে অধ্যাত্ম জ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞান বিজ্ঞানে লইয়া যায়, তখন আপনা হইতেই বিবেক আসিয়া উপস্থিত হয়। বিবেকী ব্যক্তিই বৈরাগ্যের সুখ প্রাপ্ত হইবার অধিকারী। তাই ভারতবর্ষ এই জ্ঞানের পরিণতিকে ধর্ম্মবিজ্ঞান আখ্যা দিয়াছেন। কেননা এই বিজ্ঞানই বৈরাগ্যে আনয়ন করে, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, উহা ভারতের বিজ্ঞান নহে, আর্য্যঋষিরা চিরদিনই জড়বিজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা আণুবিক শক্তিকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, নতুবা জড়ের বিশেষ বিশেষ শক্তি দ্বারা তাহাদের দুই বা ততোধিকের সম্মিলনে যে ক্রিয়া হয় সেই ক্রিয়াকেই আমরা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া বলিয়া থাকি, মোট কথা এখনকার ইংরাজী (Science) বলিলে যাহা বুঝায়, বিজ্ঞান বলিলে তাহাই অর্থাৎ জড়বিজ্ঞান বলিয়াই বুঝি, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতে পাইয়াছি, নতুবা ভারতবর্ষ কেবলমাত্র ধর্ম্ম পরিণতি তথাকথিত অধ্যাত্মজ্ঞানের পূর্ণ পরিণতিকেই বিজ্ঞান বলিয়াছেন। এই বিজ্ঞান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় অসম্পূর্ণ নহে, কেননা ইহার ভিত্তি শ্রীভগবানে আত্ম নির্ভর। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। এই জড় বিজ্ঞানের (Science) পূর্ণ উৎকর্ষের দিনে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বহুবিস্তার আলোচনা হইতেছে, কোন দেশ রসায়নে, কোন দেশ উদ্ভিদ বিদ্যায়, কোন দেশ শরীর তত্ত্বে, আবার কোন দেশ বা মনস্তত্ত্বে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বল দেখি, যে বিদ্যাদ্বারা এই ব্যাধি-জরা মৃত্যুসঙ্কুল অত্যন্ত দুঃখময় সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পৃথিবীর কোন দেশ তাহার সন্ধান পাইয়াছে কি? অপিচ যে বিদ্যাদ্বারা এই জন্মেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার কোন প্রচার বা আলোচনা করিবার কোন দেশের সাধ্য হইয়াছে কি? আর এক কথা জড়বিজ্ঞানের দড়ি অসীম, ঐ দড়ি ধরিয়া প্রকৃত জ্ঞান সমুদ্রের কোন এক সীমা পর্য্যন্ত যাইতে পারা যায়, কিন্তু আর্য্য ঋষির অধ্যাত্ম জ্ঞানের (ধর্ম্ম বিজ্ঞানের) দড়ি অসীম বলিয়া উহা জ্ঞান সমুদ্রের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখিতে চেষ্টা করে।

করিয়া ধর্ম্মসেবা করিতেন, এই দ্বারকা বিষ্ণুপুরের অদূরবর্ত্তী দারকেশ্বর তীরে অবস্থিত, এক্ষণে "দোয়ারকে" নামে প্রসিদ্ধ। দ্বারকার অপভ্রংশে দোয়ারকে বই আর কিছু হইতে পারে না। তাম্রধীরণের পর রামাই এই দ্বারকায় বা দোয়ারকেই আসিয়া যে বাস করিতেন তাহা ঐ পদ্ধতিতেই লিখিত আছে।

ভূমিকা লেখক সম্পাদক মহাশয় আর একটী বড় বীভৎস রসের কথায় পাঠকগণকে স্তম্ভিত করিয়াছেন,—

"যাত্রাসিদ্ধির পদ্ধতি হইতে জানা যায় যে তিনি (রামাই পণ্ডিত) ধর্ম্মমত স্থাপন করিবার উদ্দেশে ও বংশ রক্ষার নিমিত্ত বৃদ্ধ বয়সে কেশবতী নামে এক কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। এই কন্যার সম্ভবতঃ জাতিকুল কিছুই ঠিক ছিলনা, এ কারণেই ধর্ম্মের পাণ্ডাগণ তাঁহাকে ধর্ম্মের দক্ষিণ চরণ সম্ভূতা অযোনিসম্ভবা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাহা হউক এই অজ্ঞাত কুলশীলা কুমারীর গর্ভে বৃদ্ধ রামাই পণ্ডিতের ঔরসে ধর্ম্মদাস জন্মগ্রহণ করিলেন।" *

কিন্তু ময়নাপুরের ডোম পণ্ডিতদের ঘরের যে পদ্ধতিপুস্তক অবলম্বনে উহা লিখিত তাহাতে দেখিতে পাই—*

স্তবে তুষ্ট হয়ে তখন বলে চক্রপাণি।
হাসিয়া ঈষদ বাক্য বলিলেন তিনি ॥
কি মানস তব বাছা বলহ সত্বর।
যাহা চাহ তাহা দিব না হব কাতর ॥
শ্রীরামাই পণ্ডিত বলে শুন মোর বাণী।
এই সময় সেবাযোগ্য পাত্র দেহ আনি ॥
এত শুনি ধর্ম্মরায় ভাবিল অন্তরে।
দক্ষিণ চরণে এক কন্যা জন্ম করে ॥
জন্মমাত্র কন্যা বলে জুড়ি দুই কর।
কি কর্ম্ম করিব বল সংসার ভিতর ॥
ধর্ম্ম বলে কেশবতী নাম যে তোমার।
ধর্ম্মে মতি রবে তব সাধ্বী সতী সার ॥

* ভূমিকা ২৮০ পৃষ্ঠা।
* ঐ ১৲ পৃষ্ঠা।
* ঐ ৮০ পৃষ্ঠা।

রামাইয়ের সেবা কর যাবৎ জীবন।
অন্তকালে মম পদে মিশিবে তখন॥
দাসী দিয়া প্রভু গেলা বৈকুণ্ঠ ভবন।
দাসী পেয়ে রামাইয়ের হরষিত মন॥
রামাই বলে কোলে লহ তুমি ত জননী।
ধর্ম্ম সেবার আয়োজন দেহ সব আনি॥

* * *

অন্যত্র—শ্রীধর্ম্ম বলিয়া রামাই কন্যার গর্ভে হস্ত দিল।
সেই গর্ভে তবে এক বালক জন্মিল॥

একি বিষম রুচিভ্রম! ধর্ম্মঠাকুর আপনার দক্ষিণ চরণে কেশবতীর জন্ম দিয়া রামাই পণ্ডিতের দাসিত্বে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন; রামাই সিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ—কন্যাকে মাতৃ সম্বোধন করিলেন। তাঁহার গর্ভে পুত্রোৎপাদন কালে তিনি তাহার গর্ভে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় রামাইকে কামাতুর সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার মানবীয় চরিত্র চিত্রিত করিয়া কি গর্হিত কাজই করিয়াছেন, রামাই কি পশুভাবাপন্ন যে যাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিলেন, তাহাতেই উপগত হইয়া তাহারই গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিলেন। হিন্দুর অনেক পুরাণেই যে ঋষিতপস্বীগণের দ্বারা এরূপ পুত্রোৎপাদনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সে গুলি কি কাল্পনিক? সম্পাদক মহাশয় হিন্দু হইয়া হিন্দু সমাজে অবস্থিতি করিয়া এমন কথা কেমন করিয়া লিখিলেন?

সম্পাদক মহাশয় আবার এক আজগুবি কথা বলিয়াছেন,—

"সৃষ্টি পতনে একটী নিজস্ব আছে,—যাহা ধর্ম্মমঙ্গল ছাড়া আর কোথাও পাইতেছিনা,—তাহা উলুক ও বল্লুকা নদী। রামাই পণ্ডিত এ দুইটীকে কোথা হইতে বাহির করিলেন, তাহা অনুসন্ধেয়।"

আমরা বলি অনুসন্ধান জানিতে হইবে না—বঙ্গবাসীর স্বর্গীয় স্বত্বাধিকারী ৺যোগেন্দ্র চন্দ্রের কল্যাণে আজি বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে শাস্ত্রগ্রন্থ পাওয়া যায়, আলস্য ত্যাগ করিয়া অদ্ভুত রামায়ণের ২২ পৃষ্ঠা দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে,—উলুক পক্ষী জাতীয়—মহর্ষি নারদের সঙ্গীত শিক্ষার গুরু। তিনি মুনী মধ্যে পরিগণিত। আজি এই পর্য্যন্ত বা রান্তরে ভূমিকার অন্যান্য অংশের আলোচনা করিব।

গীতোক্ত ধর্ম্ম।

লেখক—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল।

জ্ঞান।

ভারতবর্ষ যে জ্ঞান প্রার্থনা করে, তাহাকে অধ্যাত্ম জ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞান বিজ্ঞানে লইয়া যায়, তখন আপনা হইতেই বিবেক আসিয়া উপস্থিত হয়। বিবেকী ব্যক্তিই বৈরাগ্যের সুখ প্রাপ্ত হইবার অধিকারী। তাই ভারতবর্ষ এই জ্ঞানের পরিণতিকে ধর্ম্মবিজ্ঞান আখ্যা দিয়াছেন। কেননা এই বিজ্ঞানই বৈরাগ্য আনয়ন করে, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, উহা ভারতের বিজ্ঞান নহে, আর্য্যঋষিরা চিরদিনই জড়বিজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা আণুবিক শক্তিকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, নতুবা জড়ের বিশেষ বিশেষ শক্তি দ্বারা তাহাদের দুই বা ততোধিকের সম্মিলনে যে ক্রিয়া হয় সেই ক্রিয়াকেই আমরা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া বলিয়া থাকি, মোট কথা এখনকার ইংরাজী (Science) বলিলে যাহা বুঝায়, বিজ্ঞান বলিলে তাহাই অর্থাৎ জড়বিজ্ঞান বলিয়াই বুঝি, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতে পাইয়াছি, নতুবা ভারতবর্ষ কেবলমাত্র ধর্ম্ম পরিণতি তথাকথিত অধ্যাত্মজ্ঞানের পূর্ণ পরিণতিকেই বিজ্ঞান বলিয়াছেন। এই বিজ্ঞান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় অসম্পূর্ণ নহে, কেননা ইহার ভিত্তি শ্রীভগবানে আত্ম নির্ভর। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। এই জড় বিজ্ঞানের (Science) পূর্ণ উৎকর্ষের দিনে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বহুবিদ্যার আলোচনা হইতেছে, কোন দেশ রসায়নে, কোন দেশ উদ্ভিদ বিদ্যায়, কোন দেশ শরীর তত্ত্বে, আবার কোন দেশ বা মনস্তত্ত্বে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বল দেখি, যে বিদ্যাদ্বারা এই ব্যাধি-জরা মৃত্যুসঙ্কুল অত্যন্ত দুঃখময় সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পৃথিবীর কোন দেশ তাহার সন্ধান পাইয়াছে কি? অপিচ যে বিদ্যাদ্বারা এই জন্মেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার কোন প্রচার বা আলোচনা করিবার কোন দেশের সাধ্য হইয়াছে কি? আর এক কথা জড়বিজ্ঞানের দড়ি অসীম, ঐ দড়ি ধরিয়া প্রকৃত জ্ঞান সমুদ্রের কোন এক সীমা পর্য্যন্ত যাইতে পারা যায়, কিন্তু আর্য্য ঋষির অধ্যাত্ম জ্ঞানের (ধর্ম্ম বিজ্ঞানের) দড়ি অসীম বলিয়া উহা জ্ঞান সমুদ্রের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখিতে চেষ্টা করে।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, কি বিদ্যার অভাবে অন্যান্য দেশে এই আর্য্য ঋষি প্রণীত ধর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে না? উত্তরে বলিব, জগতের আর কোন জাতির মধ্যে আচার, শুচি, পরাভক্তি বা অপরোক্ষানুভূতির, কথা শুনিতে পাওয়া যায় কি? নয় হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী সবিকল্প সমাধি বা নির্ব্বিকল্প সমাধি কুত্রাপি অভ্যাসের বস্তু হইয়াছে, এই কলিযুগে আর্য্য ঋষির বংশধরগণ নিম্নাভিমুখে চলিয়াছেন, এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারেই হিন্দুর অধোগতি হইতেছে, এই জাতীয় উন্নতির দিনে সকলেই শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বদ্ধ পরিকর হইতেছেন। সকলের মুখেই শুনিতে পাইবে দেশ রসাতলে গেল, এখন হইতে যাপান যাও, অষ্ট্রেলিয়া যাও, আমেরিকা যাও, বিদ্যা শিখিয়া আইস, বৈদেশিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত না হইলে ভারতের আর উপায়ান্তর নাই, আমরা বলি কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও সামান্য দুই চারিটি শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতবর্ষ উন্নত হইবে না, আর্য্যেরা কি শিল্প বিজ্ঞান জানিতেন না? ভারতবর্ষ শিল্পবিজ্ঞানে যত দূর উন্নত হইয়াছিল, ভারত ধর্ম্ম বলে কত বলীয়ান ছিল, ভারতবর্ষীয়েরা প্রকৃত সত্যের আদর কি প্রকার জানিতেন, তাহা ভারতের স্মরণাতীত বৈদিককালের সুবর্ণযুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহার বহুকাল পরেও আমরা ভারত সম্বন্ধে বিদেশীয়ের মুখে যাহা শুনিতে পাই, তাহাতেই ভারতের তাৎকালিক অবস্থা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকি।

ভারতে যে সকল ব্যক্তি বিদেশ হইতে পরিব্রাজকরূপে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মেগাস্থিনি-শের নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, তিনি লিখিতেছেন,—ভারতবর্ষের ন্যায় দেশকুত্রাপি আছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এখানকার ন্যায় সত্যের আদর আমি অন্য কোনদেশে দেখি নাই। গ্রহীতা সূর্য্যকে সাক্ষ্য মান্য করিয়া দাতার নিকট অর্থ গ্রহণ করে, গভীর রাত্রিকালেও দেখিয়াছি, পল্লীস্থ সকলেই দ্বার খুলিয়া শয়ন করিয়া আছে, দস্যু—বৃত্তি, চৌর্য্যবৃত্তি, এ দেশে একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, স্থাপত্য বিদ্যার এরূপ অদ্ভুত কার্য্যকলাপ পূর্ব্বে অন্য কোন দেশে আমি প্রত্যক্ষ করি নাই, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি, লোক সকল ধর্ম্ম নিরত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, মারামারি, কাটাকাটি, দলাদলি এমন কি সামান্য কলহাদি পর্য্যন্তও এখানকার লোক করিতে চাহে না।

তারপর অতি অল্প দিনের কথা বলিলেই ভারতের শিল্প এবং জড়বিজ্ঞানের কথা উপলব্ধি হইবে, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে যখন সার টমাস রো

সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি মোগল বাদসাহকে উপঢৌকন দেওয়ার জন্য তাঁহার দেশ হইতে কতকগুলি শিল্পজাত দ্রব্য আনিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন—আমি আমার দেশ হইতে আসিবার সময় আশা করিয়াছিলাম যে, লণ্ডনের শিল্পবিস্তার উন্নতি দেখিয়া ভারত সম্রাট বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত এবং আহ্লাদিত হইবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সে আশা সফল হয় নাই, আমি দীল্লির দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতেই আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল, বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর কয়েকটী অতি অকিঞ্চিৎকর শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া আমি স্বর্গরাজ্যের রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, দরবার গৃহাভ্যন্তরস্থ শিল্পজাত দ্রব্যাদি দেখিয়া আমার আনীত দ্রব্যগুলি সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস হইল না। তারপর ২।৩ দিন পরে অপর কোন একজন রাজ কর্ম্মচারী দ্বারা ঐ সকল দ্রব্য সম্রাটের নিকট পাঠাইয়াছিলাম।

ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে এরূপ প্রকার বহুবিধ প্রমাণ দেখান যাইতে পারে, যাই হোক যে অধ্যাত্ম বিদ্যায় ভারত উন্নতিতে সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছিল, যুগপ্রাবল্যে আজ অধ্যাত্ম বিদ্যা ভারত ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে বলিয়াই ভারতের এই অধঃপতন। এই অধ্যাত্ম বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা, এই বিদ্যার আলোচনাতেই ভারতবর্ষ সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিল।

আর এখন—এখন এই জড়বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে, জগৎ জড়ের চিন্তা করিতে করিতে জড়ধর্ম্মী হইয়া যাইতেছে, যে শম দম তিতীক্ষা দ্বারা দেবত্ব আসিবে, তাহার ছায়াও কেহ স্পর্শ করিতে চাহে না, সুতরাং কেবল মাত্র বাচক জড়চিন্তা করিয়াই আধ্যাত্মিক জ্ঞান হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িতেছে। যে তত্ত্বালোচনায় মানবের সর্ব্ব দুঃখনিবৃত্তি হইবে, সে দিকে কাহারও কিছুমাত্র রুচি নাই, এ অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত ব্যাধি জরামৃত্যু নিবারণের কথা বা পরম পদ প্রাপ্তির কথা লোকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই [illegible] করিবে, এমন কি কেহ এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে গেলে জড়ধর্ম্মী বৈজ্ঞানিকেরা তাহাকে উন্মাদপাগল বৈ বুদ্ধিমান বলিয়া গ্রহণ করিবে না, ল্যাংটার দেশে বস্ত্র পরিহিত মানুষ দেখিয়া যেমন সকলে উপহাস করে, জরামরণ নিবারণের কথা শুনিয়াও বৈজ্ঞানিকেরা সেইরূপ করিবে।

তাহাই বলিতেছিলাম—যাহা অধ্যাত্ম বা ব্রহ্মবিদ্যা তাহাই ভারতের বিজ্ঞান, ইহা লাভ করিতে হইলে সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইতে হইবে। এই সাত্ত্বিক ভাবই শনৈঃ শনৈঃ জ্ঞানপথে লইয়া গিয়া ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ জীবন্মুক্তির দিকে

লইয়া যাইবে। প্রকৃত জ্ঞান সত্ত্বকেই অবলম্বন করিয়া আছে,—রজঃ বা তমোগুণাশ্রয়ী লোকে কখনও নিত্যানিত্য বস্তু বিচারে সক্ষম হইতে পারে না, যেহেতু মানসিক শক্তির অভাব হইলে ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা ধারণাই হইবে না। শুধু ইহাই নহে, সাত্ত্বিক ভাবে অবস্থান করিলে দীর্ঘ জীবনও লাভ হইয়া থাকে, কিবা মানসিক শক্তি, কিবা দীর্ঘ জীবন, ইহা সত্ত্বগুণাবলম্বীই লাভ করে, সুতরাং সাত্ত্বিকতাই ধর্ম্মবিজ্ঞান লাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। প্রথমে নিরামিষ ভোজী হইয়া সৎশাস্ত্র পাঠ, সৎসঙ্গ অভাবে নিঃসঙ্গ হইয়া জ্ঞান মার্গে গমন করিতে হয়, ইহাই অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের প্রথম এবং প্রধান সহায়। ইহা না হইলে শম দম তিতীক্ষাদি ষটসম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব লাভ করিবার অন্য কোন উপায়ান্তর নাই। এই সত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই ভারতবাসী একদিন জগজ্জয়ী হইয়াছিলেন। কর্ম্মযোগ বলিবার সময়ে বলিয়াছিতো সকল মহান্ কার্য্যে জয়লাভ করাও তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু মনোজয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার—সাত্ত্বিক না হইলে মনোজয়ী হইতে পারা যায় না। মনোজয় দূরের কথা রজঃ বা তমোগুণাশ্রিত জীব সকল সামান্য মাত্র দৈহিক ক্লেশও সহ্য করিতে সক্ষম নহে, মানুষের কথা বলিব কি—ব্যাঘ্রাদি মাংসাসী হিংস্রক পশুকে তুমি দুই দিনমাত্র আহার বন্ধ কর, দেখিবে সে আর উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, চারি দিন আহার বন্ধ রাখিলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর অন্যত্র নিরামিষাসী তৃণলতা ভোজী গো মহিষাদিকে পনর দিন পর্য্যন্ত খাইতে দিও না, দেখিতে পাইবে, পনর দিন আহার না করিয়াও, আবদ্ধ স্থানে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতেছে।

এইক্ষণ অনেকে বলেন, মৎস্য মাংসের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য মানবের পক্ষে সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়। কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখা যায় মানবদেহের কতকাংশ উপাদান উহাতে থাকিলেও ঐ সকল ব্যবহারে মানুষকে পশুত্বে আনয়ন করে, আরও ভারতের ন্যায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মৎস্য মাংসাহারী কখনই দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিবেন না, প্রাগুক্ত পশুদিগের ন্যায় যে সকল মনুষ্য মৎস্য মাংস অধিক পরিমাণে আহার করেন, তাঁহারা একদিন উপবাস সহ্য করিতে পারিবেন না, কিন্তু সাত্ত্বিক নিরামিষ ভোজী পাঁচদিন পর্য্যন্ত আহার না করিয়াও উপবাস জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন।

আজ কাল এই ইংরাজী শিক্ষার প্রাবল্যে অনেকেরই বিশ্বাস, মৎস্য মাংসাদি আহার না করিলে মানবশরীরে প্রকৃত বল বীর্য্যের অভাব হইয়া থাকে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে রাজপুতবংশে একদিন বিশ্বজগৎ বিমোহিত হইয়াছিল, যাঁহা-

দের দ্বাদশবর্ষীয় একজন বালকের শৌর্য্য বীর্য্যে শত সহস্র ব্যক্তিকে মুগ্ধ হইতে হয়, সেই রাজপুত জাতি কি মৎস্য মাংসাহারি? মৎস্য মাংস যে মানবের প্রধান খাদ্য এ কথা বাতুলের মুখেই শোভাপায়।

(ক্রমশঃ)

উষা ও যামিনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুই ভ্রাতা প্রভাতেই গাত্রোত্থান করিলেন। চিন্তাকুলিত হৃদয়! অধিকক্ষণ নিদ্রা হইবে কিরূপে? যেটুকু ঘুমাইয়াছিলেন, তাহাও গাঢ় নিদ্রা নহে।

উষা স্বামীকে ও দেবরকে রাত্রিতেই যামিনীর পিত্রালয় যাইবার কথা সংক্ষেপে শুনাইয়াছিল; এক্ষণে পুনরায় আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবৃত করিল। বরুণাদাসী আসিয়া কিরূপে লুকাইয়া সব কথা শুনিয়াছিল, তাহাও অপ্রকাশ রাখিল না।

জিতেন্দ্রনাথ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—বরুণা শুনে গেছে, তাতে কোন ক্ষতি নাই; একথা শুনে জিতুর শাশুড়ী প্রমাদ করিবে সত্য, কিন্তু আমরা কারও এক পয়সা দেনা রাখিব না, সকলেই কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া পাইবেন।

শুনিয়া উষা বড়ই হৃষ্ট হইল।

জিতেন্দ্রনাথ যাইতে যাইতে কহিলেন,—"যদি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব যায়, পথের ভিখারী হইতে হয়, তাহাও হইব, তথাপি কোথাও দেনা থাকিবে না, এরূপ ব্যবস্থায় বাবা সুখী হবেন। ২।৪ দিনমধ্যে তিনি আসিবেন।"

স্বামীর কথা শুনিয়া অবধি উষা স্বীয় কক্ষে যাইয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিল।

উষাতে যামিনীতে কথা ছিল, উষা লোক পাঠাইবামাত্র যামিনী শ্বশুরালয়ে আসিবে। উষা সেই দিনই একটী দাসীকে যামিনীর পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল। যামিনী সন্ধ্যার পর উদয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। উষা দেখিল, যামিনী নিরভরণা।

ঊষার জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই যামিনী কহিল—"দিদি, মা বলিয়েন, গহনা এর পর পাঠাইয়া দিব।"

ঊষা অলঙ্কারের কথা বেশী কিছু কহিল না; দুই একটী কথা কহিয়া তখন সারিয়া দিল।

রাত্রিতে নিভৃতকক্ষে বসিয়া ঊষা ও যামিনী ক্ষণেক গোলকধাম লইয়া খেলা করিল। খানিক খেলিয়া আর ভাল লাগিল না। এ কথা সে কথায় যামিনী পুনরায় নিজের গহনার কথা উঠাইল; যামিনী জানিত, ঊষা প্রথমে সে কথা উঠাইবে না।

যামিনী কহিল—"দিদি আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল না যে আমি গহনা রেখে আসি; মাকে অনেক জেদাজেদী করিলাম—মা বলিল, গহনার বাক্স লোহার সিন্ধুকে আছে, ইহার পরে পাঠাইয়া দিব।"

ঊষা জিজ্ঞাসা করিল—"যামিনী তোমার বাপের বাড়ীতে শ্বশুরের দেনার কথা কিছু হয়েছিল?"

যামিনী। একটী কথাও না।

ঊষা। বরুণা কোন কথা তুলেছিলো?

যামিনী। আমি যে কয় দিন ছিলাম, কেহ কোন কথা উঠায় নাই।

ঊষা অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া যামিনী জিজ্ঞাসিল—"কি ভাবছ দিদি?"

ঊষা। আমি ভাব্‌ছি বোন্, তোমার ভাশুর যখন তোমার গহনার কথা জিজ্ঞাসা করবেন, আমি কি উত্তর দিব? বাবাও ২।৪ দিন মধ্যে আস্‌বেন।

ঊষার কথা শুনিয়া যামিনীর মুখখানি বিষণ্ণ ও ম্লান হইয়া গেল; তাহা দেখিয়া ঊষা মনে মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিল—ঊষা যামিনীর মুখখানি ধরিয়া কহিল—"মুখখানি শুকিয়ে গেল যে? কিসের ভাবনা বোন্! নারায়ণ সকল দিক রক্ষা করবেন।"

যামিনী। দিদি, তোমার কাছে থাক্‌লে আমি কোন ভাবনাই করিনি। আমি সত্যি বলছি, আমাকে কথা শুনতে হবে ব'লে আমি ভেবে পড়েছি।

ঊষা। কথা শুন্‌তে হবে ব'লে ভাবিনি, আমি ভাব্‌ছি, আমার বুদ্ধির দোষে বাবার কাজ না আটক পড়ে যায়।

যামিনী। বাবার কাজ আটক পড়বে?

ঊষা বাবারই কাজ

যামিনী। আমাকে বলনা দিদি!

ঊষা। কাল ভেবে চিন্তে বল্‌ব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঊষা রাত্রিতে শুইয়া অনেক কথা চিন্তা করিল। যামিনী রাত্রিতে কেবল একটী কথা চিন্তা করিল। ঊষা শ্বশুর, স্বামী, দেবর, যামিনী, যামিনীর পিতামাতা, বরুণাদাসী, দেনাপাওনা ঘটনার চক্র এইরূপ এবং অন্যরূপ কত কথা ভাবিল, যামিনী কেবল ভাবিল, দিদি বল্‌লেন, শ্বশুরের কাজে না আটক প'ড়ে যায়! ঊষার চিন্তা গভীর ও বহু বিস্তৃত, যামিনীর চিন্তাও গভীর কিন্তু অল্পায়ত; ঊষার চিন্তা বহু মানবের অদৃষ্ট লইয়া কার্য্য করিতেছে, যামিনীর চিন্তা একটী মানবের কথা ভাবিতেছে! ঊষা সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিল না—যামিনী গভীর রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

অতি প্রত্যুষে জিতেন্দ্র হিতেন্দ্র, নিমাইচাঁদ ও বিপ্রদাস কার্য্যানুরোধে বহুদূরে যাত্রা করিলেন, তাঁহারা আজ বাটীতে আহারাদি করিবেন না বলিয়া গেলেন; এমন কি তাঁহারা আজ আসিবেন কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ রহিল।

অচঞ্চল, নিস্তরঙ্গ বারিরাশি বায়ুসঞ্চালনে যেরূপ চঞ্চল ও উৎক্ষিপ্তময়ী হইয়া উঠে, দত্তদের সংসারও সেইরূপ এখন ঘটনার ঘূর্ণীপাকে পতিত হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

যামিনী ঊষাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, তুমি শ্বশুরের কাজের আটক কেন হবে?"

ঊষা। আমি ইচ্ছা ক'রে হব না বোন! তবে আমার বুদ্ধির দোষে যদি তাঁর কোন ক্ষতি হয়, তিনি মনে মনে বড় কষ্ট পাবেন।

দুই ভ্রাতৃজায়াতে নানাকথা হইল; রাত্রিতে তাহারা উভয়ে যেরূপ চিন্তা করিয়াছিল, পরস্পর অকপটে প্রকাশ করিল! যামিনীর কথা শুনিয়া ঊষা বুঝিল, যামিনী অনেক কথা চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, সে এখন [illegible] ত্যাগ করিতে পারিবে, এ দুর্জ্জয় সংসার—শ্মশানে তাহার সঙ্গিনী হইতে পারিবে। তাহাকে লইয়া ঊষা অনায়াসে সংসারের ভীষণ ভ্রুকুটী তুচ্ছ করিতে পারিবে। যামিনী বুঝিল, দিদি যাহা বুঝিয়াছে, সমস্তই অভ্রান্ত!

যামিনী এটাও বুঝিল, উপস্থিত বিপৎকালে সে যদি উষার কথা শোনে, শ্বশুরের যথেষ্ট উপকার হইবে এবং উষাও বড় সুখী হইবে।

যামিনী কহিল—"দিদি তোমার কাছে থাকলে, এ জগতে আমি কিছুই ভয় করি না; দিদি, রাজার রাণী ও ভিখারীর স্ত্রী একই লোক; কেবল অবস্থা ভেদ।"

উষা যামিনীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, একটা অপূর্ব্ব এবং অব্যক্ত মহিমা বালিকার বদনে পরিস্ফুট। ভাবে উষার হৃদয় ভরিয়া গেল। উষা ভরা ভরা ধরা ধরা আওয়াজে বলিল—"কেন বোন, ওকথা তোমার মুখ থেকে বেরুল কেন?"

যামিনী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—"দিদি, বেশী কথা বলিও না, আমি তোমার পায়ে ধরি।"

যামিনী ধূলায় লুটাইয়া উষার পদধূলী লইল। উষার হৃদয় সমুদ্র উথলিয়া আসিল। দরবিগলিত ধারে চক্ষু দিয়া অশ্রু বহিল। উষা যামিনীকে তুলিয়া লইয়া নিজের বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। অঙ্গে অঙ্গ মিশিয়া গেল! অন্তরের ভিতর দুইটী যন্ত্রের বিভিন্ন ধ্বনি একসুরে বাজিয়া উঠিল। তাহাদের কাহারও মুখে কোন কথা সরিল না। কিন্তু তাহাদের স্ফীত এবং উন্মত্ত হৃদয়ের অপরিস্ফুট ও অদৃশ্য চৈতন্য শক্তিধারা একত্রে মিশিয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া স্বর্গরাজ্যে পঁহুছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে বেলা হইল। ময়না, মদনা, হীরামোহন কাকাতুয়া জল ছোলার জন্য কলরব করিয়া উঠিল, উষা তাহাদের আহার দিতে ব্যস্ত হইল, যামিনী পাল্কিতে উঠিয়া পিত্রালয়ে গেল।

সেখানে যাইয়া বিনয় করিয়া মাকে অনেক কথা বুঝাইয়া বলিল,—"মা, আমার গহনা আমাকে ফিরাইয়া দাও, নইলে কথাটা ভাল হবে না।"

যামিনীর মা বলিল, "যামিনী তোমার গহনা তুমি ফিরে নেবে, আমার আপত্তি কি? কিন্তু পাগ্‌লী মেয়ে, এ সময়ে আমার কাছে থাকলে তোর ৫০০০ হাজার টাকার গহনা থেকে যেতো। মা যামিনী, তুই তো আমার পেটের মেয়ে।"

যামিনী মাকে বলিল—"মা তুমি স্নেহ করে বলছ। কিন্তু এ সময়ে

আমার কর্ত্তব্য কি? তুমি বার বার আর আমাকে বুঝইবার চেষ্টা করনা মা! তুমি আমার গহনা ফিরে দাও মা।”

যামিনীর মা তথাপি অনেক কথা বলিল, কিন্তু যামিনী শুনিল না, শেষে তিনি গহনা দিতে রাজি হইলেন; কিন্তু বরুণাদাসী বলিয়া উঠিল,—“গহনা কি করে দেবে মা? লোহার সিন্দুকের চাবি বাবা দোকানে নিয়ে গেছেন।”

যামিনী নিজেও চাবির জন্য অনেক অন্বেষণ করিল; কিন্তু কোথাও পাইল না। যামিনী পিতার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। সারাদিন যামিনীর মা ও বরুণা গুজ্ গুজ্ ফুশ্ ফুশ্ করিয়া কত কথা কহিল। যামিনী কহিল,—“মা তোমরা যত কথাই কও, আমি আজ গহনা নিয়ে তবে যাব।”

বরুণাদাসী আড়ালে যাইয়া একমুখ হাসিয়া আপনা আপনি কহিল,—“দেখি, আজ তুমি কি করে গহনা পাও।”

ঊষা যামিনীকে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছিল,—“যদি বোন, এ বেলা না আস্‌তে পার, আমাকে খবরটা দিতেই চাও। নচেৎ আমি বড়ই ভাবনা করব।”

কিন্তু ছেলে মানুষ যামিনী সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গেল।

যামিনী! আজ তুমি ভুলিয়া গিয়া ভালই করিলে।

(ক্রমশঃ)

অতীত স্মৃতি।

শশী গগন শোভন, যাহা হেরিছে নয়ন,
মরুময় সংসারের আনন্দ আলয়।
স্মৃতির আবেশে তার, কি বিষাদ দুঃখ ভার,
গত স্মৃতি হয় যেন সুখ স্বপ্নময়॥

চিন্তা মরীচিকা মায়া, যাহা কিছু এই ছায়া,
অনুভবে কত শান্তি ব্যথিত হৃদয়।
উদ্বেগ উচ্ছ্বাস তার, প্রাণময়ী স্মৃতি যার,
রবিশশী গ্রহ তারা লয়েছে আশ্রয়॥

সমীরণ বহে ধীরে, জোছনা ঘুমায় নীরে,
জুড়ায় তাপিত প্রাণ তোমার ছায়ায়।
তুমি হও দুঃখ জয়ী, সুখ গাথা প্রাণময়ী,
জড়-শক্তি সমাবেশ উদ্ভূত ধরায়॥

স্মৃতি শত অভিমানে, জাগে সকলের প্রাণে
কেবা জানে সংগঠিত তুমি কি মায়ায়।
তুমি প্রেম ভক্তি মূল, তুমি কল্পনার স্থূল,
হৃদয় রাজ্যেতে তুমি সম্রাজ্ঞীর প্রায়॥

জগতে হারাই যাহা, স্মৃতি আনি দেয় তাহা
ভোলা নাহি যায় তারে ভুলিব কেমনে
তব সম কোমলতা, স্নেহ মাখা মধুরতা,
কৃতজ্ঞতা না থাকিত তোমার বিহনে॥

হারালে তোমারে ভুলে, কিছু নাহি রয় মূলে,
উচ্ছ্বাসিত জলধির তরঙ্গ যেমতি।
কভু উঠে হাহাকার, গগন পরশে তার,
অগণিত ঐশ্বর্য্যের তুমি অধিপতি॥

স্মৃতি! আমি সযতনে, হৃদে রাখি তোমা ধনে,
সদয় আমার প্রতি, থেক তুমি সতি!
স্মৃতি! আমি ভক্তি ভাবে, ভাবিয়া তোমার ভাবে,
তোমার বাঞ্ছিত নামে, করিনু প্রণতি॥

সমালোচনা।

শ্রীমহাভারতের বৃহৎ সূচী।—"সংস্কৃত চন্দ্রিকা" সংস্কৃত ভ মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং "ব্রাত্য কায়স্থ চন্দ্রিকা" "বিজ্ঞান কুসুম" ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ প্রণীত, মূল্য একটাকা মাত্র।

বর্ণ ও অধ্যায় অনুক্রমে শ্রীশ্রীমহাভারতের বর্ণানুক্রম বিস্তৃত সূচী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে; আমাদের দেশে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে,—"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।"—এই বাক্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিবার যদি কাহার বাসনা হয়, আমরা তাঁহাকে পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ প্রণীত "শ্রীমহাভারতের বৃহৎ সূচী"—গ্রন্থখানি একবার দর্শন করিতে অনুরোধ করি। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তি মাত্রেরই মহাভারত নিত্য পূজ্য ও পাঠ্য। মহাভারতের ন্যায় অমূল্য মহারত্ন সাগরের কোন স্থানে কোন মহারত্ন লুকায়িত আছে, তাহা আবশ্যক মত খুজিয়া বাহির করা সাধারণ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির দুঃসাধ্য। পরম পূজ্যপাদ সিদ্ধান্ত-ভূষণ মহাশয় বিরচিত এই সমগ্র মহাভারতের বর্ণানুক্রম বিস্তৃত সূচীর সহায়ে, জ্ঞান ও ভক্তি পিপাসুনরনারী সকলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যিনি যে কোন বিষয়ের প্রমাণ মহাভারতের মধ্যে অনুসন্ধান—করিতে চাহেন, তাহা কোথায় কোন শ্লোকে কোন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত আছে, তাহা জানিতে পারিবেন।

এই সুবৃহৎ মহাভারতের সূচী প্রস্তুত করিতে পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয়ের যে কি অমানুষিক পরিশ্রম হইয়াছে, তাহা দেবপুরুষগণই জানিয়াছেন; আমরা পাঠকগণকে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে অসমর্থ। বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত এই কার্য্যে মনোনিবেশ না করিলে একার্য্য সমাধা হইত না, একথা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি; এই সূচীর দ্বারা সাহিত্য ও ধর্ম্ম সংসারের মহৎউপকার সাধিত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

মহাভারত পৃথিবীর আদি ধর্ম্মগ্রন্থ, জ্ঞান ও ভক্তির মহার্ণব স্বরূপ। এইরূপ সুপবিত্র অপূর্ব্ব গ্রন্থের ইংরাজী index এর মত বর্ণানুক্রমে সূচী প্রস্তুত করা যে, কত কঠিন কার্য্য তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার মহাভারতের কোনও আবশ্যকীয় বিষয় বর্ণানুক্রম সূচীতে পরিত্যাগ করেন নাই। অধ্যায়ানুক্রম সূচী দর্শন করিলে আরও মুগ্ধ হইতে হয়; প্রত্যেক অধ্যায়ের টীকাসম্মত অত্যাবশ্যকীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য অধ্যায় ও শ্লোকের ন্যূনাধিক্য আদি প্রমাণের সমস্তই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বহুপরিশ্রমে শাস্ত্র পাঠার্থীর মহাভারত হইতে সার সংগ্রহে যে ফল লাভ হইতে না পারে, তাহা এই সূচীর সাহায্যে অনায়াসে অল্প সময় মধ্যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে। বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর নিকটে এই মহাভারতের

বৃহৎ সূচীর সমাদর হইবে, এবং মহাভারত পাঠার্থীরও অশেষ উপকারে আসিবে, পূজ্যপাদ সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে—আমরা এরূপ সদগ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

হেমপ্রভা।—(বিশালাক্ষীর অভিনব সংস্করণ) উপন্যাস। শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র প্রণীত, কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য দশ আনা মাত্র।

রাধানাথ বাবু বঙ্গীয়সাহিত্য সংসারে সুলেখক বলিয়া সর্ব্বজন সুপরিচিত, তাঁহার প্রণীত "বিশালাক্ষী" উপন্যাসের নূতন সংস্করণে নামান্তর "হেমপ্রভা।"—এই উপন্যাসে সনাতন ধর্ম্মের মহিমা, সুনীতির মাহাত্ম্য, সংসারে হীন চরিত্রের পরিণাম, চরিত্রবানের গৌরব,—প্রদর্শন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।--সেই উদ্দেশ্য যে সম্যকরূপেই সুসিদ্ধ হইয়াছে; ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

উপন্যাস রচনায় গ্রন্থকারের সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় হেমপ্রভা উপন্যাসে প্রস্ফুটিত হইয়াছে,—আমরা উপন্যাস প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণকে হেমপ্রভা উপন্যাসখানি একবার পাঠ কারতে অনুরোধ করি। হেমপ্রভা উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি।

দ্বাদশ বার্ষিক কার্য্য বিবরণী।—কন্খল্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম হইতে প্রকাশিত; আমরা কার্য্য বিবরণীর একখণ্ড উপহার পাইয়াছি। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণাশ্রিত সন্ন্যাসী সেবকগণের দ্বারা দরিদ্রের সেবা রোগীর ঔষধ ও পথ্য নিরাশ্রয়ের আশ্রয় প্রভৃতি দেশের কত যে মহৎ উপকার হইতেছে, তাহা প্রত্যেক নরনারীর প্রত্যক্ষীভূত বিষয়, সুতরাং বিবৃতির নিষ্প্রয়োজন।

ডাইরেক্টারি পঞ্জিকা।— আমরা পি, এম, বাগচী কোম্পানীর ১৩২১ সালের ডাইরেক্টারি পঞ্জিকা যথা সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই পঞ্জিকা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু মাত্রেরই আদরণীয় হইয়াছে। বঙ্গের সুবিখ্যাত অধ্যাপক মণ্ডলী এই সুবৃহৎ পঞ্জিকার ব্যবস্থাপক, সুতরাং হিন্দুর যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড এই পঞ্জিকার ব্যবস্থা দৃষ্টে সুসম্পন্ন করিলে কর্ম্মকাণ্ড পণ্ড হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মাসি
"বিভ
প্রণী



ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত অন্তরঙ্গ সেবক—

ভক্তবীর স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

Janmabhumi Press,—Calcutta.



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। | ১৩২০ সাল, মাঘ। | ১০ম সংখ্যা।

বিবাহ ও সমাজ।

শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জীবনে দুইটি মহাসন্ধিক্ষণ আছে—বিবাহ ও মৃত্যু। মৃত্যু হইলে দেহের পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়; তাহার পর কি হয়, কেহ জানে না। আর বিবাহে—একটি প্রাণের সহিত আর একটি, একটি আত্মার সহিত আর একটি, একটি অস্তিত্বের সহিত আর একটি মিশাইয়া যায়। একটির সহিত আর একটি মিশিয়া দুই হয় না—একই হইয়া যায়। সেই মহাবন্ধন সেই মহামিলন কত পবিত্র, কত মধুর! বিবাহ, স্বর্গ ও সংসারের মহাসন্ধি-স্থল। বিবাহ হইলে সংসার নবদম্পতির উপর সব স্বত্ব পরিত্যাগ করে। বিবাহ স্বর্গের, সংসারের নহে। যে বন্ধনে, যে মিলনে বর ও বধু পরস্পর বদ্ধ ও মিলিত হয়—তাহা পার্থিব নয়। বিবাহবন্ধন স্বর্গীয়, পার্থিব নহে এই জন্য, যে ইহা স্বার্থপরতাশূন্য কেবল তাহাই নহে—এ বন্ধন এই পবিত্র বন্ধন

চিরস্থায়ী, ছিন্ন হইবার নহে; ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতিকালের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি উভয়ে উভয়েরই; তা'র পর কি হয় কে জানে?

প্রেমিক প্রেমিকাকে ভালবাসে, ভালবাসিয়া আপনাকে ভুলে; আপন ভুলিয়া প্রেমিকাকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসাইয়া দেয়,—আর নিজে? নিজে তাহার নীচে; সেই প্রেমিকাধিষ্ঠিত আসনতলে বসিয়া আনন্দে বিভোর হয়। প্রেমিকাও প্রেমিক ভিন্ন আর কাহারও কথা শুনে না, কাহাকেও জানে না, কাহাকেও দেখেও না। প্রেমিকার রূপ, গুণ, ইচ্ছা, আশা, মান, অভিমান, মন, প্রাণ, আত্মা সকলই প্রেমিকের হাতে সমর্পণ করিয়া অপূর্ব্ব ও অপার্থিব সুখ ভোগ করে। প্রেমিক প্রেমিকার এই মহামিলন, মহাদান বিবাহস্থলেই সংঘটিত হয়।

যে পিতামাতা কন্যাকে তাহার জন্মকাল হইতে কত স্নেহে, কত আদরে পোষণ করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই স্নেহের পুত্তলি কন্যাকে বিবাহস্থলে কত আনন্দে পাত্রকরে সম্প্রদান করিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে কন্যা সুখী হইবে এই আশায় তাঁহারা কত আনন্দ লাভ করিলেন।

"বীর প্রসবিনী হও; রত্নগর্ভা হও" বলিয়া তাঁহারা কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাত্রের পিতামাতাও নববধুকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিবার সময় "সাবিত্রী হও, লক্ষ্মী হও; এই গৃহে সম্রাজ্ঞী হও" এই বলিয়া কত কল্যাণ কামনা করিলেন।

বিবাহস্থলে যখন বর ও বধু বেদোক্ত মন্ত্রে অঙ্গীকার করিয়া, দেবতা সাক্ষ্য করিয়া পরস্পর স্বর্গীয় সূত্রে বদ্ধ হয়, তখন সেই পবিত্র স্থান স্বর্গের শোভা ধারণ করিয়া স্বার্থ-কলঙ্কিত সংসারকে উপহাস করে। নবদম্পতি স্বপ্নরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিএক সুখের আস্বাদনে মত্ত হয়, যে সুখ পঙ্কিল সংসারে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইলে, বর বধুকে ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন করাইলে, বধু সেই নীলিমাম্বিত জ্যোতির্মণ্ডিত চিরস্থির ধ্রুব সাক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকেন "ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্" "আমিও পতিগৃহে ধ্রুবের ন্যায় স্থিরা হইয়া থাকিব।" এ উক্তি কত মধুর, কত সুখের।

পতির মান, পতির নাম, পতির সুখ, পতির শান্তি সমস্তই পত্নীর উপর নির্ভর করে। পতিগৃহে পত্নী ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় কেন্দ্রস্থল। পতিগৃহে পত্নী সম্রাজ্ঞী। পতির সুখে, পত্নীর সুখ; পতির দুঃখে পত্নীর দুঃখ, এই জন্যই পত্নী পতির সহধর্ম্মিনী। পতি পত্নীর সম্বন্ধ একদিনের নয়—দুই দিনের নয়—

চিরদিনের; কেবল ইহকালের?—ইহকাল ও পরকাল উভয়ের; যে বন্ধনে পতিপত্নী আবদ্ধ হয় তাহা প্রেমের বন্ধন। প্রেম পার্থিব নহে, স্বর্গীয়। প্রেমের অন্ত নাই। প্রেম রূপোন্মাদ নহে, প্রেম তৃষ্ণা নহে, প্রেম প্রবৃত্তি নহে, প্রেম পণ্যদ্রব্য নহে। প্রেমে গুণগ্রাহিতা আছে, বিনিময় আছে, নিবৃত্তি আছে। মৃত্যু হইলে জীবনের, মর্ত্তের ক্ষণিক অস্তিত্বের লোপ হয় বটে; কিন্তু প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয় না। আত্মা অবিনশ্বর—আর বিবাহে আত্মবিনিময় হয় এবং সেই পবিত্র বিনিময়ের মূলমন্ত্র প্রেম সুতরাং বিবাহের সেই প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে, নিমজ্জিত হইবার নহে, শুষ্ক হইবার নহে—ভঙ্গ হইবারও নহে।

পত্নী বীরপ্রসবিনী ও রত্নগর্ভা হইলে পতির, কেবল পতির কেন, লোকান্তরিত পূর্ব্বপুরুষগণেরও মুখোজ্জ্বল, দেশের গর্ব্বস্থল। বংশে বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পিতার অপেক্ষা মাতার খ্যাতি অধিক হয়। দেশের লোক সেই বীরপ্রসবিনীর পূজার জন্য কত শত অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখে। কতযুগ চলিয়া গিয়াছে, ভারতে বীরসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই জন্য আজ অবধি ভারতবর্ষ বীরজননী নামে অভিহিতা। জননীর মন যদি প্রফুল্ল থাকে তবে সন্তানও প্রফুল্ল ও সদানন্দ হয়—আর জননী যদি চিন্তাকুলা থাকেন তবে সন্তানও দার্শনিক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; সংসার দার্শনিক লইয়া ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পতিকুল সোহাগিনী রমণীর চিন্তার কারণ কি? শক্তিরূপিনী মহিলার মন অকালে ভারাক্রান্ত কেন হয়? চপলা বালিকা পতিগৃহে আসিয়াই কেন গাম্ভীর্য্য অভ্যাস করিতে শিক্ষা করে? নববধুর অর্দ্ধবিকশিত হৃদয়কুসুমে অকালে চিন্তাকীট কেন প্রবেশ করে?

হায় সমাজ! তুমিই ইহার নিদান। লোকহিতের জন্য তোমার প্রতিষ্ঠা, কিন্তু এই কি তোমার লোকহিত ব্রত? পণপ্রথা তুমিই ভাবান্তরিত করিয়া প্রচলিত করিয়াছ। পণপ্রথা পূর্ব্বেও ছিল; কিন্তু এত কদর্য্য, এত হীন ছিল না। পূর্ব্বে পণ ছিল—প্রেম ও আত্মা। বিবাহে প্রাণপণ ছিল না কারণ প্রাণ তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

রোমিও জুলিয়েটকে ভালবাসিত, প্রতিদানে জুলিয়েট রোমিওকে ভালবাসিত। নশ্বর শরীরের ক্ষণস্থায়ী রূপে বিস্মৃত হইয়া উভয়ে উভয়কে ভালবাসে নাই। উভয়ে উভয়কে ইহকাল পরকাল সব দান করিয়াছিল। উভয়ের পিতা ধনকুবের ছিলেন, কিন্তু উভয়েই অর্থকে উপেক্ষা করিয়াছিল

রোমিও জুলিয়েটকে মৃতবৎ শায়িতা দেখিয়া ভাবিল জুলিয়েট আর ইহলোকে নাই। রোমিও বিরহ সহিতে পারিল না। রোমিও বলিল

O, here

Will I set up my everlasting rest and shake the yoke of inauspicious stars from this world wearied flesh,—eyes look your last arms take your last embrace and lips, O, you the doors of breath, seal with a rightous kiss a dateless bargain to engrossig death

... ...

... ...

Thus with a kiss, I die,

বিষপানে রোমিও এই স্বার্থবিজড়িত সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

যখন সখী—এমেলিয়া মৃত্যুশয্যাশায়িতা দেশদিমোনাকে জিজ্ঞাসা করিল "এই নৃশংস কার্য্য কে করিল? প্রেমান্ধ পতিব্রতা উত্তর করিলেন—

"no body, I myself, farewell !"

প্রেমের রাজ্যে কেহ প্রাণপণ করে না; প্রেমে প্রাণ কত তুচ্ছ! আর মূর্খ সমাজ তুমি শিখাইলে, প্রেমের পণ—ঘৃণিত অর্থ! যে অর্থ পরকালে যায় না; ইহকালেও চিরদিন থাকে না—এমন ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল ঘৃণিত অর্থ শেষে প্রেমের পণ হইল! সমাজ তোমার এত অবনতি কোন পাপে হইল? তোমার পাপে ভরা জীর্ণ তরী নরকের বাতাসে ভীষণ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে! দাম্ভিক সমাজ মনে ভাবিও না—তোমার এই তরী কূলে ফিরিবে! যতই সাবধান হও তরী বাঁচিবে না। অনেক দূর গিয়াছে ফিরিবে না। খণ্ড খণ্ড হইয়া বিস্মৃতির জলে ডুবিয়া যাইবে। না ডুবিলে, শিক্ষিত সম্প্রদায় পদাঘাতে ডুবাইয়া দিবে।

সন্তান জন্মিলে আনন্দ করিতে হয়, এই ভাবিয়া পিতামাতা কন্যা ভূমিষ্ঠা হইলে আনন্দ করেন, কিন্তু যখন তোমার অত্যাচারের কথা সব মনে পড়ে তখন কিএক বিষময় চিন্তার অস্পষ্ট কালিমারেখা পিতামাতার মুখে অঙ্কিত হইয়া যায়। পিতা মাতা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হন। তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, "হায় বিধি! একি হইল, শেষে সন্তান হইতে সর্ব্বনাশ

হইল।" আর পুত্র জন্মিলে পিতামাতা ভাবিলেন "যা হ'ক একটা সংস্থান হইল।" বিবাহে কন্যার পিতার নিকট পুত্রের পিতা এত অযথা অর্থ চাহিলেন যাহাতে তাঁহার ভাগ্যনদী উজান বহিতে পারে। যে পুত্রের বিবাহে পিতা অর্থ লাভাশায় এত স্ফীতবক্ষ হইয়া থাকেন সে পুত্রের গুণের মধ্যে প্রধান গুণ এই যে—পুত্রটি পুত্র,—কন্যা নহে। এইরূপ পুত্রের মূল্যও এত অধিক। যে পুত্র সর্ব্বকর্ম্মে সমান পটু অর্থাৎ নিতান্তই অপদার্থ, তাহার পিতার বড় আশা "পুত্রের বিবাহ দিয়া যে অর্থ পাইব তাহাতে পুত্রকে ধনবান করিয়া দিব।" যাঁহার কন্যা হইয়াছে তাঁহার আর দুঃখের সীমা নাই। যদি তিনি কায়ক্লেশে ঋণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া কন্যাটিকে পাত্রস্থা করিলেন, তাহার পরে হয় ত বৈবাহিকের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিল। অপরাধ এই যে শীতের উপহার ভাল হয় নাই—আরও অপরাধ এই যে তিনি দৈবদুর্ব্বিপাকে কন্যার পিতা হইয়াছেন। কন্যা কি এতই ঘৃণিতা? পন্থবীথিকার ভস্ম ক্রয় করিতে হইলেও মূল্য দিতে হয়—আর কন্যা—যে কন্যা মহাশক্তির রূপান্তর, যে কন্যার নিকট রূপে, গুণে নলিনীও পরাজিতা, যে কন্যা ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই কন্যাকে কেহ বিনাপণে গ্রহণ করিবেনা, আর পণ সেই ঘৃণিত অর্থ।

কন্যার পিতা কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। পতিগৃহে আসিয়া কন্যা পিতার সে দুরবস্থা কি ভুলিতে পারে? অবলা বালা নিজের মনে নিজের জীবনে ধিকার দেয়। পিতার কথা ভাবিয়া স্বর্ণলতিকা অকালে শুকাইয়া যায়। পতিগৃহের সুখসম্পদ্ তাহার মনে কিছুই স্থান পায় না। সমাজ, দেবতা সাক্ষ্য করিয়া বলদেখি, অবলার এই দুঃখের একমাত্র নিদান তুমি, না, আর কেহ?

সমাজ, তুমি অস্বীকার করিতেছ—এই শত শত দুঃখিনীর দুঃখের নিদান তুমি নহ? সমাজ, স্থির হও, শুনিতে পাইবে—কতশত অবলা বঙ্গবালা বিরলে বসিয়া তোমার অত্যাচার স্মরণ করিয়া কি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন; তাঁহাদের মর্ম্মভেদী জ্বালাময় দীর্ঘনিশ্বাস মলয়পবনকেও উত্তপ্ত করিয়াছে। সমাজ, চাহিয়া দেখ—কতশত বঙ্গনারী তোমার পাশব আচরণ অহরহ চিন্তা করিয়া তাঁহাদের দেহের স্বর্গীয় লাবণ্য অকালে হারাইয়া বসিয়াছেন। তোমার পীড়নে বিনষ্ট পিতামাতার কথা মনে করিয়া কত কাঁদিতেছেন। তাঁহারা তোমার দোষ দিতেছেন না, তাঁহারা তাঁহাদের জীবনে ধিকার

দিতেছেন। কিন্তু সমাজ, তুমি কি বারেকের জন্য ভাবিয়া দেখ না, বাঙ্গলার পতিব্রতা মহিলাগণের মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাসে তোমাকে অনন্তশূন্যে চিরদিনের জন্য মিশাইয়া দিতে পারে? তুমি কি জাননা, বঙ্গবালার এক ফোঁটা তপ্ত আঁখিজলে তোমাকে অনন্ত সমুদ্রে বিলীন করিতে পারে? তুমি কি জাননা, বাঙ্গলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদাস দৃষ্টিতে শত সহস্র সমাজ নিমেষে ভস্মে পরিণত করিতে পারে? তবে কেন সমাজ, বঙ্গনারীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছ? যাহাতে পুড়িয়া মরিতে হয়, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে এত সাধ কেন?

ঐ দেখ সমাজ, যদি চক্ষু থাকে, চাহিয়া দেখ। কি দেখিলে? একটি পতঙ্গ মহাবহ্নিতে ঝাঁপ দিল। পতঙ্গ ঝাঁপ দিল নিজের সাধ মিটাইবার জন্য নহে—মহাবহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য। বাঙ্গলার হিতের জন্য, কোটি কোটি সমাজপীড়িতা নারীর জন্য, বালিকা অকাতরে আত্মবলিদান দিল। সে দেখিল তাহাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য তাহার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন—বালিকা সেদৃশ্য দেখিতে পারিল না। সে দেখিল যাহার সহিত সে অনন্তকালের জন্য আবদ্ধ হইতে যাইতেছে, সে অর্থ চায়, প্রেম চায় না—বালিকা দাম্পত্যপ্রেমের এ অপমান সহিতে পারিল না। সে দেখিল যে পিতা এতদিন কতদুঃখ কত কষ্টের মধ্যে তাহাকে বুকের মধ্যে রাখিয়া পালন করিয়াছেন সেই স্নেহময় পিতা কাল তাহার জন্য বৃক্ষতলে আশ্রয় লইবেন—পিতৃপ্রেমের এ অপমান বালিকার অসহ্য হইল। সমাজ, তোমার নিষ্ঠুর করাল গ্রাসের সম্মুখে সে আত্মবলি প্রদান করিল। তোমার স্বার্থবহ্নির ভীষণ গর্ভে সে হাসিমুখে আত্মাহুতি দিল। স্নেহলতা চলিয়া গেল। আর আসিবে না, তোমার মুখ দেখিবে না বলিয়াই স্নেহলতা চলিয়া গেল। বাঙ্গলার বড় সৌভাগ্য যে তাহার অযত্নরক্ষিত পুষ্পোদ্যানে নন্দনকাননসম্ভবা স্নেহলতা জন্মিয়াছিল—আর সমাজ—তোমার নিষ্ঠুরতায় স্নেহলতা আজ অকালে উৎপাটিতা—তোমার কাপুরুষতার প্রভাবে আজ বাঙ্গলার উদ্যান আরও শ্রীভ্রষ্টা।

আবার বলি, এই কি সমাজ তোমার লোকহিতব্রত? ভাবিলে বিস্ময় জন্মে, এই লোকহিতব্রত সাধন করিয়া তুমি আজিও জীবিত! সমাজ চাহিয়া দেখ, স্নেহলতার দিকে আর চাহিতে হইবে না; স্নেহলতা ঘুমাইতেছে, ঘুমাইতে দাও, জাগাইও না; জাগাইলে তোমার পক্ষে ফল বিষময় হইবে।

সমাজ, চাহিয়া দেখ, একবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখ। এবার কি দেখিলে? শতসহস্র স্নেহলতা নহে কি? শতসহস্র নারী তোমার অত্যাচার দেখিতে না পারিয়া—চিরদিনের জন্য চক্ষুমুদ্রিত করিয়াছে। শত সহস্র বঙ্গকুমারী সমাজকলঙ্কিত সংসার হইতে অকালে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বঙ্গের শতসহস্র অবলা তোমায় উপহাস করিয়া ঐ নীল আকাশের পরপারে সেই জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছে—যেখানে সমাজ আছে—অত্যাচার নাই; প্রেম আছে—অর্থপণ নাই; দান আছে,—বিক্রয় নাই; বন্ধন আছে—বিচ্ছেদ নাই।

সমাজ, উর্দ্ধে চাহিয়া দেখ,—বঙ্গবালার দুঃখে শূন্যহৃদয় গগণও কাঁদিয়া ব্যাকুল হইতেছে। সেই বিলাপধ্বনি পবনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তুমি কি শুনিতেছ না? ঐ দেখ সমাজ, নদী বহিয়া যাইতেছে; দেখিতে পাইয়াছ কি, বঙ্গবালার চক্ষের জলে নদীবক্ষ কত স্ফীত হইয়াছে? শোন সমাজ, পর্ব্বতের প্রত্যেক গহ্বরে বঙ্গনারীর কি করুণ বিলাপ কি করুণভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

একি সমাজ! পাষাণের ন্যায় স্থির হইলে কেন? তোমার কুটিল নিষ্ঠুর আঁখিদ্বয় বিস্ফারিত হইল কেন? তোমার সে দম্ভ, সে তেজ, সে গাম্ভীর্য্য কোথায় গেল? কে হরণ করিল? একি! তোমার চক্ষে জল কেন? বুঝিয়াছি সমাজ, তুমি তোমার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিতেছ। না, না, তাহা হইবে না। অনেক দুর আসিয়া পড়িয়াছ, কুলে ফিরিতে পারিবে না। প্রবাহে ভাসিয়া যাও, দুঃখ নাই। কিন্তু মূর্খ, নিষ্ঠুর সমাজ, বলিয়া দাও, কোন্ মহাপরাধে নিরপরাধা বঙ্গবালার প্রতি এই শাস্তি বিধান করিয়াছ?

শ্মশান-সঙ্গীত।

লেখক,—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সাহানা-পাহাড়ী—একতালা।

শ্মশানে ঐ সোনার প্রদীপ, জ্ব'ল্‌ছেরে ভাই,
দ্যাখ্ সকলে।
ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ নাচে ভোলা,
হাততালি দে হরি বোলে॥
থাপ্‌টি মেরে টিপিসাড়ে, ব'সল এসে হৃদয় জুড়ে,

সঙ্গিগণে দিল তেড়ে, ফুঁকিয়ে শিঙ্গে কুতুহলে ॥
মরজী কি তার বুঝ্‌ব রে ভাই, কর্ত্তা সে যে জগৎ গোঁসাই,
রামকৃষ্ণ নামের দোহাই, তাই দেই রে সকল ভুলে ॥
বাণী-পূজার সে যে গুরু, কমলাক্ষি কল্পতরু,
কাঙ্গাল-ঠাকুর কৃপাং কুরু,
দেহি স্থান চরণ কমলে ॥

৫ই মাঘ, ১৩২০ সাল।

শবদর্শন।

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

কে তুমি কোথায় যাও, পার দুটা কথা কও,
কতদিন ছিলে এ ধরায় ?
কি কাজ করিতে আল্যা, কিবা তার করি গেল্যা,
লাভ ক্ষতি কি হইল তায়।
কোথা হ'তে এসেছিলে, কাহার ঘরেতে ছিলে,
কেবা সেই হতভাগ্য জন।
তোমারে বিদায় দিয়ে, রহিতে পেরেছে জীয়ে,
বল সেই কোন অভাজন ॥
দেখি তোমা সব জন, জিজ্ঞাসিতে চাহে মন,
আছে কি জননী অভাগিনী।
সঙ্গিনী কি ছিল হেথা, দিয়া তারে মনোব্যথা,
চলিলে করিয়া অনাথিনী ॥
দেখে ছিলে পুত্রমুখ ? সংসারের সার সুখ,
ভোগে হয়্যাছিলে ভাগ্যবান।
রাখি গেলে কারে কারে, আর্ত্তনাদ করিবারে,
ধরি ভারভূত দেহ প্রাণ ॥
বসায়ে সুখের হাট, ভাঙ্গি দিলে সেই ঠাট,
হাহাকার করিছে স্বজন।
কত করে ছিলে আশা, ভাঙ্গিলে তাহার বাসা,
ব্যর্থ হ'লো এ নরজীবন ॥



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। | ১৩২০ সাল, মাঘ। | ১০ম সংখ্যা।

বিবাহ ও সমাজ।

শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জীবনে দুইটি মহাসন্ধিক্ষণ আছে—বিবাহ ও মৃত্যু। মৃত্যু হইলে দেহের পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়; তাহার পর কি হয়, কেহ জানে না। আর বিবাহে—একটি প্রাণের সহিত আর একটি, একটি আত্মার সহিত আর একটি, একটি অস্তিত্বের সহিত আর একটি মিশাইয়া যায়। একটির সহিত আর একটি মিশিয়া দুই হয় না—একই হইয়া যায়। সেই মহাবন্ধন সেই মহামিলন কত পবিত্র, কত মধুর! বিবাহ, স্বর্গ ও সংসারের মহাসন্ধি-স্থল। বিবাহ হইলে সংসার নবদম্পতির উপর সব স্বত্ব পরিত্যাগ করে। বিবাহ স্বর্গের, সংসারের নহে। যে বন্ধনে, যে মিলনে বর ও বধু পরস্পর বদ্ধ ও মিলিত হয়—তাহা পার্থিব নয়। বিবাহবন্ধন স্বর্গীয়, পার্থিব নহে। এই জন্য, যে ইহা স্বার্থপরতাশূন্য কেবল তাহাই নহে—এ বন্ধন এই পবিত্র মিলন

চিরস্থায়ী, ছিন্ন হইবার নহে; ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতিকালের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি উভয়ে উভয়েরই; তা'র পর কি হয় কে জানে?

প্রেমিক প্রেমিকাকে ভালবাসে, ভালবাসিয়া আপনাকে ভুলে; আপন ভুলিয়া প্রেমিকাকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসাইয়া দেয়,—আর নিজে? নিজে তাহার নীচে; সেই প্রেমিকাধিষ্ঠিত আসনতলে বসিয়া আনন্দে বিভোর হয়। প্রেমিকাও প্রেমিক ভিন্ন আর কাহারও কথা শুনে না, কাহাকেও জানে না, কাহাকেও দেখেও না। প্রেমিকার রূপ, গুণ, ইচ্ছা, আশা, মান, অভিমান, মন, প্রাণ, আত্মা সকলই প্রেমিকের হাতে সমর্পণ করিয়া অপূর্ব্ব ও অপার্থিব সুখ ভোগ করে। প্রেমিক প্রেমিকার এই মহামিলন, মহাদান বিবাহস্থলেই সংঘটিত হয়।

যে পিতামাতা কন্যাকে তাহার জন্মকাল হইতে কত স্নেহে, কত আদরে পোষণ করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই স্নেহের পুত্তলি কন্যাকে বিবাহস্থলে কত আনন্দে পাত্রকরে সম্প্রদান করিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে কন্যা সুখী হইবে এই আশায় তাঁহারা কত আনন্দ লাভ করিলেন।

"বীর প্রসবিনী হও; রত্নগর্ভা হও" বলিয়া তাঁহারা কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাত্রের পিতামাতাও নববধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিবার সময় "সাবিত্রী হও, লক্ষ্মী হও; এই গৃহে সম্রাজ্ঞী হও" এই বলিয়া কত কল্যাণ কামনা করিলেন।

বিবাহস্থলে যখন বর ও বধূ বেদোক্ত মন্ত্রে অঙ্গীকার করিয়া, দেবতা সাক্ষ্য করিয়া পরস্পর স্বর্গীয় সূত্রে বদ্ধ হয়, তখন সেই পবিত্র স্থান স্বর্গের শোভা ধারণ করিয়া স্বার্থ-কলঙ্কিত সংসারকে উপহাস করে। নবদম্পতি স্বপ্নরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিএক সুখের আস্বাদনে মত্ত হয়, যে সুখ পঙ্কিল সংসারে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইলে, বর বধুকে ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন করাইলে, বধূ সেই নীলিমান্বিত জ্যোতির্মণ্ডিত চিরস্থির ধ্রুব সাক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকেন "ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্" "আমিও পতিগৃহে ধ্রুবের ন্যায় স্থিরা হইয়া থাকিব।" এ উক্তি কত মধুর, কত সুখের।

পতির মান, পতির নাম, পতির সুখ, পতির শান্তি সমস্তই পত্নীর উপর নির্ভর করে। পতিগৃহে পত্নী ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় কেন্দ্রস্থল। পতিগৃহে পত্নী সম্রাজ্ঞী। পতির সুখে, পত্নীর সুখ; পতির দুঃখে পত্নীর দুঃখ, এই জন্যই পত্নী পতির সহধর্ম্মিনী। পতি পত্নীর সম্বন্ধ একদিনের নয়—দুই দিনের নয়—

চিরদিনের; কেবল ইহকালের?—ইহকাল ও পরকাল উভয়ের; যে বন্ধনে পতিপত্নী আবদ্ধ হয় তাহা প্রেমের বন্ধন। প্রেম পার্থিব নহে, স্বর্গীয়। প্রেমের অন্ত নাই। প্রেম রূপোন্মাদ নহে, প্রেম তৃষ্ণা নহে, প্রেম প্রবৃত্তি নহে, প্রেম পণ্যদ্রব্য নহে। প্রেমে গুণগ্রাহিতা আছে, বিনিময় আছে, নিবৃত্তি আছে। মৃত্যু হইলে জীবনের, মর্ত্তের ক্ষণিক অস্তিত্বের লোপ হয় বটে; কিন্তু প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয় না। আত্মা অবিনশ্বর—আর বিবাহে আত্মবিনিময় হয় এবং সেই পবিত্র বিনিময়ের মুলমন্ত্র প্রেম সুতরাং বিবাহের সেই প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে, নিমজ্জিত হইবার নহে, শুষ্ক হইবার নহে—ভঙ্গ হইবারও নহে।

পত্নী বীরপ্রসবিনী ও রত্নগর্ভা হইলে পতির, কেবল পতির কেন, লোকান্তরিত পূর্ব্বপুরুষগণেরও মুখোজ্জ্বল, দেশের গর্ব্বস্থল। বংশে বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পিতার অপেক্ষা মাতার খ্যাতি অধিক হয়। দেশের লোক সেই বীরপ্রসবিনীর পূজার জন্ম কত শত অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখে। কতযুগ চলিয়া গিয়াছে, ভারতে বীরসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই জন্য আজ অবধি ভারতবর্ষ বীরজননী নামে অভিহিতা। জননীর মন যদি প্রফুল্ল থাকে তবে সন্তানও প্রফুল্ল ও সদানন্দ হয়—আর জননী যদি চিন্তাকুলা থাকেন তবে সন্তানও দার্শনিক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; সংসার দার্শনিক লইয়া ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পতিকুল সোহাগিনী রমণীর চিন্তার কারণ কি? শক্তিরূপিনী মহিলার মন অকালে ভারাক্রান্ত কেন হয়? চপলা বালিকা পতিগৃহে আসিয়াই কেন গাম্ভীর্য্য অভ্যাস করিতে শিক্ষা করে? নববধুর অর্দ্ধবিকশিত হৃদয়কুসুমে অকালে চিন্তাকীট কেন প্রবেশ করে?

হায় সমাজ! তুমিই ইহার নিদান। লোকহিতের জন্য তোমার প্রতিষ্ঠা, কিন্তু এই কি তোমার লোকহিত ব্রত? পণপ্রথা তুমিই ভাবান্তরিত করিয়া প্রচলিত করিয়াছ। পণপ্রথা পূর্ব্বেও ছিল; কিন্তু এত কদর্য্য, এত হীন ছিল না। পূর্ব্বে পণ ছিল—প্রেম ও আত্মা। বিবাহে প্রাণপণ ছিল না কারণ প্রাণ তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

রোমিও জুলিয়েটকে ভালবাসিত, প্রতিদানে জুলিয়েট রোমিওকে ভালবাসিত। নশ্বর শরীরের ক্ষণস্থায়ী রূপে বিস্মৃত হইয়া উভয়ে উভয়কে ভালবাসে নাই। উভয়ে উভয়কে ইহকাল পরকাল সব দান করিয়াছিল। উভয়ের পিতা ধনকুবের ছিলেন, কিন্তু উভয়েই অর্থকে উপেক্ষা করিয়াছিল

রোমিও জুলিয়েটকে মৃতবৎ শায়িতা দেখিয়া ভাবিল জুলিয়েট আর ইহলোকে নাই। রোমিও বিরহ সহিতে পারিল না। রোমিও বলিল

O, here

Will I set up my everlasting rest and shake the yoke of inauspicious stars from this world wearied flesh,—eyes look your last arms take your last embrace and lips, O, you the doors of breath, seal with a rightous kiss a dateless bargain to engrossig death

... ...

... ...

Thus with a kiss, I die,

বিষপানে রোমিও এই স্বার্থবিজড়িত সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

যখন সখী—এমেলিয়া মৃত্যুশয্যাশায়িতা দেশদিমোনাকে জিজ্ঞাসা করিল "এই নৃশংস কার্য্য কে করিল? প্রেমান্ধ পতিব্রতা উত্তর করিলেন—

"no body, I myself, farewell!"

প্রেমের রাজ্যে কেহ প্রাণপণ করে না; প্রেমে প্রাণ কত তুচ্ছ! আর মূর্খ সমাজ তুমি শিখাইলে, প্রেমের পণ—ঘৃণিত অর্থ! যে অর্থ পরকালে যায় না; ইহকালেও চিরদিন থাকে না—এমন ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল ঘৃণিত অর্থ শেষে প্রেমের পণ হইল! সমাজ তোমার এত অবনতি কোন পাপে হইল? তোমার পাপে ভরা জীর্ণ তরী নরকের বাতাসে ভীষণ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে! দাম্ভিক সমাজ মনে ভাবিও না—তোমার এই তরী কূলে ফিরিবে! যতই সাবধান হও তরী বাঁচিবে না। অনেক দুর গিয়াছে ফিরিবে না। খণ্ড খণ্ড হইয়া বিস্মৃতির জলে ডুবিয়া যাইবে। না ডুবিলে, শিক্ষিত সম্প্রদায় পদাঘাতে ডুবাইয়া দিবে।

সন্তান জন্মিলে আনন্দ করিতে হয়, এই ভাবিয়া পিতামাতা কন্যা ভূমিষ্ঠা হইলে আনন্দ করেন, কিন্তু যখন তোমার অত্যাচারের কথা সব মনে পড়ে তখন কিএক বিষময় চিন্তার অস্পষ্ট কালিমারেখা পিতামাতার মুখে অঙ্কিত হইয়া যায়। পিতা মাতা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হন। তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, "হায় বিধি! একি হইল, শেষে সন্তান হইতে সর্ব্বনাশ

হইল।" আর পুত্র জন্মিলে পিতামাতা ভাবিলেন "যা হ'ক একটা সংস্থান হইল।" বিবাহে কন্যার পিতার নিকট পুত্রের পিতা এত অযথা অর্থ চাহিলেন যাহাতে তাঁহার ভাগ্যনদী উজান বহিতে পারে। যে পুত্রের বিবাহে পিতা অর্থ লাভাশায় এত স্ফীতবক্ষ হইয়া থাকেন সে পুত্রের গুণের মধ্যে প্রধান গুণ এই যে—পুত্রটি পুত্র,—কন্যা নহে। এইরূপ পুত্রের মূল্যও এত অধিক। যে পুত্র সর্ব্বকর্ম্মে সমান পটু অর্থাৎ নিতান্তই অপদার্থ, তাহার পিতার বড় আশা "পুত্রের বিবাহ দিয়া যে অর্থ পাইব তাহাতে পুত্রকে ধনবান করিয়া দিব।" যাঁহার কন্যা হইয়াছে তাঁহার আর দুঃখের সীমা নাই। যদি তিনি কায়ক্লেশে ঋণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া কন্যাটিকে পাত্রস্থা করিলেন, তাহার পরে হয় ত বৈবাহিকের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিল। অপরাধ এই যে শীতের উপহার ভাল হয় নাই—আরও অপরাধ এই যে তিনি দৈবদুর্ব্বিপাকে কন্যার পিতা হইয়াছেন। কন্যা কি এতই ঘৃণিতা? পল্লবীথিকায় ভস্ম ক্রয় করিতে হইলেও মূল্য দিতে হয়—আর কন্যা—যে কন্যা মহাশক্তির রূপান্তর, যে কন্যার নিকট রূপে, গুণে নলিনীও পরাজিতা, যে কন্যা ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই কন্যাকে কেহ বিনাপণে গ্রহণ করিবেনা, আর পণ সেই ঘৃণিত অর্থ।

কন্যার পিতা কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। পতিগৃহে আসিয়া কন্যা পিতার সে দুরবস্থা কি ভুলিতে পারে? অবলা বালা নিজের মনে নিজের জীবনে ধিক্কার দেয়। পিতার কথা ভাবিয়া স্বর্ণলতিকা অকালে শুকাইয়া যায়। পতিগৃহের সুখসম্পদ্ তাহার মনে কিছুই স্থান পায় না। সমাজ, দেবতা সাক্ষ্য করিয়া বলদেখি, অবলার এই দুঃখের একমাত্র নিদান তুমি, না, আর কেহ?

সমাজ, তুমি অস্বীকার করিতেছ—এই শত শত দুঃখিনীর দুঃখের নিদান তুমি নহ? সমাজ, স্থির হও, শুনিতে পাইবে—কতশত অবলা বঙ্গবালা বিরলে বসিয়া তোমার অত্যাচার স্মরণ করিয়া কি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন; তাঁহাদের মর্ম্মভেদী জ্বালাময় দীর্ঘনিশ্বাস মলয়পবনকেও উত্তপ্ত করিয়াছে। সমাজ, চাহিয়া দেখ—কতশত বঙ্গনারী তোমার পাশব আচরণ অহরহ চিন্তা করিয়া তাঁহাদের দেহের স্বর্গীয় লাবণ্য অকালে হারাইয়া বসিয়াছেন। তোমার পীড়নে বিনষ্ট পিতামাতার কথা মনে করিয়া কত কাঁদিতেছেন। তাঁহারা তোমার দোষ দিতেছেন না, তাঁহারা তাঁহাদের জীবনে ধিক্কার

দিতেছেন। কিন্তু সমাজ, তুমি কি বারেকের জন্য ভাবিয়া দেখ না বাঙ্গলার পতিব্রতা মহিলাগণের মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাসে তোমাকে অনন্তশূন্যে চিরদিনের জন্য মিশাইয়া দিতে পারে? তুমি কি জাননা, বঙ্গবালার এক ফোঁটা তপ্ত আঁখিজলে তোমাকে অনন্ত সমুদ্রে বিলীন করিতে পারে? তুমি কি জাননা, বাঙ্গলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদাস দৃষ্টিতে শত সহস্র সমাজ নিমেষে ভস্মে পরিণত করিতে পারে? তবে কেন সমাজ, বঙ্গনারীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছ? যাহাতে পুড়িয়া মরিতে হয়, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে এত সাধ কেন?

ঐ দেখ সমাজ, যদি চক্ষু থাকে, চাহিয়া দেখ। কি দেখিলে? একটি পতঙ্গ মহাবহ্নিতে ঝাঁপ দিল। পতঙ্গ ঝাঁপ দিল নিজের সাধ মিটাইবার জন্য নহে—মহাবহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য। বাঙ্গলার হিতের জন্য, কোটি কোটি সমাজপীড়িতা নারীর জন্য, বালিকা অকাতরে আত্মবলিদান দিল! সে দেখিল তাহাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য তাহার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন—বালিকা সেদৃশ্য দেখিতে পারিল না। সে দেখিল যাহার সহিত সে অনন্তকালের জন্য আবদ্ধ হইতে যাইতেছে, সে অর্থ চায়, প্রেম চায় না—বালিকা দাম্পত্যপ্রেমের এ অপমান সহিতে পারিল না। সে দেখিল যে পিতা এতদিন কতদুঃখ কত কষ্টের মধ্যে তাহাকে বুকের মধ্যে রাখিয়া পালন করিয়াছেন সেই স্নেহময় পিতা কাল তাহার জন্য বৃক্ষতলে আশ্রয় লইবেন—পিতৃপ্রেমের এ অপমান বালিকার অসহ্য হইল। সমাজ, তোমার নিষ্ঠুর করাল গ্রাসের সম্মুখে সে আত্মবলি প্রদান করিল। তোমার স্বার্থবহ্নির ভীষণ গর্ব্বে সে হাসিমুখে আত্মাহুতি দিল। স্নেহলতা চলিয়া গেল। আর আসিবে না, তোমার মুখ দেখিবে না বলিয়াই স্নেহলতা চলিয়া গেল। বাঙ্গলার বড় সৌভাগ্য যে তাহার অযত্নরক্ষিত পুষ্পোদ্যানে নন্দনকাননসম্ভবা স্নেহলতা জন্মিয়াছিল—আর সমাজ—তোমার নিষ্ঠুরতায় স্নেহলতা আজ অকালে উৎপাটিতা—তোমার কাপুরুষতার প্রভাবে আজ বাঙ্গলার উদ্যান আরও শ্রীভ্রষ্টা।

আবার বলি, এই কি সমাজ তোমার লোকহিতব্রত? ভাবিলে বিস্ময় জন্মে, এই লোকহিতব্রত সাধন করিয়া তুমি আজিও জীবিত! সমাজ, চাহিয়া দেখ, স্নেহলতার দিকে আর চাহিতে হইবে না; স্নেহলতা ঘুমাইতেছে, ঘুমাইতে দাও, জাগাইও না; জাগাইলে তোমার পক্ষে ফল বিষময় হইবে।

সমাজ, চাহিয়া দেখ, একবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখ। এবার কি দেখিলে? শতসহস্র স্নেহলতা নহে কি? শতসহস্র নারী তোমার অত্যাচার দেখিতে না পারিয়া—চিরদিনের জন্য চক্ষুমুদ্রিত করিয়াছে। শত সহস্র বঙ্গকুমারী সমাজকলঙ্কিত সংসার হইতে অকালে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বঙ্গের শতসহস্র অবলা তোমায় উপহাস করিয়া ঐ নীল আকাশের পরপারে সেই জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছে—যেখানে সমাজ আছে—অত্যাচার নাই; প্রেম আছে—অর্থপণ নাই; দান আছে,—বিক্রয় নাই; বন্ধন আছে—বিচ্ছেদ নাই।

সমাজ, উৰ্দ্ধে চাহিয়া দেখ,—বঙ্গবালার দুঃখে শূন্যহৃদয় গগণও কাঁদিয়া ব্যাকুল হইতেছে। সেই বিলাপধ্বনি পবনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তুমি কি শুনিতেছ না? ঐ দেখ সমাজ, নদী বহিয়া যাইতেছে; দেখিতে পাইয়াছ কি, বঙ্গবালার চক্ষের জলে নদীবক্ষ কত স্ফীত হইয়াছে? শোন সমাজ, পর্ব্বতের প্রত্যেক গহ্বরে বঙ্গনারীর কি করুণ বিলাপ কি করুণভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

একি সমাজ! পাষাণের ন্যায় স্থির হইলে কেন? তোমার কুটিল নিষ্ঠুর আঁখিদ্বয় বিস্ফারিত হইল কেন? তোমার সে দম্ভ, সে তেজ, সে গাম্ভীর্য্য কোথায় গেল? কে হরণ করিল? একি! তোমার চক্ষে জল কেন? বুঝিয়াছি সমাজ, তুমি তোমার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিতেছ। না, না, তাহা হইবে না। অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছ, কূলে ফিরিতে পারিবে না। প্রবাহে ভাসিয়া যাও, দুঃখ নাই। কিন্তু মূর্খ, নিষ্ঠুর সমাজ, বলিয়া দাও, কোন্ মহাপরাধে নিরপরাধা বঙ্গবালার প্রতি এই শাস্তি বিধান করিয়াছ?

শ্মশান-সঙ্গীত।

লেখক,—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সাহানা-পাহাড়ী—একতালা।

শ্মশানে ঐ সোনার প্রদীপ, জ্ব'ল্‌ছেরে ভাই,
দ্যাখ্‌ সকলে।
ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ নাচে ভোলা,
হাততালি দে হরি বোলে॥
বাপ্‌টি মেজে টিপিসাড়ে, ব'সল এসে হৃদয় জুড়ে,

সঙ্গিগণে দিল তেড়ে, ফুঁকিয়ে শিঙ্গে কুতূহলে॥
মরজী কি তার বুঝ্‌ব রে ভাই, কর্ত্তা সে যে জগৎ গোঁসাই,
রামকৃষ্ণ নামের দোহাই, তাই দেই রে সকল ভুলে॥
বাণী-পূজার সে যে গুরু, কমলাক্ষি কল্পতরু,
কাঙ্গাল-ঠাকুর কৃপাং কুরু,
দেহি স্থান চরণ কমলে॥

৫ই মাঘ, ১৩২০ সাল।

শবদর্শন।

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

কে তুমি কোথায় যাও, পার দুটা কথা কও,
কতদিন ছিলে এ ধরায়?
কি কাজ করিতে আল্যা, কিবা তার করি গেল্যা,
লাভ ক্ষতি কি হইল তায়।
কোথা হ'তে এসেছিলে, কাহার ঘরেতে ছিলে,
কেবা সেই হতভাগ্য জন।
তোমারে বিদায় দিয়ে, রহিতে পেরেছে জীয়ে,
বল সেই কোন অভাজন॥
দেখি তোমা সব জন, জিজ্ঞাসিতে চাহে মন,
আছে কি জননী অভাগিনী।
সঙ্গিনী কি ছিল হেথা, দিয়া তারে মনোব্যথা,
চলিলে করিয়া অনাথিনী॥
দেখে ছিলে পুত্রমুখ? সংসারের সার সুখ,
ভোগে হয়্যাছিলে ভাগ্যবান।
রাখি গেলে কারে কারে, আর্ত্তনাদ করিবারে,
ধরি ভারভুত দেহ প্রাণ॥
বসায়ে সুখের হাট, ভাঙ্গি দিলে সেই ঠাট,
হাহাকার করিছে স্বজন।
কত করে ছিলে আশা, ভাঙ্গিলে তাহার বাসা,
ব্যর্থ হ'লো এ নরজীবন॥

আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া জ্বর।

আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।

লেখক,—আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাতীর্থ কবিরাজ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ বি, এ, এল, এম, এস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মাড়িখসা দেখিতে পাইবেন, অধিকাংশই এই আধুনিক চিকিৎসার ফল। তখন চিকিৎসা ছিল— রোগীকে প্রথম রস প্রয়োগ করা, তার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিরেচন এবং রক্ত মোক্ষণ। তিনি বলেন, এক এক জন রোগীকে ৬০০ হইতে ৮০০ গ্রেণ ক্যালোমেল দেওয়া হইয়াছে। এক বৎসরে জেনারল হাঁসপাতালে ক্যালোমেলের খরচ— ১৩,৩৩৭ গ্রেণ।

যিনি এই আসুরিক চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহার নাম পূর্ব্বে বলিয়াছি ডাক্তার জনসন। এবং বলিয়াছি যে তাঁহার চিকিৎসার ফলে এই ঘটে, যে তাঁহার বিরুদ্ধে এ দেশে প্রবল আন্দোলন উত্থাপিত হয়। তিনি সেই আন্দোলনে এ দেশ ছাড়িয়া পালাইতে বাধ্য হন।

অবশ্য এই ক্যালোমেল প্রয়োগ, আর আমাদের পারা গন্ধকের কজ্জলী ও হিঙ্গুল এক নহে। রস প্রয়োগ হইলেও,— ইহাতে মাড়ি খসিয়া যাওয়ার ভয় একরূপ নাই বলিলেও হয়।

তবে ইহাতে যে কোন অপকার হয় না, একথা ঠিক বলা কঠিন। জয়পাল প্রয়োগও তদ্রূপ। স্থল বিশেষে উপকারী হইলেও যেখানে কুফল ঘটে সেখানে মহা অনর্থ উৎপন্ন হইতে কতক্ষণ লাগে?

যাহা হউক— ডাক্তার জনসনের আসুরিক চিকিৎসার পর ডাক্তারেরা এদেশে refrigerent ঔষধ অর্থাৎ যাহাতে বমনাদি আনয়ন করিয়া শরীরের সঞ্চিত দোষ বহিঃনিসৃত করিতে পারে, এমন ঔষধ ব্যবস্থা করিতে থাকেন। এই refrigerent সম্বন্ধে তাঁহাদের যে মত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে আমরা দেখিয়াছি, একজন বলিতেছেন এই ঔষধ দেওয়া— আর কিছু না করিয়া কিছু করিলাম এইরূপ বিশ্বাস জন্মান ইহাই যথালাভ— অধিকন্তু শুভ এই যে উপকার করিতে না পারিলেও ইহাতে কোন অপকার করা হয় না।

ডাক্তারদিগের refrigerent ঔষধ কিম্বা তৎসদৃশ চিকিৎসা যাহা, তাহা ভৈষজ্যরত্নাবলীর জ্বর চিকিৎসায় প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। ষড়ঙ্গ পানীয় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চ মূল বৃহৎ স্বল্প, চতুর্দ্দশাঙ্গ, অষ্টদশাঙ্গ প্রভৃতি— পাচন সমস্তই এই শ্রেণীর ঔষধ। দোষের নিরুহণ— সকল গুলিরই মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্বরকে পৃথক্ দ্বন্দ সান্নিপাতিক ভেদে বিভক্ত করিয়া সেই বাতাদি দোষকে

শমন ও শোধন করিতে এই সকল সংযোগ সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্ট হইলেও, প্রথম সপ্তাহে ইহাদের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। লঙ্ঘন বা ষড়ঙ্গ পানীয় এবং যবাগূপ্রভৃতির ব্যবহার তরুণ জ্বরের প্রথম চিকিৎসা। ডাক্তারেরা হয়ত বলিবেন ইহাও তাঁহাদের refrigerent এর মত— কিছু না করিয়া কিছু করিলাম— অধিকন্তু উপকার করিতে না পারি, অপকার করিলাম না এই ইহার লাভ।

ডাক্তারেরা যাহাই বলুন— আমরা আয়ুর্ব্বেদের দিক হইতে বলিতে চাই, এই যে ষড়ঙ্গ পানীয় ও যবাগূ চিকিৎসা— ইহাই তরুণ জ্বরের প্রকৃত চিকিৎসা। মহর্ষি পুনর্ব্বসুর উদ্ভাবিত উদ্ধৃত সূত্রের সহিত ইহার সম্পূর্ণ যোগ আছে। দোষ, দেশ, কাল, বয়স, সাত্ম্য, আহার, ঔষধ প্রভৃতি সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল বিচার করিয়া এই চিকিৎসা। অতি সাবধানে অতি সতর্কতার সহিত এই চিকিৎসা ক্রম আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। গেলেও একটি বিষয়ের অভাব আছে ; অভাব তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, জ্বর ভূতাভিসঙ্গোত্থ হইলেও, সকল জ্বর ভূতাভিষঙ্গোত্থ নহে। জ্বরে বাতাদি দোষই সর্ব্বজ্বর ব্যাপিয়া অবস্থিত,— পৃথক দ্বন্দ্ব সংসর্গ ও আগন্তুক লইয়া জ্বরের মূল বিভাগ। বিষমজ্বর— ইহার অন্তর্ভূক্ত— এক কোণে অবস্থিত। মোটকথা ম্যালেরিয়া ধরিয়া তাঁহারা জ্বরের চিকিৎসা প্রণালী পরিগঠন করেন নাই।

ডাক্তারেরা যেখানে ৫ গ্রেণে না হইলে ১০ গ্রেণ, ১০ গ্রেণে না হইলে ২০ গ্রেণ কুইনাইন দেন, সেখানে তাঁহারা কেবলমাত্র লঙ্ঘনের উপর নির্ভর করিতে গিয়া স্থলবিশেষে জয়যুক্ত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই হটিয়া হটিয়া শেষে তরুণ জ্বরের চিকিৎসা বিদেশীর হস্তে তুলিয়া দিয়া আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন। দোষের অংশাংশ কল্পনা করিয়া চিকিৎসা যে কি কঠিন তাহা, যাহারা, এইরূপ সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিয়া চিকিৎসা করেন, তাহারাই বলিতে পারেন। মহর্ষি পুনর্ব্বসু যে বলিয়াছেন, ইহাতে বিমল বিপুলমতির বুদ্ধিও আকুলহয়, অল্প বুদ্ধির ত কথাই নাই। ইহা সত্য অতি সত্য কথা! পাচন চিকিৎসা, যবাগূ চিকিৎসা, ষড়ঙ্গ পানীয়ের চিকিৎসা, এদেশে কয়জন খ্যাতনামা চিকিৎসক করিয়া থাকেন, বা করিতে প্রস্তুত? হিঙ্গুলেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, তরুণ জ্বরে ঘরে ঘরে। রস প্রয়োগ এবং সেই সঙ্গে ডাক্তারি সাগু বার্লি আরারুট হর্লিক, এলেনবেরী পর্য্যন্ত! কেবল যত দোষ কুইনাইনে-- যাহা ম্যালেরিয়া জ্বরে ধন্বন্তরি, তাহাই তাঁহাদের সর্ব্বনাশের

জন্য এপর্য্যন্ত তাহারা প্রকাশ্যে গ্রহণ করেন নাই। পেরু দেশের কুইনাইন ইয়ুরোপীয়েরা আগে সন্ধান পাইয়া গ্রহণ করিাছেন, আমরা আগে জানিতে পারি নাই, যদি কিছু কুইনাইনের অপরাধ থাকে, আমি দেখি এই অপরাধ ভিন্ন আর তাহার কোন দোষ নাই—সুধু এই এক দোষের জন্য এমন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়া, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। সকলে মিলিয়া একত্র হইয়া কুইনাইনকে আমাদের করিতে আপনাদের কতক্ষণ লাগে,? একটি সংস্কৃত শ্লোক—তাহার রচনা, আপনাদের মধ্যে যে সে করিতে পারেন। আমি বলি ম্যালেরিয়ার নাম বিষম জ্বর দিয়া কুইনাইনকে বরণ করিয়া আপনারা ঘরে তুলুন, দেখিবেন আমাদের জ্বর চিকিৎসা দেশ জুড়িয়া যাইবে। দেশের তিন ভাগ লোক আয়ুর্ব্বেদের জয়গীতি আবার উচ্চৈস্বরে গান করিতে থাকিবে। কুইনাইন ম্যালেরিয়ায় সুপরিচিত হইয়া ধন্বন্তরির মত সম্মান লাভ করিয়াছে। এই সুপরিক্ষিত ঔষধ ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া আর আমাদের কত্তব্য নহে। পেরুর কুইনাইন এখন দার্জ্জিলিঙ্গে প্রচুর পাওয়া যায়। বিদেশীয় দ্রব্য বলিয়া ও ইহাকে আর অনাদর উপেক্ষা করা চলে না। তবে যদি একান্তই আর কোন কারণ থাকে, যাহাতে কুইনাইন আমরা লইতে পারি না, তাহা হইলে নিরূপায় হইয়া আমি বলিতেছি—আমাদের জ্বর চিকিৎসা এমন করিয়া নূতন ভাবে পরিগঠিত করা হউক, যাহাতে সব রোগী না সারিলেও অধিকাংশ রোগীই সারিতে পারে। কি করিলে সেই প্রণালীর চিকিৎসা আমরা পুনরুদ্ধার করিতে পারি তাহাই এখন পরিচিন্তনীয়। আমি বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিয়াছি, আমাদের জ্বর চিকিৎসায় তালিকায় মুখ্য এবং গৌণরূপে কত গুলি দ্রব্য বিধৃত হইয়াছে।

অদ্যকার প্রবন্ধে এই সকল উপাদানের উল্লেখ করাই আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদে জ্বরের চিকিৎসায় যাহা যাহা জানা প্রয়োজন, তাহাতে আপনারা সকলেই আমা অপেক্ষা অনেক বেশী অভিজ্ঞ। সুতরাং সে চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন কথা এখানে উত্থাপন করা আমার পক্ষে উপহাসের বস্তু। আমি আপনাদিগকে, সেই চিকিৎসার কথা বলিব, যাহাতে বিষমজ্বরকে ম্যালেরিয়া বলিয়া স্বীকার করিলে, যেরূপ প্রণালীর চিকিৎসা অনুসরণ করা আবশ্যক হয়। বিগত মাসিক সভার অধিবেশনে আমি নিজের কোন কথাই না বলিয়া কেবল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, আয়ুর্ব্বেদে বিষমজ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে যে কারণের উল্লেখ আছে, তাহা ভিন্ন, একদল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

লোক প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিম্বা প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যে জ্বরমাত্রেই বিষমজ্বর এবং বিষমজ্বর ভূতাভিষঙ্গোত্থ। ভেড় ভালুকি পুষ্কলাবত বাণ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণই যে কেবল এই মত পোষণ করিতেছিলেন তাহা নহে,— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে এই শেষোক্ত মতের সংস্থাপক, প্রচারক, ও প্রকাশক। তিনিই প্রথম প্রচার করেন, বিষমজ্বর ভিন্ন অন্ত আকারে জ্বরের আধিপত্য মানবের উপর নাই, এবং এই বিষমজ্বর শিবজ্বর। যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই কথা বলিয়াছি, সে প্রমাণ হরিবংশে বিস্তৃতভাবে আছে; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও সংক্ষেপে এই সকল প্রমাণ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। আমি ঐ সকল প্রমাণ যথাযথ আকারে বিগত বারে আপনাদিগের নিকট উদ্ধৃত করিয়াছি। আপনারা তাহার যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা আমি আমার কোন কথার প্রতিবাদ মনে না করিয়া মনে করিয়াছিলাম, আপনারা আমাদের পুরাণেরই প্রতিবাদ করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের মতের উপর আপনাদিগের সকলের শ্রদ্ধা বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। পৌরাণিক মতে সহসা আপনারা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাহা আপনাদিগের প্রশংসারই বিষয়। কেবল আপনারা একা নহেন, এপর্য্যন্ত এই মতের উপর কোন চিকিৎসকই আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই। পারিলে ডল্লনের মত একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই মতকে অল্পতন্ত্রবিদ্‌দিগের মত বলিয়া এমন উপেক্ষা করিবেন কেন? কেবল ডল্লন নহেন, ভগবান ধন্বন্তরিও নিজগ্রন্থে তাঁহাদিগকে "কেচিৎ" শব্দে অভিভাষণ করিয়া একপ্রকার উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কেচিৎসংজ্ঞাভিহিত এই সকল ব্যক্তিগণের মত লইয়া আমি যখন বলিয়াছি, বিষমজ্বর এবং ডাক্তারদিগের আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়া একই তত্ত্ব, তখন আমি নিজেই নিজেকে যখন নিরপরাধী মনে করিতে পারি না, তখন আপনারা পারেন নাই, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। আমি কেবলমাত্র এই অনুরোধ করিতেছি, পৌরাণিক মতে বিষমজ্বর এবং ম্যালেরিয়া যে সদৃশতত্ত্ব তাহা আপনারা পুরাণের দিক দিয়া স্বীকার করেন। যদি এইরূপ স্বীকার করায় ক্ষতি বোধ না হয়, তাহা হইলে এই স্বীকারের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া আমি অদ্যকার আলোচনার বিষয় যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে প্রস্তুত হই। আয়ুর্ব্বেদের মতে জ্বরের যে প্রণালীর চিকিৎসা অনুসৃত হইয়াছে ও হইয়া আসিতেছে, তাহা আপনারা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমা

অপেক্ষা অনেক ভাল জানেন। আমি ভূতাভিষঙ্গ ধরিয়া জ্বরের--- শিবজ্বরের--- বিষমজ্বরের চিকিৎসা আপনাদিগের নিকট অদ্য নিবেদন করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি। এই প্রণালীর চিকিৎসা অনুসৃত হইলে, ডাক্তারদিগের নিকট আমরা আর অসম্মানিত হইব না, ইহা আমি একরূপ নিশ্চয় করিয়া আপনাদিগকে বলিতে পারি। তাঁহারা কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ যশস্বী হইতেছেন, আমরা কুইনাইন প্রয়োগ না করিয়া কেবল আমাদিগের স্বদেশীয় ভেষজের সাহায্যে তদ্রূপ যশোলাভ করিতে সমর্থ হইব। বিজ্ঞানক্ষেত্রে আজ সংপ্রাপ্তি বিজ্ঞানেরই সমূহ আদর। আমাদের জ্বরের সংপ্রাপ্তি বিজ্ঞান ভূতাভিষঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে, ঔষধে কি করে— বিজ্ঞানের বিচারে উচ্চসম্মান লাভ করিতে আমরা আর বঞ্চিত থাকিব কেন? তাঁহারাও যেমন স্বীকার করিতেছেন, জ্বরের ঔষধ ভূতাভিষঙ্গ বিনাশক, আমরাও সেইরূপ বলিতে চাই, আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যে সকল ঔষধ আছে, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ভূতাভিষঙ্গেরই বিরোধী। পেরুর কুনাইনের অনুসন্ধান তাঁহারা আগে পাইয়াছেন, আমরা আগে পাইনাই উভয়ের মধ্যে এইমাত্র যাহা কিছু ইতর বিশেষ! প্রকৃত কথা বলিতে কি, আমাদের পুণ্য আয়ুর্ব্বেদে এমন সকল ভেষজ আছে, যাহা ভূতাভিষঙ্গ নষ্ট করিতে কুইনাইন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। বর্ত্তমান সময়ে এরিলিকসের যে জয়নিনাদে প্রতীচ্য ভূমি নিনাদিত, সেই ৬০৬ যে উপাদানে গঠিত, সকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন,— সেই পুণ্য পবিত্র বীর্য্যবান্ ঔষধ ভারতেরই সম্পত্তি! ভারত সর্ব্ব প্রথমে ইহার আবিষ্কার করিয়া ভৈষজ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে চির দিনের জন্য অসীম জয়যুক্ত! Berdœ তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

Preparations of arsenic have long beon used in medicine. Dioscorides applies the name arsenikon to the yellow Sulphuret of arsenic. The Arabs call it Turmeckh, which is supposed by Sprengel to be a corruption of Arsenikon They were familiar with the white oxide, which they call Sum-al-far,— Mouse poison or rats poison the Hindus were well acquainted with the form of arsenic knowh as orpiment, whioh they call. " Hertal " realgar which is thus mansil and white arsenic which they name " Sancha ".

Royle thinks it was first prescribed internally by the Hindus, who used it for leporosy and intermittent fevers. It is a remedy of great value in many kinds of skin diseases and in of great use in agues and in all periodic disorders for which it is only inferior to Qninine.

কেবল arsenic নহে, Royle বলেন, Mercurus or quick Silver was known to the ancients. It was probably first prescribed internally by the Hindus. স্বর্ণ, রৌপ্য, যবক্ষার, সাচিক্ষার সোহাগা এ সমস্ত ভেষজ ও ভারতের প্রথম অবিষ্কার।

মোটকথা আমাদের ভেষজ ভাণ্ডারে এমন সকল অমূল্য রত্ন আছে, যাহা ভূতাভিষগ্‌গেরও সম্পূর্ণ বিরোধী।

সেই সকল দ্রব্য কি তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমি একটি তালিকার প্রতি আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি। তালিকাটি আমি অতিযত্নে অস্ত প্রত্যূষে আপনাদিগের জন্য সংগ্রহ করিয়াছি।

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আমাদের ভৈষজ্যরত্নাবলীতে তরুণ জ্বরের চিকিৎসায় রস চিকিৎসাধ্যায়ে ১৭টি ঔষধ সংগৃহীত আছে। (১) হিঙ্গুলেশ্বর (২) শীতভঞ্জীরস (৩) তরুণজ্বরারি (৪) নবজ্বরেভসিংহ (৫) ত্রিপুর ভৈরব রস (৬) জ্বর ধূমকেতু (৭) শ্রীমৃত্যুঞ্জয়রস (৮) শ্রীরাম রস (৯) নবজ্বরাঙ্কুশ (১০) প্রচণ্ড রস (১১) বৈদ্যনাথ বটি (১২) অগ্নিকুমার রস (১৩) রত্নগিরি রস (১৪) প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস (১৫) চণ্ডেশ্বর রস (১৬) উদক মঞ্জরী রস (১৭) অচিন্ত্যশক্তি রস।

এইসকল ঔষধের উপাদানগুলি নিম্নলিখিত রূপ ; যথা—

(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)
মরিচ	জয়পাল	বিষ।	হিঙ্গুল
শুঠ	দন্তী		পারা
পিপুল	কটকী।		গন্ধক
বচ			তাম্র
কুড়			সোহাগার খই
মুতা।			লৌহ
			স্বর্ণ
			অভ্র

সীসা
বৈক্রান্ত
স্বর্ণমাক্ষিক।

(ঙ) ভাবনা---

জান্তব--- রোহিতপিত্ত—

উদ্ভিজ্জ (১) নিসিন্দা পাতার রস
(২) উচ্ছেপাতার রস
(৩) জম্বীর রস
(৪) ঘৃতকুমারীর রস
(৫) ভৃঙ্গরাজ
(৬) কেশরাজ
(৭) সজিনা
(৮) বাসক
(৯) বচ
(১০) চিতা
(১১) ভু কদম্ব
(১২) কণ্টকারী
(১৩) গুলঞ্চ
(১৪) জয়ন্তী
(১৫) বকপুষ্প
(১৬) ব্রহ্মী
(১৭) তিতরাজ
(১৮) আদার রস
(১৯) থানকুনি
(২০) গিমাশাক
(২১) শালিঞ্চা
(২২ কাটানটে
(২৩) অপরাজিতা শ্বেত
(২৪) হুড় হুড়ে শ্বেত।

(চ) অনুপান—

আদার রস
ঘৃতকুমারীর রস
চিনি
শুঠ
পিপুল ও কাথ
মরিচ
ধনের কাথ
কৃষ্ণজীরা
পুরাতন গুড়
পান
উষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ জল
শুঠ চূর্ণ।

(ছ) পথ্য

শীতল জল
ইক্ষু
চিনির জল
মুগের যুষ
দধির মাত
তক্র
অন্ন
মাংসযুষ।

(জ) ব্যাপত্তিতে

মস্তকে তৈল ও
শীতল জলের পটি।

(ঝ) উপসর্গে—অনুপান

পীনস ওপ্রতিশ্যায়ে	আদার রস
অগ্নিমান্দ্যে	লবঙ্গ
আমে	শুঠ চূর্ণ
অমাতিসারে	ধন্যা শুণ্ঠি
পক্কাতিসারে	কুটজ কাথ মধু
অতিসারে	মুতা
কাশে	কণ্টকারী
শ্বাসে	সর্ষপ তৈল ও পুরাতন গুড়
কফজ্বরে	আদার রস, নিসিন্দা পাতার রস
সান্নিপাতিকে	
প্রথম অবস্থায়	পিপুল আদার রস
গ্রহণীতে	শুঠ
শোথে	দশমূল।

এই সকল উপাদানের মধ্যে——

বিষ— ১. ৩ ৪. ৫. ৭. ১০. ১২. ১৪. ১৫ সংখ্যক ঔষধে— মোট ৯বার উল্লিখিত

হিঙ্গুল— ১. ২. ৬. ৭. ৯. ১৪.— মোট ৬বার

পারা ও গন্ধক — ১. ৩. ৪. ৬. ৭. ৮. ৯. ১০. ১১. ১৩. ১৫. ১৬. ১৭ সংখ্যক ঔষধে মোট ১৪বার।

সোহাগার থই— ৫. ৭. ১৪. ১৬.—	মোট	৪
তাম্র— ৪, ৫. ১৩. ১৫. ১৭	মোট	৫
লৌহ— ৪. ১৩	মোট	২
মরিচ— ৭. ৮. ১২, ১৬. ১৭—	মোট	৫
পিপুল— ১. ৭	মোট	২
জয়পাল— ২. ৩. ৮, ৯ ১৪.	মোট	৫
দন্তী— ২. ৫. ৮, ৯	মোট	৪
ভৃঙ্গরাজ— ১৩. ১৭		২
রোহিতপিত্ত ১৬		
তক্র— ১০ ১৬		২
অন্য উপাদান—		১ বার
কটকী— ১১		১

আদার রস— ৪, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৫—
নিসিন্দা পাতার রস— ১০, ১৩, ১৫, ১৭—

এই তালিকাভুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে

বিষ
হিঙ্গুল
পারা
গন্ধক
সোহাগার খই
তাম্র
হরিতাল
মনছাল
ত্রিকটু
ত্রিফলা
জয়পাল

প্রধান।

প্রধানতম—

বিষ
পারা গন্ধক হিঙ্গুল
হরিতাল
মনছাল
সোহাগার খই
তাম্র
জয়পাল।

কুঁচলে
ভেলা
পঞ্চপিত্ত

কৃষ্ণসর্প বিষ ও ধুতরা বীজের প্রয়োগ মধ্যজ্বরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জীর্ণজ্বরে—

প্রবাল ভস্ম
মুক্তা —

কড়ি —
শুক্তি —
স্বর্ণ —
লৌহ —
অভ্র —
তাম্র — বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা যেমন দেখিতে পাই, তরুণ ও মধ্য জ্বরের চিকিৎসায় আমাদের প্রধান ভেষজ—

বিষ
পারা
গন্ধক
হিঙ্গুল
তাম্র
সোহাগার খই
মরিচ
জয়পাল
দন্তী
আদার রস
এবং নিসিন্দা পাতার রস

তেমনি হরিতাল ও মনছাল ইহার অপরদিকে প্রধান অঙ্গ।

তরুণ জ্বরে প্রধানতম— ভেষজ--- পারা গন্ধক।
তার নিচে বিষ
তাম্র, সোহাগার খই
জয়পালাদি বিরেচক।

আয়ুর্ব্বেদের মতে তরুণ জ্বরের সীমা ৭ রাত্রি।
তাহার উর্দ্ধে ২১ দিন পর্য্যন্ত মধ্য জ্বর;
তার পর জীর্ণ জ্বর।

যদিও এই সীমা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ৭ দিন তরুণ জ্বরের এবং তদূর্দ্ধে মধ্য এবং জীর্ণ জ্বরের সীমা সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট।

এখন মধ্যজ্বরের এবং জীর্ণজ্বরের ঔষধের তালিকা দিতেছি।

(১)• রস, উপরস, ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি যথা—

হিঙ্গুল	বিষ	শুঠ	যবক্ষার
পারা	কুচিলা	পিপুল	সাজিক্ষার
গন্ধক	ভেলা।	মরিচ	সন্ধবলবণ
সোহাগার খই		হরীতকী	বিট—
তাম্র		আমলকী	সচল—
হরিতাল		বহেড়া।	
মনছাল			
স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক			
রৌপ্য	শিলাজতু	ধুতরাবীজ ও রস	নিমছাল
লৌহ		জয়পাল	
অভ্র		দন্তী	
সীসা		তেউড়ী	
তুতে		কটকী	
		কালমেঘ	
হিরাকস		উচ্ছেপাতা	
গেরিমাটি		আকন্দছাল	
বঙ্গ			আদার রস
অয়স্কান্ত			নিসিন্দা রস
প্রবাল ভস্ম			
মুক্তা ভস্ম			
শুক্তি—			
কড়ি—			

তরুণ এবং মধ্য জ্বরের উপাদানগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবং প্রধান প্রধান ভেষজগুলির কথা স্মরণ করিলে,— স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে— আমাদিগের দেশের জ্বর চিকিৎসায় এমন সকল ভেষজের সংমিশ্রণে পরিগঠিত যে ডাক্তার দিগের পরিভাষায় বলিতে হইলে বলা যায়, যে ইহার এক দিকে যেমন

বমন

বিরেচন

রস প্রয়োগ— অবস্থিত,

তেমনি অপর একদিকে— দোষ নিঃসারক

পাচনাদি—

এবং অন্যদিকে— ভূত নাশক ঔষধ যাহাতে জীবাণু এবং উদ্ভিজ্জাণু জিঘাংসু ভূতবিশেষ বিধ্বস্ত হয়। এই শেষোক্ত ঔষধের মধ্যে হরিতাল মনছাল পূর্ব্বে বলিয়াছি, কুইনাইনের সমকক্ষ না হইলেও ঠিক নিম্নের স্তরেই অবস্থিত।

প্রাচীন চরকাদি গ্রন্থের চিকিৎসা যাহাতে লঙ্ঘন বমন হইতে আরম্ভ করিয়া

ষড়ঙ্গ পানীয়

যবাগু

পাচন—কষায়

প্রভৃতি সংমন ও সংশোধন

ঔষধের ব্যবস্থা আছে, তাহা দোষ নিষ্কাশনের দিক দিয়া দেখিলে ডাক্তারদিগের refigerent স্বরূপ। রস প্রয়োগে জ্বর চিকিৎসা এবং তৎসঙ্গে জয়পাল প্রভৃতি তীব্র বিরেচন এবং সেই সঙ্গে বিষ প্রয়োগ—ইহা ঠিক সেই শ্রেণীর চিকিৎসা যে চিকিৎসা ডাক্তার জনসন এদেশের দুর্ভ্যাগ্য ক্রমে জেনারাল হাসপাতালে এবং অন্যান্য স্থানের চিকিৎসায় পরীক্ষা করিয়া যান। ইহার কুফল আপনাদিগকে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। তরুণ জ্বরের এই সকল— ঔষধ আগ্নিমান্দ্য হেতু অজীর্ণ হইয়া উদরে সঞ্চিত থাকায়, মধ্যজ্বরে যেমন রোগী উপসর্গাদি দ্বারা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সে সময় যে মহান অনর্থসমুৎপাদন করিতে পাবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ এই প্রকার ঔষধের অপকারিতা পরিদৃষ্টে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ— তরুণ জ্বরের চিকিৎসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

সকলেই স্বীকার করিবেন, জীর্ণ জ্বরের চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ আপনাদিগের যথার্থ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। করিবার কথাও আছে; এই চিকিৎসায় তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে এমন সকল ঔসধ ব্যবস্থা করেন, যাহা, জ্বরকে ভূতাভিষঙ্গোথ মনে করিলে, সে জ্বর প্রশমনে তাহা অব্যর্থ। প্রকৃত ভূত বিনাশক ঔষধ যাহা, তাহাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থের শেষ-

ভাগে সংগৃহীত হইয়াছে। হরিতাল মনছাল এর আরম্ভ— এইখানে; সোহাগার খই, তাম্র — এবং সঙ্গে সঙ্গে রস ও গন্ধকের, এমন সুন্দর সমাবেশ এখানে যেমন আর কোথায় তেমন আছে কি? একটু বিচার পরায়ণ হইয়া দেখিলেই আপনারা স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন—

রস ও গন্ধক

ইহাদের অপেক্ষা Parasiticide ঔষধ আর আছে কি? কলিকাতা হাস-পাতালে অস্ত্র চিকিৎসার এত যে জয়ধ্বনি! দেখিবেন, ইহার যে কিছু বিজয় বার্ত্তা এই রস ও গন্ধককে মধ্যকেন্দ্র করিয়া সমুদিত।

তারপর হরিতাল মনছাল। পূর্ব্বে এরিলকের ৬০৬ এর কথা বলিয়াছি; ডাক্তারদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ—এই হরিতাল মনছাল কিম্বা তৎজাতীয় ভেষজের উপর সম্পূর্ণরূপে সংপ্রতিষ্ঠিত। উপদংশ একা নহে, যক্ষ্মাতেও এই ঔষধ, কেহ কেহ বলেন একমাত্র ঔষধ, বহুমূত্রেও প্রায় সেই কথা। কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ যেখানে যত প্রকার আছে, সর্ব্বত্রই সেই arsenic—যাহা ডাক্তার Royle বলিয়া-ছেন, ভারতই ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগবিষয়ে অগ্রণী।

সোহাগার খইএ মুখের ঘা সারে কে না জানেন? — সেই সোহাগার খই আয়ুর্ব্বেদে পত্রে পত্রে! যে জ্বরে অন্ত্রে ক্ষত হয়, যেমন টাইফয়েড জ্বর—সেখানে এই স্বল্প মূল্যের সোহাগা— স্বর্ণ হইতেও বহু মূল্য।

তাই বলিতেছি, যাহাদের পুস্তকে রস আছে, গন্ধক আছে, মনছাল আছে, সোহাগা আছে, তাহাদের পরাঙ্গপুষ্ট কয়েকটি তুচ্ছ উদ্ভিজ্জাণু বা জীবাণুর বিনাশের জন্য আর নাই কি? কুইনাইন নাই বা থাকিল! যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট! তাহাই একত্রে বা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিকল্পনা করিয়া ভূতা-ভিষঙ্গের ধ্বংশার্থ ব্যবহার করিতে পারিলে, আয়ুর্ব্বেদ লইয়া ম্রিয়মাণ হইবার কথা কি?

কিন্তু বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছি, আমরা পুরাণের দিক দিয়া বিষমজ্বর কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া,— মনে করি, হরিতাল মনছাল, সোহগার খই, রস গন্ধক, তরুণ জ্বরে কিম্বা মধ্য বা জীর্ণ অবস্থাতেও অনিষ্ট-কর। হিঙ্গুলেশ্বর দিয়া আমরা তত ভয় করি না; কেন না ইহার বটিকা যতদূর সূক্ষ্ম করা যায়, ততদূর আমরা করিয়া থাকি। কিন্তু হরিতাল মন-ছাল দেওয়া ঔষধ আমাদের তরুণ জ্বরে আর বড় বেশী স্থান পায় না। ডাক্তারেরা কালাজ্বরে যে সোয়ামিন, আরেহনাল কিম্বা আটক্সিল্ ব্যবহার

করেন— তাহাদের পরীক্ষিত ধন্বন্তরিকল্প ঔষধ যে ইহা— তাহার কারণ, ইহাতে আর্সেনিক আছে। তাঁহারা বলেন রক্তশূন্যতা নিবারণ পক্ষে arsenic অব্যর্থ। তাঁহাদের ব্লুডসপিল ও আর্সেনিক্, তাঁহাদের arsenoferratose প্রভৃতি ঔষধও যে এত আদরের তাহার কারণ, লৌহ এবং arsenic ইহাতে একত্রে মিশান। ডাক্তারেরা যেখানে কুইনাইন দিয়া উপকার দেখেন না, সেখানে একবার arsenic কোন না কোনরূপে দিবেনই দিবেন। কিন্তু আমরা arsenic কে বাঘের মত দেখি,— দেখিয়া যেখানে দিলে ইহাতে সুমঙ্গল হইবে, সেখান হইতে হটিয়া আসি। আর্সেনিক অর্থ "রসান" করা।

আজ যে টাইফয়েড জ্বর জীর্ণজ্বরে পরিণত হইয়াও, ডাক্তারদিগের হস্তে না সারা পর্য্যন্ত অধিক সংখ্যা যাইতেছে ও থাকিতেছে, তাহার কারণ, আমরা সোহাগার খইএর এত গুণ জানিলেও সেক্ষেত্রে রামবাণ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করি। ফলতঃ যে কয়েকটি ঔষধ আমাদের আছে— যে কোন জ্বরের চিকিৎসার্থ সেই কয়েকটি ঔষধ ঔষধের শ্রেষ্ঠ।

আমরা জ্বরের প্রকৃত সংপ্রাপ্তি পৌরাণিক মতের দিক দিয়া না দেখিয়া মিথ্যাহার বিহারের দিক দিয়া দেখিতে গিয়া আমের পরিপাক, দোষের পরিপাক জন্য সময় ক্ষেপণ করি। ডাক্তারেরা সেই সময়ে তাহাদের ব্রহ্মাস্ত্র কুইনাইন এবং arsenic প্রয়োগ করিয়া দুর্গ দখল করিয়া ফেলেন।

তাই বলিতেছি— যদি এখন আপনারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের প্রধানতম আরাধ্য মনে করিয়া তাঁহার উপদেশের অনুবর্ত্তন করিয়া মনে করেন জ্বর, মাত্রেই বিষমজ্বর— বা ম্যালেরিয়া, তাহা হইলে প্রথম হইতেই এখন এমন সকল ঔষধ ব্যবহার করুন, যাহাতে ভূতাভিষঙ্গের আশু দমন সংসাধিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমপাচক দোষ প্রশমক ঔষধও দেওয়া সেত আরও ভাল; এবং এমন সকল ঔষধও দিতে বাধা কি যাহাতে রক্তের কণা সকলের শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে এই জিঘাংসু ভূত সকলকে নিধন করিতে অব্যর্থ শক্তি সম্পন্ন করে।

আমাদের শাস্ত্রে ইহাও আছে, যে পিতৃগ্রহ আমাদিগের শরীরকে দুষ্টগ্রহ হইতে রক্ষা করে। তাহাদিগকে এই কল্যাণকর কার্য্য সুসম্পন্ন করাইতে হইলে, এমনভাবে তাহাদিগকে পূজা ও সৎকার করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা পুষ্ট হইয়া এই শত্রুদিগের নিধন সাধনে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্বরের কারণ ভেদে অষ্টবিধত্ব যেমন মাধব তাঁহার গ্রন্থের

প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ করিয়া শেষকে প্রারম্ভে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ শেষের কথা আগে, আগের কথা শেষে লিখিয়াছেন, সেইরূপ আমার মনে হয়, ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থে প্রথমের চিকিৎসা শেষে লিখিত হইয়াছে। হরিতাল ও মনছাল, সেই সঙ্গে রস, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র প্রভৃতির স্থান তাই জীর্ণজ্বরের ভিতর।

ডাক্তারদিগের কুইনাইন যেখানে প্রযোজ্য আমি অনুরোধ করি, সেইখানে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিয়া আপনারা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য পরীক্ষা করেন— যে ইহার অশ্চর্য্য ফল কতদুর?

তরুণজ্বরকে ম্যালেরিয় বা বিষমজ্বর মনে করিলে যাহা করা উচিত তাহাই আমি করিতে বলি। ঔষধ বিষমজ্বরের ভিতর ঠিকই লেখা আছে, কেবল বুঝিতে হইবে, বিষমজ্বর এদেশে তরুণও যেমন, মধ্যও তেমন জীর্ণও তেমন। সমস্তই ম্যালেরিয়া না হইলেও অধিকাংশই ম্যালেরিয়া। হয় কুইনাইন, না হয় আর্সেনিক তাহার ঔষধ। আর্সেনিক ব্যবহারে যৎ কিঞ্চিৎ কুফল বা ব্যাপত্ত যে নাই, তাহা আমি বলিতেছি না। আছে বলিয়াই আমি বলি, আসুন আমাদের ডাক্তারদিগের মত সবই আছে; এমন কি অনেক বেশীও আছে। নাই এক কুইনাইন; সে কুইনাইন আমরা ছাড়ি কেন? আসুন সকলে সমবেত হইয়া ইহাকে আমাদিগের ভৈষজ্যরত্নাবলীতে বরণ করিয়া এমন এক অদ্ভুত চিকিৎসা প্রণালীর অবতারণা করি, যাহা আমাদিগের পুণ্য আয়ুর্ব্বেদকে পুণ্যময় স্থানে দাঁড় করাইতে সক্ষম হইবে। যদি ইহাতে আপনাদের কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে, আমি আর অধিক বলিতে অগ্রসর হইব না; একবার এইমাত্র জোড়হস্তে অনুনয় করিয়া বলি— একবার পুরাণের প্রতি কৃপা কটাক্ষ করিয়া আপনারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অন্যান্য বিষয়ের মত আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে সত্য কি না?

আমি উপসংহারে পুনরায় আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে তিনি প্রকৃতই বলিয়া গিয়াছেন— জ্বর মাত্রেই শিবজ্বর; শিবজ্বরকে মানব দেহে প্রবেশ করিতে হইলে একমাত্র বিষমজ্বরের আকারে আকারিত হইয়া তাহাতে আবিষ্ট হইতে হয়। শিবজ্বরের চিকিৎসা ভূতাভিষঙ্গেরই চিকিৎসা।

সমাপ্ত

বাণী-মঙ্গল।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়।

(১)

হে জননি সরস্বতী, মাতঃ বীণাপাণি,
এস গো এস গো হেথা—এ কুঞ্জ নিরালা!
কবি চিত্ত মধু তুমি, এই মাত্র জানি,
তুমি মা গো এ বিপিন ক'রে থাকে আলা!
সাজায়ে রেখেছি হেথা, পূজিবার ফুল
থরে থরে; কত কাব্য, কত না কবিতা!
দেখে তব হেম কান্তি (নাহি যার তুল!)
শান্তিসরে ভাসে হৃদি—হেমেন্দ্র বন্দিতা!
সুকণ্ঠে গাও মা গীতি, হৃদয় মধুর,
পিয়ে আমি পাগল গো! তব মধু গীতা।
কাঁদে শুনে হৃদি মোর বিয়োগ বিধুর!
সঙ্গীত পবিত্র তব, সুরত্ন মণ্ডিতা।
ভাবিতে চরণ তব—চোখে আসে জল,
জ্ঞান হারা হয়ে যাই, নাহি থাকে বল।

(২)

শ্রাবণের ধারা সনে, কেঁদে ওঠে প্রাণ,
ঝর ঝর বাদলের রিম-ঝিম ধারা—
নাহি থাকে, নাহি থাকে, মোর বাহ্য জ্ঞান
হয়ে যাই, হয়ে যাই, জ্ঞান বুদ্ধি হারা।
বয় যবে বৃষ্টিধারা—বসুধা সিঞ্চন —
তখন ছোটে যে প্রাণ, তোমার চরণে!
নিরালায় বসে আমি, করি মা চিন্তন,
থাকি যেন ওই পদে, জীবনে-মরণে!
আশা না পুরিল কভু, তোমার সাধনে,
তিয়াশী চাতক প্রায়, হয়ে থাকি মুগ্ধ!
ফিরিল না হৃদি কভু, তোমার তাড়নে,
চিরদিন হয়ে আছি, তব পদ লুব্ধ!
জানি না হইব কি না, সিদ্ধ সাধনায়,
রাজীবে গৌরব কিনা, অপূর্ব্ব বিভায়?

আত্মহত্যা।

লেখক—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম।

নিজকে নিজে হনন করিবার নাম আত্মহত্যা। আত্মহত্যার মূল মানসিক দুর্ব্বলতা। পরিণাম ফল ভীষণ নরক যাতনা। "মানুষ জীবিত থাকিলে শতবর্ষ পরেও সুখী হইতে পারে।" কিন্তু আত্মহত্যায় ঐহিক ও ভবিষ্যৎ সুখে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে হয়। শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশানুসারে আত্মহত্যা মহাপাপ। এ মহাপাপের ফল, অনন্তকাল দুস্তর ভোগ। নিরয়ে সুখের লেশও নাই। যে দুঃখ শান্তির নিমিত্ত বিবেক বিহীন মূঢ় মানব আত্মহত্যা করে—নিরয়ে কেবলই সেই দুর্বিসহ লোমহর্ষণ দুঃখের গভীর নিষ্পেষণ। কেবলই "হা-হুতাশ"—কেবলই অসহনীয় অনন্ত যাতনা। মূঢ় লোক, বৃথা ক্ষণ স্থায়ী পার্থিব সুখের আশায় অভিনব বিপদকে আহ্বান করে; ঐহিক সামান্য যাতনার শান্তির নিমিত্ত আত্মহত্যা করিয়া অন্তিমে কতই না ভীষণতর যাতনার বজ্রময় কঠিন নিষ্পেষণে জর্জ্জরীভূত হয়।

আত্মহত্যা বিষয়টি তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম আত্ম প্রাণ নাশ। দ্বিতীয় আত্ম প্রশংসা দ্বারা আত্মসম্ভ্রমের অপলাপ। তৃতীয় আত্ম বিকৃতি। অর্থাৎ অপরিমিত বা অনৈসর্গিক ভাবে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া স্বীয় জীবন ধ্বংসের পথ উন্মুক্তকরা। এই ত্রিবিধ আত্মহত্যাই মহাপাপ জনক এবং অবশ্যম্ভাবী অনন্ত নিরয় যাতনা প্রদ। তবে দুষ্কৃতির গুরুত্ব অনুসারে পাপ ভোগের সমানুপাতিক পার্থক্য থাকা অসম্ভব নহে। কর্ম্মানুযায়ী ফল অবশ্য সকলকেই ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বরের রাজ্যে স্বর্গ—নরক দুইই আছে। কর্ম্ম দ্বারা যে স্থানে ইচ্ছা গমন করিতে পার। অবারিত দ্বার।

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন প্রভৃতি আরও বহুবিধ আত্ম বিকৃতিরূপ আত্ম হত্যার কারণ বিদ্যমান আছে; কিন্তু সে সকল বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে অধুনা—

আত্মপ্রাণ নাশ!

রূপ সাংঘাতিক শ্রেণীর আত্মহত্যা ব্যাধির পুর্ণাবির্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অহিফেন সেবন, উদ্বন্ধন, জলে নিমজ্জন, শাণিত শস্ত্র বা রজ্জুর ব্যবহার ইত্যাদি কোন রূপ অবৈধ জঘন্য উপায়ে সুদুর্লভ মানব জীবন ধ্বংসের কথা প্রায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শ্রুত হওয়া যায়। সাধারণতঃ কঠিন প্রকৃতি পুরুষ অপেক্ষা

সুকোমল হৃদয়া মহিলা দিগকেই অধিক সংখ্যায় এ রোগের অধীন হইতে দেখা যাইতেছে। ইহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-হৃদয়ের অধিকতর দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত একটুকু স্বাধীন। কোনরূপ গ্লানিজনক দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে তাঁহারা যত সহজে উহা দুরী করণে সমর্থ হয়, রমণীগণের পক্ষে তাহা তত সহজ সাধ্য নহে। তাই তাঁহারা জীবনের দুর্ব্বিসহ দুঃখের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মানসিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন করতঃ পার্থিব সকল দুঃখের—সকল যাতণার শান্তি করিতে যাইয়া ঘোরতর নিরয়ে গমন করে। অতএব যাহাতে উল্লিখিতরূপ দুর্ব্বল হৃদয় সম্পন্ন স্ত্রী পুরুষেরা সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ দ্বারা হৃদয়ের বল সঞ্চয় করিতে পারে এবং আত্মহত্যা জনিত নিরয়ের দুঃখময় ভীষণ চিত্র কল্পনার চক্ষে দর্শন করিয়া এবংবিধ দুষ্কৃতি হইতে স্বতঃ নিবৃত্ত থাকিতে সমর্থ হয়, ব্যক্তি মাত্রেরই তদ্বিষয়ে যত্নিক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

অধিকাংশ স্থলেই তরল মতি কুল বধুগণ, শাশুড়ী ননদিনী কিংবা গুণধর স্বামীর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অথবা প্রাণারাধ্য প্রিয়তম স্বামী দেবতার স্বর্গীয় ভালবাসায় বঞ্চিতা হওয়ায়, কি তাঁহার (স্বামীর) মানবোচিত চরিত্রবলের অভাবেই অলৌকিক রূপে সুদুর্লভ মানব জীবন ধ্বংস করিতে অভিলাষিণী হন। এ ক্ষেত্রে মাতৃসমা স্নেহময়ী শাশুড়ী ও অবলা হৃদয় স্বর্ব্বস্ব স্বামী এবং বাঘিনী ননদিনী প্রভৃতির নিজ নিজ হৃদয়ে উপযুক্তবল সঞ্চয় করিয়া বধু নির্জ্জাতন ব্রতে বিরত থাকাই একান্ত সমীচীন। আমাদের বিশ্বাস, শাশুড়ী যদি পুত্রবধূকে পরকন্যা না ভাবিয়া স্বীয় গর্ভ সম্ভূতা দুহিতার ন্যায় জ্ঞান করিতে পারেন এবং পুত্র বধূও যদি শাশুড়ীকে গৃহ কণ্টক মনে না করিয়া পরমারাধ্যা স্নেহময়ী জননী জ্ঞানে যথোচিত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্ন করিতে পারেন, অসময়ে তাঁহার (শ্বশ্রূর) আসনে স্বয়ং বসিতে প্রয়াস না পান, আর পুরুষ পুঙ্গবেরাও যদি একটুকু বুঝিয়া শুনিয়া পরিবার প্রতিপালন ও স্বীয় স্বীয় চরিত্র রক্ষণে তৎপর হন, তবে বুঝিবা এই জঘন্য আত্মহত্যা মহাব্যাধির শনৈঃ শনৈঃ এত বৃদ্ধি না হইয়া অনেকটা প্রশমনই ঘটিতে পারে।

আত্মহত্যার অন্যতম কারণ দরিদ্রতা। বহুস্থলে দরিদ্রতাই পারিবারিক বিবাদ বিসংবাদ প্রভৃতি সৃষ্টির মূলীভূত কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সেই সকল সাংসারিক জঞ্জাল ও উত্তমর্ণের মর্ম্ম ভেদী কঠোর বাক্য শৈল্য সহ্য করিতে না পারিয়া কিংবা দারিদ্র নিবন্ধন নিজ পরিবার বর্গের ভরণ পোষণে অসমর্থ

হইয়াই লোক আত্মহত্যা রূপ অতি জঘন্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ সময় বিশেষে ঘটনা চক্রে পড়িয়া মানুষ এমনিই বিপদ বিহ্বল হয় যে, আত্মহত্যাকেও তাঁহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে তৃপ্তিপ্রদ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। অন্যথা ইচ্ছা করিয়া কে গরল ভক্ষণে স্বীয় প্রাণাহুতি দিতে চায়? অনেক স্থলে কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী স্বকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের ঘোরতর ত্রুটি নিবন্ধন ভাবী রাজদণ্ড ভয়ে ভীত হইয়া আত্মহত্যা বলে মুক্তি পাইতে যান্ত্রিক হয়। কোথাও বা পবিত্র মুর্ত্তি রমণী সতীত্বরত্নে জলাঞ্জলি দিয়া উক্ত দুড়পণের কলঙ্ক প্রকাশ ভয়ে, আত্মহত্যা করিয়া থাকে। পুরুষদিগকেও সময় সময় ঐরূপ অবৈধ প্রণয়ে মজিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে দেখা না যায় এমত নহে। ফলতঃ মানুষ নানারূপ পাপের দায়ে আবদ্ধ হইয়াই স্বীয় প্রাণ অবৈধ উপায়ে উৎসর্গীকৃত করিয়া থাকে। মানবমন যতদিন পাপ-পথ হইতে বিরত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক মাত্রায় আত্মহত্যারূপ এ মহাপাপস্রোত অবিরাম প্রবাহিত হইবারই সম্ভাবনা। মানুষ ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ স্পর্শ করিলে কুত্রাপি কোন গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করে না। অতএব যাহাতে মানব মণ্ডলী পাপস্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মবলে বলীয়ান হয়, তদ্বিষয়ে যাত্নিত হওয়াই আমাদের সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আত্মপ্রশংসা ও আত্মবিকৃতি রূপ আত্মহত্যার বিষয় বারান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

কমলা।

লেখক—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সম্মিলন।

কমলা যখন উপস্থিত হইলেন, তখন রঘুপতি বন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া দেহে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি কমলাকে দর্শন করিয়াই ভয়ে ঘরের মধ্যে পলায়ন করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। ভয়ে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। স্বামীকে দর্শন করিয়াই কমলার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু স্বামীকে ঐরূপ ভাবে পলায়ন করতঃ ঘরের দ্বার বন্ধ করিতে দেখিয়া, তিনি রোদন করিতে লাগিলেন দ্বারের নিকটে গমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমাকে দেখিতে না চাও,

তোমার অন্ধা মায়ের কথা কি একবারও চিন্তা কর না?" রঘুপতি কথা শ্রবণ করিয়া ঘরের মধ্য হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কমল! তুমি কি জীবিত আছ? আমার দুঃখিনী অন্ধা মা কি জীবিত আছেন? আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি। ভয়ে আমার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইতেছেনা। এই দেখ, হুকাটি কম্পান্বিত হস্ত হইতে ঘরের মেঝে পড়িয়া গিয়াছে।" এত দুঃখেও কমলার মুখে হাসি আসিল, তিনি জিজ্ঞাসাকরিলেন, "আমাকে দেখিয়া এত ভয় কিসের?"

রঘুপতি বলিলেন, "প্রায় এক বৎসর গত হইল, আমি কালীভৈরবের এক পত্র পাই, তাহাতে লিখিতছিল, তুমি ও মা মারাগিয়াছেন, সেই পত্র পাইয়া আমার সংসারে আস্থা নাই। এখানকার আমারযাহা কিছু আছে সমস্তই বিক্রয় করিয়া কাশীবাস করিব মানস করিয়াছি। বাবু, বাবুর মা ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে সংসারী করিবার জন্য পাত্রী স্থির করিয়াছেন। সেই জন্য তুমি যমালয় হইতে আগমন করিয়া আমাকে তোমার নিকটে লইয়া যাইতে আইস নাই ত?" কমলা রঘুপতির কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি না পুরুস মানুষ? তোমার এত ভয়? ভয় নাই; আমি মরি নাই; তোমার মাও মরেন নাই। তুমি ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমার শ্রীমুখ দেখি এবং তোমার পাদপদ্মের ধূলা মস্তকে ধারণ করি।"

তখন রঘুপতি ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া, কমলাকে বলিলেন, "কমল! আজ আমার হৃদয় শীতল হইল। হায়! কতদিনে গিয়া মায়ের পাদপদ্ম দর্শন করিব? মধুসূদন! তুমি ধন্য? যে তোমাকে বিপদে ভুলে না, তুমি তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। আমার দ্বারাই তোমার মধুসূদন নামের সার্থকতা সম্পাদন হইল।

তিন দিন অনাহারে এবং পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায়, কমলা রঘুপতির পদতলে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রঘুপতি কমলার অবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, কমল, কমল, প্রাণের কমল! দেখা দিয়া আবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও কেন? প্রিয়তমে! উঠ; একবার কথা কও; আমার সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হউক। আমার সদানন্দময়ী কমলার মুখ এমন হইল কেন? ইত্যাদি কতই রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সর্দ্দার আসিল। সর্দ্দার দেখিয়া বলিল, বাবু! ও কেরে? তুই কান্‌চিস্ কেনরে। রঘুপতি বলিলেন, "বলিব এখন; তুই শীঘ্র জল

লইয়া আয়।" সর্দ্দার জল আনিল। এইরূপ জলের ঝাপ্টা দেওয়ায় কমলা চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "প্রিয়তম! তোমাকে যে পুনরায় দেখিতে পাইব এমন আশা ছিল না। দাও তোমার পায়ের ধুলা আমার মস্তকে দাও; বলিয়া রঘুপতির পায়ের ধুলা মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। হা, অদৃষ্ট! আমাকে ধিক! আমি জীবিত, আর তুমি নিরাভরণা? সাদা থান পরিধান করিয়াছ? সর্দ্দার! আমার ঐ কাপড় খানা আনিয়া দে। ক্রমশঃ একে একে অনেক বুনো ও তাহাদের স্ত্রীরা আগমন করিল। সকলে রঘুপতির মুখে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু! তোদের দেশ বড় খারাপ। তোদের দেশের লোকের ধরম নাই। ইত্যাদি কত কথাই বলিতে লাগিল।

রঘুপতি সর্দ্দারের দ্বারা একজোড়া শাটী ও নারিকেল তৈল আনাইলেন। পূর্ব্বেই কমলার সীমন্তে সিন্দুর ও বাম হস্তে লৌহ পরাইয়া দিয়াছিলেন। কমলার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তাঁহাকে এক বাটী গরমদুগ্ধ খাইতে দিলেন। তিনি প্রথমে দুগ্ধ পান করিতে চাহিলেন না। কিন্তু রঘুপতি ও বুনা রমণীদের অনুরোধে দুগ্ধ পান করিলেন। রঘুপতি স্নান করিয়া আসিলেন। বুনা রমণীরা কমলাকে স্নান করাইয়া আনিল। তাহারা বলিতে লাগিল, তুই আমাদের ভাদু মা আছিস। (ভাদু বুনাদের দেবী) বাস্তবিক কমলার এত রূপই বটে। আহারান্তে দম্পতি যুগল ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আপনাদিগের সুখ দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। কমলা কিরূপে এই সুদীর্ঘ পাঁচ পাঁচ বৎসর সংসার চালাইয়াছেন, একে একে সমস্ত বিবৃতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকটে আসিবার জন্য শাশুড়ীর আহারাদির কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন, একে একে সমস্ত বর্ণনা করিলেন। রঘুপতি শুনিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গেলেন। নয়ন জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল, এবং নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কমলাকে বলিতে লাগিলেন, আহা মরি মরি! আমার সোণার কমল এই হতভাগ্যের জন্য কি কষ্টই পাইয়াছে। কমলা বলিলেন, যখন তোমার শ্রীচরণের দর্শন পাইয়াছি, সে সকল কষ্ঠ আমার পক্ষে কষ্টই নয়। মা কেমন আছেন, তাঁহার আহারাদি কিরূপে হইতেছে? এখন আমার সেই ভাবনাই প্রবল হইয়াছে। তোমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারিলেই আমার দুঃখের বিমোচন হয়। তখন রঘুপতি বলিলেন, কালীভৈরবটা এমন নরাধম আমি বুঝিতে

পারি নাই। আমার তাহাকে ভাল বলিয়াই বিশ্বাস ছিল। সে উত্তম বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিয়াছে। জগতে সৎলোক দুর্ল্লভ। আগে বাড়ী যাই, তারপর তাহাকে দেখিব। কমলা বলিলেন, তুমি আর দেখিবে। যখন আমাদের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিলে, সেই সময়ে তোমার একবার বাটীতে যাওয়া উচিত ছিল না কি? বাড়ীতে গিয়া শ্রাদ্ধ করিলে কি দোষ হইত? গৃহে তোমার জিনিস পত্র ত রহিয়াছে। রঘুপতি বলিলেন, কমল! দুরাত্মা আমাকে এমন পত্র দিয়াছিল যে আমি যে দিন পত্র পাইয়াছিলাম সে দিন তোমাদের সাত দিন মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। দেশে গিয়া শ্রাদ্ধাদি করা অসম্ভব হইত। কাজেই আমাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে। কমলা বলিলেন, শ্রাদ্ধের পর কোন একবার গেলে? রঘুপতি বলিলেন, কমল! যাহা বোকামি হইয়াছে তাহার ত কথাই নাই। কমলার নয়ন যুগল জল ভারাক্রান্ত হইল। তিনি সেই অশ্রুবেগ সংযত করিতে পারিলেন না।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

ঋতুসংহারম্।—সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। সংস্কৃত টীকা শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তপস্বি বিদ্যাভূষণ দ্বারা বিরচিত। পদ্যানুবাদ রচয়িতা শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার। ছাপা, কাগজ, বাঁধা, সুন্দর মূল্য কত? পুস্তকে তাহ র উল্লেখ নাই।

সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস ভুবনবিখ্যাত মহাকবি, সেই অমর কবির লেখনী প্রসূত "ঋতুসংহার" সংস্কৃত ভাষায় একখানি সুমধুর অপূর্ব্ব কাব্য। ঋতুসংহার ছয় সর্গে বিভক্ত এবং ছয়টি ঋতুর বর্ণনায় পরিসমাপ্ত। মহাকবি কালিদাস আদি রসাত্মক মহাকবি সুতরাং ঋতুসংহার কাব্যে আদি রসের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি; বর্ত্তমান রুচি-বাগীশগণের নিকটে আদি রসের সমাদর নাই, কি স্তুপূর্ব্বে সেরূপ ছিল না, আলঙ্কারিকেরা এই আদি রসকেই "ব্রহ্মানন্দসহোদরঃ" বলিয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস প্রকৃতির বর পুত্র ও উপযুক্ত শিষ্য; তাঁহার সমস্ত কাব্যই স্বভাবের জলন্ত ছবি। ঋতুসংহারে স্বভাব বর্ণনায় প্রকৃতি বর্ণনায়, পশু পক্ষীর বর্ণনায়, নরনারী হাব-ভাব-রূপ বর্ণনায় কবি সকল স্থলেই যথাযথ প্রকৃতি-গত বর্ণনাই করিয়াছেন,—ঋতুসংহারের বর্ণনা মধুর ভাবপূর্ণ, ইহাতে মহাকবি

কালিদাসের কবি প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ পাইয়াছে ও অনুবাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয়ের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋতুসংহারের বঙ্গপদ্যানুবাদ এবং সংস্কৃত টীকা পাঠ করিয়া আমরা পরমপ্রীত হইয়াছি। সুধী সমাজে এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

খেয়াল।—সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী বিরচিত। শ্রীযুক্ত তারকনাথ বাগ্‌চী দ্বারা ৯।২ নং গৌরলাহার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত; মূল্য বারো আনা মাত্র। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

আমরা "খেয়াল" একখণ্ড উপহার পাইয়াছি, পুস্তকে কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে; খেয়ালের কোন কোন কবিতা ইতিপূর্ব্বে "জন্মভূমি" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার বোধ হয় অনাবশ্যক জ্ঞানে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই।

"খেয়াল" পাঠ করিয়া আমরা বস্তুতই আনন্দ লাভ করিয়াছি। খেয়ালের কবিতাগুলি সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক, খেয়ালকে একখানি উৎকৃষ্ট কোষকাব্য বলা যাইতে পারে,—"বাক্যরসাত্মকং কাব্যং" রসযুক্ত বাক্যকেই কাব্য বলা যায়, কিরূপ রসযুক্ত বাক্যকে কাব্য বলা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আলোচ্য খেয়াল কোষকাব্যে শ্রীযুক্ত বাগচী মহাশয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। খেয়ালের গ্রন্থন সৌকর্য্য প্রাঞ্জল, প্রত্যেক কবিতার ভাব ও ভাষা লালিত্যে আমরা এতদূর মুগ্ধ হইয়াছি যে, মুখবন্ধের কয়েক ছত্র কবিতা পাঠক পাঠিকাগণের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মুখবন্ধে কবি লিখিয়াছেন:—

"মনে যদি ভাব ওঠে কে রাখে তা চেপে।
যে রাখে সে বোবা হয়—নয় যায় ক্ষেপে॥
ভাষার পোষাক দিয়ে কেতাবের শেপে।
প্রকাশ করিনু তাই ভাবগুলা ছেপে॥
ছাপা হেঁজীপেঁজী নয়—কি ব্যয় বাহুল্য।
খরচের তুলনায় সামান্যই মূল্য॥
চক্‌চকে আইভরি ফিনিশ পেপার।
নম্বর ওয়ান্ কালী বিরাট ব্যাপার॥
খাঁটি সোণা দিয়ে রঙিন্ কভার।
চোখে পড়িলেই হবে ইহার শভার॥

প্রথমেই আছে দুটি হাফটোন ছবি।
একটি স্বনাম ধন্য অন্যটি এ কবি॥
এ বহি বিলাতে আমি নিতান্ত অশক্ত।
এক একখানি বহি, এক ভরি রক্ত॥"

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে প্রাচীন কবিগণের আদর্শে এমন করিয়া মনের ভাব সরল কথায় প্রকাশ করিবার শক্তি আধুনিককবিগণের সচরাচর দেখা যায় না,—তাই "খেয়াল" কোবকাব্য খানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, "খেয়াল" পাঠ করিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি।

প্রাপ্তি স্বীকার।

কলিকাতা ৬৮ নং সুতাপটী বড় বাজারের সুপ্রসিদ্ধ কাপড় ও পোষাক বিক্রেতা জহরলাল পান্নালাল কোম্পানির—ইংরাজী ১৯১৪ সালের চিত্র পঞ্জিকা আমরা উপহার পাইয়াছি; আয়নাযুক্ত ও কৌশলে আবশ্যকীয় কাগজ পত্রাদি রাখিবার স্থান সমেত পঞ্জিকা আর বড় একটা কাহাকেও বাহির করিতে দেখা যায় না; ইহা গৃহে রাখিলে গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। আমরা জরলাল পান্নালাল কোম্পানির কারবারের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

দি, ডিভাইন ব্যাঙ্কিং এণ্ড ইন্‌সিওরেন্স কোং লিমিটেড।

উপরোক্ত কোম্পানি ইংরাজা নববর্ষের চিত্র পঞ্জিকা আমাদের উপহার প্রদান করিয়াছেন, ইহাঁদের চিত্রে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমভাবোদ্দিপক দৃশ্য বড়ই মনোহর; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরে বৃক্ষমুলে বসিয়া বংশীধ্বনি করিতেছেন, আর সরোবরে রাজহংস, মৃক্ষমুলে ময়ুর তন্ময় হইয়া সে বংশী ধ্বনি শ্রবণ করিতেছে; আর ভাবে বিভোরা প্রেমময়ী শ্রীমতী শ্রীরাধিকা সেই বৃক্ষমুলের অন্তরালে দণ্ডায়মানা; বাস্তবিক এ দৃশ্য স্বর্গীয় পবিত্র সুমধুর প্রেমভাবোদ্দিপক। দি, ডিভাইন ব্যাঙ্কিং এণ্ড ইন্‌সিওরেন্স কোং লিমিটেডের সুযোগ্য ম্যানেজীং ডিরেক্টর পি, কে, পাইন মহাশয়ের যোগ্যতায় ও কার্য্য তৎপরতায় কোম্পানির উত্তরোত্তর উন্নতি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। | ১৩২০ সাল, ফাল্গুন। | ১১শ সংখ্যা।

আসি ও যাই।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা হইয়াছে। দিবসব্যাপী প্রাণান্তকর পরিশ্রমে অতি শ্রান্ত দিবাকান্ত আকাশের পশ্চিমকোলে ডুবিয়া গিয়াছেন। তারা ফুটে নাই। পশ্চিম আকাশে কে যেন সূক্ষ্ম তুলিকায় কত রঙের কত ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। ওপারের গাছগুলি ধীরে ধীরে আঁধারে মিশিয়া যাইতেছে। ভাগীরথী তীরে একটি বিটপীমূলে আমি অর্দ্ধশায়িত। সম্মুখে বিপুলবক্ষা ভাগীরথী তর তর রবে জলধির পানে উন্মাদিনীর ন্যায় ধাবিতা। নীলজল আঁধারে মিশিয়া গিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি ক্ষণকালের জন্য আমাকে ভুলিয়াছিলাম। বহির্জ্জগতে আমার সজ্ঞান অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল; হঠাৎ একটি সঙ্গীতের একটি মধুমাখা কথা বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া আমার কাণের কাছে মিলাইয়া গেল। চেতনা ফিরিয়া আসিল। একবার চারিদিকে

চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম—তিনটি আঁধার মূর্ত্তি আমার দিকে আসিতেছে। তাহারা গাহিতেছে, "আমরা কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই।" ক্রমে কাছে আসিলে দেখিলাম, তিনটি রাখাল বালক গানের ঐ চরণটি বার বার গাহিতেছে। গাহিতে গাহিতে তাহারা আমার নিকট দিয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তাহারা তিমিরে ঢাকিল; কিন্তু তাহাদের গানের ঐ চরণটি তখনও আমার কাণে আসিতে লাগিল; ক্রমে গান মিলাইয়া গেল। গানটির একটি চরণ শুনিয়াছি। গানের সেই কয়টি মধুমাখা কথাই আমার কাণের ভিতর দিয়া মরমের মরম স্থানে পশিল; প্রাণ আকুল করিল। মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই?" প্রাণ আরও আকুল হইয়া উঠিল। কত ভাবিলাম, "কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই।" ভাবিয়া বুঝিতে পারিলাম না। গান বাতাসে মিশিয়াছে; কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব ঝঙ্কার আমার হৃদয় বীণার প্রতি তন্ত্রীতে বার বার বাজিতে লাগিল। কি জানি কেন, প্রাণ আরও আকুল হইয়া উঠিল। শষ্পশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম; গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। নিভৃতে স্বীয় প্রকোষ্ঠে শয্যায় শুইয়া আছি কিন্তু আমার মনের ভিতর তখনও সেই গানের মধুর ঝঙ্কার নীরব হয় নাই। আমি তখনও ভাবিতেছি—"কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই।" এই অনন্ত কালসমুদ্রে আমি একটি বুদ্বুদ বিশেষ; কেন আসি, কেন ভাসি, কেন মিলাই? এই সংসার উদ্যানে, আমি একটি নির্ব্বাস পুষ্প; কেন ফুটি, কেন হাসি, কেন শুকাই? এই পৃথিবীতে এই অসংখ্য জনস্রোতে কেহই জানে না "কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই।" আসি কেন, থাকি কেন, আবার দুদিন পরে চলিয়া যাই কেন, কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি আমায় থাকিতেও হইবে, যাইতেও হইবে, হয়ত আবার আসিতেও হইবে; আর কিছুই জানি না।

আমার এই আসা যাওয়ার মধ্যে কি এক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, তাহা আমিই জানি না; অপরে কেমনে জানিবে? কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া আমায় কি করিতে হইবে, আসিবার পূর্ব্বে আমায় কি করিতে হইত, আবার এখান হইতে চলিয়া যাইলে পর, যেখানে যাইব সেখানেই বা আমাকে কি করিতে হইবে; এ কথা নিজে ভাবিয়া পাই না, পরকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও বলিতে পারে না; আমাকে উন্মাদ স্থির করিয়া আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। জাহ্নবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম; কুলুকুলুস্বরে জাহ্নবী বলিয়া

উঠিলেন "এখনও জানি না, এখনও চলিতেছি।" জাহ্নবী চলিয়াছেন। কোথায় যাইবেন, কোথায় যাইলে তাহার বাঞ্ছিতকে পাইবেন, তাহা তিনি জানেন না; তবে তাঁহারই সন্ধানে তিনি চলিয়াছেন। উপরে ধূমকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল "এখনও পাই নাই, তবে ঘুরিতেছি।" কত সহস্র যুগ যুগান্তর ধরিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে নীলিমা ভেদ করিয়া ধূমকেতু তাহার অভীষ্টের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে, এখনও দেখে নাই। নীলনৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু চিক্ চিক্ ঝিক্ ঝিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। একে একে তাহাদের সকলকে ঐ কথাটি জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল, "ঘুরিতেছি, দেখি নাই।" সত্য কথা, কত কাল ধরিয়া তাহারা আকাশে ছুটাছুটি করিতেছে, গন্তব্যে উপনীত হয় নাই। পবন বহিয়া গেল। সে বলিল, "বহিতেছি, যাই নাই।" সৃষ্টির সেই আদিক্ষণ হইতে পবন নিরবধি বহিতেছে, এখনও তাহার চির অভিলষিত গন্তব্যে যায় নাই। যাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ একই ভাবের উত্তর দিল। কেহই বলিতে পারিল না। এই কাল সমুদ্রের কালজল বাহিয়া, আজন্ম ভাসিয়া চলিয়াছি; কে ভাসাইল, কেন ভাসিলাম মনে নাই। বুঝিতেছি আমি ভাসিতেছি। কত কাল পরে কূল পাইব জানি না, হয়ত এ সমুদ্রের অন্ত নাই, এ সমুদ্রে দ্বীপ নাই; এ সমুদ্রে আশ্রয় পাইবার একগাছি তৃণও ভাসিয়া আসে না। আমি কি করি, কোথায় যাই, কাহাকে ডাকি, কেই বা আমার কথা শুনিবে। এ কাল সমুদ্রে আমার করুণ আহ্বান শুনিবার জন্য কে এখানে বসিয়া আছে। যে ভীষণ অন্ধকার এ সমুদ্র ঘেরিয়া আছে, তাহার মধ্যে আলো লইয়া কে আমায় পথ দেখাইবে! ফিরিবার উপায় নাই, ডুবিতেও সাহস হয় না। কোথায় আসিয়াছি, আর কতদূর যাইতে হইবে, কে তাহা বলিয়া দিবে। যে দিকে চাহি সে দিকেই আঁধার, আঁধার, আঁধার। বোধ হইতেছে ঐ আঁধারের মধ্যে কত বিভীষিকাময় বস্তু আঁধার দ্বিগুণিত করিয়া অট্টহাস্য করিতেছে। বোধ হয় আমাকে দেখিয়াই তাহারা হাসিতেছে। আমি ভয়ে কাঁপিতেছি; তাহারা আরও হাসিতেছে। আমাকে কি অনন্ত কালের জন্য, এই বিপদ সঙ্কুল মহাকাল সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেই হইবে? সংসারে এত কাল আছি, আরও কত কাল থাকিতে হইবে কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসা হইল না; পরে হইবে কি না কে জানে? এ সংসারে আসিয়া অবধি কত হাসিলাম, কত কাঁদিলাম; কিন্তু কেন হাসিলাম, কেনই বা কাঁদিলাম, তাহাত বুঝিতে পারিলাম না। বেশ

জানি মর জগতে অস্তিত্বের একটি গূঢ়তম মহান্ রহস্য জীবনের এই হাসিকান্নার মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু কি সেই রহস্য?

ঐ যে নীল আকাশে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে; ঐ যে তাহারা হাসিয়া আকুল হইতেছে; আবার ঐ যে তাহারা নিশাশেষে চুপে চুপে মলিন মুখে নীলিমার মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে;—এসবের কারণ কি? কত ভাবিলাম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিলাম না, তাহারা দিবাশেষে নীল আকাশে কেন ফোটে, কেন হাসে; আবার নিশাশেষে চোখের নিমেষে মলিনমুখে কোথায় পলায়! তাহাদের এই অনাহুত আবির্ভাবের, এই নীরব হাস্যের, এই বিষাদময় প্রয়াণের মধ্যে একটি প্রহেলিকা ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু কি সেই প্রহেলিকা?

ঐ যে নীল গগনের এক কোনেতে একটু কালো মেঘ ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে কালো মেঘে বিশাল শূন্য ঢাকিয়া ফেলিল; ঐ যে গুরু গম্ভীর নির্ঘোষে মানবকে বধির করিয়া তুলিল; মুষলধারে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল; পলে পলে বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, দিবসে রজনী আসিল; হুহুঙ্কারে পবন বহিল; বুঝিবা প্রলয় ঘটিল। আবার দেখিতে দেখিতে মেঘ চলিয়া গেল; নীল আকাশ প্রকাশ পাইল; পবনের ভীষণ বেগ প্রশমিত হইয়া মৃদুমন্দ মারুতে পরিণত হইল; অশনির সেই ভীম নিনাদ স্তব্ধ হইল; কাননে পাখী ডাকিল; সৌদামিনী অদৃশ্যা হইল, রোদ্র বিকাশ পাইল। এসব কেন হইল? কে ঘটাইল? মেঘ কেন আসিল, গগন কেন ঢাকিল, আবার কেন চলিয়া গেল? কি সেই রহস্য?

ঐ যে ঊষার বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া, আঁধার উদ্যান আলো করিয়া, কত ফুল ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে স্ব স্ব অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল; হাসিমুখে চারিধারে চাহিয়া দেখিল, চুপে চুপে পবন করে অকাতরে কত পরিমল বিলাইয়া দিল; কেহ বা গাছে থাকিয়া হাসিতে লাগিল, কেহ বা কোমল বালিকার কমণীয় কণ্ঠে স্থান পাইয়া তাহার সেই সরল হাসি চুরি করিল; আবার দেখিতে দেখিতে তাহারা তাহাদের সদানন্দ অস্তিত্বের শেষ করিয়া শুকাইয়া ঝরিল। তাহারা ফুটিল, হাসিল, শুকাইল কেন?

ঐ যে শ্রবণমধুর নিনাদে কত যোগী, ভোগীর মন ভুলাইয়া স্বচ্ছহৃদয়া তটিনী তরঙ্গভঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে, কত নগর, কত কানন তাহার স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; কত রূপসী তাহার স্বচ্ছনীলজলে অবগাহন করিতেছে; কত

কুরূপা তাহার স্বচ্ছ হৃদয়ে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শনে নিজেকে রূপসী ভাবিতেছে। তটিনীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তটিনী পাগলিনী। কত পূজার ফুলে মালা পরিয়া, কত পুণ্য স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া তটিনী—পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়াছে; কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, সে জানে না; কেহ জানে কি?

কেহ জানে না, কেহ ভাবে না, কেহ জানিতেও চাহে না "কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই।" ভাবিয়াছিলেন একজন সেই নিত্যশুদ্ধ—বুদ্ধদেব। তিনি ভাবিয়াছিলেন বলিয়াই রাজ্য, সম্পদ্, মান কিছুই তাঁহাকে ভুলাইতে পারে নাই। তিনি জানিয়াছিলেন বলিয়াই, স্নেহের আগার পিতামাতা, প্রেমের নির্ঝর ভার্য্যা, স্নেহের কোরক সুকুমার তনয় কেহই তাঁহাকে মায়া বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি জানিয়াছিলেন বলিয়াই, আজি অর্দ্ধ জগৎ সেই বিশ্বপ্রেমিকের পাদমূলে নতশির।

আর জানিয়াছিলেন—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব। তিনি জানিয়াছিলেন বলিয়া গৃহবাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, সংসার বন্ধনছিন্ন করিয়াছিলেন। জানিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রেমের সেই মোহিনীশক্তি সর্ব্বজীবে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন—সেই আদি, সেই অনন্ত, সেই প্রেমময়, সেই বিশ্ববিমোহন সেই কৃষ্ণবরণ লীলাময়ের তিনি একটি অংশ বিশেষ। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহারই নিকট হইতেই তিনি আসিয়াছেন। সাগরোপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি দেখিলেন যে, সাগর তাঁহারই মত বিশাল, প্রেমে তাঁহারই মত সদা উচ্ছ্বসিত, তাঁহারই মত বিশ্ববিমোহন, আবার তাঁহারই মত কালোবরণ। তিনি দেখিলেন, প্রতি তরঙ্গে চাঁদের আলো কত ভাবে কত খেলা খেলিতেছে। ভাবিলেন—এই ত সেই—তাঁহার চিরাভীষ্ট। ভাবিলেন এই ত সেই, তিনি যেখান হইতে আসিয়াছেন! আর থাকিতে পারিলেন না প্রেমের উদ্দাম স্রোতে হৃদয়ের সব বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। প্রেমের অবতার প্রেমময়ের ভাবময় আলিঙ্গনে মাতোয়ারা হইয়া সাগর বক্ষে ঝাঁপ দিলেন।

এ সংসারে যখনই কেহ বুঝিতে পারিবে "কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই," তখনই তাহার সহিত সংসারের সকল সম্বন্ধই লোপ পাইবে। এ প্রশ্ন যে ভাবে সে পাগল হয়।

আমি চলিয়াছি—ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি চলিতেছি, আর কত কাল আমাকে

এই ভাবে চলিতে হইবে, মৃত্যুর পরও চলিতে হইবে কিনা, গন্তব্যস্থল আমার নিকট হইতে কতদূরে? এ কথা আমার মত সকল পথিকেরই জিজ্ঞাস্য। দার্শনিক এ প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর প্রদান করিয়াই স্বীয় অসামান্য পাণ্ডিত্যের বিকাশে গর্ব্বভরে গাম্ভীর্য্য ধারণ করেন। দার্শনিক এই কঠিন প্রশ্নের গুরুত্ব কিছুমাত্র অনুভব না করিয়াই বলিয়া দেন "সকলই স্বপ্ন, সকলই ভিত্তিহীন।" উত্তর শুনিবামাত্র স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের গভীর গবেষণার স্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছে। যদি আমাদের এই আসা যাওয়া সকলই স্বপ্নময় ও ভিত্তিহীন হইল, তবে বাস্তব সত্য কি?

যখন এ বিশ্ব সৃষ্ট হয় নাই, যখন গ্রহ নক্ষত্রাদি খচিত ঐ নীল নৈশ নভোস্থল সৃষ্ট হয় নাই, যখন জলস্থল, জীবজন্তু এ বিশ্বে জন্মে নাই, তখন কি ছিল? কোথা হইতে এই জনসমাকীর্ণ তৃণলতাদিশোভিত পৃথিবী উৎপন্ন হইল? কোথা হইতে আসিয়া ঐ নীল আকাশ তারার হার গলায় পরিয়া অনন্ত শূণ্য ব্যাপ্ত করিল? কেহ জানে কি? কেহ জানিতে চাহে কি?

আবার যখন সকলই যাইবে, এই বিশাল বিশ্ব, ঐ বিচিত্র বিকাশ আকাশ, ঐ নয়নরঞ্জন গ্রহ-নক্ষত্রগণ, এই দাম্ভিক মানব, জীব জন্তু যখন সকলই যাইবে, কি থাকিবে? বিদায় লইয়া তাঁহারা কোথায় যাইবে? কোন্ মহান্ শূণ্যে মিশিয়া তাহারা আপন হারাইবে?

অদূরে একটি গৃহে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল; আনন্দ কলরবে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল প্রতিবাসীই আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে সেই গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল; গৃহে আনন্দের হাট বসিয়া গেল। শুনিলাম, গৃহস্থের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনে ভাবিলাম— আনন্দের কথা বটে।

দিন যায় দিন থাকে না। একদিন, দুইদিন, তিনদিন করিয়া কত দিন চলিয়া গিয়াছে। একদিন সেই গৃহস্থের গৃহে বড় আনন্দের ধুম পড়িয়া গিয়াছে; আত্মীয় স্বজনে গৃহ পূর্ণ হইয়াছে। সকলেই আনন্দ করিতেছে; নানাবিধ গীতিবাদ্যের রবে পল্লী মুখরিত হইতেছে; কত রঙের কত ফুলে সজ্জিত হইয়া গৃহ নববেশ ধারণ করিয়াছে; পল্লী বাসিনী কুল রমণীগণ স্ব স্ব গৃহের বাতায়নে বসিয়া পথের পানে চাহিয়া আছে। হঠাৎ আনন্দ দ্বিগুণিত হইল। শুনিলাম,—গৃহস্থের পুত্র নববধু লইয়া গৃহপ্রবেশ করিতেছে। মনে ভাবিলাম— আনন্দের কথা বটে।

আবার একদিন, দুইদিন, তিনদিন করিয়া কত দিন চলিয়া গেল। এক দিন অর্দ্ধরাত্রে মুষলধারে শিলাবৃষ্টি হইতেছে; নৈশ নক্ষত্রমালা মেঘে লুকাইয়াছে, চারিদিক আঁধারে ঘেরিয়াছে; মেঘের কোলে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিতেছে; পরক্ষণে ভীমনাদে করকাভিঘাত হইতেছে; হুহুঙ্কারে পবন বহিতেছে; নদীবক্ষে বায়ুতাড়িত তরঙ্গমালা তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। অকস্মাৎ গম্ভীর বজ্রনিনাদ ভেদ করিয়া কাহার করুণ বিলাপ, কাহার মর্ম্ম-স্পর্শী আর্ত্তনাদ ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিল। বোধ হইল, সেই বেদনাময় আর্ত্তনাদে কোন শোকাতুর তাহার ভীষণ বিপদে সাহায্য চাহিতেছে। কেহই অগ্রসর হইল না। শোকাতুরের সান্ত্বনার জন্য, বিপন্নের সাহায্যের জন্য, আর্ত্তের রক্ষার জন্য, কেহই যাইল না। শুনিলাম—গৃহস্থের সেই বড় সাধের পুত্রটি অকালে ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। মনে ভাবিলাম—শোকের কথা বটে; আরও ভাবিলাম, তাহাতে লোকের কি?

যদি কেহ জান, বলিয়া দাও, যদি কেহ শুনিয়া থাক, বলিয়া দাও "কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই।" আমাদের এই আসা-যাওয়ার মধ্যে একটি মহা-সন্ধিস্থল আছে—মৃত্যু। মৃত্যু হইলে মানবের কি হয়? আত্মা কোথায় যায়? মৃত্যু ঘটিলে আত্মা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না, ক্ষণকালের জন্য তিরোহিত হয়? এ কথা কেহই জানে না। লোকে এইমাত্র জানে যে যাহা ছিল, তাহা আর নাই; যাহা আছে, তাহাও চিরদিন থাকিবে না। সৃষ্ট হইলেই, ধ্বংস হইবে। আসিলেই যাইতে হইবে। কিন্তু এই আসাযাওয়ার মধ্যে মরজগতে আমাদের ক্ষণিক অস্তিত্ব অন্তর্নিবিষ্ট। এই ক্ষণিক অস্তিত্বের উপর আমাদের এত ভালবাসা—কেন জন্মে? এই ক্ষণিক অস্তিত্বে, এই অস্থায়ী জলরেখায়, এই অলীক প্রতিবিম্বে বিশ্বাস করিয়া আমরা আমাদের আদি ও অন্ত ভুলিয়া যাই। সদাই মন জানিতে চাহে "কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই।" সময়ে সময়ে মন বড় আকুল হয়। আমি জুড়াইবার স্থানের জন্য ব্যাকুল হই, জুড়াইবার স্থান পাই না। যে দিকেই দেখি, সকলেই আমারই মত ভ্রান্ত, আমারই মত ব্যাকুলিত চিত্ত। সকলেই জানে "আসি, যাই।" কিন্তু হায়, কেহই জানে না 'কোথা হ'তে আসি আর কোথা ভেসে যাই।" তখন মনে ভাবি, মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত। আবার ভাবি—যখন

কেহই জানে না, কেহই ভাবিয়া পায় না; তখন এই অনন্ত কালসমূদ্রের সৈকত প্রান্তে বসিয়া নগণ্য ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র বালুকা কণা আমি, আমার ভাবিয়া, জানিয়া প্রয়োজন কি?

প্রাণাধিকের জন্মতিথি।

সপ্তদশবর্ষ তার যাইল চলিয়া।
প্রাণসম সে আমার, আজি জন্মতিথি তার,
তাহারি কল্যাণে যাচি ঈশ্বরে স্মরিয়া॥

কোথা ওহে নারায়ণ! পুরাও কামনা।
পুরাও মনের সাধ, কর তারে আশীর্ব্বাদ,
মন হ'তে মুছে দাও দুঃখের ভাবনা॥

কোথা দুর্গে! দুঃখ হরা, ডাকিমা তোমায়।
মস্তকের কেশ যত, দাও তার আয়ু তত,
রাখ মা তাহারে সুস্থ সুকুমার কায়॥

দাও তারে সুখশান্তি দেবী মহেশ্বরি!
দাও তারে ধন মান, মেধা বুদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞান,
সকলে বাসুক ভাল স্নেহ যত্ন করি॥

স্বর্গের দেবতাগণ করহ কল্যাণ।
বাছা যেন সুখে থাকে, সবে যেন দেখে তাকে,
করে যেন প্রাণ তুল্য আপনার জ্ঞান॥

চিরদিন সুখে থাক প্রাণাধিক মম।
অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপা তার, সুখে থাক মা আমার,
বড় ভালবাসি তারে তনয়ার সম॥

সরলা বালিকা সে যে সদা হেসে খেলে।
কাটাইছে দিন রাত, খেলিবার সখি সাথ,
আমারে আদর কোরে বলে ছেলে ছেলে॥

জগদীশ! ডাকি তোমা তাই অহরহ।
আজি জন্মতিথি ক্ষণে, কৃপা দৃষ্টি বরিষণে,
রক্ষা কর "মা"কে মম প্রাণাধিক সহ॥

ঊষা ও যামিনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শান্ত সমুদ্রের উপর দিয়া একখানি বহুজনপূর্ণ সুশোভিত তরণী অনুকূল বায়ুভরে দিব্য ভাসিয়া যাইতেছিল; শান্ত নীলাকাশ সুপরিস্কৃত দিঙমণ্ডল তরণীস্থ আরোহীরা নিঃশঙ্কচিত্তে তরণী মধ্যে আরাম করিতেছিল। কিন্তু প্রকৃতির অবস্থা সদা পরিবর্ত্তনশীল সহসা একদিন গগণোপ্রান্তে একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল। সান্ধ্যবায়ু সংযোগে সেই ক্ষুদ্র মেঘটুকু বিরাট কলেবর ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে শান্ত নীলাকাশ অনন্তঘনমেঘরাশিতে ভরিয়া গেল—লোলিহান অগ্নিজিহ্ব বিদ্যুৎচকিৎ হইল — ভীমনাদে বজ্র ডাকিল, আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত কম্পিত হইল—তরণীখানি প্রতিমুহূর্ত্তে নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কা হইতে লাগিল। তরণীস্থ আরোহীরা ভীতচকিত ও স্তম্ভিত।

এ সংসার সমুদ্রে দত্তদের সংসারতরণীখানির ঠিক এইরূপ অবস্থা।

যামিনীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া অবধি ঊষা চিন্তা করিতেছে। যামিনী কখন্ আসে কখন্ আসে। বেলা দুই প্রহরের সময় যামিনী নিশ্চিত আসিবে। ঊষা এইরূপ ধারণা করিয়াছিল। কিন্তু দুই প্রহরের পর আড়াই প্রহর, তৃতীয় প্রহরও অতীত হইয়া গেল, তথাপি যামিনী আসিল না, ঊষা বড়ই চিন্তা করিতে লাগিল। ঊষা স্বভাবতঃ বড়ই চিন্তা করিয়া থাকে।

অপরাহ্ন অতীত হইল, তথাপি যামিনী আসিল না। তখন ঊষা চিন্তার আশঙ্কা করিতে লাগিল। শেষে ভাবিয়া ঠিক করিল যামিনী যদি সন্ধ্যার সময়েও না আসে একটি দাসীকে লইয়া ঊষা নিশির অন্ধকারে লুকাইয়া যামিনীর পিত্রালয়ে যাইবে।

সন্ধ্যা হইল; দীপ জ্বলিল; ঊষা গৃহমধ্যে সেই দীপ সম্মুখে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল, দীপ শিখাটী বাতায়ণ রন্ধ্রস্থ মৃদু বায়ু সন্তারনে ধীরে ধীরে কম্পিত হইতেছে—ঊষার চিন্তা পরিম্লান মুখখানি গম্ভীর ও সুন্দর দেখাইতেছে। শান্তোজ্জ্বল চক্ষু দিয়া একটা অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইয়া আসিতেছে। সে জ্যোতিঃরাশি চিন্তা সহচরীর সহিত একত্রে সংযুক্ত হইয়া দূর ভবিষ্যতের আকাশ চিত্রপটে গভীর অন্ধকারপূর্ণ অদৃষ্টের গূঢ় লিখন পাঠ করিবার চেষ্টা পাইতেছে

আবার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, সেই ক্ষুদ্র দীপ শিখা সম্মুখে মুখখানি বড় গম্ভীর বড়ই সুন্দর, এবং বড়ই মহিমাময় দেখাইতেছে। ঊষা চিন্তা করিতে করিতে এরূপ অন্যমনস্ক যে মাথার বসন সরিয়া গিয়াছে। তাহাতে কিছু মাত্র মনোযোগ নাই। সারাদিন স্নানাহার নাই বিশুষ্ক, রুক্ষ কুন্তল জাল পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এক এক বার বায়ুভরে তাহাদের দুই একটি সেই সুন্দর মুখ খানির উপর হেলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে।

চিন্তা করিতে করিতে ঊষা সহসা গৃহবহির্দ্বারে একটা বিশ্রী কালো রেখা অঙ্কিত হইতে দেখিতে পাইল। সে বিকটাকার রেখাটা দেখিবামাত্র ঊষা শিহরিয়া উঠিল—চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। ঊষা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া গৃহ বহির্দ্দেশে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। ঊষা এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, সেই দীপালোকিত গৃহে এবং বহির্দ্দেশে অল্প অন্ধকারের সহিত একটা অব্যক্ত গম্ভীর নীরবতা আধিপত্য করিতেছে। ঊষা জনমানব ও শব্দহীন গৃহ মধ্যে একা ক্ষণেক দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া লইয়া তারপর নারায়ণকে প্রণাম করিয়া একখানি সলিল বস্ত্র পরিয়া নিরভরণা হইয়া একটী দাসীকে লইয়া সেই নৈশ অন্ধকারে লুকাইয়া অগ্রসর হইল। আসিবার সময় ঊষা মনের মনোরমাকে তাড়াতাড়ি বলিয়া আসিল—"আমি যামিনীর বাপের বাড়ী যাইতেছি, তুমি আমাদের ঘরে গিয়া ব'স।" মনোরমা যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে এমন অবসর ঊষা তাহাকে দিলনা।

এমন দুঃসাহসিক কার্য্য ঊষা এ জীবনে কখনও করে নাই। এরূপ ভাবে গুরুজনের বিনা আদেশে গৃহস্থ কুল বধূর কোথাও গমনাগমন ঊষা ইতিপূর্ব্বে বড়ই ঘৃণা করিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বরুণা দাসী সারাদিন যামিনীর মাকে বুঝাইয়াছে—"মা তোমার টাকা নষ্ট হবেনা, কারণ যামিনীর শ্বশুরের বাড়ীঘর সব তোমার কাছে বাঁধা আছে। কিন্তু মা তুমি যামিনীর গহনার বাক্স ছেড়োনা। তোমারও উপকার যামিনীরও উপকার।"

যামিনীর মা কিন্তু বরাবর বলিতেছে—বরুণা সব বুঝ্‌ছি তবু যামিনীর বাক্সটাতে আমার আদৌ মন সরেনা। কর্ত্তাও বোধ হয় রাজি হবেন না।

বরুণা একটু রাগিয়া বলিল—তবে মা যা ভাল বোঝ তা কর—শেষে কিন্তু আমাকে দোষ দিওনা।

যামিনীর মা বরুণার হাত ধরিয়া বলিল, তুই রাগ করিস না মা আমি যতবার তোর মত ঠেলে কাজ করেছি, তত বারই ঠকেছি। এখন কি করি বলদেখি? তুই যা ভাল বুঝিস্ তা কর, আমার মতামত নিস্না।

এবার বরুণার মনের মতন কথা হইল, বরুণার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বরুণা গৃহিনীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার কানে কানে কি কথা কহিল, গৃহিণী তাহা শুনিয়া কতকটা ভয়ে কতকটা আনন্দে কহিল—

"তুই একি পার্‌বি বরুণা?"

"তোমার মা বাপের আশীর্ব্বাদের জোর থাক্‌লে আমি সব পারি।

"দেখিস্ মা হিতে বিপরীত না ঘটে।

"তুমি মা অতো ভয় খেয়োনা।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইল। স্বভাবের আলোক অন্তর্হিত হইল। নিশার অন্ধকারে বিশ্বজগত জুড়িয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কুললক্ষ্মী ঊষা নিরাভরণা হইয়া নৈশ আঁধারের মধ্যে লুক্কাইত থাকিয়া মনুষ্য সমাগম শূণ্য একটা অচিহ্নিত পথ ধরিয়া দ্রুতবেগে যামিনীর পিত্রালয়দিকে অগ্রসর হইল। বৃদ্ধা সঙ্গিনী কহিল—"কোন পথে যাও মা" ঊষা তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া যাইয়া কহিল, "আস্তে কথা কও মা আমি ছেলে বেলা হইতে অনেক পথ জানি।

বৃদ্ধা। আমি এ পথে কখনও আসি নাই।

ঊষা। জানা পথে অনেক চেনা লোক। বেশী কথা কওনা মা চুপ্ করে চল।

দুইজন দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। নৈশ অন্ধকার আকাশে মধ্যে মধ্যে মেঘখণ্ড গুলি আসিতেছে এবং ভাসিয়া যাইতেছে; অসংখ্য নক্ষত্র মণ্ডলী কতবার নিবিতেছে ও ফুটিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া তীব্র বায়ু স্বন্ স্বন্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

সহসা ঊষা কি একটা শব্দ শুনিতে পাইল, কে যেন মাটিতে গর্ত্ত খনন করিতেছে। ঊষা এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না; ঊষা শব্দ শুনিতেছে, আর অগ্রসর হইতেছে। সহসা একটা অনতিগভীর গর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া গেল—হুড় হুড় করিয়া তাহার মধ্যে একটা লোকের উপর চাপিয়া পড়িল। যে গর্ত্তমধ্যে ছিল, সে বলিয়া উঠিল, "কে তুইরে মাসী।"

কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের যাহার কণ্ঠস্বর উষা তাহাকে বুঝিতে পারিল, কিন্তু কোন উত্তর দিলনা। উষা গর্ত্তমধ্যে একটি শক্ত জিনিষের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল; হস্তস্পর্শে জানিতে পারিল, উহা একটা বাক্সের মত। উষা মুহূর্ত্ত মধ্যে কি ভাবিয়া আঁটিয়া কাপড় পরিল এবং সজোরে সেই রমণীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—বরুণা তুই সত্যি করে বল্ এবাক্স কোথায় পেলি।

সর্ব্বনাশ বরুণার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল—এ যে উষা।

বরুণা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, না না বাক্স নহে।

ইতিমধ্যে উষা করস্পর্শে ঠিক বুঝিল, ইহা যামিনীর গহনার বাক্স—যামিনীর গহনার বাক্সের আঙটাটী কিছুদিন পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

উষা বাক্সের উপর চাপিয়া বসিল। বরুণা গায়ের জোরে উষাকে ফেলিয়া দিয়া গহণার বাক্স উঠাইয়া লইল। যেমন গর্ত্তমধ্য হইতে লাফ দিয়া পলাইবে উষা পশ্চাৎ হইতে দৃঢ় মুষ্টীতে তাহার এলোচুল জড়াইয়া ধরিল। তখন উষার দেহে মত্ত হস্তীর বল আসিয়াছে। বরুণা কোন উপায় না পাইয়া সজোরে উষাকে এক ধাক্কা দিল। উষা চিৎকার করিয়া ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া গেল। কিন্তু বরুণার কেশমুষ্টী ছাড়িলনা। উষার আকর্ষণে বরুণাও গর্ত্তমধ্যে পড়িল গহনার বাক্সটা ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। উষা তখন নৈসর্গিক বলে বলীয়ান, ঠিক তেমনি করিয়া বরুণার কেশমুষ্টি ধরিয়া রহিল, এবং মহিষাসুর মর্দ্দিনী দশভুজা যেমন অসুরকে মর্দ্দন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পদতলে বরুণাকে মর্দ্দন করিতে লাগিল, বরুণার শক্তি উষার শক্তিকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারিল না।

উষার চীৎকারে সেখানে কয়েকজন লোক আসিয়া পড়িল, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া আলো জ্বলিতেছে। তাহারা আসিয়া দেখিল, অপূর্ব্ব রণ রঙ্গিণী মূর্ত্তি। সুন্দরে ও ভীষণে অপূর্ব্ব মাখা মাখি একাধারে কোমলে কঠোরে মিশিয়াছে। মহাতেজোময়ী অব্যক্ত মহিমাময়ী উজ্জ্বল প্রভা-শালিনী দেবীপ্রতিমা! তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া সেই অভুতপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী দেবী-প্রতীমা স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

মাধুরী *

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন।

মাধুরীদেবী বিশ্ববিখ্যাত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রাণপ্রতিম পুত্র মহাপণ্ডিত মহাত্মা মধুচ্ছন্দার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী। রাজা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইলেও অসাধারণ তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হইয়া বিশ্ব বিশ্রুত হইয়াছেন। রাজা বিশ্বামিত্রকে এজগতের কয়জন জানিত? রাজর্ষি বিশ্বামিত্র মহাযোগ প্রভাবে সর্ব্বজনবরণীয় ও অনন্ত কাল স্মরণীয় মহাযোগী মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ব-মিত্র। বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দাও পরমধার্ম্মিক ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং বেদপরায়ণ মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বলিয়া পিতারই অনুরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মধুচ্ছন্দা পত্নী মাধুরীদেবী রূপসী বা বিদূষী না হইলেও চরিত্র ও পাতিব্রত্য প্রভাবে, সর্ব্বত্র গরীয়সী ছিলেন। পতির সেবা-পরিচর্য্যা, কায়মনোবাক্যে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন, প্রাণপণে স্বামীর মনোরঞ্জন ও নিয়ত তাঁহার সুখ-সুবিধা বর্দ্ধন এবং পতিপদ পূজা ও পতি আরাধণাই তাঁহার নারী জীবনের সার ব্রত ছিল। পতিব্রতা মাধুরী অসাধারণ পতিগত প্রাণা ছিলেন। যথা কালে পতির আশ্রমে আগমনে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইলেও পতিগতপ্রাণা মাধুরী কি যেন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিতেন। ক্ষণমাত্র পতিবিরহ তিনি অনন্ত যাতণাপ্রদ মর্ম্মভেদী ঘটনা বলিয়া মনে করিতেন। তৎকালীন ঋষি-পত্নী সমাজে পতিব্রতা সতী বলিয়া মাধুরীদেবীর নাম আন্ত-রিক শ্রদ্ধা ও যারপর নাই গৌরবের সহিত সাদরে উচ্চারিত হইত।

মহাপণ্ডিত মহাত্মামধুচ্ছন্দা মহাধার্ম্মিক মহাবীর মহারাজ শর্য্যাতির পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী ও প্রিয়তম বয়স্য ছিলেন। একদা রাজা শর্য্যাতি দিগ্বিজয় যাত্রায় পুরোহিত বয়স্য মহাবিজ্ঞ মধুচ্ছন্দাকে তাঁহার সহযাত্রী হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পণ্ডিত মধুচ্ছন্দা পরম বান্ধব মহারাজ শর্য্যাতির

* এ নামটি আমার কল্পিত। বহু অনুসন্ধানেও মধুচ্ছন্দা পত্নার নাম সংগ্রহে সমর্থ হই নাই; পুনঃ পুনঃ "মধুচ্ছন্দা-পত্নী" লিখা হইতে অব্যাহতি লাভ মানসে এরূপ কল্পিত নাম করণে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি, ইহাতে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের সুবিধাই হইবে। লেখক।

অনুরোধ উপেক্ষা করা সমীচীন মনে করিলেন না। তিনি পতিব্রতা পত্নীর নিকট এ সংবাদটা বলিয়া বিদায় লইয়া আসিবার নিমিত্ত মহারাজের নিকট কিঞ্চিৎ সময় চাহিয়া লইলেন।

এ দিকে রাজবাটী হইতে পতির আশ্রমে প্রতিগমন প্রতীক্ষায় মাধুরী পথের দিকে চাহিয়া আছেন। একটি মুহূর্ত্ত যেন তাঁহার নিকট যুগ-যুগান্তর বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। তিনি একবার গৃহে একবার বাহিরে যাতায়াত করিয়া উদ্বিগ্ন মনে সময় পাত করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন; কতক্ষণে পরমারাধ্য পতিপদ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবেন। ক্ষণকালের বিরহও যেন তাঁহার অসহ্য বোধ হইতেছে। এমত সময় পণ্ডিতবর মধুচ্ছন্দা পত্নীর নিকট উপনীত হইয়া নৃপতির সহিত দিগ্বিজয় যাত্রার সংবাদ বলিয়া কিছুকালের জন্য বিদায় গ্রহণাভিলাষ জানাইলেন।

এ সংবাদ শুনিয়া পতিবিরহ ভয়ে সতী মাধুরী যারপর নাই কাতর হইলেন,—তাঁহার মস্তকে যেন শত অশনি পাত হইল। কিন্তু পতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথাটি বলাও সতী সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি বিষাদ-মলিন বদনে পতির দিগ্বিজয় যাত্রায় অনুমোদন করিয়া বিনয় মধুর বচনে আগামী যামিনী প্রভাতের পূর্ব্বে আশ্রমে প্রত্যাগমন জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মধুচ্ছন্দা নৃপতিসহ দিগ্বিজয় যাত্রা করিলেন; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই বিপক্ষীয় সামন্ত নৃপতিগণ মহারাজ শর্য্যাতির নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। রাজা বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শরণাগত রাজন্যবর্গকে আশ্বাসিত করিয়া রাজধানীতে প্রতিগমন না করিয়াই ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন।

কিছুকাল ভ্রমণান্তর উভয়ে একান্তে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট আছেন, এমত সময় রাজা বয়স্যের মলিন মুখ দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—মহাশয়, আপনাকে এমন বিসন্ন দেখিতেছি কেন? আপনি নিস্পাপ ও মহাজ্ঞানী মহাপণ্ডিত বলিয়া আমার রাজ্য মধ্যে মহামান্য মহাশয় ব্যক্তি; আমি স্বয়ং আপনার বন্ধু, সেবক ও শিষ্য। আপনার এরূপ বিষাদের কারণ কি? বিনা যুদ্ধে—বিনা-রক্তপাতে আমার দিগ্বিজয় হইল; চতুর্দ্দিকস্থ নৃপতিগণ স্বেচ্ছায় বহুমূল্য উপঢৌকন ও কর প্রদান করিয়া আমার বশীভূত হইলেন, এ আনন্দের দিনে আপনি নিরানন্দ কেন?

তখন মধুচ্ছন্দা বলিলেন,—"মহারাজ! আপনার সকল কথাই সত্য; আপনার সহবাস আমার সর্ব্বথা প্রীতিপ্রদ। কিন্তু আমি আমার প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণীর অনুরোধ স্মরণ করিয়া এরূপ বিষাদিত হইয়াছি। তিনি আমাকে অদ্য যামিনী অবসানের পূর্ব্বেই আশ্রমে প্রতিগমন জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন; এখন রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়, নিশ্চয়ই আমার সহধর্ম্মিণী আমার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ উন্মাদিনীর ন্যায় পথ পানে চাহিয়া আছেন, ইহাই আমার বিষাদের কারণ।

রাজা মহাপণ্ডিতের উক্তি শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"মহাশয় আমার গুরু ও পরম বান্ধব, আশাকরি আমার কথায় বিরক্ত বা বিষন্ন হইবেন না। আপনি মহাপ্রাজ্ঞ মহাত্মা ব্যক্তি; আপনার এ স্ত্রৈণতা—এ বিষম বিড়ম্বনা কেন? জ্ঞানিগণ কখনই এরূপ অনিত্য সুখে আত্ম বিস্মৃত হন্না।

মধূচ্ছন্দা বলিলেন,—"মহারাজ, এ আপনার গুরুতর ভ্রম! দাম্পত্য প্রেম দোষের নহে; পতি-পত্নীর বিশুদ্ধ প্রণয়, স্ত্রী-পুরুষের রমণীয় ভূষণ এবং ধর্ম্মার্থ কামাদি বর্দ্ধক ও ভগবৎ প্রেম লাভের সরল সোপান। রমণী প্রথমে পতিতে, পরে অপত্যে ভালবাসা শিক্ষা করিয়া ক্রমে বিশ্ব জনীন্ প্রেম ও ভগবদ্ভক্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। পতি-পত্নী প্রেম ঐরূপ ভালবাসা বা বিশ্ব প্রেম ও ভগবৎ প্রেম লাভের একটা ক্ষীণ বিকাশ মাত্র।"

একথার পর পণ্ডিতবর মধুচ্ছন্দা তাঁহার প্রেমময়ী সহধর্ম্মিনীর বিশুদ্ধ পতি ভক্তির অপূর্ব্ব মধুর কাহিনী নৃপতির নিকট সমস্ত বলিলেন। রাজা বিশদ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুরুপত্নী মাধুরীর প্রগাঢ় পতি প্রেমের পরীক্ষার্থ গোপনে জনৈক অনুচর ডাকিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। রাজানুচর রাজধানীতে যাইয়া প্রচার করিয়া দিল, "রাজা ও রাজ বয়স্য বিদেশে বিরাট রাক্ষসের বিশাল গ্রাসে প্রাণ হারাইয়াছেন।"

পতিব্রতা মাধুরী স্বামীর এ আকস্মিক মৃত্যু বিবরণ শ্রবণ মাত্র ছিন্নমুল তরুর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইয়া মৃত্যুর গ্রাসে ঢলিয়া পড়িলেন। কিন্তু রাজ মহিষীগণ তেমন শোক বিহ্বলা না হইয়া রাজ নিধন বার্ত্তার সত্যতা নির্দ্ধারণ জন্য যথাশক্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজা স্বরাজে প্রবেশ করিয়াই উক্ত সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। রাজ কৌশলে সতী মধুচ্ছন্দা-পত্নীর মৃতদেহ সযত্নে রক্ষিত এবং পণ্ডিতবর মধুচ্ছন্দা বিদেশে—

দূরবর্ত্তী তীর্থে প্রেরিত হইলেন। রাজ কৌশলে প্রেমময়ী ভার্য্যার অকাল-তিরোধান বার্ত্তা তিনি বিন্দু মাত্রও জানিতে সমর্থ হইলেন না।

রাজা আর রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন না। সৈন্য, সেনাপতি ও অমাত্যবর্গকে রাজধানী প্রেরণ করিয়া রাজা স্বয়ং গঙ্গা তীরে এক বিরাট শ্মশান প্রস্তুত করিয়া ধ্যান স্তিমিত নেত্রে যোগাসনে বসিয়া প্রাণপণে স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজা সমাপন পূর্ব্বক গুরুপত্নীর মৃতদেহে পুনঃ জীবন সঞ্চার প্রার্থনায় স্বয়ং শ্মশানের সেই প্রজ্জলিত অনলকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। রাজার যোগবল ও পুণ্য প্রভাবে অগৌণে ব্রাহ্মণ-পত্নী প্রাণ লাভ করিলেন।

সুদূর তীর্থে মহাত্মা মধুচ্ছন্দার কর্ণে এ সংবাদ পঁহুছিল। বিস্ময়-বিষাদ-গ্রস্ত রাজগুরু কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রাজাকে পুনর্জ্জিবীত করিবার জন্ত কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। তাঁহার ঐকান্তিক তপঃবল প্রভাবে ভগবান্ সূর্য্য দেবের কৃপায় রাজা পুনর্জ্জীবিত হইলেন।

ঋষি মধুচ্ছন্দা সেই গঙ্গা তীরে পুণ্যব্রত নৃপতির পুণ্য জ্যোতিঃ বিমণ্ডিত মধুর মূর্ত্তি দর্শন এবং পতিব্রতা সাধ্বীসতী মাধুরীর লোকাতীত পুণ্যপবিত্রতাময়ী স্বর্গীয় দেবীপ্রতিমা অবলোকন করিয়া যারপর নাই মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমামৃতরূপ অমৃত নির্ঝরিণীর পবিত্র পুণ্য প্রবাহ শত ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন সেই পবিত্র ভাগীরথীতীরে তিনজনে সমস্বরে ভক্তিভরে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্ত্তনে আত্মহারা হইলেন। পতিব্রতা মাধুরীর পতিপদসেবাব্রত সার্থক হইল। সতীর পদরেণু স্পর্শে গঙ্গাতীরের সেই শ্মশান ক্ষেত্র মহাতীর্থে পরিণত হইল। শত শত নরনারী সেই পুণ্যব্রতের পবিত্র গাঁথা শ্রবণে কৃতার্থ হইয়া শত মুখে সতীর প্রশংসা করিতে লাগিল। সতীর পতিসেবা—মাধুরীর নারী জন্ম সফল হইল। পতিব্রতা সতী মাধুরী সুদীর্ঘকাল স্বামী সেবা সুখভোগ অন্তে নিত্য নিরাময় স্বর্গবাসে প্রস্থান করিলেন। সুপবিত্র সুরভি সুন্দর কুসুমটি আপনার অনন্ত সৌরভে এজগৎ পূর্ণ করিয়া অনন্ত বিশ্বে বিলীন হইল।

কমলা।

লেখক—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা আগমন করিল। সন্ধ্যা সমাগমে সুন্দরবন অতি রমণীয় শোভা ধারণ করে। স্থানে স্থানে মল্লিকা সকল অৰ্দ্ধ বিকসিত হইয়াছে। বিবিধ বনজলতা সমূহের কুসুম বিকসিত হইয়া মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। ব্যাঘ্র সকল নিজ নিজ গুহা হইতে বহির্গত হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল, কমলা ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। রঘুপতি কমলার অবস্থা দেখিয়া সহাস্তবদনে বলিলেন, " আমাকে উদরের চেষ্টায় এই বিপদ সঙ্কুল স্থানে থাকিতে হয়।" এইকথা শুনিয়া কোমল হৃদয়া কমলার নয়নপ্রান্তে জল দেখা দিল, তাহা দেখিয়া সর্দ্দারের স্ত্রী বলিল, "মা! তুই ভয় পাইতেছিস্? ও ত গিধোড় আছে, আমরা ভয় করিনা।" কমলা বলিলেন, "কোথায় ডাকিতেছে?"

সর্দ্দারের স্ত্রী। অনেক দূরে ডাকিতেছে! আমাদের এখানে হামেসা আসেনা, সর্দ্দার ও এইসব লোকেরা হামেসা গিধোড় মারিতেছে। মা! এ বড় খারাপ যায়গা; আমাদের দেশে বনে কেবল গিধোড়, ভালুক এইসব বুনো জানোয়ার আছে। এখানে জলে কুমীর বনে বাঘ আছে।

কম। আমাদের এই পুকুরে কুমীর আছে না কি?

সর্দ্দার স্ত্রী। না, এ পুকুরে নাই। মাঝে মাঝে আসে। আমাদের মরদেরা দেখিতে পেলেই মারিয়া ফেলে।

রঘু। গত বৎসর এই পুকুরে একটা প্রকাণ্ড কুমীর ঢুকিয়াছিল; সর্দ্দার আর এই সব লোকেরা বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। তুমি যদি দেখিতে ভয়ে অজ্ঞান হইয়া যাইতে।

কম। আমি খুব বড় কুমীরও দেখিনাই, আর খুব বড় বাঘও দেখিনাই"।

রঘু। ক্রমে দেখিবে; এখানে থাকিলেই সব দেখিতে পাইবে। তাহার পর সর্দ্দারের স্ত্রীকে বলিলেন ওরে সর্দ্দারণি! ওবছর সেই যে সাপটা ধরিয়াছিল দেখে ছিলি?

সর্দ্দারণী। হাঁ বাবু! ওরে বাপ্‌রে! এতবড় সাঁপ আমরা কখন দেখি নাই

কম। সাপটা কতবড় ?

সর্দ্দার স্ত্রী। সাঁপটা সতের হাত লম্বা, খুব পাকা সুপারি গাছের মত মোটা ছিল।

রঘু। সেটা একটা কেঁদো বাঘকে ধরিয়াছিল না?

সর্দ্দার স্ত্রী। সর্দ্দারের স্ত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল, হাঁ হাঁ বাবু! তোর ঠিক মনে আছে।

এইরূপ কথোপকথনে ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতা হইল। বুনা রমণীরা আপন আপন গৃহে গমন করিল। কাছারির অতি নিকটে তাহাদের গৃহ। কমলাও রাত্রিকালীন ভোজনের নিমিত্ত রন্ধন করিতে গমন করিলেন।

অষ্টদশ পরিচ্ছেদ।

স্বদেশ গমনে সর্ব্বনাশ।

তথায় দুই তিন দিন অতিবাহিত করিবার পর দম্পতিযুগল স্বদেশে গমন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। রঘুপতি বলিলেন, " তুমি এখানে থাক; নেপাল রহিল; আর এই বুনারা সব রহিল; আমি মাকে লইয়া শীঘ্র চলিয়া আসিব। রাত্রে সর্দ্দারণী তোমার নিকটে শয়ন কবিবে। কমলা বলিলেন, " না, তাহা হইবে না, আমি তোমার সঙ্গে যাইব ; আমি সই, সইয়ের মা, ও রাঙা ঠান্‌দিদি প্রভৃতি সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব। এখানে আসিলে, কতদিন পরে আবার দেশে যাইব, তাহার ঠিক নাই; তাই বলি, তাহাদের সহিত দেখা করিয়া অসিবনা ?" এইকথা শুনিয়া রঘুপতি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, তখন উভয়ে যাওয়াই স্থির হইল।

পরদিন আহারাদির পর উভয়ে দুর্গাশ্রীহরি স্মরণ করিয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নেপাল ও সর্দ্দার তাহাদের সহিত প্রায় ক্রোশাধিক পথ আগমন করিয়াছিল। প্রায় সন্ধ্যা হয়, এমন সময়ে তাঁহারা একটা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্য রঘুপতি অনেকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কোথায়ও আশ্রয় পাইলেন না, কাহারও অতিরিক্ত ঘর নাই। রঘুপতি বড় বিপদে পড়িলেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অবশেষে একজন লোকের সদর দ্বারের পার্শ্বে একটি চালা আছে দেখিতে পাইলেন। তিনি গৃহস্থকে রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্য সেই চালাটুকু প্রার্থনা করিলেন। সে বলিল, "আপনি ব্রাহ্মণ, কি করিয়া চালাটুকু আপনাকে দিই? দিতে আমার সাহস হইতেছেনা; যদি কোন বিপদ ঘটে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইব?"

রঘু। কিসের ভয়?

গৃহস্থ। বাঘ আইসে।

রঘু। প্রত্যহই কি বাঘ আইসে?

গৃহস্থ। না, কদাচ, কখন আইসে।

রঘু। কদাচ, কখন; তবে আমরা এইখানেই রাত্রি কাটাইব।

তখন সেই গৃহস্থ একটি মাদুর আনিয়া দিল, সচরাচর যাহাকে পটপটি বা বালাগুার মাদুর কহে। মাদুর পাতিতে পাতিতে গৃহস্থ বলিতে লাগিল, একটি ঘেরা হইলেই বেশ হইত। এই মাসের মধ্যেই ইহাকে ঘেরিয়া ফেলিব। ঐ দিন রাত্রে রঘুপতি ও কমলার অন্নাহার হইলনা। গৃহস্থকৃষক চিঁড়া, গুড় ও দুগ্ধ যোগাড় করিয়া দিল, রঘুপতি মূল্য প্রদান করিতে গেলেন, সে কিন্তু গ্রহণ করিলনা, বলিল, "অমন আজ্ঞা করিবেন না। মহাশয়! ব্রাহ্মণের নিকট দান লইব? এত অমানুষ আজিও হই নাই।"

রঘুপতি তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া, সেইখানে মাদুরের উপর উপবেশন করিলেন। গৃহস্থও আপন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রঘুপতি ও কমলা দুগ্ধ ও চিঁড়ার ফলার করিয়া আপনাদিগের সুখ ও দুঃখের কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ নিদ্রার ঘোরে তাঁহাদের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল। তখন উভয়ে শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে; প্রভাত হইবার বিলম্ব নাই, এমন সময়ে কিসের খস্‌খস্‌ শব্দে রঘুপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলেন, পার্শ্বে কমলা নাই। তিনি মনে করিলেন, তাইত কোথায় গেল? রঘুপতি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ক্রন্দন শব্দে গৃহস্থ কৃষক ও পল্লীর অন্যান্য অনেক লোক জাগরিত হইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিল এবং কি হইয়াছে? জিজ্ঞাসিল। রঘুপতি বলিলেন, "আমার স্ত্রীকে দেখিতে পাইতেছিনা। সে কোথায় গেল? ওগো তোমরা আমাকে বলিয়া দাও।" কৃষকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, তাইত ঠাকুর! কোথায় গেল, আমরা কি করিয়া বলিব? তোমরা ত উভয়ে এখানে শয়ন করিয়াছিলে; তাহার পর কি হইল? তাহাদের কথা শুনিয়া, রঘুপতি

বলিতে লাগিলেন, ভোর বেলা কিসের খস্ খস্ শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম আমার নিকটে কমলা নাই। এত ডাকিতেছি, কোন উত্তর পাইতেছিনা। একটী চৌদ্দ পনের বৎসরের বালক বলিল, মহাশয়! আমার বোধ হয় বাঘে লইয়া গিয়াছে।

বালক অধোভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; করিয়াই বলিল, হাঁ মহাশয়! নিশ্চয় বাঘে লইয়া গিয়াছে। এই দেখুননা বাঘের থাবার দাগ রহিয়াছে।

সকলে বালকের কথা শুনিয়া ভূমিতলে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল, সত্যইত বাঘের পায়ের দাগ রহিয়াছে।

এই স্পষ্ট কাদার দাগ রহিয়াছে। তখন সকলে দেখিয়া সকলে বাঘের পদচিহ্ন ধরিয়া, নদীতীরে গমন করিল, রঘুপতিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। তাহারা সকলে নদীতীরে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, বাঘ এইস্থানে গাঙপার হইয়াছে। তাহারা রঘুপতিকে বলিল, আর ঠাকুর! ভাবিলে কি হইবে? তাঁহার ঐ নিয়তী। আপনি স্বদেশ গমন করুন বলিয়া কেহ কেহ নিজ নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিল, কেহ বা থাকিল।

রঘুপতি নদীপার হইবার জন্য নদীতে নামিতে উদ্যত হইলেন। তখন একজন লোক তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিল, নামিবেন না কুমীরে খাবে। রঘুপতির নদীর জলে অবতরণ করা হইল না।

কতিপয় বালক বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ নৌকা খুলিয়া বলিল, চলুন ঠাকুর মহাশয়! ও পারে চলুন। এইকথা শুনিয়া, রঘুপতি নৌকায় গিয়া বসিলেন। নিকটে নদীতীরে একটা সুন্দরী কাষ্ঠের-লগুড় পড়িয়াছিল; রঘুপতি সেইটা কুড়াইয়া লইলেন। নৌকা পরপারে গিয়া লাগিল। রঘুপতি নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। বালকেরা অধোমুখে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিল, ঠাকুর মহাশয়! এই দেখুন বাঘের পায়ের দাগ। বাঘ এই স্থান দিয়া গিয়াছে। রঘুপতি বাঘের পায়ে দাগ দেখিলেন, বালকগণকে বলিলেন, ভাই সকল তোমরা নৌকাখানা লইয়া এইখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি, বলিয়া তিনি সেই ব্যাঘ্রের পদচিহ্নের অনুসরন করিলেন। নদীর উপরে উঠিয়া আর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেননা, কিন্তু একটি সঙ্কীর্ণ পথ দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই পথ ধরিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অত্যল্পদূর গমন করিয়াই, দেখিলেন, একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে একটি মানুষ শায়িত আছে। তিনি লগুড়টা বাগাইয়া অতিধীরে নিঃশব্দ পদ

সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সত্যই ব্যাঘ্রের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, দেখিলেন, শায়িত লোকটা নারী, অবশেষে জানিলেন, কমলা। কমলা স্বামীকে ঐরূপ ভাবে আগমন করিতে দেখিতে পাইয়া হস্ত সঞ্চালন দ্বারা যাইতে নিষেধ করিলেন, কমলাকে হস্ত সঞ্চালন করিতে দেখিয়া, ব্যাঘ্রটা কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া নিজের থাবা উত্তোলন করিল। বিড়াল যেমন ইন্দুর লইয়া খেলা করে, ব্যাঘ্রেরাও শিকার লইয়া সেইরূপ করে, বলিয়াই কমলাকে লইয়া ঐভাবে বসিয়াছিল। রঘুপতি কমলাকে হস্তদ্বারা সঙ্কেতে চুপ করিতে বলিয়া পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। কমলাও ব্যাঘ্রের চক্ষের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কারণ কমলা অতিশয় বুদ্ধিমতি। তাঁহার শুনা ছিল যে, ব্যাঘ্রের সহিত চোখাচুখী হইলে ব্যাঘ্র বিনাশ করিতে পারেনা। এইবার রঘুপতি ব্যাঘ্রের পশ্চাতে আগমন করিয়া, যথাশক্তি তাহার মস্তকে লগুড়াঘাত করিলেন। ব্যাঘ্র বিকট চিৎকার করিয়া কমলার পদতলে দক্ষিণ পার্শ্বে একবার লাফাইয়াই পড়িয়া গেল।

এদিকে নৌকারোহী বালকেরা একবাক্যে ঐ যা, বামুনকেও লইয়া গেল; বলিতে বলিতে ভয়ে নদীর পরপারে নৌকা লইয়া গেল। ব্যাঘ্রটা পড়িয়া গিয়া একেবারে মরিলনা, গোঁ গোঁ শব্দে ধড়ফড় করিতে লাগিল। রঘুপতি সেই লগুড়ের দ্বারা তাহাকে আরও পাঁচ সাত ঘা দিয়া নিঃসন্দেহ ভাবে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ব্যাঘ্রটা পড়িয়া গেলেই কমলা উঠিয়া বসিলেন। কমলাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া, রঘুপতি বলিলেন, কমল ব্যাঘ্র দংশনে তোমার গায়ে কি কোন ক্ষত হইয়াছে? কমলা বলিলেন, না। চল, বন হইতে পলাই।

এই বলিয়া সেই পথ ধরিয়া নদীর তীরাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলে রঘুপতি বলিলেন, আইস, ব্যাঘ্রটাকে টানিয়া লইয়া যাই। একা পারিব না। তুমি একটা পা ধর, আর আমি একটা পা ধরি। রঘুপতি এইকথা বলিবামাত্র কমলা ব্যাঘ্রের পশ্চাতের একটা পা এবং রঘুপতি আর এক পা ধরিলেন। রঘুপতি বলিলেন, টান। উভয়ে একযোগে না টানিলে, পারিবনা, দুই জনে টানিলে, বোধ হয়, পারিব। এই বলিয়া উভয়ে অত্যল্পদূর মাত্র টানিয়া লইয়া গেলেন। যখন দেখিলেন, দুইজনে টানিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেননা, তখন সেইস্থানে ব্যাঘ্রটাকে পরিত্যাগ করিয়া নদীতীরে গমন করিলেন। দেখিলেন, বালকগণ নদীর অপর পারে নৌকা লইয়া গিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ভাই সকল! নৌকা লইয়া

আয় ভাই! আমার স্ত্রীকে পাইয়াছি ও ব্যাঘ্রটাকে বিনাশ করিয়াছি। তোরা আয় ভাই! ব্যাঘ্রটাকে দুইজনে টানিয়া আনিতে পারিলাম না। প্রকাণ্ড বাঘ; অতিশয় ভারী।

বালকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নৌকা এপারে আনিল। রঘুপতি কমলাকে বলিলেন, কমল! তুমি নৌকায় আইস; আমরা বাঘটাকে টানিয়া আনি। কমলা নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। বালকগণ রঘুপতির সঙ্গে গমন করিয়াই বাঘটাকে নৌকার নিকটে টানিয়া আনিল। পরিশেষে সকলে ধরাধরি করিয়া, বাঘটাকে নৌকার উপরে উত্তোলন করিয়া, নদীর পরপারে গমন করিল। রঘুপতিও যেস্থানে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। বালকেরা হৈ হৈ শব্দে কলরব করিতে করিতে ব্যাঘ্রটাকে টানিয়া তথায় লইয়া গেল।

কাতারে কাতারে আবালবৃদ্ধবনিতা রঘুপতি, কমলা ও মৃত বাঘটাকে দেখিতে আসিল। সকলে গলায় বস্ত্র দিয়া কমলাকে নমস্কার করিতে লাগিল। সকলেই শূদ্র, কাজেই কমলা কোন আপত্তি করিলেন না। সকলে কমলাকে জিজ্ঞাসিল, হঁ্যা মা! তোমাকে যে বাঘটা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কই, তোমার গায়ে ত একটুকুও আচড় লাগে নাই, এর কারণ কি? কমলা বলিলেন, বাপ সকল! সকলই ভগবানের খেলা। বাঘটা আমার মাথার খোঁপায় ধরিয়া পিটে ফেলিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাইতে আমার গায়ে কোন আচড় লাগে নাই। মধুসূদনই রক্ষা করিয়াছেন! তাহার পর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে স্বামীকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, ইনি না গেলেই বাঘটা আমাকে বিনষ্ট করিয়া উদরস্থ করিত। কেবল ভগবানের কৃপাতেই এযাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। এই বলিয়া, স্বামীর চাকরি করিতে আগমন হইতে গত রাত্রে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রমন ও পরিত্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা তাহাদিগের নিকট বর্ণন করিলেন। সকলে বিশেষতঃ রমণীরা শ্রবণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গললগ্নীকৃতবাসে কমলার যুগল চরণে নমস্কার করিতে লাগিল। বালকগণ "সতী মায়ীকি জয়," "সতী মায়ীকি জয়," বলিয়া করতালি দিয়া নৃত্য করিতে ও ব্যাঘ্রের মস্তকে পদাঘাত করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

প্রণয়ী-যুগল।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ।

'উজানির' পশ্চিমেতে 'বেনারী' মাঠের পাশে
জ্ঞাতি কলহেতে গৃহ ছাড়ি,
অজয়ের অতি কাছে সুখী পরিবার এক
নিরালায় রয়েছিল বাড়ী।
তাদিকে সকল লোকে বলিত 'মাঠের রায়'
বাসিত তাদেরে সবে ভাল,
সুযশের প্রভা সম তাদের সাঁজের দীপ
বহুদূরে ছড়াইত আলো।
অজয়ের আন পাড়ে 'টিকুরী' গ্রামের মুখে
রামতনু ঘোষালের ঘর,
দোঁহার সাঁজের আলো দোঁহারা দেখিতে পায়
বাস এক নদীর উপর।
রায়ের একটী ছেলে, ঘোষালের কন্যা এক,
অন্য আর ছেলে পুলে নাই,
জনমের আগে হতে বিবাহের কথা আছে
বলা বলি করিত সবাই।
ছেলে মেয়ে এক সাথে আঙিনায় খেলাঘরে
যখন খেলিত একমনে,
পুলকে যুগল বন্ধু দুটী পুতুলের খেলা
দাঁড়ায়ে দেখিত একসনে।
মেয়ে যবে যেত চলি ছেলেটী কাঁদিত কত
ভুলায়ে রাখিত মাতা তায়,
শৈশবের ভালবাসা বড়ই দারুণ ওগো
প্রিয় জনে ছাড়িতে না চায়।
একে একে করিমেয়ে আট বছরের হল
স্থির হল বিবাহের দিন,
একি বিধাতার খেলা পীড়ায় পড়িল বালা
বিছানায় হল দেহ লীন।

শ্রাবণের কৃষ্ণ নিশি আরো কৃষ্ণ হয়ে এলো
সহসা উঠিল হায় হায়,
ভবন আঁধার করি নিভে গেল স্বর্ণদীপ
বাদলের মত্ত ঝটিকায়।
মধুর মিলনে ওগো বিধির কি অভিশাপ
স্নেহ ডোরে সুখী দুটী বাড়ী,
এতদিন ছিল হেতা শোকের পীড়নে আজ
একেবারে হল ছাড়াছাড়ি।
স্নেহের বাঁধন গেল সংসারের সব গেল
নাহি সুখ ভেঙে গেছে আশ,
ঘোষাল পত্নীরে লয়ে ছাড়িয়া সংসার মায়া
করিতে গেলেন কাশীবাস।
উদাস উদাস মাঠে জ্বলিছে একটী দীপ
সাথীটী নিভিয়া গেছে তার,
নিশায় পথিক আহা বৃথা চেয়ে চেয়ে দেখে
সে দিকটী আঁধার আঁধার।
মলিন তারার মত রায়েদের গৃহ দীপ
কিছুদিন জ্বলেছিল সেথা,
তার পর তার পর তাদের কাহিনী সব
এখন হয়েছে উপকথা।
অজয়ের ভাঙণেতে কত মাঠ ভেঙে গেল
কতগুলি গ্রাম গেল টুটি,
ছোঁয়নি প্রবল নদী এখনো এখনো ওগো
প্রণয়ের সুখনীড় দুটী।
শ্রাবণে বন্যায় যবে অজয়ের রাঙা জলে
চারিদিক হয় একাকার,
অনন্ত সলিল কোলে প্রেমের সমাধি সম
ডিপ্ দুটী জাগে মাঝে তার।
যে বলে জীবন সাথে প্রণয় ছড়ায়ে যায়
সে হেতার দেখে যাক আসি,
প্রণয়ের পুণ্যভূমি তাহাও অমর ভবে
কালস্রোতে যায় না রে ভাসি।

সমালোচনার চাটনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

আধুনিক নব্য কবিগণের কবিতা সমালোচনা আর যামিনী ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীসম-মানিনীর মান ভাঙ্গান দুইই বিপজ্জনক। সমালোচনার নির্ব্বাপিত ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গেও কবির কুসুম কোমল গাত্র ঝলসিয়া যায়, ফোস্কার জ্বালা অনুভূত হয়। কাজেই সমালোচককে নানারূপে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত করার চেষ্টা চলে; ফলে সমালোচকের শত্রুবৃদ্ধিই হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কবিতা সম্বন্ধে মতামতের কোন সামঞ্জস্যই এ পর্য্যন্ত হইল না। সমালোচক বলিলেন, "পদ্যটি কুরুচিগন্ধি, না হয় দুর্ব্বোধ্য, অথবা অপাঠ্য," তখনই কোন ভক্ত উত্তরে গাহিলেন, এই পদ্যটি কালিদাসের শ্লোকের সহিত উপমিত। সমালোচক হাস্যরসোদ্দীপক বলিয়া যে কবিতার সুখ্যাতি করিলেন, নিন্দুকের দল বলিল, উহা "ভাড়ামী"। যাঁহারা কবিত্ব বুঝেন, ভাব উদরস্থ করিবার শক্তি ধরেন—তাঁহারা প্রহসনাত্মক কাব্যের বালুস্তূপের মধ্যে ভক্তির ফল্গুস্রোত প্রবাহিত দেখেন।

নব্য কবিগণের কবিতার সমালোচনা করিতে হইলে, সমালোচককে বড় ভয়ে ভয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। আজিকালিকার পদ্যে ভাষা চলে মৃত্তিকার উপর দিয়া, ভাব বহে নদী স্রোতের মধ্য দিয়া, অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মত পাতাল ভেদ করিয়া রস প্রবাহ ছুটে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সমালোচ্য কবিতাটির নাম "পিতৃলোক"। ইহা কবির, সমালোচকের কি পাঠকবর্গের তাহা বোঝা বড়ই কঠিন। কবি কে? প্রবীণ কি নবীন? মাসিকপত্র সচিত্র কি বিচিত্র? তাহার উল্লেখ না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। পদ্যে—শিষ্যগণ পিতৃলোকে গুরুসন্নিধানে প্রলয় কালীন প্রার্থনা জানাইতেছেন। শিষ্যগণ জীবাত্মা। আইডিয়ার বৈচিত্র আছে, কল্পনার নূতনত্ব আছে।

পিতৃলোকে গুরুদেব শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিতেছে,—

"উঠ ত্বরা করি এসেছে প্রলয়"

প্রলয়—খণ্ড প্রলয়, কি মহাপ্রলয়, তাহা পাঠকগণ পরে বুঝিতে পারিবেন।

"যুগ সম্মিলন দেবের গোধূলি
পেয়েছে অতীত ইহাতে লয়।"

যুগ সম্মিলন —যুগের সন্ধিস্থল। যুগ—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। ঐ সন্ধিস্থলই দেবের গোধূলি। দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থল সন্ধ্যা; সেই সন্ধ্যারই প্রথম ভাগ গোধুলি। এই গোধূলিতে অতীত ধূলির মত লয় পাইয়াছে। অতীত যে লয় পায়, ইহা আমরা শুনি নাই। "সূর্য্যাচন্দ্রাসমৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" লয়—লীন হওয়া কি ?

"মানব জগতে যথা কোন জন
প্রত্যক্ষ বিনা না করে স্থাপন।"

কবি সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুটনোটে একটি টীকা করিয়া যাইলেই ভাল করিতেন। তা তিনি করেন নাই, আমরা তাঁহার সে দুঃখ রাখিব না। প্রত্যক্ষ চাক্ষুস—না ষড়বিধ? ষড়বিধ প্রত্যক্ষ ব্যতীত ও যে অন্য প্রমাণ আছে—অনুমান, শব্দ অর্থাপত্তি অভাব উপমান। প্রত্যক্ষ বিনা কি স্থাপন করে না ? পাঠকগণ যাহা হয় একটি ধরিয়া লউন। কিন্তু অনুমান অগ্রাহ্য, নৈয়ায়িকগণ ইহা শুনিলে কবির নশ্বর দেহ খানিকে ছিড়িয়া খাইবেন। বাঙ্গলার নৈয়ায়িকগণ, উঠুন, জাগুন, দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ান! আমরা ত অনুমান করিতেছি যে, কবি সমালোচনা পড়িয়া আমাদের উপর ভ্রূভঙ্গীর তীক্ষ্ণ শরাঘাত করিতেছেন।

"মানবে যেমতি জ্ঞান ও অজ্ঞান
সমভাবে রহে হৃদয়ে বিলীন।"

এ ক্ষেত্রে টীকা অচল। টীকা অচল হউক, ভাষ্য ত চল। সকলেই জানেন, জ্ঞান আলোক, অজ্ঞান অন্ধকার। জ্ঞান জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ, অজ্ঞান আবরণ স্বভাব। একের অপগমনেই অপরের আবির্ভাব। পরস্পরের সম্বন্ধ অহি-নকুলবৎ। কবি অঘটন ঘটন পটীয়ান্ নিরঙ্কুশ। তিনি জ্ঞান ও অজ্ঞান সমভাবে মানবে বিলীন রহে বলেন। বিলীন বিরাজিত অর্থে। মাসিক পত্রের প্রবন্ধ, গীতার অনুবাদ পড়িয়া যে জ্ঞান—তাহা অজ্ঞান সহ থাকিতে পারে। সেই জ্ঞানই এস্থলে ধরিলে হানি কি? আর জ্ঞানকর্ম্ম সমুদয় বাদীর মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম একসঙ্গে থাকে। বেদান্ত মতানুসারে কর্ম্ম—অজ্ঞান জন্য—অজ্ঞান।

"কহে আত্মাগণ ডাকি উচ্চৈঃস্বরে"

আত্মা—জীবাত্মাগণ (শিষ্যগণ)। আমরা জানিতাম, জীবাত্মা শরীর আশ্রয় করিয়াই কথা কহেন। কবিবর নবন্মেষিনী প্রতিভার বলে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, ঐ কথা কওয়া—অর্থাৎ বাসনাজড়ীভূত অন্তঃকরণের কলুষভাব প্রকাশ করা।

" তুমি বনশালী উদ্যমের প্রভু
উৎসাহ দানি বাঁচাও সবে।

উদ্যমের প্রভু? পাঠকগণ চমকাইবেন না! ব্যাকরণ দুষ্ট বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না! নব্য কবিরা ব্যাকরণকে যদিও সুট করেন, তথাপি এক্ষেত্রে ব্যাকরণ জবাই হয় নাই। প্রভূয়তে যস্মাৎ—প্রভব হয় যাহা হইতে,—প্রভূ আকর। উদ্যমের আকর—আশ্রয়।

" কৃত্রিমতাশ্লীল প্রাকৃততা ভরা "

প্রাকৃততা ভরা লৈখকতাভরা কবিবরের মত কিরকম মত শুনাইলেও ব্যাকরণ দুষ্ট নহে। সৌন্দর্য্য পূর্ণ—সুন্দর, প্রাকৃততাভরা—প্রাকৃত।

" মরুভূর মত বাসনার বায়ু "

বাসনার বায়ু মরুভূর মত বিস্তৃত নহে। উত্তরপদলোপী বহুব্রীহী। বাসনার বায়ু মরুভূমির বায়ুর মত উত্তপ্ত। যথা গর্দ্দভবুদ্ধি।

" জীবাত্মা যখন তুলি আবরণ
প্রবেশি মরতে অদৃশ্য হয়। "

দুর্ব্বোধ্য মত বৈকিতেছি কি? দুর্ব্বোধ্য ভাবে আজিকালি কবিতার অলঙ্কার ভাব ফল্গু স্রোতের মত বহিবে, অর্থ অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মত অপ্রকাশ থাকিবে, ভাষা নর্ত্তকীর নুপুর ধ্বনির মত নাচিয়া নাচিয়া চলিলেই যথেষ্ট।

জীবাত্মা যখন আবরণ তুলিয়া মর্ত্তে প্রবেশ করতঃ অদৃশ্য হয়। আবরণ—অবিদ্যা, কামকর্ম্মপাশ, জীবাত্মা যখন কামকর্ম্মপাস হইতে বিমুক্ত হয়, তখনই পরমাত্মায় মেশে বা পরমাত্মস্বরূপ হইয়া থাকে। সে সময়ে জীবাত্মা জীবাত্মারূপে দৃশ্য হইবে কি প্রকারে? বুদ্বুদ সলিলে মিশিলে অদৃশ্যই হয়। " মর্ত্তে প্রবেশ করতঃ " অর্থ কি? ওহে বাপু, এ কবিতা, দর্শন কহে! তার্কিকের মত অমন কুটপ্রশ্ন করিলে কবিতা বোঝা যায় না, রস অনুভব হয় না, ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কবিত্ব—গন্ধ, শব্দ স্পর্শ রূপাত্মক। অনুভব গম্য, আস্বাদনীয়' ত্বগ গ্রাহ্য নাসিকামুখকর, শ্রুতি তৃপ্তিপ্রদ। বিশ্লেষণ করিলে বাস্তবাংশ, স্থূল পার্থিবাংশই অবশিষ্ট থাকে, কবিত্বের মধ্যে স্থূল পার্থিবাংশ থাকিলে ত বিশ্লেষণের পর অবশেষাংশ থাকিবে? উচ্চদরের কবিতার মধ্যে স্থূল পার্থিবাংশ নাই। বাস্তবিকতা কবিত্বের ধর্ম্ম নহে। যাহা কি যেন কি যেন কিরূপ—তাহার মধ্যে অত বিচার, অত প্রশ্ন, অত বিশ্লেষণ, অত অর্থানুসন্ধান কেন? সামঞ্জস্য সঙ্গতি, সম্বন্ধ অনুসন্ধান ভুলিয়া কবিত্বরসানুভব কর! তৃপ্তি লাভ হইবে!

বসন্তে সতর্কতা।

১। চারিদিকে বসন্তের ধুম পড়িলে, কোন একদিন আদার রস লইয়া অল্প একটু কর্পূর সহ মাড়িয়া স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে এবং শুষ্ক হইলে ধুইয়া ফেলিবে। ইহা কোন একটী ব্রহ্মচারীর মত।

২। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, কণ্টকারী গাছের মুলের ছাল সিকিভরি ২১ টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া (বাটিবার সময় অল্প একটু জলদিবে) ১ টী বড়ী তৈয়ার করিয়া শূন্যোদরে জলসহ সেবন করিবে। ৭ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাত্রা, ৩—৬ বৎসর পর্য্যন্ত সিকি মাত্রা। তন্নিম্নে তাহার অর্দ্ধেক। নিতান্ত শিশুর পক্ষে ১ বড়ীর বিশ ভাগের এক ভাগ। গর্ভিণীকে নিঃসন্দেহে দেওয়া যায়।

৩। অঘট্ট স্থলে কণ্টকারীর মূল ॥০ আধতোলা ÷ গোলমরিচ ৪ গণ্ডা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। এই আধপোয়া পাচন, কোন একদিন ৪।৫ জনে ভাগ করিয়া খাইবে। পাচন জ্বাল দেওয়ার পূর্ব্বে জিনিস দুইটী বেশ করিয়া থেতো করিয়া লইতে হয়।

৪। কণ্টকারীর মূল ১।০ সোয়াতোলা ÷ কাঁচা হলুদ ॥০ আধ তোলা ÷ গোলমরিচ।০ সিকি ভরি, জল ॥০ আধসের, পাকশেষ আধপোয়া। ছাঁকিয়া ইহার সহিত ॥০ আধতোলা ইক্ষু গুড় মিশাইয়া পান করিবে। খালিপেটে পান করিতে হয়। ৩।৪ দিন মাত্র সেব্য এই ঔষধটীও বিশ্বাস্য।

৫। টীকা দেওয়াটাও বসন্তের প্রতিশেষক।

৬। পুনর্ণবার মূল ১ তোলা ÷ গোলমরিচ ৵০ আনা একত্র বাটিয়া খালিপেটে বাসি জলসহ সেব্য। প্রতি বৎসর বসন্ত দেখা সময় ১ বার সেবন করিবে।

৭। ভাব প্রকাশে আছে "যে সকল ব্যক্তি নিম্ব ও বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা শীতল জল সহ পান করে, তাহাদের শীতলারোগ কখনও উৎপন্ন হয় না। নিম্ববীজাদির পরিমাণের উল্লেখ তিনটী সমভাগে মোট।০ সিকি ভরি নিতে পার।

৮। "পাপরোগতরং দূরাৎ শিবাস্থি বিনিবারয়েৎ" অর্থাৎ হরিতকীর অস্থি (বীজ) খণ্ড খণ্ড করিয়া পয়সার মত করিয়া কাটিয়া সূত্রসহযোগে স্ত্রীলোকের বাম পার্শ্বে ও পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে ধারণ করিলে বসন্তরোগে আক্রমন করিতে পারে না।

৯। বাঙ্গলা দেশের কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুরা, চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসে নিম হলুদ বাটিয়া গায়ে মাখিয়া স্নান করেন ও নিমপাতা খাইয়া থাকেন। বোধ হয় ইহাও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে। "বসন্তে ভ্রমণং পথ্যামব্যং নিম্ব ভোজনং।"

১০। প্রত্যহ কাঁচা সোনামুগ কমপক্ষে খালিপেটে খাইবে। প্রত্যহ মুগের দাইল আহার করিবে ইহার গুণ চারিদিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।

১১। শরীরে তেল মাখা সম্পূর্ণ নিসিদ্ধ, নিতান্ত অসুবিধা পক্ষে মাথায় তৈল দিতে পারা যায়, নিরামিষ প্রশস্ত ব্যবস্থা। মাদক দ্রব্য পান প্রভৃতি বিসর্জ্জন করিবে। ব্যঞ্জনে তৈলের পরিবর্ত্তে ঘৃত হইলে ভাল হয়।

১২। গৃহে দুইবার ধূপ ধুনা দিবে। গোবর দিয়া অঙ্গনাদি লেপন করিবে।

১৩। বসন্ত রোগ দেখা দিলে, তৎস্থানের লোকেরা প্রত্যহ কিঞ্চিৎ গাধার দুগ্ধ পান করিবে। অভাবে দুই তিন দিন সোনামুগ বা চাউল অন্ততঃ দশ বার ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া প্রত্যহ ঐ মুগ বা চাউল তিন চারিটা খাইবে।

১৪। আর একটি হোমিওপ্যাথিক মতের প্রতিষেধক ঔষধ ভেরিওলিনাম্ ইহা সপ্তাহে একমাত্রা। বসন্তের প্রাদুর্ভাব সময়ে সময়ে শত ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ পরীক্ষিত। লবণ খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র।

জননী জন্মভূমির সুসন্তান, জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ঢাকা বিক্রমপুরের সুবিখ্যাত বসু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন কালে বৈজ্ঞানিক নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবনে বালক জগদীশ সহপাঠি ও অধ্যাপকগণকে চমৎকৃত করিতেন। বিজ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ বশতঃ তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া কেমব্রিজ ক্রাইষ্ট কলেজে রসায়ন বিদ্যা ও বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কেমব্রিজের বি, এ, উপাধি লাভ করেন, পরে ক্যাণ্টাবের এম, এ, উপাধি ও লণ্ডনের ডি, এস, সি, উপাধিতে ভূষিত হন। তথায় বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে তিনি বায়ু মধ্যস্থ তড়িত দ্বারা শব্দ সঞ্চালন শক্তির আবিষ্কার করেন; তাহারই ফলে, তারবিহীন বার্ত্তাবহের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা মনুষ্যের ন্যায় বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতিরও প্রাণ আছে, এবং সেই জীবনী শক্তির তারতম্যানুসারে, জীবজগতের ন্যায় উদ্ভিদ ও জড়জগতে যে সকল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তাহা নিরাকরণ করিয়া, জগতস্থ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণকে

চমৎকৃত করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চাসন লাভ করেন। ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া সরকারি শিক্ষা বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বজনীন বৈজ্ঞানিক মহাসমিতির অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া, ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে গমন করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া সমগ্র বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া অভিহিত হন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সভা সকল জগদীশচন্দ্রকে সভ্য মনোনীত করিয়া গৌরব অনুভব করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া তিনি সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। সম্প্রতি বিলাতের বিজ্ঞান সভায় প্রতি শুক্রবারে তাঁহার নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ব্যতীত কাহাকেও এই পদে বরণ করা হয় না। আজ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র সেই সম্মান লাভ করায়, জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। সর্ব্বদা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষার চর্চ্চায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ভগবান জগদীশচন্দ্রকে দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্য প্রদান করিয়া জগতের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত রাখুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। দর্শক।

সমালোচনা।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়।—বৈষ্ণব সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা-তীর্থ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল্, এম, এস, বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কবিরাজ শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী বিজ্ঞানতীর্থ দ্বারা ২৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; মূল্য দুইটাকা মাত্র।

এইগ্রন্থে শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাস শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত এ যাবৎ অপ্রকাশিত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত,—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় তথা শ্রীকবিকর্ণপূর কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা এবং শ্রীভক্তমালগ্রন্থোদ্ধৃত শ্রীনবদ্বীপ পরিকর ও শ্রীব্রজপরিকরগণের নাম ও মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন এই গ্রন্থে ভক্তিনামামৃত সিন্ধু ভগবতামৃতাদি গ্রন্থমালা হইতে তৎসংগৃহীত যথা-বশ্যকীয় শ্লোক, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আলোচ্য "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণের পরিচয়াদি প্রাচীনবাঙ্গালা পয়ারাদিছন্দে লিখিত হইলেও স্থানে স্থানে সংস্কৃত

শ্লোক আছে। গোস্বামী মহাশয়,—সেই শ্লোক গুলির অশেষ পাণ্ডিত্য পূর্ণ সুন্দর ব্যাখ্যা ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করিয়া সুধীজনের একটি অভাব মোচন ও বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি অক্ষয় কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও ভাগবতামৃত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বচন প্রমাণাদ ও টিকা টিপ্পনী উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থখানিকে অধিকতর প্রমাণিত সমলঙ্কৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কেবল যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরাই পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন তাহা নহে; এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ভক্তভাবুকগণকে ভক্তি ও ভগবৎ প্রেমে তন্ময় হইতে হইবে; অধিকন্তু সাহিত্যিক ও সামাজিক ঐতিহাসিকগণও তাঁহাদের আলোচনার উপযুক্ত বৈষ্ণবশাস্ত্র, বৈষ্ণব ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাহায্য পাইবেন, বিশেষতঃ এই গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাংশ পাঠ করিয়া আমরা বস্তুতই পরমানন্দ লাভ করিয়াছি।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস, মহাশয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এবং পাশ্চত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এল, এম, এস, উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া সনাতনআয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের আলোচনায় ও আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা কার্য্যে পারদর্শীতা লাভ করিয়া জনসমাজে একজন শ্রেষ্ঠ কবিরাজ বলিয়া সর্ব্বজন সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বে ইনি কয়েকখানি আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থও প্রণয়ণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

জন্মভূমির পাঠক মহোদয়গণকে শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের নূতন পরিচয় আর কি দিব, ইনি গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় সিদ্ধ হস্ত। ইহাঁর প্রণীত কয়েকখানি নাটক ও উপন্যাস আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠ করিয়াছি, তাহার ভাষা যেমন সরল, তেমনি ভাবপূর্ণ। বর্ত্তমান "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" গ্রন্থখানি স্বধর্ম্মানুরাগী সুধীসজ্জনের গৃহে গৃহে বিরাজিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

গিরিশচন্দ্র।—বা গিরিশ প্রসঙ্গ ও গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর সময় নির্দ্দেশ তালিকা সম্বলিত গিরিশ গীতাবলী দ্বিতীয় ভাগ। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বহুদিনের নিত্য-সহচর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। ছবি, ছাপা, বাঁধাই উৎকৃষ্ট, মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

পুস্তকের ভূমিকায় সম্পাদক অবিনাশ বাবু লিখিয়াছেন:—" গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর গিরিশ গীতাবলি ২য় ভাগ প্রকাশের জন্য যখন তাঁহার জীবনীর শেষাংশ লিখিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার মনে হয় যে, একে আমি

ক্ষুদ্রশক্তি, তাহাতে প্রবন্ধ ক্ষুদ্রাবয়ব ইহাতে গিরিশচন্দ্রের বিশাল জীবনের কয়টা কথা বলিব? অথচ এমন অনেক কথা আমার জানা আছে, যাহা সাধারণের জ্ঞাতব্য এবং তাঁহার বৃহৎ জীবনী লিখিবার সময় কাজে আসিবে। সেরূপ বৃহৎ জীবন-চরিত লিখিতে অনেকে আমাকেই অনুরোধ করেন। যদি দিন পাই এবং শ্রীভগবান সহায় হন, সুধীগণের বাক্য রক্ষা করিতে অবশ্য প্রয়াস পাইব। কিন্তু জীবন অনিশ্চিত সে গুরুতর দায়িত্বভার নিজের উপর সম্পূর্ণভাবে রাখিতে সাহসী হইলাম না। জ্ঞাতব্য বিষয় বাছিয়া বাছিয়া কিছু কিছু, এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই জন্যই গিরিশ গীতাবলী, দ্বিতীয়ভাগের পরিবর্ত্তে গ্রন্থের নাম করন হইল,"গিরিশচন্দ্র।"

গ্রন্থকার অবিনাশ বাবু বহুবৎসরাবধি গিরিশচন্দ্রের অনুজোপম সুহৃদরূপে গিরিশচন্দ্রের সাথী ছিলেন; গিরিশচন্দ্রের ঘটনা বহুল জীবনের অনেক বৃত্তান্ত অবিনাশ বাবু সুবিদিত; ভূমিকায় গ্রন্থকার যেরূপ উদারতা প্রকাশ করিয়া নিজের দায়িত্বভার অন্যের স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা কিন্তু তাহাতে পরিতুষ্ট হইতে পারিলাম না, আমরা সত্বরেই অবিনাশ বাবু সম্পাদিত গিরিশচন্দ্রের সুবৃহৎ জীবনবৃত্তান্ত দর্শন করিতে একান্ত অভিলাষী। আলোচ্য "গিরিশচন্দ্র" পুস্তকে "গিরিশ প্রসঙ্গ" ও মহাকবি গিরিশচন্দ্রের রচনা-বলীর সময়নির্দ্দেশতালিকা, মহাকবির বিচিত্রজীবনের নানা ঘটনা ও গল্প সম্বলিত বহুপ্রসঙ্গ নানা চিত্তাকর্ষকপ্রসঙ্গ এই—"গিরিশচন্দ্র" পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রীগণের প্রায় ৭০ খানি সুন্দর হাফ্‌টোন চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে;—পুস্তকখানি নাট্যামোদিগণের অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। নানা প্রয়োজনীয় কৌতুহলোদ্দীপক প্রসঙ্গ এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, এ পুস্তক খানি পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন; অবিনাশবাবুর ভাষা উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক প্রাঞ্জল। অবিনাশবাবুর চেষ্টায় ও যত্নে গিরিশচন্দ্রের বহু অপ্রকাশিত সঙ্গীতও এইগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা "গিরিশচন্দ্র" পাঠ করিয়া যারপর আনন্দিত হইয়াছি, এবং ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, বীণা যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, সুবাদকের হস্তে পরিচালিত না হইলে বিড়ম্বিত হয় মাত্র। "রং" যতই সুন্দর হউক না কেন, সুযোগ্য চিত্রকরের হস্তে চিত্রিত না হইলে "সং" হইয়া পড়ে, অবিনাশবাবুর কৃতিত্বে "গিরিশচন্দ্র" পুস্তক খানি উভয় গৌরব সম্পন্ন হইয়াছে।



স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু।

জন্ম ১৮৩৯ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৯১৩ খ্রীঃ।

জন্মভূমি প্রেস,—কলিকাতা।



“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ বর্ষ। | ১৩২০ সাল, চৈত্র। | ১২শ সংখ্যা।

বেদ-রহস্য।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাজ রাজেন্দ্র চন্দ্র।

পদার্থ বিদ্যার চর্চ্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের আলোচনা ক্রমশঃ অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইতেছে। বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিতগণ মধ্যে অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিদ্যা ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ প্রতিপাদন করে, তাহাই একমাত্র সত্য বিদ্যা, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সম্বন্ধীয় প্রত্যয়ের উপর সংস্থাপিত যে বিদ্যা, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র উপায়। যদ্যপি ইন্দ্রিয় সংযোগে মানসিকবৃত্তির পরিচালনা না হয়, তবে আত্মজ্ঞান, বাহ্য বস্তুর জ্ঞান কোনও প্রকার জ্ঞান সম্ভব হয় না। তাঁহারা বলেন যে, “আমরা প্রথমতঃ বিশেষ বিশেষ ঘটনার জ্ঞান লাভ করি, ক্রমে আত্মজ্ঞানের অঙ্কুর হয়, অবশেষে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর ভাবাদি অবলম্বন করিয়া তদ্বিষয়ক তত্ত্ব ও নিয়মাবলী নিরূপন করি, এবং বহির্জ্জগতের সহিত

সম্বন্ধ বিচার করি। মন প্রকৃতিতে সান্ত এবং অপূর্ণ; মানসিকবৃত্তির পরিচালনা ও কতকগুলি নিদ্ধারিত নিয়মের অধীন। তজ্জন্য আমাদের জ্ঞানও নিয়ন্ত্রিত ও পরতন্ত্র এবং জ্ঞানের বিষয়ও প্রকৃতিতে সান্ত ও অপূর্ণ। এবম্বিধ অবস্থায় একজন অতীন্দ্রিয় অনাদি ও অসীম গুণ সম্পন্ন পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা নিয়ন্ত্রিত ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবের সাধ্যায়ত্ব নহে। ঈশ্বর অভিধেয় পুরুষ তাঁহার অভিধান অনুসারেই মানব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেনা। তাঁহার অস্তিত্ব ও গুণগ্রামে বিশ্বাস, চিরপরম্পরাগত প্রবাদের উপর সংস্থাপিত ও কুসংস্কারের দ্বারা সংগঠিত তাহার ভিত্তি কখনও সত্য মুলক হইতে পারেনা।

এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের মতে ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মনিরূপণ চেষ্টা পণ্ড-শ্রম মাত্র। এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বানস্তিত্ব উভয়ই আমাদের পক্ষে তুল্য। ইউ-রোপীয় কোমৎমিল, প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন দার্শনিকগণ বহুতর কুটিল তর্কের দ্বারা এইমত সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদের তর্কের প্রবল বেগ সহ্য করা, অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা ও অসারত্ব সাব্যস্ত করা; আমাদের মত অল্পবুদ্ধি লোকের সাধ্যায়ত্ব নহে। নাস্তিকতা প্রতিপাদক গ্রন্থের কুটিল তর্কজালে জড়িত হইয়া এক সময়ে আমাদের মন বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, ঈশ্বর অস্তি কি নাস্তি, তিনি আমাদের জ্ঞেয় কি অজ্ঞেয়, ব্রহ্মবিদ্যা সম্ভব কি অসম্ভব, ইত্যাকার চিন্তায় আকুল হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। অনেক সময়ে ভাবিয়াছিলাম যে, কোমৎমিল, প্রভৃতির প্রনোদিত মতই বিশুদ্ধ মত। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও নাস্তিকতা প্রতিপোষক তর্কের সদুত্তর দানে সমর্থ হই নাই। ভাবিয়াছিলাম যে, অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞানলাভ মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু মন তৃপ্তিলাভ করে নাই। হৃদয়ের অভাব পূর্ণ হয় নাই, সত্যলাভ করিলে তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর হৃদয় যেরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রুপ আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। ঈশ্বর মানবের সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞেয়, ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ চেষ্টা নিতান্ত নিস্ফল, ব্রহ্মবিদ্যা চিরপরম্পরাগত প্রবাদ ও কুসংস্কারের উপরই সংস্থাপিত, এবম্বিধ বাক্যের সত্যতা স্বীকার করিতে কোনও প্রকারে প্রবৃত্তি জন্মান নাই? কেবলমাত্র সন্দেহে মন পরিপূর্ণ ও সংশয়মেঘে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। মনের তৃপ্তি শান্তি এবং আনন্দ তিরোহিত হইয়াছিল, এবম্বিধাব-স্থায় উপায়ান্তর বিহীন হইয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের ও পরমার্থ তত্ত্ববিদ্ আর্য্য ঋষিগণের আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তি যুক্ত বিবেচনায় তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী

সাধ্যমত আলোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহাদর উল্লিখিত যুক্তি সঙ্গত কি না, এবং সিদ্ধান্ত তর্ক শাস্ত্রানুমোদিত কিনা স্থির করণাভিপ্রায়ে বহু সময় আন্দোলন করিলাম; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মত সামঞ্জস্য ও পরস্পর বিরোধী মতের ভিতর হইতে সত্যচয়ন জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলাম, সেই অধ্যয়ণ ও চিন্তার ফল পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি, গ্রন্থ বিশেষ অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইলনা। ব্যক্তি বিশেষের মতের প্রতি অন্ধ নির্ভর করি নাই, যে মত বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই সত্য বলিয়াই অক্ষুব্ধ চিত্তে গ্রহণ করিয়াছি, সম্পূর্ণনূতন মত প্রচার করণ লালসায় লুব্ধ হইয়া অভিনব নূতন পথ অবলম্বন করি নাই, মহাজন প্রদর্শিত পথানুসরণ পূর্ব্বক চিন্তারাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছি, নানাখনি হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া হার গাঁথিয়া জন্মভূমির পাঠকের হস্তে অর্পন করিতেছি। গৃহীত হইলে চরিতার্থ হইব, এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি কোনও পাঠকের মনে ঈশ্বর তত্ত্ব অনুসন্ধানেচ্ছা কিয়ৎ পরিমাণেও বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল জ্ঞান করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিব।

যোগশক্তি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

বৃহৎ তাম্বু পড়িয়াছে। আরাম কেদারায় বসিয়া দুইজন ইংরাজ বন্ধু. ইঞ্জিনিয়ার ও সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব রসালাপে নিযুক্ত। আনন্দের ফোয়ারা সুরারাগরঞ্জিত হইয়া সমস্ত তাম্বুটীকে যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের উদ্দাম আমোদ চঞ্চল হাসি রাত্রির মসীকৃষ্ণ অন্ধকারকে শুভ্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছিল। একটী বন্ধু হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, আপনার পকেট হইতে ডায়রীখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অমন আনন্দ-চঞ্চল মুখখানি চিন্তাগম্ভীর হইয়া পড়িল। পার্শ্বস্থ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ কি, হঠাৎ তোমার এভাব কেন”? ডায়রীখানা পকেটে রাখিয়া জিজ্ঞাসিত বন্ধুটি উত্তর দিলেন—“আজ আমার একটী ভয়ানক দিন”!

“ব্যাপার খানা কি”?

“আজ যেখানে আমরা তাম্বু ফেলিয়াছি—২ বৎসর পূর্ব্বে এইখানে আমি আমার প্রিয়তম বন্ধুদ্বয়ের সহিত বেড়াইতে আসি। সে বন্ধু দুইটী আর ইহ-

লোকে নাই, একা আমিই রহিয়াছি। হয়তঃ আমারও আজ শেষ দিন!"

"ছিঃ এসমস্ত কুসংস্কার তোমার মত শিক্ষিত ইংরাজের মুখে শোভা-পায় না! ভারতবাসীর মুখেই শোভা পায়।"

"আমি বহুদিন ভারতবর্ষে আছি। তুমি নূতন আসিয়াছ। আর এই অপূর্ব্ব ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই জাননা তাই কুসংস্কার ভাবিতেছ! যোগশক্তির পরিণতি একদিন ভারতই লাভ করিয়াছিল।

"ব্যাপার টি কি শুনিতে পাই না?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি দুই বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে তদারকে আসি। আমার সঙ্গে দুইজন বেড়াইতে আসেন। বন্ধুদ্বয়ের শিকার করাই অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তিন জন বন্ধু মিলিয়া অনেক গুলি পক্ষী বধ করিলাম। একটী হনুমানকেও গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলাম। তাহার পর, তাহার পর—" বক্তা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহার পর কি?"

সিগারেট টি টানিতে টানিতে পুনরায় গল্প আরম্ভ হইল।

"তাহার পর দেখি এক সন্ন্যাসী! সে মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণে একটী ভয় জন্মিল; সে দৃষ্টি যেন বিদ্যুজ্জালা বর্ষণ করিতেছিল; সেই শুষ্ক ক্ষীণতর অঙ্গুলী উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সন্ন্যাসীটী আসিয়া আমাদের উপর বিরক্তিপূর্ণ স্বরে তিরস্কার জুড়িয়া দিল; ভাবটি এই, যেন আমরা কি ঘোর অপরাধ করিয়াছি! তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া ও চীৎকার শুনিয়া আমার বন্ধু দুইটি বড়ই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসীর সেই বেয়াদবী তাহাদের আর সহ্য হইল না। একবন্ধু ছুটিয়া গিয়া সন্ন্যাসীকে ধাক্কা দিলেন, অপর বন্ধু সন্ন্যাসীর মাথার উপর সজোরে মুষ্টাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসী মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, তাঁহার তপঃ ক্ষীণ মুখ দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িল। আমার সে দৃশ্য ভাল লাগিলনা, বরং সে দৃশ্যে একটু কষ্টই অনুভব করিতেছিলাম। বন্ধুদ্বয়কে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বারণও করিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার বিদ্যুৎজ্জালাময় নয়ন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। অভিশাপ দিল—"তোমরা তিন জনেই পর পর তিন বৎসরের মধ্যেই যমালয়ে যাইবে। প্রহর্ত্তার দিকে চাহিয়া "তুমি সর্ব্বগ্রে যাইবে, তাহার পর তুমি"—আমার দিকে চাহিয়া "তুমি শেষে"। এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। অন্য দুই জন গতাসু;—আমারও আজ মৃত্যু দিন।

শ্রোতা এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছিল। উপহাস করা আর ভাল দেখায় না বলিয়া মিষ্টস্বরে বলিল—" চান্সে হইয়া গিয়াছে। আজ তোমার এত ভয়ের কারণ কি ?"

বক্তা একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—" তবে শুনিবে, অভিশাপ দিনের ঠিক একবৎসরের মাথায় প্রথম বন্ধুটী মারা গেলেন। অমন সুদক্ষ অশ্বারোহী অশ্ব হইতে পড়িয়া জনশূন্য অরণ্যে প্রাণ হারাইল। আর দ্বিতীয় বন্ধুটীর জলে ডুবিয়া মৃত্যু ঘটিল। মান্দ্রাজে যাইয়াও অভিশাপের হাত এড়াইতে পারিল না। ইহাও ঠিক দ্বিতীয় বৎসরের একই দিনে হইয়া গেল। আর আজ তৃতীয় বৎসরের শেষ দিন !

শ্রোতা বন্ধুটীর মনে ভয় জন্মিল। মুখে বলিল—" ও ভাবনা ছাড়, আজই আমি দেখাইব যে ওটা চান্স। যাহা হউক তুমি আজ আমার তাম্বুতে থাক।"

রাত্রি হইল। দুই জনে পৃথক কামরায় শুইয়া পাড়ল। শেষ রাত্রে তাম্বুর ভিতর একটী বিকট আর্ত্তনাদ শুনা গেল। সে কি মর্ম্মভেদী হুহুঙ্কার। পাশের কামরা হইতে ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুটী ভয় পাইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বন্ধুর কামরায় আসিয়া দেখিলেন—বন্ধুর গলদেশ দ্বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে ঃ রক্তস্রোত যাইতেছে। বন্ধু জন্মের মত প্রাণ হারাইয়াছে। সম্মুখে দেখিলেন এক বীর হনুমান বিকট লোচনে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহা দ্বারাই বন্ধুটি নিহত—ইহা জানিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সাহেব ক্ষিপ্রহস্তে গুলি ছাড়িলেন। হনুমানের দেহ প্রাণ শূন্য অবস্থায় পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ সেই সময়ে সাহেব দেখিলেন সেই তাম্বুর মধ্যে এক সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া। বন্ধুর বর্ণনামত তাঁহার আকৃতি। বুঝিতে পারিলেন এই সেই সন্ন্যাসী। তখন সাহেব তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য অনুচরবর্গকে আদেশ করিল, ততক্ষণাৎ সেই সন্ন্যাসী বাতাসের মত কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গ্রামের মণ্ডলগণকে ডাকাইয়া সাহেব তদ্দণ্ডে বলিলেন—এই সন্ন্যাসী হনুমানজীর মন্দিরে থাকিত। কিন্তু আজ ছয় মাস কাল তাহার দেহত্যাগ হইয়াছে। তখন সাহেব বুঝিলেন—সন্ন্যাসী প্রকৃত যোগবল সম্পন্ন অসাধারণ ব্যক্তি।*

* ইংরাজী মাসিক পত্র অবলম্বনে লিখিত।

কল্পনা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত।

বিশ্ববিজয়ী বীর নেপোলিয়ন পৃথিবীকে প্রাণের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া শেষে আপনার ভ্রমে আপনি আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন :—

"Imagination rubs the world."

সে মহাবীরের মুগ্ধ কাহিনী পার্থিব কর্ম্মের প্রত্যেক বিষয়ে স্ব-প্রমাণিত হইয়া প্রতিপদে বিশ্ববাসীকে দেখাইতেছে যে, কেবল কল্পনা পৃথিবীতে আধিপত্য করিতেছে। কল্পনা মুগ্ধ জীব কতপ্রকারে কত কার্য্যে আত্মহারা হইয়া কেমন আত্মরক্ষার স্থলে আত্মনাশে রত তাহার দৈনন্দিন কাহিনী বিদ্যুৎবেগে জগৎসমক্ষে প্রচারিত হইলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করে না। প্রকৃতির প্রলয় বিভীষিকাকে এই কল্পনার কমণীয় মুর্ত্তি কেমন ঢাকিয়া দিবার চেষ্টায় রত, তাহা সেদিনের "টিটানিক" ঘটনায় জগৎ দেখিলেও, সেই সদা মরণের ইতিহাস, ইতিহাসের পৃষ্টায় স্মৃতিরূপে বিরাজ করিবে মাত্র, তাহা কল্পনাকে কমাইতে সক্ষম হইবে না। তাই মহাজ্ঞানী নিউটন বিরক্তির সহিত বলিয়াছিলেন :—

"I cannot calculate the madness of the people."

পৃথিবী জোড়া এই বাতুলতার মধ্যে আবার প্রত্যেকে প্রত্যেককে পাগল বলিতেছে, প্রত্যেকে প্রত্যেককে উন্মাদনায় হাস্য করিতেছে। এমন বিচিত্র ঘটনা সত্যই বড় বিমুগ্ধকর।

এই কল্পনার সংসারে কল্পনা ভেদ করিয়া কোথায় কখন কি সত্য বাহির হইয়া পড়ে, কোথায় কোন জোরা পাহাড় কোন হিমতুষার এই অকুল পাথারে কাহার কোন সাধের তরণী চূর্ণ করিয়া দেয়, তাহা এত কল্পনা বিমুগ্ধ জীব দেখিবার অবকাশ পায় না, তাই এই পৃথিবী এমন হাহাকারে পরিপূর্ণ।

কল্পনার এ সংসারে হাহাকার পূর্ণ হইলেও এখানে কেহ স্থির থাকিতেছে না। জগতের নীতি যখন গমনশীল, তখন জাগতিক ব্যাপার স্থির ভাবে বলিতে পারে না। তাই দলে দলে কল্পনার বহুরূপী বহুপ্রকারে জাগতিক ব্যাপার রহস্যময় করিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া চলিয়াছে। কোনও দল দেশের কল্পনায় আত্মহারা। তাহাদের কতক মনে করে স্বদেশের নামে তাহারা তাহাদের স্থানীয় লোকেদের নিকট অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইতে পারিবে, কতক

কল্পনা করে তাহারা এইরূপে বড়লোকের সঙ্গে মিশিবার সুবিধা করিয়া সাধারণের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইতে পারিবে, কতক কল্পনায় জাতীয় উন্নতি করিতে যায়, কতক লোক পরিচয়ের সুবিধা করিয়া আপনার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে চলে; কতক মনে করে এইরূপ একটা সমিতির ব্যবস্থা করিলে আমোদ এবং সম্মান উভয়ই পাওয়া যাইতে পারিবে, কতক বক্তৃতায় নিজেকে মহাবক্তা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হয়, কতক কোনও কাজ কর্ম্মের অভাবে এইরূপে সময় কাটাইতে যায়, কতক দল বাঁধিয়া হৈ চৈ করিয়া আড়ম্বর প্রকাশ করিবার প্রলোভনে ভুলে, কতক দশের কার্য্য করিতেছি ভাবিয়া স্বদেশের কাল্পনিক মঙ্গলের জন্য ছুটে, কতক ইহার প্রহেলিকা ভেদ করিতে দৌড়ায়, ফলে সকলেই কল্পনার দাসত্বে এবং স্বার্থের সংঘর্ষে সমস্তই পণ্ড করিয়া ফেলে। এমনি করিয়া কল্পনা সমাজে, সংসারে আপনার আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিয়া প্রকৃতির সত্য মুর্ত্তিকে কেবল ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।

কেহ কল্পনায় ইন্দ্রপুরী নির্ম্মাণে ব্যস্ত। তাহার ধন, জন পুত্র পরিবারের সদা হাস্যময় মুর্ত্তির অন্তরালে যে চোরাবলি কার্য্য করিতেছে, তাহা সে মোহান্ধ কাল্পনিক দেখিতে পায় না, তাই তাহার সে অদৃষ্ট বিভীষিকা মুর্ত্তি অকস্মাৎ একদিন তাহার সমস্ত কল্পনা ধুলিসাৎ করিয়া দিলে সে মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে সমস্ত বজ্জিত করিয়া তোলে। মানব এ বিচিত্র ভাবে মুগ্ধ তাই আমাদের জাতীয় কবি গাহিয়াছেন :—

> "আমি কেবলি স্বপন করি গো বপন বাতাসে,
> তাই আকাশ কুসুম করি গো চয়ন হতাশে।"

নেপোলিয়ন এবং নিউটনের কথার এমন প্রতিধ্বনি আরও কতজনে কত মতে করিয়াছেন, কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিবার কেহ নাই। তাই কেবলই দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত শ্রুত হয় :—

> "আহা হা আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।"

এমনি করিয়া কল্পনাকে বুকে করিয়া এ জগৎ এখনও কতকাল কাঁদিয়া বেড়াইবে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি অনু পরমানু অপেক্ষায় হীন মানব যে কল্পনার সাহায্যে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে ছাড়িয়া তাহার বাঁচিবার আশা কোথায়? নিউটন উন্মত্ততায় হাস্য করিলেও নিজেই বলিয়াছেন—"আমি তীরে দাঁড়াইয়া কেবল উপলখাত বাহিতেছি!" অথচ তাঁহার জ্ঞান বলিতেছে, অসংখ্য মনিমাণিক্য এই জগতেই

ছড়াইয়া রহিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে কল্পনা ভিন্ন মানবের গতি কোথায়? মানবের ক্ষীণ সৃষ্টি জগতের যাবতীয় দ্রব্য দর্শনে অক্ষম, তাই কল্পনাকে বুকে লইয়া অদৃষ্ট তিমির ভেদ করিবার জন্য মানুষ এত ব্যগ্র। এইরূপে বিজ্ঞানী বিদ্যুৎকে জগতে আনিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; এবং ক্ষুদ্র মানব উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত আলোড়ন করিয়া বলিতে সক্ষম হইয়াছে। তাই বলিতেছি, কল্পনা মানবের সঙ্গী। এবং যতদিন জাগতিক ব্যাপারে মানবের শক্তি পূর্ণতা লাভ করিতে না পারিবে, ততদিন বাস্তবকে ধরিবার জন্য কল্পনার আধিপত্য এ জগতে অটুট থাকিবে।

কিন্তু কল্পনার মধ্যে যে সন্দেহ বিরাজ করিতেছে, যাহার ভয়াবহ দৃশ্য কাল্পনিক মানব অহরহ অবলোকন করিয়া কাঁপিয়া বেড়াইতেছে, মানবের মধ্যে সে দানবী মুর্ত্তির খেলা বড়ই শোচনীয়। কল্পনা যদি এমন সন্দেহ জড়িত হইয়া এত অসত্যের পথে না যাইত, তবে হয়ত বাস্তবের পথ আরও দুর্গম হইতে পারিত। এই কল্পনা ও সন্দেহ ভেদ করিবার জন্য মানুষ সদা সচেষ্ট; কিন্তু এ অনন্ত যবনিকা ভেদ করা সহজ সাধ্য নহে, তাই কবির কথার আক্ষেপ শ্রুত হয়, তাই শুনা যায়ঃ—

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে।"

এইরূপে কালিদাস বা সেক্সপীর, সেলি বা জয়দেব, হার্ব্বার্টস্পেন্সর বা চার্ব্বাক হইতে আমাদের নিধুবাবু, ভোলাময়রা, বঙ্কিমবাবু; পর্য্যন্ত এ অনন্ত পাথারে ভাসিয়া ডুবিয়া গেলেন, কতশত চোরা বালি বরফের পাহাড় আবিস্কৃত হইল, কিন্তু তবুও "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে" রহিয়া গেলে। তাই যদি হয়, তবে এত দৌড়াদৌড়ি কেন? প্রবৃত্তির পথে এত অশান্তি ভোগ না করিয়া নিবৃত্তির পথে নির্ব্বাণ লাভের চেষ্টায় মানুষ রত হয় না কেন? তাহার কারণ এ চেষ্টাও কাল্পনিক এ পথেও বুদ্ধ, শঙ্কর, ঈশা, মুসা অনেক সত্য বাহির করিয়া অনেক শান্তি দেখাইয়া দিয়া শেষে সান্ত্বনা লাভের জন্য বলিয়াছেনঃ—

"অদৃষ্ট তিমির গর্ভে কোরো না প্রবেশ।"

এখানেও যদি এমন "প্রবেশ নিষেধ" হইল ইংরাজী কথায় "Strictly Prohibited" হইল; তবেই বলিতে ইচ্ছা হয়ঃ—

"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা"

তবে কি সত্যই এ পৃথিবীতে আমাদের দাড়াইবার স্থান নাই? এমন রম্য উপবনে, প্রান্তরে ভূধরে কি আমাদের কিছুমাত্র উপভোগের বস্তু নাই? শুধুই

কি কল্পনা এবং সন্দেহ বুকে করিয়া এ পার্থিব পর্ব্বতে ক্রন্দনে কেবল হাহুতাশ করিয়া প্রাণান্ত করিতে হইবে? প্রকৃতিকে দেখিয়া সেরূপ ত কখনও মনে হয় না। প্রকৃতিদেবী জননীরূপে পৃথিবীকে পালন করিতেছেন। তুমি যদি কাল্পনিক মোহে প্রকৃতির সে জননী মুর্ত্তি অবলোকন না করিয়া ইহাকে রাক্ষসী ভাবিয়া দূরে দূরে থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে প্রকৃতি তোমাকে রক্ষা করিবে না, তোমার দাড়াইবার স্থান থাকিবে না। কিন্তু যদি তুমি প্রকৃতিকে প্রাণ খুলিয়া মা বলিয়া ডাকিতে পার, যদি প্রকৃতির মাতৃমুর্ত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার, তবে তোমায় প্রকৃতি কোলে তুলিয়া লইবে। সে সত্য এখনও তেমন করিয়া তোমার নিকট প্রকাশিত হয় নাই, তাই তুমি গাছ পাথর অপেক্ষায় হীন অবস্থায় থাকিয়া কেবল হাকাকার করিতেছ। তোমার কল্পনা যদি কখনও এই সত্য আবিষ্কার করিতে পারে, তবে তোমার পূর্ণতার পথ সহজ হইবে। তখন তুমি তীরের উপলখণ্ড ফেলিয়া মনি মানিক্য উপভোগ করিবে। কিন্তু ততদিনে তোমার মোহ তোমাকে জড়ত্বের পথ সুগম করিয়া দিবে কি না তাহা কে বলিতে পারে? অসময়ে হরিনামের মালা আনিয়া কেবল অসারে জলসার করিয়া জন্ম এবং কর্ম্মপণ্ড করা ভিন্ন অন্য ফল লাভ হইবে না। তবে মানব নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ ভাবিয়া প্রকৃতির উপর সে দম্ভ প্রকাশ করিয়া বেড়ায় যাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে সেদিনের টিটানিক প্রকৃতি গঠিত শতক্রোশ ব্যাপী বরফের পাহাড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, নিজের কতদিনের বহুশ্রম জনিত পদার্থ চূর্ণ করতঃ জগৎব্যাপী হাহাকারের সৃষ্টি করিল, তাহাতে ভাবী মন্দারের অভিনয় কল্পনা এখনও যে সুদূর পরাহত তাহাতে সন্দেহ নাই। জানিনা সে কতকালে সে মহাকালের ভবিষ্য অঙ্গ দেশের সে মহামহিমান্বিত অভিনয়ে মানব সমাজ দেবত্বের পথে পূর্ণত্ব লাভ করিবে—জানিনা কতদিনে মানবজগত সে পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের পুনরাভিনয়ে অমরত্ব লাভের জন্য অগ্রসর হইবে—জানিনা মানবের সে পথে মোহ কেবল দাম্ভিকতার অবতাররূপে তাহার জড়ত্বের পথ সুগম করিয়া তুলিবে কি না, কিন্তু মানবের "টিটানিক" পরিণতি তাহার বৃহত্তর তরণী নির্ম্মানে যখন বাধা উৎপাদন করিতে পারিল না, তখন মানব কল্পনা একদিন যে সমুদ্রমন্থনের পুনরাভিনয় করিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। সে দেবতার দল এবং মহাদেব—সে সুধা এবং গরল আবিষ্কার দর্শনের সৌভাগ্যলাভের জন্য কল্পনা যখন আমাদের একমাত্র সঙ্গী তখন তাহাকে ভুলিলে চলিবে না। জানিনা সে বাস্তব বিষয় মানবের দম্ভ কতকালে প্রবেশাধিকার

পাইবে, তবে মানব কল্পনা সে সুধা বা গরল লাভের জন্য যে চিরদিন ছুটিবে ইহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই মনে হয়। আরও মনে হয় মানব বিজ্ঞান একদিন কল্পনার সাহায্যে বাস্তবলে আবিষ্কার করিবে।*

কমলা।

লেখক—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দারগা।

সেই গ্রামের লোকেরা দুইখানি গরুরগাড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিল। একখানির তিনদিকে মোটা মোটা কঞ্চি প্রোথিত করিয়া ছই প্রস্তুত করিল। তাহার উপর বড় বড় দুইখানা মাদুরের আবরণ দিল। পাঠকগণ! আপনারা বোধ হয় সকলেই গরুর গাড়ীর ছই দেখিয়াছেন, সুতরাং তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন। ছইওয়ালা গাড়ীখানিতে কমলা ও রঘুপতি উপবেশন করিলেন। অনাবৃত খানায় বাঘটা রহিল। অনুমান তিন ঘণ্টার মধ্যে গো—শকটদ্বয় আসাশুনি থানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঠক! এখন আশা-শুনি সোণার যায়গা হইয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে ইহা বড় ভয়ঙ্কর স্থান ছিল।

থানায় দারোগা ছিলেন। তৎকালীন দারগাদিগের মধ্যে তাঁহার মত সদাশয় লোক অতি বিরল ছিল। তিনি রঘুপতির প্রমুখাৎ সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এবং স্বয়ং রঘুপতিকে ১০৲ দশ টাকা পুরস্কার দিলেন। আরও তথাকার লোকদিগের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া রঘুপতিকে ১৫০৲ দেড়শত টাকা প্রদান করিলেন। রঘুপতি সস্ত্রীক দারোগা বাবুর পদধুলি গ্রহণ করিয়া বারাসাতে যাত্রা করিলেন। জনার্দ্দন বাবু রঘুপতি অপেক্ষা অনেক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী বারাসাতে উপস্থিত হইল। উকিল, মোক্তার এবং পেয়াদা হইতে আদালতের কর্ম্মচারিবর্গ দলে দলে বাঘ দেখিতে আগমন করিল। সকলেই রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কে বাঘ মারিয়াছে? তুমি?"

* ভাগলপুর শাখা পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

রঘুপতি বলিলেন, হাঁ মহাশয়! তখন সকলে জিজ্ঞাসিল কেমন করিয়া? রঘুপতিও সকলকে যথাযথ বিবরণ বর্ণন করিলেন। বারাসাত জেলা ২৪ চব্বিশ পরগণার একটী মহকুমা কিন্তু এখানে জেল ও জেলা স্কুল বর্ত্তমান আছে। ২৪ চব্বিশ পরগণায় সদর আলিপুরে গবর্ণমেণ্টের কোন স্কুল নাই। বারাসাত গবর্ণমেণ্ট স্কুলই জেলা ২৪ পরগণার জেলাস্কুল।

রঘুপতি ও কমলা যখন কদম্বগাছীতে মুন্‌সেফ্‌ বাবুর নিকটে গমন করিয়াছিলেন, তখন মুন্‌সেফ্‌ বাবু রঘুপতির মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া নিরতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। মুন্‌সেফ্‌ বাবুর স্ত্রী নিতান্ত যত্নের সহিত কমলাকে আপনার নিকটে রাখিয়াছিলেন। তিনি কমলাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন, মা! তোমার অনুপম পতিভক্তি ও গুরুভক্তি বশতঃ বাঘটা মারা গিয়াছে। রঘুপতি ও কমলা যখন মুন্‌সেফ্‌ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর নিকটে বারাসাতে আগমন করিবার জন্য বিদায় লইয়াছিলেন, তখন মুন্‌সেফ্‌ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া ২৫৲ পঁচিশটী টাকা অর্পণ করিয়াছিলেন। মুন্‌সেফ্‌ বাবু কায়স্থ ছিলেন। বাটী হইতে প্রত্যাগমন কালে তাঁহাদিগের বাসায় গমন করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ একজন চর্ম্মকার আহুত হইল। সে বাঘটার চর্ম্ম খুলিয়া ফেলিল। চর্ম্মখানা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং রাখিলেন। উকিল মোক্তারদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাঘের দন্ত, কেহ কেহ বাঘের নখ রাখিলেন। একজন উকিল বাঘের জিহ্বাটা রাখিলেন। কারণ লোকে বলে বাঘের জিহ্বা ঘষিয়া খাইলে প্লীহা আরোগ্য হয়। তাঁহার পুত্রের প্লীহা হইয়াছিল।

বারাসাত হইতে যাত্রা করিয়া কমলা ও রঘুপতি বৈদ্যবাটীতে আগমন করিয়া নিমাই তীর্থের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিলেন। স্বামী সকাশে আসিবার কালে গঙ্গাস্নান করিতে করিতে যে ব্রাহ্মণ রমণীর সহিত কমলার পরিচয় হইয়াছিল, স্ত্রীপুরুষে তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ রমণী কমলাকে স্বামীসহ প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া, নিরতিশয় আনন্দিতা হইলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে কমলার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, মা! তুমি যথার্থ সতী লক্ষ্মী, মা! তুমি যথার্থ সতী লক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ রমণী তাঁহাদিগকে পরম পরিতোষ করিয়া আহার করাইলেন। কমলা তাঁহাকে মা বলিয়াছিলেন। সেই দিন তথায় অবস্থান করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় স্বগৃহে যাত্রা করিলেন।

বেলা দুই প্রহরের সময়ে তারকেশ্বরে আগমন করিয়া ষোড়শোপচারে তারকনাথের পূজা দিলেন। কমলা গললগ্নী কৃতবাসে তারকনাথকে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, বাবা! প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় যে তোমার পূজা দিব এ আশা ছিল না। এ জীবনে আর যেন কষ্ট না পাই। তারকেশ্বরে আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে তিনটার সময়ে পুনরায় যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যা হইলে আর গমন করিতেন না। যে গ্রামে সন্ধ্যা হইত, সেই গ্রামেই রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। সঙ্গে অনেকগুলি টাকা থাকায় তাঁহাদিগকে অতি সাবধানে গমন করিতে হইয়াছিল।

পরদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া একঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা রাত্রি হইলে তাঁহারা বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অগ্রে কমলা বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। তাঁহাদের পায়ের থস্ থস্ শব্দ শুনিতে পাইয়া, রঘুপতির মা নিজের যষ্ঠীটা উত্তোলন করিয়া যা, যা, দুর, দুর, পোড়া লোকের জ্বালায় কিছু গাছপালা হইবার যো নাই। বৌমা আমার কতযত্ন করিয়া, শশা গাছগুলি পুতিয়াছে সব খাইয়া ফেলিল। এমন সময়ে কমলা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা গ্রহণ করিলেন; বলিলেন, মা! আমি আসিয়াছি।

শাশু। কে, বৌমা এলি?

কম। হ্যাঁ, মা! তোমার ছেলেও আসিয়াছে।

শাশু। কি বল্লি? আমার রঘুপতি আসিয়াছে? বলিয়া কমলাকে বক্ষেঃ ধারণ করিয়া, "ও সরলা আয়রে!" তোর সই এসেছে। অত্যানন্দে চীৎকার করিয়া কমলাকে মুখে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে রঘুপতি আসিয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদধুলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, মা! তোমার অকৃতজ্ঞ, নরাধম পুত্র আমি আসিয়াছি।

তখন রঘুপতির মাতা হস্ত বিস্তার করিয়া বলিলেন, আয় বাবা! কোলে আয়। এতদিন পরে তোর দুঃখিনী অন্ধা মাকে কি মনে পড়িয়াছে! কমলা শাশুড়ীর ক্রোড় হইতে উঠিয়া পৌটলা পুঁটুলি গুছাইতে গেলেন। গৃহ অন্ধকার দেখিয়া বলিলেন, মা! ঘরে সন্ধ্যা দাও নাই? অন্ধকারে বসিয়া আছ?

শাশু। আর সন্ধ্যা? তুমি বাড়ী থেকে গেলে, পাড়ার লোকে কত যে সব কথা বলেছে; সে সব কথা শুনিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। তাইতে ঘর থাকুক, আর যাউক, সন্ধ্যা জ্বালা হউক, আর না হউক সে দিকে ইচ্ছাই হয় না। এখন তাহাদের মুখ পুড়ে গেল। আমার কি তেমন বউ?

কম। সই কোথায় ? সে আসে নাই ?

শান্ত।" সে রোজ আসে। সন্ধ্যা জ্বেলে রেখে গিয়াছে। বোধ হয়, বাতাসে নিভিয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে সরলা কমলাদের বাটীতে আসিল। রঘুপতির মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল বামুন মা! আমাকে অমন করিয়া ডাকিলে কেন? কোন ভয় পাইয়াছ? রঘুপতির মাতা কহিলেন, না, না, ভয় পাই নাই। কে আসিয়াছে দেখ? তাহার পর রঘুপতিকে দেখিয়াই ছুটিয়া তাহাদের বাড়ীতে "ওমা! সই এসেছে, বামুন দাদা এসেছে বলিতে বলিতে সমাচার দিতে গেল। সরলার মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলে আগমন করিল। কমলা রঘুপতিকে লইয়া বাড়ীতে আসিয়াছেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে কাতারে কাতারে দেখিতে আসিল। যাহারা কমলার নিন্দা করিয়াছিল তাহারাই বলিতে লাগিল, আমি ত বলিয়াছি, সে সতী লক্ষ্মী সে তাহার স্বোয়ামীকে লইয়া নিশ্চয় আসিবেই আসিবে। বলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি ঘুরাইয়া মুখের একরকম অবক্তব্য ভাব করিয়া, হুম্ বলিয়া একটা শব্দ করিল।

বাটীতে আসিবার পূর্ব্বেই রঘুপতি রামরতন বাবুকে পত্র লিখিয়া আসিয়াছেন। বাটীতে আসিয়াই পুনরায় আর একখানি পত্র দিলেন। পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়া ছিলেন, আমার মাতা ও স্ত্রী জীবিতা আছেন, আমার স্ত্রী আমাকে বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন; অতএব আমি ৭।৮ সাত আট দিনের জন্য বাটীতে রওনা হইলাম। এই পত্রে কেমন করিয়া কমলাকে ব্যাঘ্র লইয়া গিয়াছিল, কেমন করিয়া তিনি অসম্ভাবিত উপায়ে তিনি সেই ব্যাঘ্র বধ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, সদাশয় মহোদয়গণ কর্ত্তৃক টাকা পাইয়াছেন, ইত্যাদি সমস্তই লিখিলেন। তিনি পত্র পাঠ করিয়াই, মা ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া রঘুপতিকে কলিকাতায় যাইতে আদেশ করিলেন।

যে দিন কমলা পতি অন্বেষণে বাটী হইতে বহির্গত হন, তাহার পর দিনই দুরাত্মা কালীভৈরব নিজ স্ত্রী পুত্র-কন্যাকে এবং সেই সঙ্গে গৃহের সমস্ত আসবাব পত্র বিষ্ণুপুরের নিকট কোন গ্রামে পাঠাইয়া দিয়াছিল। এই দিন কমলার আগমন সংবাদ পাইয়াই শূন্য বাটি পরিত্যাগ করিয়া কোন একদিকে পলায়ন করিল। আহা! হতভাগ্য আহার করিবে বলিয়া উনানে ভাত চড়াইয়াছিল; দুরাত্মার আহার হইল না। উনানে ভাত ফুটিতেই লাগিল।

রঘুপতি ও কমলার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, গ্রামের প্রৌঢ় যুবক

ও বালকগণ "গালাগালি করিয়া" তাহার বাটীর দিকে ধাবমান হইল। কালী ভৈরব ইহার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল।

কতিপয় দিবস নিজ বাটিতে থাকিয়া, রঘুপতি মাতা ও স্ত্রীকে লইয়া, কলিকাতায় রামরতন বাবুর বাটীতে গমন করিলেন। রামরতন বাবুর স্ত্রী সৌদামিনী কমলাকে আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। কমলার মুখে কালীভৈরব ও ব্যাঘ্র ঘটিত সমস্ত বিববরণ শ্রবণ করিয়া নয়ন জলে অভিসিক্ত হইলেন। তিনি নিজ গাত্রের প্রায় সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া কমলার অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। তাহার পর রামরতন বাবু আহার করিতে বসিলে, কমলাকে লইয়া গিয়া বলিলেন, দেখ দেখি, কেমন বৌ আসিয়াছে। কমলা লজ্জিত হইয়া মস্তকে ব্রীড়া টানিয়া দিলেন। সৌদামিনী বলিলেন, দুর্, লজ্জা করিসনে, বাবু যে তোর বাপ। বাপকে দেখিয়া কি লজ্জা করিতে হয়? সমস্ত গহনাই তোমার রামরতন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বাপ, না শ্বশুর। রঘুপতি তোমার না ছেলে? সৌদামিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আচ্ছা! না হয় তাহাই হইল।

কলিকাতায় কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া, রঘুপতি মাতা ও স্ত্রীকে লইয়া জলপথে আবাদে উপস্থিত হইয়া কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বুনারা রঘুপতিকে পাইয়া এবং বুনা রমণীরা কমলাকে পাইয়া মহা আনন্দিত হইল।

কমলা প্রত্যহ পূজা করিবার সময়ে মৃণ্ময় শিব গড়িয়া পূজা করিতেন। পূজাবসানে তিনি শিবের নিকট রামরতন বাবুর পুত্র কামনা করিতেন। শিব সতীর প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন। সৌদামিনীর প্রৌঢ়াবস্থার একটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল। কমলাই পুত্রের নাম শিবদাস ও কন্যার নাম শিব দাসী রাখিয়াছিলেন। যে বৎসরে সৌদামিনীর কন্যা জন্ম গ্রহণ করে সেই বৎসরের প্রথমেই বৈশাখ মাসে বৃদ্ধ দেওয়ানের মৃত্যু হইল। অবশেষ রঘুপতিই রামরতন বাবুর বাটীর দেওয়ান হইলেন।

রঘুপতি বাটী হইতে আবাদে গমন করিবার সময়ে গোবিন্দের পুত্র গদাকে লইয়া গিয়াছিলেন। গদাকেও জমি দিয়া নেপালের মত চাষ করিয়া দিয়াছিলেন। গদা একা সমস্ত চাষ রক্ষা করিতে না পারায় গোবিন্দও সপরিবারে আবাদ অঞ্চলে গিয়া বাস করিয়াছিল। রঘুপতি নেপালের বিবাহ দিয়াছিলেন। যে বৎসরে নেপালের বিবাহ হয় ঐ বৎসরে কমলার একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। সুন্দর বনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পুত্রের "সুন্দরী মোহন" নাম রাখিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

কাহার কুমারী?

জানি না তো আমি কাহার কুমারী,
কোথায় নিবাস, মাতাপিতা কেবা;
কোথাহতে কবে আসিয়াছি বলে,
কে মোরে রাখিয়া গেছে কতদিন,
কেন আছি? কার তরে? এ বিজনে,
কত ভাবি মনে, কিছু মনে নাই।
সুধুমাত্র মনে পড়ে বালিকা বয়সে—
ছিনু আমি একাকিনী রোম্য উপবনে।
মিছে কথা,—নানা,—আমি একাকিনী নয়,—
রূপবতী সখী দুটি ছিল মম পাশে;
উপবন বটে, কিন্তু নহে নিরাশ্রয়;—
মনোহর অট্টালিকা পাষাণে নির্ম্মিত—
থরে থরে সারি গাঁথা, বিচিত্র দর্শন।
ছোট ছোট থাম দেওয়া, নীচু নীচু ছাত,
দেওয়ালে পঙ্কেরকাজ পাথরের গায়,
দর্পনেরমত তাতে মুখ দেখা যেতো।
সাজানে গুজানো বেশ, অতি পরিপাটি;
সুকোমল শয্যা পাতা রজতের খাটে।
সখীদের সনে মিলে করিতাম খেলা,
হাসিতাম, নাচিতাম, গাহিতাম গীত,
ভাল কথা ফুটে নাই, আধআধ স্বরে
গাহিতাম শ্রীহরির মধুমাখা নাম।
কে যে হরি তা তখন নাহি জানিতাম,
তবু গাহিতাম গীত করতালি দিয়া।
(শুনিবে কি? শুনে কিন্তু অবাক হইবে।)
কচি মেয়ে, তবু সেই কচিদেহে মম—
অসম্ভব শক্তিছিল; কিজানি কেমনে—
হয়েছিল সেই দিনে সে শক্তি সঞ্চার।
তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, শিশু মাতঙ্গ সংহতি—

খেলা করিতাম আসি, সখিরা দেখিত।
উপবনে বাস, কিন্তু উপবাসী নয়,
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভোজ্য বাসিত সৌরভে—
সখীসহ করিতাম সুখেতে আহার।
কোথাহতে কে আনিত দিত যোগাইয়ে,
বুঝিবারে নারিতাম, দেখিতাম চেয়ে—
চারিদিকে জনপ্রাণি নাহি দিত দেখা!
সখীরা আমার চেয়ে বয়সেতে বড়,
কৌতুকে কহিত তারা লক্ষিয়া আমারে—
"দেবদূতে এনেদেয় এই রাজভোগ!
দেবতারা বুঝি তোরে এত ভালবাসে,
দেবরাণী হবি তুই হেন মনে লয়!
কিম্বা কোন ব্রহ্মদত্যি তোররূপ দেখে,
মোহিত হইয়ে গেছে বিবাহের আশে,
সেই বুঝি শূন্যপথে মায়া বিকাশিয়ে—
এই সব অন্নপানি উড়াইয়ে আনে!"
সখীদের ঐ কথা, কৌতুকে কৌতুকে—
হাসিতে হাসিতে তারা পড়িত ঢলিয়া।
আমার অধরে কিন্তু হাসি আসিত না।
অজ্ঞান বালিকা আমি বুদ্ধি ছিল কম,
তবু যেন কোথা হতে বুদ্ধি যোগাইত,
কে যেন কহিয়া দিত শ্রবণ কুহরে,
তাই শুনে মনে মনে আসিত বিশ্বাস;
হরিনাম করি আমি, হরিকে চিনি না,
হরি বুঝি কৃপাকরি স্বর্গধাম হতে—
অন্নরূপে সুধাদান করেন আমারে!
হরির প্রসাদ খেয়ে বাড়িত উল্লাস,
হৃষ্টপুষ্ট হইতাম হরির কৃপায়।
আজ আমি বলিতেছি আজকার কথা।
আজ আর আমি সেই কচি মেয়ে নই,

বয়সে হয়েছি এবে পূর্ণ পঞ্চদশী,
অঙ্কুরিত হইয়াছে নবীন যৌবন,
এখন যা দেখি শুনি, মনে থাকে সব ;
যে যাহা শুনিতে চায়, শুনাইতে পারি।
গতরাত্রে দেখিয়াছি অপূর্ব্ব স্বপন।
নবীন নধর মূর্ত্তি দূর্ব্বাদল শ্যাম,
ময়ূর পুচ্ছের চূড়া শোভিত মস্তকে,
অলকা তিলকা কাটা শ্রীমুখমণ্ডলে,
করপুটে শোভাকরে মোহন মুরলী;
আমার শিহরে বসি, মধুর বচনে—
"আপনারে নাজানি কানন বাসিনী!
আমার সেবিকা তুই ছিলি সুরলোকে;
কামনায় পৃথিবীর সুখভোগ হেতু—
লয়েছিল মর্ত্ত্যধামে নূতন জনম।
রাজার কুমারী তুই এ অবনী পুরে।
সংসারের লীলা খেলা সাঙ্গ হবে যবে,
আবার হইবি তুই বৈকুণ্ঠ বাসিনী।"
তখনি ভাঙ্গিল ঘুম, আঁখি কচালিয়া—
চেয়ে দেখি, হায় হায়! সে মূরতি নাই!
সব অন্ধকারময় এ পোড়া নয়নে!
আহা মরি! কি স্বপন কিসুন্দর রূপ!
কি সুন্দর কথাগুলি! এখনো বাজছে—
যুগল শ্রবণে সেই মধুর ঝঙ্কার!
সত্য বুঝি হবে তাই, সত্য বুঝি হবে,
দাসীরে করুণা করি এসেছিলা হরি!
অহো! কি আশ্চর্য্য কথা শুনিনু স্বপনে!
রাজার কুমারী আমি কানন বাসিনী!
কে সে রাজা? জানি যদি জ্ঞানের উদয়ে,
জানাইব, তোমাদের, এই অঙ্গীকার।

ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

লেখক ;—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিশ্বাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, একদিন দেবেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্র বাবু ও তিন চারিটী ভক্তের সহিত বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব দেখিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে উপেন্দ্রবাবুর একটী আত্মীয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি প্রথমে, দেবেন্দ্রনাথকে এবং যাঁহারা দেবেন্দ্র-নাথের নিকট যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে নিন্দা ও বিদ্রুপ করিতেন। পরে ইনি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিত এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি রোগ শয্যায় শায়িত হইয়াও এবং দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আপনার গুরুদেবের প্রতি ও ভগবান রামকৃষ্ণদেবের প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাস ও অদ্ভুত ভক্তি দেখাইয়া বীরের ন্যায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা আছে শীঘ্রই এঁর একখানি জীবনী লিখিয়া, এঁর কার্য্য সকল আমরা তাহাতে প্রকাশ করিব।

ভক্তটী উপস্থিত হইলে, উপেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে তুমি আমাদের সঙ্গে বেলুড় মঠে যাবে"? ভক্তটী ছেলেবেলা থেকেই বড় হৈ চৈ ভালবাসিতেন এবং আহারের উপর বড় ঝোঁক ছিল। ভক্তটী বলিলেন, "সেখানে ঘেঁট হবে তো"? উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তুমি যা ভালবাস, খিচুড়ী আলুরদম সেখানে যথেষ্ট পাওয়া যাবে"। ভক্তটী মনে মনে বলিলেন, "এদের ব্যাপারটা কি একবার দেখেই আশা যাক্ না, ফিরে এসে আরও বেশী কোরে ঠাট্টা করা যাবে"। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভাই, তোমরা যদি আমার যাবার আস্বার খরচ দাও, তাহ'লে আমি যেতে রাজি আছি" উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আচ্ছা আমি তোমার খরচ দিব"। ভক্তটী যাইতে স্বীকৃত হইলে, উপেন্দ্রবাবু তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী আনাইলেন। পরে আহিরীটোলার ঘাটে পৌছাইয়া, নৌকা করিয়া সকলে বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন।

ভক্তটী আর একটী ভক্তের সহিত চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন; এই অপূর্ব্ব ভক্ত-সম্মিলন ভক্তটীর বড়ই ভাল লাগিল। ভক্তটী অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন, কত দেশ-দেশান্তর হইতে কতলোক আসি-তেছেন, নানাস্থান হইতে নানা সম্প্রদায়ের লোক সকল আসিতেছেন—শৈব। বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গানপত্য, কর্ত্তাভজা, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা, ভক্তি ও আগ্রহের সহিত পরমহংসদেবের জন্মোৎসব দেখিতে আসিতেছেন। আর দেখিলেন, পণ্ডিত, পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া, ধনী, ধনের অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, অতি দীনভাবে করজোড়ে পরমহংসদেবের ছবির দিকে একদৃষ্টে

চাহিয়া আছেন। দেখিলেন, সন্ন্যাসী গৃহী সকলে একসঙ্গে সমবেত হইয়া প্রাণের সহিত, ভক্তির সহিত মুহুর্মুহুঃ রামকৃষ্ণদেবের জয়ধ্বনি করিতেছেন। দেখিলেন, পূর্ব্বেকার ঋষিদিগের ন্যায় সন্ন্যাসীরা অতি সুমধুর স্বরে বেদ পাঠ করিতেছেন, আর দর্শকমণ্ডলী একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতেছেন। ঐসময়ে ভক্তটী দেখিলেন, যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীর উপর কি এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ পড়িয়াছে; তাঁহার বোধ হইল, সমগ্র মানব মণ্ডলী যেন কি এক স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছে। তারপর দেখিলেন, নানাসম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তনের দল আসিয়া ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে করিতে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ভক্তটীর হৃদয় গলিয়া গেল। আহার ও বিদ্রূপের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবলই ঠাকুরের চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, " পরমহংসদেব কি মানুষ? যদি মানুষই হ'ন, তাহ'লে আমাপেক্ষা যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। নিশ্চয়ই ইনি মহাত্মা লোক, না হ'লে এই সকল বিদ্বান ধনবানেরা—যাঁদের দরজায় গিয়ে খোষামদ কোরে দেখা পাওয়া যায়না, তাঁরা আজ দীনের দীন হীনের হীন হ'য়ে, জয় রামকৃষ্ণদেবের জয় বোলে মর্ম্মভেদী চীৎকার কোর্ব্বে কেন" ? ভক্তটী ভগবান রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে প্রসাদ পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রবাবু প্রভৃতির সহিত ইটালীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ভক্তটী সেদিন রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, কেবলই পরমহংসদেবের চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ইনি নিশ্চয়ই ভগবান. না হ'লে এত লোক এঁর শরণাগত হবে কেন? আজ থেকে আমিও এঁকে ভগবান বলিব। লোকে হাঁসে হাঁসুক, বিদ্রূপ করে করুক, নিন্দা করে করুক, আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করিবনা, কাহারও কথায় কর্ণপাত করিবনা, আজ থেকে আমি রামকৃষ্ণদেবকে ভগবান বোলে পূজা করিব। আমার মন প্রাণ যখন এঁকে ভগবান বোলে পূজা করতে চাচ্ছে, তখন আমি লোকের কথা কেন শুনবো ? আমিত আর কোন মন্দ কার্য্য কোর্ত্তে যাচ্ছিনা, না হয় একজন সাধুপুরুষকে ভগবান বোলে পূজা কোর্ব্বো। আমাদের শাস্ত্রেতো আছে, যাঁকেই ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করনা কেন, ভগবানই গ্রহণ করেন। আমিও রামকৃষ্ণদেবকে ভগবান বোলে পূজা কোর্ব্বো, ভগবানই গ্রহণ কোর্ব্বেন।

আবার ভাবিতে লাগিলেন, " অহো ! রামকৃষ্ণভক্তদের প্রাণখুলে সংকীর্ত্তনদেখে' আমার বড়ই ভাল লেগেছে। আচ্ছা, আমরাতো সন্ধ্যারপর ইয়ারকী দিয়ে বেড়াই, তার পরিবর্ত্তে ঐ সময়ে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের নাম গান কোরলে হয়না ? হয়না কি ! নিশ্চয়ই কোর্ব্বো—কাল থেকেই আরম্ভ কোর্ব্বো। রাত পোহালে মজুমদার মহাশয়ের (ইটালীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, দেবেন্দ্রনাথকে মজুমদার মহাশয় বলিয়া ডাকিতেন।) কাছে গিয়ে দুটী পায়ে

ধোরে বোল্‌বো, মশাই, আমার এই আশাটী আপনাকে পূর্ণ কোরতেই হবে। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, তিনি নিশ্চয়ই আমার আশা পূর্ণ করিবেন”। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রশেষে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, দেবেন্দ্রনাথ, তাঁহার মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দিয়া, অতি মধুরস্বরে বলিতেছেন, “বৎস! আমি আশীর্ব্বাদ কোর্‌ছি তোমার এ শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে”। ভক্তটীও সেই সময়ে জয়গুরু জয়গুরু বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর ভক্তটী ঠাকুরের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, “হে ঠাকুর! এই অধমের প্রতি আজ তুমি অহৈতুকী দয়া দেখালে। আজীবন বিলাসিতা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা প্রভৃতি ঘৃণিতকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলাম, কখনও তোমার নাম শ্রদ্ধা পূর্ব্বক স্মরণ করি নাই, বরং তোমার নিন্দা করিয়া বেড়াইতাম এবং যাঁহারা তোমার আশ্রিত ভক্ত তাঁহাদিগেরও নিন্দা করিয়া বেড়াইতাম। এক্ষণে আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, এই গুরুতরপাপে আমার অনন্তকাল নরকাগ্নিতে পুড়িতে হইত। কিন্তু হে দয়াল ঠাকুর, তোমার অহৈতুকী কৃপার বলে, আজ তোমার যোগীজনবাঞ্ছিত নাম শ্রদ্ধা পূর্ব্বক করিতে ইচ্ছা করিতেছে, আজ তোমার পাতকীতারণ নামের বলে, এই অধম পাপীরও আশ্বাস হচ্চে, এই নরকাগ্নি হইতে রক্ষা পাইব। হে প্রভু, অধম মহাপাপীর প্রতি আজ যে কৃপা দেখালেন, এই কৃপা হ'তে যেন আর বঞ্চিৎ না হই, এই কৃপা যেন কখনও না ভুলি”। ভক্তটী এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করিয়া, হাত মুখ ধুইয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকট গমন করিলেন।

ভক্তটী দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইলে, দেবেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গো বাবু, সকাল বেলা কি মনে করে”? ভক্তটী জোড়হাত করিয়া অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, “মশাই আপনার নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে, আপনি অভয় দেন তো বলি”। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, “আমার নিকট অত কিন্তু হবার আবশ্যক কি, তোমার কি বক্তব্য আছে সচ্ছন্দে বল”।

ভক্তটী দেবেন্দ্রনাথের আশ্বাসবাণী পাইয়া বলিলেন, “মশাই, কাল বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণভক্তদের সংকীর্ত্তন দেখিয়া আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, ইচ্ছা হচ্ছে, আফিস থেকে এসে বাজে ইয়ারকি না দিয়া ঐরূপভাবে সংকীর্ত্তন করি”।

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, “এতো খুব ভাল কাজ, মানুষ মাত্রেরই এরূপ মহৎ ইচ্ছা হওয়া উচিত। তোমার এই শুভেচ্ছায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলেম. ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার এই শুভেচ্ছা আরও বৃদ্ধি হউক”।

ভক্তটী অতি দীনভাবে বলিলেন, "মশাই, আমরা কিছু জানিনা, আপনাকে দয়া কোরে আমাদের রামকৃষ্ণনাম শেখাতে হবে, না হলে আমাদের আর অন্য উপায় নাই"।

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বাপু আমি কি জানি যে শেখাব—আমি যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। তবে এই শুভকার্য্যে তোমাদের সহিত যোগদান করিব"।

ভক্তটী ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মশাই, আপনি আমদের সঙ্গে থাক্‌লেই যথেষ্ট হবে"। এই বলিয়া ভক্তটী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়ীতে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "তাইতো, মজুমদার ম'শাইকে তো সংকীর্ত্তনের কথা বোলে এলাম' এখন সংকীর্ত্তন হবার স্থান কোথায়? বাহিরের একটী ঘর নাই যে সেইস্থানে সংকীর্ত্তন করি। বাহিরে বসিবার যে স্থানটী ছিল, তাও বাড়ীওয়ালা অধিকার করিয়াছে, স্তুপাকার করিয়া চুন রাখিয়াছে। এখন দেখছি ঐ চুন পরিস্কার করিয়া স্থান না করিলে, সংকীর্ত্তন করিবার অন্য উপায় নাই। যা হোক, যে কোন প্রকারে এ চুন পরিস্কার করিতেই হইবে"।

ভক্তটী যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, ঐ সময়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু (ইনি ভক্তটীর বন্ধু এবং দেবেন্দ্রনাথকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তটী নগেন বাবুকে দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন—অকুল সমুদ্রে ভাসমান ব্যক্তি যেন একটী আশ্রয় পাইল। ভক্তটী নগেন বাবুকে প্রাণের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিয়া, পরিশেষে বলিলেন, "এই চুন পরিস্কার করিবার কি হবে"?

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তার আর কি! এসনা হাতাহাতি কোরে পরিস্কার কোরে ফেলা যাক, সবটা না হয়, অর্দ্ধেকটা কোরে আজ থেকেই কার্য্যারম্ভ কোরে দেওয়া যাক"। তখন উভয়ে চুনের গাদা পরিস্কার করিতে লাগিলেন, ঐ সময়ে আরও দুইটী ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উঁহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধেক পরিস্কার হইলে ভক্তটী তৎক্ষণাৎ দরমা ক্রয় করিয়া বেড়া দেওয়াইলেন। সেদিন আফিস কামাই করিলেন; আহারাদির পর খোল, করতাল এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি ক্রয় করিতে বহির্গত হইলেন। খোল করতাল ক্রয় করিয়া ঠাকুরের বড় ছবির জন্য অনেক স্থান ঘুরিলেন, কোথায়ও পাইলেন না। শেষে একখানি ছোট ছবি ক্রয় করিয়া, তাহাকে বাঁধাইয়া বাড়ীতে

ফিরিলেন।

ভক্তটী বাড়ীতে ফিরিয়া শ্রীযুক্ত নগেন বাবুকে ও আর দুইটী ভক্তকে বলিলেন, " সংকীর্ত্তনের আসবাব তো একরকম যোগাড় হল' এখন সংকীর্ত্তন কর্‌বার লোক কোথা '' ?

একটী ভক্ত বলিলেন, " কেন, আমাদের সংকীর্ত্তন কর্‌বার লোকও তো যোগাড় রয়েছে ! এই দেখনা, তুমি. আমি, নগেন. চন্দ্র, সতীশ, চারু আর মজুমদার মশাই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বোলেছেন, এই কজনেই বেশ সংকীর্ত্তন হবে, একবার আরম্ভ হ'লে অনেক লোক জুট্‌বে "।

আর একটী ভক্ত বলিলেন, " কালীদাদাকে (ইনি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিত ও রামকৃষ্ণভক্ত ছিলেন; এঁর নাম সংকীর্ত্তনে বড়ই অনুরাগ ছিল। ইনি দেহত্যাগ করিবার সময় আপনার গুরুদেবকে সম্মুখে রাখিয়া অনবরত ঠাকুরের নাম করিয়াছিলেন। এঁর নামসংকীর্ত্তনে যথার্থ অনুরাগ ছিল বলিয়া, প্রাণ বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, হঠাৎ একটী সংকীর্ত্তনের দল তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গিয়াছিল।) নিলে হয়না ? কালীদাস সংকীর্ত্তন পাগল লোক, আমার বিশ্বাস সংকীর্ত্তনের নাম শুন্‌লে নিশ্চয়ই আস্‌বে "।

প্রথম ভক্তটী তৎক্ষণাৎ নগেন বাবুকে সঙ্গে করিয়া কালীদাদার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কালীদাদা তখন বাড়ীতেই ছিলেন, আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভক্তটী সংকীর্ত্তনে যোগদানের জন্য কালীদাদাকে মিনতি করিয়া অনেক কথা বলিলেন। কালীদাদা সংকীর্ত্তনের নাম শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং ভক্তটীকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়া শেষে বলিলেন, আমি সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই যাব। কালীদাদার উৎসাহিত বাক্য শুনিয়া ভক্তটী প্রসন্নচিত্তে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন;

সন্ধ্যার সময় ভক্তটী একাকী রামকৃষ্ণ নাম স্মরণ করিতে করিতে, দেবেন্দ্রনাথের বাসায় উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানে শ্রীযুক্ত সতীশবাবু (ইনি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিত ও রামকৃষ্ণভক্ত) ও চারু বাবু উপস্থিত ছিলেন। ভক্তটী যোড়হাত করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিতে লাগিলেন, " মশাই ! কৃপা কোরে আজ থেকেই আমাদের রামকৃষ্ণ নাম শেখাতে হবে !

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, " সংকীর্ত্তনের খোল করতাল যোগাড় কোরেছ কি " ? ভক্তটী তখন একে একে সকল কথাই বলিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ভক্তটীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, " ধন্য তুমি, ধন্য তোমার

ফিরিলেন।

ভক্তটী বাড়ীতে ফিরিয়া শ্রীযুক্ত নগেন বাবুকে ও আর দুইটী ভক্তকে বলিলেন, " সংকীর্ত্তনের আসবাব তো একরকম যোগাড় হল' এখন সংকীর্ত্তন করবার লোক কোথা '' ?

একটী ভক্ত বলিলেন, " কেন, আমাদের সংকীর্ত্তন করবার লোকও তো যোগাড় রয়েছে ! এই দেখনা, তুমি, আমি, নগেন, চন্দ্র, সতীশ, চারু আর মজুমদার মশাই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বোলেছেন, এই কজনেই বেশ সংকীর্ত্তন হবে, একবার আরম্ভ হ'লে অনেক লোক জুটবে "।

আর একটী ভক্ত বলিলেন, " কালীদাদাকে (ইনি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিত ও রামকৃষ্ণভক্ত ছিলেন; এঁর নাম সংকীর্ত্তনে বড়ই অনুরাগ ছিল। ইনি দেহত্যাগ করিবার সময় আপনার গুরুদেবকে সম্মুখে রাখিয়া অনবরত ঠাকুরের নাম করিয়াছিলেন। এঁর নামসংকীর্ত্তনে যথার্থ অনুরাগ ছিল বলিয়া, প্রাণ বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, হঠাৎ একটী সংকীর্ত্তনের দল তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গিয়াছিল।) নিলে হয়না ? কালীদাস সংকীর্ত্তন পাগল লোক, আমার বিশ্বাস সংকীর্ত্তনের নাম শুন্‌লে নিশ্চয়ই আস্‌বে "।

প্রথম ভক্তটী তৎক্ষণাৎ নগেন বাবুকে সঙ্গে করিয়া কালীদাদার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কালীদাদা তখন বাড়ীতেই ছিলেন, আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভক্তটী সংকীর্ত্তনে যোগদানের জন্য কালীদাদাকে মিনতি করিয়া অনেক কথা বলিলেন। কালীদাদা সংকীর্ত্তনের নাম শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং ভক্তটীকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়া শেষে বলিলেন, আমি সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই যাব। কালীদাদার উৎসাহিত বাক্য শুনিয়া ভক্তটী প্রসন্নচিত্তে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন ;

সন্ধ্যার সময় ভক্তটী একাকী রামকৃষ্ণ নাম স্মরণ করিতে করিতে, দেবেন্দ্রনাথের বাসায় উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানে শ্রীযুক্ত সতীশবাবু (ইনি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিত ও রামকৃষ্ণভক্ত) ও চারু বাবু উপস্থিত ছিলেন। ভক্তটী যোড়হাত করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিতে লাগিলেন, " মশাই ! কৃপা কোরে আজ থেকেই আমাদের রামকৃষ্ণ নাম শেখাতে হবে !

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, " সংকীর্ত্তনের খোল করতাল যোগাড় কোরেছ কি " ? ভক্তটী তখন একে একে সকল কথাই বলিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ভক্তটীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, " ধন্য তুমি, ধন্য তোমার

অধ্যবসায়! এইরূপ অধ্যবসায়েই ভগবান লাভ হয়"। দেবেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু ও চারু বাবুকে সঙ্গে লইয়া ভক্তটীর সহিত, তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত হরিবাবু ও চন্দ্রবাবু দেবেন্দ্রনাথের আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত হওয়াতে, প্রথমে উভয়ে, পরে সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কালীদাদাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, এখন তোমরা ওরূপভাবে চীৎকার করিওনা, এখন শুধু ধীরে ধীরে কার্য্য কোরে যাও। প্রথমে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম কোরতে হবে, অনেক সহ্য কোর্ত্তে হবে"। ঠাকুর বোলতেন, "শ, ষ, স, তবে র'"। এই কথা কয়েকটী বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির দিকে চাহিয়া ওঁ গুরুদেব, ওঁ গুরুদেব বলিয়া প্রণাম করিলেন। ভক্তরাও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথকে জয় গুরু শ্রদ্ধার সহিত পদধুলি গ্রহণ করিলেন।

ভক্তরা দেবেন্দ্রনাথের জন্য একটী স্বতন্ত্র আসন করিয়াছিলেন; দেবেন্দ্রনাথ আপনিই তাহাতে উপবেশন করিলেন। পরে, ভক্তদিগকে মধুরবাক্যে উপবেশন করিতে বলিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অনুমতি পাইয়া, ভক্তরা প্রফুল্লচিত্তে একে একে উপবেশন করিলেন।

ভক্তটী উপবেশন করিয়া, দেবেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া, অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। কষ্টের কারণ এই, যে স্থানটী অতি কদর্য্য, সেঁৎসেঁতে, চুনের ঝাঁজ নাকে লাগিতেছিল, উচিংড়া; আরশোলা উড়িয়া গায়ে পড়িতেছিল, এই সকল ব্যাপারে ভক্তটীর হৃদয়ে দারুন আঘাত লাগিয়া, কষ্ট হইতেছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ভক্তটীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, দেখ বাবা, তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হয়োনা। আমি সত্য কোরে বোলছি আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয়না, ঠাকুরের নামে তোমাদের রুচি হয়েছে দেখে, আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে, তোমাদের সঙ্গে ঠাকুরের নাম কোর্ব্বো, এস্থান আমার স্বর্গাধিক বোধ হচ্ছে। ঠাকুরের নাম কোরে কার্য্যারম্ভ করা যাক, ঠাকুরের ইচ্ছা হয়তো এই স্থানই স্বর্ণমন্দিরে পরিণত হইতে পারে! এই কথা কয়েকটী বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ওঁ গুরুদেব, ওঁ গুরুদেব বলিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। পুনরায় ওঁ গুরুদেব' ওঁ গুরুদেব বলিয়া, ঠাকুরের ছবির দিকে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভক্তরা একাগ্রচিত্তে, একদৃষ্টে

দেবেন্দ্রনাথের কার্য্য সকল দেখিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সকল দেব দেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, ভগবান, ভক্ত, ভাগবৎ তিন এক বলিয়া শেষে প্রণাম করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেই দিনই বদ্ধ জীবকে উত্তেজিত করিবার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত রচনা করিয়া ছিলেন, গীতখানি লইয়া ভক্তটীর হাতে দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন; "দেখ, তোমাদের এগান ভাল লাগবে তো"? গানটীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, গানটী সম্পূর্ণ জানিতে ইচ্ছা হইলে, দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত দেব-গীতিতে পাইবেন।

ঝিঁঝিট—একতালা।

"দিবা-বিভাবরী, ডাক প্রাণ ভরি, জয় রামকৃষ্ণ ব'লে।
পাপ তাপ যাবে, প্রাণ জুড়াইবে, নামেরি মহিমা বলে॥
তরু-পত্র প্রান্তে লম্বিত নীহার, জান কি পতনে কি বিলম্ব তার,
পদ্মপত্রে জল, জীবন চঞ্চল, কেমনে রয়েছ ভুলে॥" (ইত্যাদি)

ভক্তটী গানখানি শ্রদ্ধার সহিত মস্তকে ধারণ করিয়া, শেষে পাঠ করিয়া বলিলেন, "মশাই এ অতি সুন্দর হয়েছে, আমার মনে হচ্চে ম'শাই, আমাদের অবস্থা দেখে, আমাদের চৈতন্য করিবার জন্য এই সংগীত খানি রচনা করিয়াছেন"। দেবেন্দ্রনাথ কিছু বলিলেন না, কেবল ঠাকুরের ছবির দিকে চাহিয়া একটু মৃদুহাস্য করিলেন। ভক্তটী গানখানি কালীদাদার হাতে দিয়া বলিলেন, "এর সুর ঠিক কর"। কালীদাদা ও সূর্য্যবাবু উভয়ে মিলিয়া গানখানির সুর ঠিক করিলেন। তখন সকলে মিলিয়া, খোল করতালের সহিত উপর্য্যপরি গানখানি গাহিতে লাগিলেন। জানিনা, মহাপুরুষের সঙ্গগুণে, অথবা নামের গুণে, ভক্তরা এরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, তিন ঘণ্টা কাল কোথায় দিয়া যে গিয়াছিল, তাহা তাঁহারা কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই।

দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যহই সন্ধ্যার পর যাতায়াত করিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি হয়, ভক্তদিগকে অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তরা দেবেন্দ্রনাথের শ্রীমুখ নিঃসৃত উপাদেয় উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। প্রত্যহই সংকীর্ত্তন হইত; দেবেন্দ্রনাথও প্রায় প্রত্যহই একখানি করিয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। ইটালীর রামকৃষ্ণঅর্চ্চনালয় উপরোক্তরূপে আরম্ভ হইয়াছিল।

* দেব-গীতির প্রাপ্তব্য স্থান ২০ নং দের লেন, পোঃ অঃ ইটালী) শ্রীরামকৃষ্ণঅর্চ্চনালয়) কলিকাতা।